রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

তৃতীয় খণ্ড

১২৯২-১৩০০

প্রশান্তকুমার পাল

শ্রীযুক্ত শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মুখবন্ধ

রবিজীবনীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ১২৯২ থেকে ১৩০০ বঙ্গাব্দ—রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চবিংশ বৎসর থেকে ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর পর্যন্ত নয়টি বছর এই খণ্ডের উপজীব্য।

এই গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হলে খুশি হতাম—পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত থাকলেও প্রকাশকের অসুবিধার জন্য গ্রন্থভুক্ত করা যায় নি। তেমনি ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাস বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হলে সাধনা-পর্বের রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার ভাববৃত্তটি সম্পূর্ণ হত—কিন্তু লেখকের অক্ষমতাবশত তা সম্ভব হয় নি, এর জন্য আমি আন্তরিক ভাবেই লজ্জিত আছি।

গ্রন্থটির পূর্ববর্তী দুটি খণ্ড বিক্রয়ের দিক দিয়ে আশানুরূপ জনসমাদর না পেলেও রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকসমাজের কাছে আদৃত হয়েছে, অনেক পাঠক ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করে বা পত্রে তাঁদের খুশির কথা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ—এই কঠিন পরিশ্রম-সাপেক্ষ কাজে তাঁদের প্রীতি আমার অন্যতম পাথেয়।

রবিজীবনী-র প্রথম খণ্ডটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারে 1982-84 কালপর্বের শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ হিশেবে 'নরসিংহদাস পুরস্কার'-এ সম্মানিত হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য আমাকে 'সুরেশচন্দ্র স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার' [1985]-এ ভূষিত করেছেন। এঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই উৎসাহের প্রয়োজন ছিল।

প্রয়োজন ছিল বা আছে আরও অনেক-কিছুর। সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল জীবিকার জন্য নিত্যকর্মের থেকে দীর্ঘকালের জন্য অব্যাহতি—যাতে আমি অনেকদিন শান্তিনিকেতনে থেকে আমার সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তি এই কাজে নিয়োজিত করতে পারি। আনন্দমোহন কলেজের কর্তৃপক্ষ ও বাংলা বিভাগের সহকর্মীরা আমার কর্মভার কমিয়ে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছেন, কিন্তু আমার পক্ষে তা যথেষ্ট না হওয়ায় আরও সুযোগের জন্য বিভিন্ন দ্বারে বৃথাই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কাজ বন্ধ করে দেবার হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত নেবার আগে শেষ চেষ্টা হিশেবে বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য ড নিমাইসাধন বসুর দ্বারস্থ হই। আশ্চর্য সৌজন্যে ও উদারতায় তিনি আমার বক্তব্য শোনেন ও তাঁরই অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রধান অভীককুমার সরকার মাসিক আড়াই হাজার টাকার 'অশোককুমার সরকার স্মৃতি বৃত্তি-প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই বৃত্তির জন্য আমাকে নির্বাচিত করেছেন। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই—আমার প্রয়াসের যদি কিছুমাত্র সদর্থক মূল্য থাকে, আশা করি, ভাবীকাল এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করবে।

রবীন্দ্রভবনের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কাছে আমি যথারীতি সর্বপ্রকার সাহায্য পেয়েছি। অধ্যক্ষ ড নরেশ গুহ, প্রাধিকারিক দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অবেক্ষক ড সনৎ বাগচী, গ্রন্থাগারিক সুপ্রিয়া রায়, শ্রুতি-দৃশ্য বিভাগের প্রধান অজিত পোদ্দার সর্বদা লক্ষ্য রেখেছেন যাতে আমার কাজের কোনো অসুবিধা না হয়। তাছাড়া আশিস হাজরা, তুষার সিংহ, দিলীপ হাজরা, রামগোপাল চক্রবর্তী, ড গৌরচন্দ্র সাহা, নন্দকিশোর

মুখোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী যেভাবে আমার জন্য পরিশ্রম করেছেন, তা বার বার উল্লেখ করতে হয়। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী স্বপনকুমার ঘোষ শুধু তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক কর্তব্য করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, আমার ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি প্রয়োজন মেটাবার দিকেও সর্বদা তৎপর থেকেছেন। বোলপুর পুস্তকালয়ের অহীন্দ্র নায়েক ও সুবর্ণরেখা-র ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সাহায্য ছাড়া শান্তিনিকেতনে থেকে এই বই ছাপানো শক্ত হত। এঁদের আমার আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য ড নিমাইসাধন বসু ও রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ ড নরেশ গুহ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অপ্রকাশিত উপাদান ব্যবহারে অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।

ড কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ফাইল দেখতে দিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এসপ্ল্যানেডে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের সংবাদপত্র-শাখা, চাংড়িপোতার বিদ্যাভূষণ গ্রন্থাগার প্রভৃতির কর্মীদের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি-র সম্পাদক আনন্দ মুখোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত স্কেচগুলি দেখতে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।

'নির্দেশিকা'-প্রস্তুতে আমার দুই কন্যা কল্যাণীয়া শ্রাবণী ও শ্যামলী অনেক সাহায্য করেছে। তাদের শুভ কামনা করি। আর যাঁর নীরব ত্যাগ ছাড়া এই কাজ অব্যাহত রাখা সম্ভবই হত না, গ্রন্থপ্রকাশের শুভ মুহূর্তে তাঁর কথা ভুলে থাকা শক্ত।

রবিজীবনীর প্রথম দুটি খণ্ডের প্রকাশক 'ভূর্জপত্র' একজন অখ্যাত লেখকের গ্রন্থপ্রকাশে সাহস করে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে আমি এর জন্য সশ্রদ্ধভাবে কৃতজ্ঞ।

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের কর্ণধার বাদল বসুর আন্তরিক আগ্রহে নূতন চেহারায় এই খণ্ডটির প্রকাশ সম্ভব হল। কিন্তু আধুনিক মুদ্রণপদ্ধতির সঙ্গে তাল মেলানোর ব্যাপারে আমার অজ্ঞতার জন্য সম্ভবত কিছু কিছু ত্রুটি পাঠকের নজরে পড়বে। এর জন্য আগাম মার্জনা ভিক্ষা করে রাখছি। একটি 'শুদ্ধিপত্র' সংযোজিত হল। পাঠকেরা অনুগ্রহ করে গ্রন্থপাঠের পূর্বে সংশোধন করে নিলে ভালো হয়।

শান্তিনিকেতনে এসে যে-মানুষটির সংস্পর্শে কৃতার্থ হয়েছি, তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়ির মানসিক আভিজাত্যের প্রতিনিধি, অসামান্য স্মৃতিধর, সহৃদয়, উদার এই মানুষটি নিজেকে অন্তরালে রেখে বিভিন্ন জনের সাহায্যে রবীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রটি সুনিপুণভাবে প্রস্তুত করে রেখেছেন রবীন্দ্রভবনে। তাঁর স্নেহ লাভ করেছি, আমার জীবনে এ এক বড়ো প্রাপ্তি। বর্তমান খণ্ডটি তাঁকে উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

রবীন্দ্রভবন
শান্তিনিকেতন-৭৩১২৩৫
পাল ৭ পৌষ, ১৩৯৩

প্রশান্তকুমার পাল

বিষয়সূচী

পাঠ নির্দেশ

এই গ্রন্থ-রচনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পুস্তকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-র বিভিন্ন খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে পৃষ্ঠাঙ্কের সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে উদ্ধৃতি বা উল্লেখের মূল খুঁজে পেতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না ভেবে সংস্করণ বা মুদ্রণ-তারিখ নির্দেশিত হয় নি। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে পাদটীকায় প্রথম উল্লেখের স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ-সন দেওয়া হয়েছে। দণ্ড চিহ্নের পরের সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।

গ্রন্থের মূল পাঠে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত তারিখগুলি সাধারণত পুরোনো পঞ্জিকা বা Ephimeris অবলম্বনে নির্ধারিত। উদ্ধৃতির মধ্যে এইরূপ বন্ধনী-মধ্যস্থ শব্দ বা শব্দগুলি আমরা যোগ করেছি। মূলের বানান সাধারণত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। [?]-চিহ্ন সংশয়-সূচক। উদ্ধৃতি ছাড়া অন্যত্র খৃস্টাব্দ সর্বদাই ইন্দো-আরবীয় হরফে [1, 2, 3…ইত্যাদি] লিখিত, 'শক' শব্দটির ব্যবহার না থাকলে বাংলা হরফে লেখা অব্দগুলিকে বঙ্গাব্দ বুঝতে হবে।

শব্দ-সংক্ষেপণ

জীবনস্মৃতি ১৭। ২৭৩ : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ, পৃ ২৭৩।

'পিতৃস্মৃতি', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [১৩৭৫]। ১৫২ : ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধ, পৃ ১৫২

র°র° ১ [প. ব.]। ১০৮-১০; পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী-র আধুনিক সংস্করণের ১ম খণ্ডের পৃ ১০৮ থেকে ১১০।

বি. ভা. প. ১৮। ৪। ৩৮৯ : বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩৮৯।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সা-সা-চ ৩। ৪৫। ১০ : সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩য় খণ্ড ৪৫ সংখ্যক 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থের পৃ ১০।

অগ্র° : অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ব° : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

গীত : গীতবিতান।

স্বর : স্বরবিতান।

গবেষণা-গ্রন্থমালা : রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা, প্রফুল্লকুমার দাস-রচিত।

ত্রিবেণীসংগম : রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম, ইন্দিরা দেবী-রচিত।

সাধনা ও সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য, ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য-রচিত।

রবিজীবনী

প ঞ্চ বিং শ   অ ধ্যা য়

১২৯২ [1885-86] ১৮০৭ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চবিংশ বৎসর

১ বৈশাখ [সোম 13 Apr 1885] মহর্ষিভবনে নববর্ষ-উৎসব দিয়ে যে বৎসরটির সূচনা হল, পূর্ব বৎসরে রচিত তিনটি ব্রহ্মসংগীত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে বরণ করলেন :

১. দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখতাপ ২. দুখের কথা তোমায় বলিব না ৩. গাও বীণা, বীণা গাওরে—এগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি।

বৎসরের শুরুতেই তাঁর যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল সেটির নাম 'আলোচনা', বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকা অনুসারে গ্রন্থপ্রকাশের তারিখ 15 Apr 1885 [বুধ ৩ বৈশাখ], মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০, মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে শুধু 'আলোচনা।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।' শব্দগুলি মুদ্রিত করে অন্যান্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় : 'আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা।'[১]

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২ [আখ্যাপত্র]+২ [উৎসর্গ]+৪ [সূচীপত্র]+১৩৩

গ্রন্থটি মহর্ষিকে উৎসর্গীকৃত : 'উৎসর্গ।/ এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।/ গ্রন্থকার।'

ছোটো ছোটো শিরোনাম-যুক্ত অনুচ্ছেদে বিভক্ত ছ-টি প্রবন্ধ ভারতী-র চৈত্র ১২৯০, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১২৯১ ও তত্ত্ববোধিনী, শ্রাবণ ১৮০৬ শক [১২৯১] এবং নবজীবন, কার্তিক ১২৯১ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। 'হিতবাদীর উপহার' রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী-তে [1904] ও রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে [1941] আলোচনা পুনর্মুদ্রিত হয়।

এর পরে 'পদরত্নাবলী' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৯২-তে, যদিও বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকায় প্রকাশের তারিখ 25 Jun [বৃহ ১২ আষাঢ়]। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র : 'পদরত্নাবলী।/ অর্থাৎ/ মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা/ গুলির একত্র সংগ্রহ। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ও/ শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক/ সম্পাদিত।/ শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার দ্বারা প্রকাশিত।/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা/ মুদ্রিত।/ ৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত।/ বৈশাখ ১২৯২।/ মূল্য এক টাকা।'

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২ [আখ্যাপত্র]+২ [নিবেদন]+৬ [সূচীপত্র]+২০ [ভূমিকা]+১০৮। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস জানিয়েছেন : 'আমরা শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদারের নিকট আর এক খণ্ড 'পদরত্নাবলী' দেখিয়াছি; উহা ৮১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রথমে এই সংস্করণের কয়েক খণ্ড পুস্তক সম্ভবতঃ বাজারে

বিক্রয় হইয়াছিল। তাহার পর "রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক" কতকগুলি পদ সন্নিবেশিত করা একান্ত প্রয়োজন বোধ হওয়ায়, উহার সহিত কেবলমাত্র "নিবেদন" ল০ পৃষ্ঠা, "সূচীপত্র" ৬ পৃষ্ঠা এবং "রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক" পৃঃ ৮২-১০৮ যোগ করিয়া 'পদরত্নাবলী' পুনঃ প্রকাশিত হয়; এই সংস্করণের উল্লেখই বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় আছে।'[২] এই বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রথম প্রকাশকালে 'নিবেদন' অংশটি ছিল না, 'সূচীপত্র'-তে ২৭টি পদ কম ছিল এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের সময়ে ৮১ সংখ্যক পৃষ্ঠাটি নতুন করে ছাপাতে হয়েছিল।

পদরত্নাবলী-তে মোট ১১০টি পদ আছে; তার মধ্যে অজ্ঞাত ৭টি, অনন্তদাস-৪, উদ্ধবদাস-১, কবিবল্লভ-১, জ্ঞানদাস-১১, গোবিন্দদাস-১১, চণ্ডীদাস-১৪, জগন্নাথদাস-১, নরহরি-১, নরসিংহদাস-১, নরোত্তম-৩, প্রেমদাস-২, বলরামদাস-১৭, বংশীদাস-৩,বিদ্যাপতি-১১, বিপ্রদাস ঘোষ-১, বৃন্দাবন দাস-১, মাধব দাস-১, যদুনন্দন দাস-১, যদুনাথ দাস-২, যাদবেন্দ্র-১, রায়বসন্ত-৬, রায়শেখর-৬, লোচন-২, এবং শ্রীনিবাস আচার্য-১।

গ্রন্থটি সম্পর্কে আমাদের অন্যান্য বক্তব্য পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা অনুযায়ী রবিচ্ছায়া-র প্রকাশের তারিখ 2 Jun 1885 [২১ জ্যৈষ্ঠ] হলেও গ্রন্থটি যে বৈশাখে প্রথমেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ সঞ্জীবনী-র ২০ বৈশাখ সংখ্যায় [৩।৩, পৃ ১১] মুদ্রিত বইটির 'সমালোচনা।'[১] তদুপরি উক্ত পত্রিকার ২৭বৈশাখ [৩।৪।১৪] ও পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় নিম্নলিখিত 'বিজ্ঞাপন'টি মুদ্রিত হয় :

'রবিচ্ছায়া। রবিচ্ছায়া/ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত সমূহ একত্রে মুদ্রিত। মূল্য ০ আনা; ডাক মাশুল / ০

ইহাতে প্রণয় সঙ্গীত, স্বভাব সঙ্গীত, ধর্ম্ম সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত প্রচুর পরিমাণে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রবীবাবু যে শোক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি বিগত চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহার প্রায় সকলগুলিই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বহুসংখ্যক গান পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই।···

গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত পুস্তক পান নাই আমায় শীঘ্র লিখিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র/ ২ নং বেনেটোলা লেন।/ পটলডাঙা। কলিকাতা।'

—বিজ্ঞাপনের শেষ বাক্যটি থেকে মনে হয়, বইটির জন্য পূর্বাহ্নে মূল্য প্রেরণ করে তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

রবিচ্ছায়া।/ (সঙ্গীত)/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ।/ শ্রী যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক/ প্রকাশিত।/ কলিকাতা।/ ৪৫ নং বেনেটোলা লেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।/ বৈশাখ ১২৯২।

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২ [আখ্যাপত্র]+৫ [রচয়িতার নিবেদন, প্রকাশকের বক্তব্য]+১১ [সূচীপত্র]+১৭১।

বিবিধ সঙ্গীত [১১৬], ব্রহ্মসঙ্গীত [৭৪] ও জাতীয় সঙ্গীত [৭]—এই তিন অংশে গ্রন্থটি বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত একটি 'পরিশিষ্ট' অংশে ৪টি গান গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। মোট গান ২০১টি। অবশ্য এটি এ-পর্যন্ত রচিত

রবীন্দ্রসংগীতের পূর্ণাঙ্গ সংকলন নয়। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-র মাত্র ৫টি গান এতে গৃহীত হয়েছে, আরও কয়েকটি গান অনবধানতা-বশত বা অন্য কোনো কারণে গ্রন্থভুক্ত হয়নি—আবার কতকগুলি গান এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়, ফলে সেগুলির প্রকৃত রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ। এইরূপ গানগুলি হল :

[১] বেহাগ-কাওয়ালি। চরাচর সকলই মিছে মায়া, ছলনা দ্র গীত ৩। ৮৮৩; স্বর ৩৫।

[২] বাহার-কাওয়ালী। হায়রে সেই ত বসন্ত ফিরে এল দ্র গীত ২। ৫৩৮; স্বর ১০।

[৩] বাহার-কাওয়ালী। খুলে দে তরণী খুলে দে তোরা দ্র গীত ৩। ৮৭৭; স্বর ৩২।

[৪] বাহার-আড়াঠেকা। এ কি হরষ হেরি কাননে দ্র গীত ৩। ৮৭৭; স্বর ৩৫।

[৫] ভৈরবী-ঝাঁপতাল। অসীম সংসারে যার কেহ নাহি কাঁদিবার দ্র গীত ৩। ৮৮৮।

[৬] মিশ্র-কাওয়ালী। কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া দ্র গীত ৩। ৮৭৯; স্বর ৩৫।

মূল : 'Drink to me only', দ্র ত্রিবেণীসংগম। ৩৬।

[৭] দেশ-আড়াঠেকা। দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল দ্র গীত ৩। ৮৮৫।

[৮] সাহানা-আড়াঠেকা। একবার বল সখি ভালবাসো মোরে দ্র গীত ৩। ৮৭৯।

[মালতীপুঁথি-র 71/৩৭ক পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রটি উদ্ধৃত করা আছে]

[৯] কাফি-আড়াঠেকা। এ ভালোবাসার যদি দিতে প্রতিদান দ্র গীত ৩। ৮৮০-৮১।

[মালতীপুঁথি-র 71/৩৭ক পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রটি উদ্ধৃত করা আছে]

[১০] সরফর্দা-ঝাঁপতাল। ও কি সখা কেন মোরে কর তিরস্কার দ্র গীত ৩। ৮৮১

[মালতীপুঁথি-র 60/৩১খ পৃষ্ঠায় গানটির খসড়া রূপটি পাওয়া যায়, দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ১৩২]

[১১] বেলোয়ার-কাওয়ালি। ও কি সখা মুছ আঁখি দ্র গীত ৩। ৮৮২; স্বর ৩২।

[১২] আসোয়ারি-[কাওয়ালি]। না স্বজনি না, আমি জানি জানি সে আসিবে না দ্র গীত। ৩। ৯৫১; স্বর ৩২।

[১৩] আলাইয়া-আড়খেম্‌টা। যাই যাই, ছেড়ে দাও দ্র গীত ৩। ৮৮৮; স্বর ৩৫।

[১৪] হাম্বীর-কাওয়ালি। হোলনা লো হোলনা সই দ্র গীত ২। ৪২১; স্বর ৩২।

[১৫] সিন্ধু ভৈরবী-কাওয়ালি। হা' সখি ও আদরে দ্র গীত ৩। ৮৮২; স্বর ৩২।

[১৬] খাম্বাজ-কাওয়ালি। হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর দ্র গীত ৩। ৮৭৬; স্বর ৩২। গানটি ভারত শ্রমজীবী পত্রিকার ফাল্গুন ১২৯২ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

[১৭] বেহাগ-কাওয়ালি। সহেনা যাতনা দ্র গীত ৩। ৮৮৭-৮৮; স্বর ৩২।

[১৮] সরফর্দা-কাওয়ালি। এমন আর কতদিন চলে যাবেরে দ্র গীত। ৯৪৭; স্বর ৪৫।

[১৯] দেশ-কাওয়ালি। দাঁড়াও, মাথা খাও, যেওনা সখা দ্র গীত। ৮৯০; স্বর ২৩।

[২০] মিশ্র ঝিঁঝিট-কাওয়ালি। সখা হে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায় দ্র গীত। ৮৮৭; স্বর ২৩।

[২১] জয়জয়ন্তী-কাওয়ালি। এতদিন পরে সখি দ্র গীত ৩।৮৮২-৮৩।

[২২] মিশ্র-খেম্‌টা। পুরাণো সে দিনের কথা দ্র গীত ৩।৮৮৫; স্বর ৩২।

[২৩] বেহাগ-আড়খেম্‌টা। দুজনে দেখা হল-মধু যামিনীরে দ্র গীত ৩। ৮৮৪-৮৫; স্বর ৩২।

[২৪] ভৈরবী-একতালা। ফুলটি ঝরে গেছে রে দ্র গীত ৩। ৮৮৬-৮৭; স্বর ৫১।

[২৫] টোড়ি-কাওয়ালি। সকলি ফুরাইল। যামিনী পোহাইল দ্র গীত ৩। ৮৮৬ স্বর ৩২।

[২৬] মিশ্র ছায়ানট-ঝাঁপতাল। দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমিত এনেছ ডাকি দ্র গীত ২। ৬০৮; স্বর ৫৫।

[২৭] বেহাগড়া-[একতালা]। ও গান গাস্‌নে-গাস্‌নে-গাস্‌নে দ্র গীত ৩। ৮৮৬; স্বর ৩৫-এ রাগ-তাল 'খাম্বাজ। একতাল [বিলম্বিত]'।

এ ছাড়াও মালতীপুঁথি থেকে নিম্নলিখিত গানগুলি সংকলিত হয় :

[১] বাহার-ঝাঁপতাল। গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয়স্রোতে [পৃ 19/১০ক] দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১/৩১-৩২; গীত ৩। ৮৭৮; স্বর ৩৫।

[২] বেহাগ-কাওয়ালি। সখি বল দেখি লো [পৃ 14/৭খ ও 27/১৫ক] দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ৩০-৩১; গীত ২। ৪১৭; স্বর ৩২।

[৩] সিন্ধুকাফি-আড়াঠেকা। কেমনে শুধিব বল তোমার এ ঋণ [পৃ 71/৩৭ক] দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১| ১২১-২২; গীত ৩। ৮৮০।

আমাদের ধারণা, গানগুলি ১২৮৪-৮৭ বঙ্গাব্দে ভগ্নহৃদয় কাব্য-রচনার সমকালে লেখা। উপরে উল্লিখিত গানগুলির মধ্যেও কয়েকটি সম্ভবত এই কাব্যের জন্যই স্বতন্ত্রভাবে রচিত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাব্যে স্থান পায়নি। এ-সম্পর্কে যথাস্থানে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। 'পুষ্পাঞ্জলি' পাণ্ডুলিপি-ভুক্ত গানগুলিও এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

'রচয়িতার নিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> বর্ত্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত অধিকাংশ গান সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না!
>
> ইহার অনেক গানই বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্ত-স্থায়ী সুখ দুঃখের সহিত দুই দণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল—সেই সকল শুষ্কপত্র চারিদিক হইতে জড় করিয়া বইয়ের পাতার মধ্যে তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিলে গ্রন্থকার ছাড়া আর কাহারও তাহাতে কোন আনন্দ নাই।
>
> আমার এইরূপ মনের ভাব। এই জন্য এ গানগুলি আজ সাত আট বৎসর [অর্থাৎ ১২৮৪-৮৫ অবধি] ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই।···
>
> অনেক কারণে গান ছাপান নিষ্ফল বোধ হয়। সুর সঙ্গে না থাকিলে গানের কথাগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া গানের কবিতা সকল সময়ে পাঠ্য হয় না, কারণ সুরে ও কথায় মিলিয়া তবে গানের কবিতা গঠিত হয়। এইজন্য সুর ছাড়া গান ছাপার অক্ষরে পড়িতে অনেকস্থলে অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকে।···
>
> পুনশ্চ—অনেকগুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসান হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারেন।
>
> এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা—পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেকগুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসান হয়।···

দুঃখের বিষয়, গ্রন্থটি জনপ্রিয় হয়নি, ফলে অগ্রহায়ণ মাস থেকে এটিকে হ্রাসমূল্যে [আট আনায়] বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়; সঞ্জীবনী-র ১৪ অগ্র° [৩। ৩১] থেকে ৪ মাঘ [৩। ৩৮] পর্যন্ত মোট ৮টি সংখ্যায় এই ঘোষণা-যুক্ত বিজ্ঞাপন[১] মুদ্রিত হতে দেখা যায়—সঞ্জীবনী ও ভারত শ্রমজীবী পত্রিকার গ্রাহকদের জন্য মূল্য ধার্য হয় ছ' আনা। কিন্তু গ্রন্থ বিক্রয়ের এই হিসাব রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার প্রকৃত নিরিখ নয়। উক্ত ১৪ অগ্র° সঞ্জীবনী-তেই মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করছি: 'ব্রহ্মসঙ্গীত-শিক্ষা।[২] প্রথম ভাগ। ···স্বর ও মাত্রাসাধনাদির উপদেশ এবং কণ্ঠ প্রস্তুতোপযোগী কতিপয় সাধন সহ আদি, ভারতবর্ষীয় এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯টী গীত স্বরলিপিবদ্ধ হইয়াছে।···ডোয়ার্‌কিন্‌ এন্ড সন্,

লালবাজার পুলিসের পূর্বধার,…।লo '—এখানে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ তাৎপর্যহীন নয়। এই সময় থেকেই বালক ও ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হতে শুরু করে—পরে পাঠক-পাঠিকার অনুরোধে ভারতী-তে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি মুদ্রিত হচ্ছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আত্মীয় ও ব্রাহ্মদের গণ্ডির বাইরে সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে নরেন্দ্রনাথ দত্ত [স্বামী বিবেকানন্দ] শ্রীরামকৃষ্ণকে রবীন্দ্রনাথের গান শোনাচ্ছেন ও 'সঙ্গীত কল্পতরু'-তে সংকলন করছেন, এ-ও জনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ বলে গণ্য করতে পারি। তবে থিয়েটারি চটুল গানের পাশে 'রবিবাবুর গান' যথোপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক সময় নিয়েছে, একথা মানতেই হবে।

বৈশাখের প্রথমেই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ও রবীন্দ্রনাথের কার্যাধ্যক্ষতায় 'বালক' প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবউঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।'[৩] আমরা দেখেছি, স্বর্ণকুমারী দেবীর হাতে ভারতী-র সম্পাদনার দায়িত্ব হস্তান্তরিত হবার পর রবীন্দ্রনাথের লেখা সেখানে প্রকাশিত হলেও তা লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে। অথচ রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্বে দেখা যায়, কোনো একটি সাময়িকপত্রকে আশ্রয় করে তাঁর রচনা-প্রতিভা বিচিত্রভাবে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। বালক পত্রিকার ক্ষেত্রেও আমরা একই ব্যাপার লক্ষ্য করি। প্রথম সংখ্যাতেই মোট ১৩টি রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা ৫টি, পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও এই অনুপাতের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

বালক-এর বার্ষিক মূল্য ছিল দু-টাকা। সচিত্র এই পত্রিকার প্রধান চিত্রশিল্পী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু হরিশচন্দ্র হালদার [হ. চ. হ.], সত্যপ্রসাদও কয়েকটি ছবি আঁকেন। কিন্তু বালক-বালিকাদের জন্য প্রকাশিত হলেও বালক বয়স্ক পাঠকদের কাছেও যথেষ্ট আদরণীয় হয়েছিল। প্রসঙ্গত সোমপ্রকাশ-এ [২৯। ৩৩, ১৬ আষাঢ়। ৬৫৫] মুদ্রিত একটি সমালোচনা উদ্ধৃত করি : '…শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণকে নানাবিষয় সহজে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে, অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় এই পত্রিকাখানির সম্পাদিকার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই সংখ্যাতেই ১৩টী বিষয় লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একা রবীন্দ্র বাবুই ৫টী প্রস্তাবের লেখক। তিনি যেরূপ সরল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ছোট ছোট বালক বালিকাগণের পক্ষে সেগুলি বড় সরল পাঠ্য হইয়াছে। পদ্য দুটী এমন সুললিত হইয়াছে যে, ইহারই মধ্যে ছোট ছোট বালক বালিকাগণ সুর করিয়া গাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এত দিন ছেলেরা "পাখী সব করে রব" এই পদ্যটীই দুলিয়া দুলিয়া গান করিত, এখন তাহারা আর একটী নূতন পদ্য মুখস্থ করিতে পাইল, "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বাণ।" "কাজের মানুষ কে?" এই প্রসঙ্গে রচয়িতা নানকের জীবনের স্থূল স্থূল বিবরণগুলি সরল অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লিখিয়াছেন। এইভাবে প্রস্তাব লেখকগণ যতই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় লিখিতে থাকিবেন, ততই আমাদের অল্প শিক্ষিত বালকসম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। এই পত্রিকায় যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা বালক কেন অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিও অবগত নহেন।…'—সমালোচক পত্রিকার লক্ষ্যটি যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বালকদের শিশু ভাবতে রাজি ছিলেন না—তাই তাঁর নিজের জীবনে যেমন পাঠ্য-অপাঠ্যের সীমারেখা মানেননি, তেমনি এই পত্রিকার জন্য

যেমন ‘মুকুট’ ‘রাজর্ষি’ প্রভৃতি গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন, তেমন ‘চিরঞ্জীবেষু-শ্রীচরণেষু’ পত্রধারা ‘রুদ্ধগৃহ’ ‘পথপ্রান্তে’ ‘লাইব্রেরী’ প্রভৃতি রচনা পরিবেশন করতেও কুণ্ঠিত হননি। এই মনোভাব পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাদর্শেও প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমান সংখ্যায় তাঁর নিম্নলিখিত রচনাগুলি মুদ্রিত হয় :

১-২ ‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ’ দ্র শিশু ৯। ৫৮-৬০ [‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’]

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ সপ্তম ভাগ [১৩১০] ‘শিশু’ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত কবিতাটি কড়ি ও কোমল-এর অন্তর্গত ছিল।

২-৬ ‘কাজের লোক কে?’ দ্র ইতিহাস [১৩৬২]। ৮৩-৮৮

এটি তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় [পৃ ৩৬-৩৯] ‘(বালক হইতে উদ্ধৃত)’ মন্তব্য-সহ পুনর্মুদ্রিত হয়।

২৩-৩৩ ‘মুকুট’ প্রথম-পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্র গল্পগুচ্ছ ১৪। ২৫৯-৬৯

৪১-৪৫ ‘গুটিকত গল্প’

৫৬-৫৭ ‘ফুলের ঘা’ দ্র শিশু ৯। ৮৬-৮৭ [‘শীতের বিদায়’]

কবিতাটি কড়ি ও কোমল-এর দ্বিতীয় সংস্করণে [১৩০১] গৃহীত হয়েছিল।

এ ছাড়া ২০-২২ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের ‘বল্ গোলাপ মোরে বল্’ গানটির প্রতিভাসুন্দরী দেবী-কৃত স্বরলিপি ‘সহজে গান শিক্ষা’ পর্যায়ে মুদ্রিত হয়। সম্ভবত এইটিই রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম মুদ্রিত স্বরলিপি। ২২ পৃষ্ঠার সম্মুখবর্তী একটি স্বতন্ত্র মোটা ধরনের কাগজে ‘Litho/By H. c. Halder’ উল্লেখ-সহ সচিত্র হস্তলিপিতে গানটি মুদ্রিত হয় [দ্র গীতবিতান। ৪৪২]। ‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ কবিতাটির সঙ্গেও একটি চিত্র ছিল [‘By H. c. Halder, Painter Lithographer’]—এই H. c. Halder বা হরিশ্চন্দ্র হালদার রবীন্দ্ররচনার প্রথম চিত্রকর। এইরূপ অনেকগুলি লিথোগ্রাফ বালক-এর বিভিন্ন সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ভারতী, বৈশাখ ১২৯২ সংখ্যায় [৯। ১]রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা প্রকাশিত হয় :

২-৪ ‘নূতন’ দ্র কড়ি ও কোমল ২। ৩৩-৩৫

কবিতাটিকে ভারতী, চৈত্র ১২৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বিদায়’ [‘পুরাতন’]-এর পরিপূরক বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, ‘কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবিভাব’[১]–‘যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের’ কবিতা এসেছে আরও পরে, কিন্তু মৃত্যুর আবির্ভাবের মোকাবিলা করতে হয়েছে ‘পুষ্পাঞ্জলি’-র ডায়ারি জাতীয় রচনায়, ‘সরোজিনী প্রয়াণ’-এর আপাতলঘুতার অন্তরালে, ‘হায়’, ‘যোগিয়া’, ‘ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি’, ‘কোথায়’, ‘উপকথা’ প্রভৃতি কবিতায় ও কিছু-কিছু গানে। জীবনের অবিশ্রাম প্রবাহের মাঝখানে যে মৃত্যুকে অস্বীকার করা যায় না, অথচ অস্তিত্বের সব দাবীকেও মেনে নিয়ে এগিয়ে চলতে হয়—এই দুই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা এই সময়ের রবীন্দ্ররচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর একটি জটিলতর দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কৈশোরের শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীর স্নেহ-মমতার আশ্রয় লাভ করেছিলেন। তাঁর সন্তানহীন জীবনে রবীন্দ্রনাথও একটি প্রধান অবলম্বন ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল সখ্যের পর্যায়ভুক্ত—রবীন্দ্রনাথ যা লিখতেন তার প্রথম শ্রোত্রী ছিলেন কাদম্বরী

দেবী, লেখার প্রেরণাও আসত অনেকটা তাঁর কাছ থেকেই। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিষয় ও রচনাপদ্ধতির দিক দিয়ে তাঁর রুচির আনুগত্য স্বীকার করা প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল, যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে 'কাব্যরচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত'[২] ছিলেন তাকে খসিয়ে ফেলায়। এর পর থেকে রচনার জগতে রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় নতুন বউঠাকুরানীর অনুশাসন না মেনে উপায় ছিল না। অথচ সেই সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আত্মীয়-সংকুল বদ্ধ জীবনের চেয়ে মেজ বউঠাকুরানীর পরিবারের মুক্ত আবহাওয়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সংগত কারণেই ছিল অধিকতর। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই কাদম্বরী দেবীর আত্মহননের নিদারুণ আঘাত তাঁকে অভিভূত করেছে, কিন্তু মুক্তির স্বাদও এনে দিয়েছে অভাবিত রূপে। এই অদ্ভুত বৈপরীত্য মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। উপরে উল্লিখিত রচনাগুলিই তার দৃষ্টান্ত, কিন্তু 'মরিতে চাহিনা এই সুন্দর ভুবনে'—এই যাঁর আকাঙক্ষা, তাঁর পক্ষে চিরকাল 'পুরাতন'-কে আঁকড়ে থাকা সম্ভব নয়, 'নূতন'-কে আহ্বান প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

৪-১৩ 'পুষ্পাঞ্জলি/প্রভাতে' দ্র জীবনস্মৃতি [গ্র: প:] ১৭। ৪৮৫-৯৫

রচনাটি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। 'পুষ্পাঞ্জলি'-র বিস্তৃত পাণ্ডুলিপি-পরিচয় দিয়েছেন কানাই সামন্ত বিশ্বভারতী পত্রিকা-র শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ সংখ্যায় [২৫। ১। ৬৫-৮৪]।

২৪-২৭ 'রসিকতার ফলাফল' দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৫০১-০৩

সমকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন সমালোচনা এই ব্যঙ্গরচনাটির লক্ষ্যস্থল। কিন্তু কি কারণে এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তির উদ্বোধন ঘটল, উপযুক্ত উপকরণের অভাবে তা নির্ণয় করা দুরূহ।

উল্লেখ্য, ভারতী-র বর্তমান সংখ্যায় কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের [1859-1939] 'ধরা-সুন্দরী' [পৃ ৪৫-৪৬] কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এ-সম্পর্কে নবকৃষ্ণ লিখেছেন, 'প্রথম কয়েকটি লেখা কবিবর (অধুনা বিশ্বকবি) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাই। তিনি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উহাতে সংশোধনের কিছুই নাই এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া 'ভারতী'র সম্পাদিকা মহাশয়ার নিকট পাঠাইয়া দেন।' কবিতাটি সম্বন্ধে 7 Apr 1885 [মঙ্গল ২৬ চৈত্র ১২৯১] রবীন্দ্রনাথ নবকৃষ্ণকে লেখেন, 'আপনার কবিতাটি আমার বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। সংশোধন করিবার কিছুই দেখিলাম না। আপনার অভিপ্রায় অনুসারে সে কবিতাটি ভারতীর সম্পাদিকার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাঁহারও ভাল লাগিয়াছে শুনিয়াছি।'[১] ঘটনাটি উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথকে যে দায়িত্ব প্রায়শই বহন করতে হয়েছে তার সূচনা-কালটি নির্দেশ করা। অনুরূপ আর একটি কাজ তাঁকে করতে হয় সাবিত্রী লাইব্রেরির ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে নারীদের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক হিশেবে। ঢাকা-নিবাসিনী শ্যামাসুন্দরী দেবীর 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না' প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য, ১২৮৯ ও ১২৯০ বঙ্গাব্দের প্রতিযোগিতাতেও ইনিই পুরস্কৃত হন, দু-বারই রবীন্দ্রনাথ বিচারক ছিলেন। অধিবেশনটি হয় ২৮ বৈশাখ [রবি 10 May 1885], ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকার উপরোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন[২] -প্রবন্ধটি সভায় ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন কিনা

নিশ্চিত করে বলা যায় না, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিতর্কে অবতীর্ণ হননি, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিশেবে এই সময়ে বিধবাবিবাহ সমর্থন করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল।

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : [কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে] 'কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল।…কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ-দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের [Thacker Spink & Co.] বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি।'[৩] কিন্তু কয়েকটি হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমান সময়ে তিনি এই ভাব মোটামুটি কাটিয়ে উঠেছেন। ২৩ চৈত্র ১২৯১ [4 Apr] তারিখের হিসাব : 'ব°ল্যাজারাস কো° দং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চশমা ক্রয়ের ১ বিল শোধ দেওয়া যায় ২৫৲', ২৭ বৈশাখের [9May] হিসাব: 'রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের কম্পাস-গাড়ির ঘোড়ার সাজ ১টা ক্রয়ের মূল্য শোধ…৫৬৲ ও 'গাড়ি বার্নিশ করান ব্যয়…৩৬৲'। বিখ্যাত কবি, প্রাবন্ধিক, বক্তা ও গায়ক এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের মর্যাদার উপযোগী সাজ ও যানবাহনের আয়োজন থেকে পরিবর্তনটুকু আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি।

উক্ত ২৭ বৈশাখের হিসাব থেকেই জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১৯ বৈশাখ [শুক্র 1 May] চুঁচুড়ায় পিতার কাছে গিয়েছিলেন। চৈত্র মাসেই মহর্ষি চন্দননগর থেকে চুঁচুড়ায় 'কমিশনার সাহেবের বাড়ি নামে আখ্যাত ভবনে' উঠে আসেন।

বালক-এর জ্যৈষ্ঠ [১। ২] সংখ্যায় রবীন্দ্ররচনার সংখ্যা ৫টি :

৫৯ 'মা লক্ষ্মী' দ্র শিশু ৯। ৮০-৮১

কবিতাটি অবলম্বনে একটি লিথো-চিত্রও মুদ্রিত হয়। এটি কড়ি ও কোমল [১২৯৩] কাব্যে প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়।

৬০-৬৩ 'লাঠির উপর লাঠি' দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৮৪। ১৬-১৯

বৈশাখ সংখ্যায় [পৃ ৩৩-৪১] সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১২টি চিত্র সহযোগে 'ব্যায়াম' নামক প্রবন্ধে ফিলাডেলফিয়ার একটি স্কুলে একজন আমেরিকানের লাঠি নিয়ে ব্যায়ামের অভিজ্ঞতা ও উপযোগিতা বর্ণনা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'বশম্বদ শ্রীঃ—' স্বাক্ষরে [বার্ষিক সূচীতে তাঁর নাম আছে] লঘু ভঙ্গিতে উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি বিতর্কের অবতারণা করেন।[১] এই সংখ্যাতেই 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ [পৃ ১০৩-০৬] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তার উত্তর দেন। আষাঢ় সংখ্যায় [পৃ ১৩৪-৩৬] 'শ্রীকেদার-দক্ষিণেশ্বর' স্বাক্ষরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [1863-1949] 'লাঠালাঠি' প্রবন্ধ লিখে এই বিতর্কের উপসংহার ঘটান। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি হালকা চালে লেখা হলেও কয়েকটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পড়াশুনো সম্বন্ধে বাঙালিদের সঙ্গে য়ুরোপীয়দের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'তাহারা নিজের ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন করে আমরা পরের ভাষায় জ্ঞানোপার্জ্জন করি। বিদেশীয় ভাষা ও বিদেশীয় ভাব আয়ত্ত করিতে আমাদের কত সময় চলিয়া যায়, তাহার পরে সেই ভাষার ভাণ্ডারস্থিত জ্ঞান। মাতার ভাষা আমরা স্নেহের সঙ্গে শিক্ষা করি। মাতৃদুগ্ধের সহিত তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তাহা আমরা আকর্ষণ করি। সে ভাষা আমাদের ভাষা, প্রতিদিনের সুখ দুঃখের ভাষা, আমাদের খেলাধূলার ভাষা। আর বিমাতৃভাষা

আমাদের তিক্ত ঔষধ, শক্ত পিল, গিলিতে হয়, গলায় বাধে। নাক চোখ জলে ভাসিয়া যায়।···ভাষা নামক কেবল একটা যন্ত্র আয়ত্ত করিতে গিয়াই আমাদের হাড় গোড় সেই যন্ত্রের তলে পিষিয়া যায়।···যে শৈশবকাল স্নেহের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময় সেই শৈশবে বিদেশী চালকড়াই ভাজা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইয়া কোন মতে গলাধঃকরণ করিতে হয়। তবুও যদি পাকশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, জ্ঞানের প্রতি অরুচি না হয় তবে সে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।'[২] শিক্ষার ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মত সারাজীবন অপরিবর্তিত থেকেছে। এর পরে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন : 'আমাদের মেয়েরাও আবার আজকাল এক্‌জামিন পাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।···মেয়েরা যে বিদ্যাশিক্ষা করিবে তাহার একটা অর্থ বুঝিতে পারি—কিন্তু মেয়েরা কেন যে পরীক্ষা দিবে তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। এমন সযত্নে তাহাদিগকে এমন সৎশিক্ষা দাও যাহাতে জ্ঞানের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে। আয়ুক্ষয়কর এবং কোমল হৃদয়ের বিকারজনক প্রকাশ্য গৌরবলাভের উত্তেজনায় তাহাদিগকে নাকে চোখে জ্ঞান গিলিতে প্রবৃত্ত করান ভাল বোধ হয় না। ···প্রকাশ্য গৌরব লাভের জন্য প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে যোঝাযুঝি করিতে দণ্ডায়মান হইলে অধিকাংশ স্থলেই হৃদয়ের দুর্মূল্য, সৌকুমার্য্য দূর হইয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, জ্ঞান লাভ গৌণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়।'[৩] লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে স্ত্রীশিক্ষার পোষকতাই করেছেন, কিন্তু তাদের জন্য পরীক্ষা-নির্ভর শিক্ষা অনুমোদন করেননি। নিজের কন্যাদের ক্ষেত্রে তিনি এই আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী পর্বে তাঁর পক্ষে এই মতে অবিচল থাকা সম্ভব হয়নি, অবশ্য কেবল পরীক্ষা-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা কখনোই তাঁর সমর্থন লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার প্রথম প্রকাশ বলেই প্রসঙ্গটি এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হল।

এইখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যাশবহি-র ২৯ ফাল্গুন ১২৯১ [11 Mar 1885] তারিখের হিসাবে দেখি 'জায়/···রবীবাবু স্কুলের জন্য বাটী দেখিবার গাড়ি ভাড়া/ বিঃ ২ বৌচর-১০ ॥°, ৯ চৈত্র আবার একবার যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। হিসাবটি সম্পূর্ণ নয়—বর্তমান বৎসরেও 'জায়' হিসাবেই লেখা হয়েছে এবং শোধের হিসাব লিপিবদ্ধ হয়নি। সুতরাং স্কুলের জন্য রবীন্দ্রনাথের বাড়ি খোঁজার সম্পূর্ণ বিবরণটি স্পষ্ট করা দুরূহ। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'খেয়াল গেল ছোটোদের স্কুল করতে হবে। নীচের তলায় ক্লাস-ঘর সাজানো হল বেঞ্চি দিয়ে, ঝগড় চাকর ঝাড়পোঁছ করছে, ঘণ্টা জোগাড় হল, ক্লাস বসবে। কোত্থেকে মাস্টার ধরে আনলেন। কোথায় কী পাওয়া যাবে, রবিকাকা জানতেনও সব। হাল্কাভাবে কিছু হবার জো নেই, যেটি ধরছেন নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন করা চাই।'[১] এই স্কুলের জন্য 'শকুন্তলা' [1895] গ্রন্থ লেখার কথা তিনি বলেছেন, সে অনেক পরের কথা। তাই বর্তমান প্রচেষ্টাটির ইতিবৃত্ত স্পষ্ট করা যায়নি। যাই হোক, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতার প্রথম প্রয়াসটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যদি চেষ্টাটি সামান্যতম ফল প্রসব করে থাকে, তাহলে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশের পটভূমিকাটি বিস্তৃততর হয়।

৬৪-৭১ 'মুকুট' ষষ্ঠ-একাদশ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট দ্র গল্পগুচ্ছ ১৪। ২৭০-৭৯

৭৭-৮১ 'চিরঞ্জীবেষু' দ্র চিঠিপত্র। ২। ৫০৭-১১ [১]

'চিরঞ্জীবেষু' ও 'শ্রীচরণেষু' শিরোনামে বালক পত্রিকার আটটি সংখ্যায় (অগ্র° সংখ্যা বাদে ও চৈত্র সংখ্যায় দু'টি] মোট ন'টি পত্র-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনপন্থী ঠাকুর্দা ষষ্ঠিচরণ দেবশর্মা ও নব্যপন্থী নাতি নবীনকিশোর

শর্মার উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র-তে বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা থাকলেও কয়েকটি বাদে সেগুলি ব্যক্তিবিশেষকেই লেখা, সুতরাং পত্রেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু এখানে পরিকল্পনাটি ভিন্নতর। পত্রের ছদ্মবেশে একই বিষয়ের উপর দু'টি বিপরীত কোণ থেকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত আলোকপাত করে বক্তব্যকে সরস ও উজ্জ্বল করার প্রয়াসটি লক্ষণীয়। অবশ্য প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী পত্রসমূহে রক্ষিত হয়নি, যা রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত—যথাস্থানে আমরা সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। পত্রগুলি 'চিঠিপত্র' [১২৯৪] নামে গ্রন্থভুক্ত হয়।

৮৮-৯৩ 'হেঁয়ালি নাট্য' দু হাস্যকৌতুক ৬। ৫৩-৫৭। ['রোগের চিকিৎসা']

একটি স্কুল স্থাপনের চেষ্টা ও 'লাঠির উপর লাঠি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। বর্তমান রচনায় তাঁর শিক্ষাদর্শের আর একটি দিক প্রত্যক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলতে জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকেই বুঝতেন, অভিনয় বা নির্দোষ আমোদপ্রমোদকে তিনি সেই শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জীবনচর্যায় তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। ব্রাইটনে থাকার সময়ে তিনি কিভাবে সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে আনন্দ দেবার জন্য নানা কৌতুককর উদ্ভাবন করতেন, তা আগেই বর্ণিত হয়েছে। বালক-এর অল্পবয়সী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বর্তমান আয়োজন তারই অন্যতর প্রকাশ বলে গণ্য হতে পারে।[২] অবশ্য আমাদের ধারণা, পারিবারিক পরিবেশেই এই হেঁয়ালি-নাট্যের জন্ম। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, 'সেখানে [স্বর্ণকুমারী দেবীর কাশিয়াবাগান-স্থিত বাড়িতে] আমাদের খুব যাওয়া-আসা ছিল; রবিকাকাও মাঝে মাঝে যেতেন এবং আমাদের আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেন। এই সূত্রে তাঁর 'খ্যাতির বিড়ম্বনা "…নাটকটি নিজেরাই অভিনয় করে আমাদের প্রচুর আনন্দ দেন।'[৩] উক্ত নাট্যটি মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু সম্ভবত তার পূর্বেই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে এইরূপ অভিনয়ের সূচনা হয়ে থাকতে পারে। আষাঢ় সংখ্যায় 'প্রবাদ প্রশ্ন' নামে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় অনুরূপ একটি খেলার প্রবর্তন করেন।

'হেঁয়ালি নাট্য'-টির একটি দীর্ঘ ভূমিকা আছে। লক্ষণীয়, নবযৌবনের কূলাতিক্রমী উদ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশ ও বাঙালি জাতির উন্নতি সম্বন্ধে [তখনও ভারতচিন্তা তাঁর মধ্যে স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেনি] কেবল আবেগময় তাত্ত্বিক চিন্তা নয়, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন :

'সূর্যের আলো না হইলে গাছ ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।

'আমোদ-প্রমোদ কর এ কথা যে বলিতে হয় এই আশ্চর্য। কিন্তু আমাদের দেশে এ কথাও বলা আবশ্যক। আমরা হৃদয়-মনের সহিত আমোদ করিতে জানি না। আমাদের আমোদের মধ্যে প্রফুল্লতা নাই, উল্লাস নাই, উচ্ছ্বাস নাই। তাস পাশা দাবা পরনিন্দা ইহাতে হৃদয়ের বা শরীরের স্বাস্থ্য-সম্পাদন করে না। এ-সকল নিতান্তই বুড়োমি, কুনোমি, কুঁড়েমি।…যদি খেলার সময় আমোদের সময়, আমরা ইচ্ছা করিয়া বুড়োমির চর্চা করি, তবে যৌবনকে গলা-টিপিয়া বধ করা হয়।…

'বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষি জ্ঞান করি—বিজ্ঞলোকের, কাজের লোকের পক্ষে সেগুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে, যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে

জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে। যাহারা কাজ করে না তাহারা আমোদও করে না। ইংরাজেরা জ্ঞানে বৃদ্ধের মতো, কাজে যুবার মতো, খেলায় বালকের মতো। আসল কথা এই যে, বালকের মতো না খেলিলে যুবার মতো কাজ করা যায় না, যুবার মতো কাজ না করিলে বৃদ্ধের মতো জ্ঞান পাকিয়া উঠে না। ক্ষেত্রেই যেমন শস্য পাকিয়া থাকে, গোলাবাড়িতে পাকে না, তেমনি কার্যক্ষেত্রেই জ্ঞান পাকিয়া থাকে—জড়তার মধ্যে তাম্রকূটের ধোঁয়ায় পাকিয়া উঠে না। মানুষের মতো মানুষ হইতে গেলে বালক বৃদ্ধ যুবা এই তিনই হইতে হয়। কেবলই বৃদ্ধ হইতে গেলে বিনাশ পাইতে হয়, কেবলই বালক হইতে গেলে উন্নতি হয় না। আমরা বাঙালিরা যদি যথার্থ মহৎজাতি হইতে চাই তবে আমরা খেলাও করিব, কাজও করিব চিন্তা করিব। আমরা প্রফুল্ল হইয়া খেলা করিব উদ্যোগী হইয়া কাজ করিব ও গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিব।'[১]

রচনাগুলি যখন হাস্যকৌতুক [গদ্যগ্রন্থাবলী ৬, ১৩১৪] গ্রন্থে সংকলিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ সূচনায় লিখেছিলেন, '…ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথ নিষেধ করলেও পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য আমরা হেঁয়ালির উত্তরগুলি সংকলন করে দেব—এগুলি পরবর্তী সংখ্যায় উত্তরদাতাদের নাম-সহ মুদ্রিত হত। বর্তমান সংখ্যার হেঁয়ালির উত্তর : 'হাঁসপাতাল'।

এই সংখ্যায় সরলা দেবী 'দুর্ভিক্ষ' [পৃ ৮৫-৮৭]-শীর্ষক একটি আবেগদীপ্ত প্রবন্ধে বীরভূমের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বালক-বালিকাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সম্ভবত উক্ত প্রবন্ধ প্রসঙ্গেই তিনি আত্মজীবনীতে লেখেন, '…অক্রূর দত্ত পরিবারের গোবিন্দ দত্ত রবিমামার বন্ধু ও সাহিত্যরসিক। 'বালকে' প্রকাশিত আমার একটি লেখার তিনি খুব রসগ্রাহী হলেন ও রবিমামাকে সে বিষয়ে লিখে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—"একদিন এই নবীন লেখনী বঙ্গ সাহিত্যে প্রবীণতায় নিজের স্থান নেবে।" রবিমামাই তাঁর চিঠি আমায় পড়ে শোনালেন একটু হাসতে হাসতে। সে হাসি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর অনুমোদনে বা সন্দিহানে জানিনে।'[২] সরলা দেবীর শেষ মন্তব্যটি এক্ষেত্রে অহেতুক; পরবর্তীকালে তাঁর অনেক লেখা, মতামত ও আচরণ রবীন্দ্রনাথ পছন্দ না করলেও, নবীন লেখকদের উৎসাহদানে তিনি অকৃপণ ছিলেন না—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠিই তার অন্যতম প্রমাণ।

এই সংখ্যাতেই প্রতিভা দেবী 'গান অভ্যাস' পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরং' গানের প্রথম স্তবকটির 'দেশ-কাওয়ালি' সুর-তালে নিবদ্ধ স্বরলিপি প্রকাশ্ করেন [পৃ ৯৪-৯৫]। সুরটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। এর আগে মল্লার রাগে [যদুভট্ট বা ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত] নিবদ্ধ একটি সুরে গানটি ২৯ আষাঢ় ১২৮৮ [12 Jul 1881] তারিখে চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সংবর্ধনা সভায় গাওয়া হয়েছিল।[১] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরটিই শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় ও বর্তমানে এই সুরেই গানটি গাওয়া হয়ে থাকে। পরে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে সরলা দেবী 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত বাকি অংশে সুর দেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতী-তে ৯|২] রবীন্দ্রনাথের একটি রচনাই মুদ্রিত হয় :

৭০-৭৬ 'বিবিধ প্রসঙ্গ'

তেরোটি সংখ্যা-চিহ্নিত অনুচ্ছেদে বিভক্ত রচনাটি এখন পর্যন্ত কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এগুলির রচনারীতি সন্ধ্যাসংগীত-পর্বে লিখিত ও পরে পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-গুলির মতোই, তবে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি'-র সঙ্গে এদের সাদৃশ্য অনেক বেশি—মৃত্যুভাবনা রচনাটির অনেকটাই অধিকার করে আছে : 'শোকে মানুষকে উদাস করিয়া দেয়, অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া দেয়।···চন্দ্র সূর্য্য আকাশ আর আমাদিগকে ঘেরিয়া রাখে না, সুখ দুঃখ আশা আর আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে না, ক্ষুদ্র জিনিষের গুরুত্ব একেবারে চলিয়া যায়। তখন এক মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করি যে, আমরা স্বাধীন। যাহাকে এতদিন বন্ধন মনে করিয়াছিলাম তাহা ত বন্ধন নহে, তাহা ত লূতা-তন্তুর মত বাতাসে ছিঁড়িয়া গেল; বুঝিলাম বন্ধন কোথাও নাই; ধরা না দিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না; যাহারা বলে আমি তোমাকে বাঁধিয়াছি, তাহারা নিতান্তই ফাঁকি দিতেছে। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, প্রতিদিনের ধূলিরাশি আমাদের চারিদিকে ভিত্তি রচনা করিয়া দেয়, শোকের এক ঝটিকায় সে সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়া যায়, আমরা অনন্তের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি।'[২] সচেতন পাঠক জীবনস্মৃতি-র 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ের কোনো কোনো অংশের সঙ্গে উদ্ধৃতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষ্য করবেন।

আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথকে দু'টি সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা যায়। ৯ আষাঢ় [সোম 22 June] তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ[৩] সাংবৎসরিক অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। ক্যাশবহি-তে ৭ ভাদ্রের হিসাবে দেখি : 'ভবানীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বড়বাবুর ও সত্যবাবুর ও রবীন্দ্রবাবুর ও দ্বিপেন্দ্রবাবুর ও রমণীবাবুর যাতায়াতের সেকেন ক্লাশের গাড়িভাড়া ৩ গাড়ির কাত বিঃ ৯ আষাঢ়ের ১ বৌচর···৬।ল০' সোমপ্রকাশ [২৯। ৩৩, ১৬ আষাঢ়। ৬৫২]-এ লিখিত হয় : 'গত সোমবার ভবানীপুর আদিব্রাহ্মসমাজের ত্রয়ত্রিংশ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভায় শ্রীযুক্তবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের আসন গ্রহণ করেন। এ সভায় যেগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়াছিল তন্মধ্যে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুমধুর স্বরে যে দুইটি গীত গান করিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রীতিকর ও শ্রুতিমধুর হইয়াছিল।' কোন্ গান দু'টি রবীন্দ্রনাথ পরিবেশন করেছিলেন নিশ্চিত করে বলা শক্ত, কারণ এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী বা অন্য কোনো পত্রিকায় তাঁর নতুন কোনো গান প্রকাশিত হয়নি।

১১ আষাঢ় [বুধ 24 Jun] সুকুমার হালদারের সঙ্গে শরৎকুমারী দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা সুপ্রভার বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব দিন ১০ আষাঢ় এঁর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা হয়, ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখি রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভারতী-র আষাঢ় সংখ্যায় [৯।৩] রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা না থাকলেও 'বালক'-এ [১।৩] তাঁর দু'টি রচনা প্রকাশিত হয় :

১০৭-০৮ 'সাত ভাই চম্পা' দ্র শিশু ৯।৬১-৬৪

কবিতাটির সঙ্গে একটি লিথো-চিত্রও মুদ্রিত হয়েছিল। এটি কড়ি ও কোমল-এ [১২৯৩] প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়।

১১৩-১৮ 'দশদিনের ছুটি' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৮৩-৮৬ ['ছোটনাগপুর']

[মূল পাঠ দ্র দেশ, ৯ শ্রাবণ ১৩৭৭। ১৩৭২-৭৬]

এই প্রবন্ধটিও দু'টি চিত্র-সমৃদ্ধ হয়ে মুদ্রিত হয়। ইস্টারের ছুটিতে ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে হাজারিবাগ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তারই সরস কৌতুকময় বর্ণনা রচনাটির বিষয়বস্তু। এই অংশগুলি বাদ দেওয়ায় 'ছোটনাগপুর' প্রবন্ধটি অনেকটা বর্ণহীন লাগে।

১২৭-৩৩ 'রাজর্ষি/ প্রথম খণ্ড' প্রথম-তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্র রাজর্ষি ২।৩৭৫-৮২

এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় উপন্যাস, বউ-ঠাকুরানীর হাট-এর মতো ইতিহাস-আশ্রিত। এটি তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস'। এ-সম্পর্কে তিনি জীবনস্মৃতি-তে [১৭।৪১৩] লিখেছেন : 'দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই-একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না,—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল [রবীন্দ্র-রচনাবলী ২-এর 'সূচনা'-র বর্ণনা : 'রাত্রে গাড়ির আলোটা বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে বলে তার নিচেকার আবরণটা টেনে দিলুম। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সহযাত্রীর মন তাতে প্রসন্ন হল না, ঢাকা খুলে দিলেন।']। মনে করিলাম, ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, এ কী! এ-যে রক্ত!" বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।…এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।' স্বপ্নলব্ধ ঘটনাটি রাজর্ষি-র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই স্বপ্নের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের একটি অভিজ্ঞতার যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। 28. Aug 1930 [১৩ ভাদ্র ১৩৩৭] জেনেভায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ দিতে গিয়ে রম্যাঁ রলাঁ লিখেছেন : 'অত্যধিক ভাবপ্রবণ মানসিক গতিশক্তির এই মানুষটির কাছে শৈশবের এমন কোনো ছাপ সারাজীবনের চিন্তাধারাকে নির্দিষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি যখন বলছিলেন, তাঁর শৈশবের সেই শিহরণ অনুভব করছিলাম; বলছিলেন, সেই দিনটির কথা, যেদিন কলকাতার বড়ো কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে [1865-এ ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে যাওয়ার পথে ঠনঠনের কালীমন্দিরে?] দেখতে পেয়েছিলেন রক্তের একটা স্রোত চৌকাঠের নীচে উপচে উঠছে, আর পথ-চলতি একটি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক নিচু হয়ে রক্তে আঙুল ডুবিয়ে নিচ্ছে, তার শিশুর কপালে তিলক দিয়ে দিচ্ছে। সেই একই রকমভাবে ক্রোধ ও বিতৃষ্ণায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, এক হতভাগা পুরোহিত একটা বাচ্চা ছাগের পা মুচড়ে ধরে-গলায় কোপ বসাবার আগে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।'[১] এই ঘটনাই হয়তো তাঁর অবচেতন স্তর থেকে স্বপ্নে ভেসে উঠেছিল।

এই জীববলি-বিরোধিতাই রাজর্ষি উপন্যাসের মূল ভিত্তি; ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাহিনীর ক্ষীণ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় জীববলিকে কেন্দ্র করে রাজশক্তি ও গোঁড়া পুরোহিততন্ত্রের বিরোধ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ঘটনার বিস্তার ঘটেছে। অবশ্য এর জন্য ত্রিপুরার ঐতিহাসিক পরিবেশটির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল না, বাংলা বা ভারতের যে-কোনো অংশকেই ঘটনাস্থল হিসেবে গ্রহণ করা চলত। তবুও যে ত্রিপুরার পটভূমি রবীন্দ্রনাথ অবলম্বন করলেন তার কারণ কয়েকটি ব্যক্তিগত যোগাযোগ বলেই আমাদের ধারণা। ভগ্নহৃদয় [১২৮৮] প্রকাশের বৎসরাধিক পরে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য তাঁকে অভিনন্দিত

করেছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ত্রিপুরার রাজস্বসচিব গোলোকচন্দ্র সিংহের পুত্র কৈলাসচন্দ্র সিংহ ঠাকুর পরিবারের উড়িষ্যার জমিদারি দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং আশ্বিন ১২৯১ থেকে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, এ তথ্যও আমাদের জানা। তাছাড়া এই সময়ে হেয়ার স্কুলে বলেন্দ্রনাথের সহপাঠী ত্রিপুরা রাজপরিবারের [কর্নেল] মহিমচন্দ্র দেববর্মা [১২৭১-১৩৩০] রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।[২] এইসব যোগাযোগই সম্ভবত তাঁকে ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। আমরা দেখেছি, কৈলাসচন্দ্র সিংহ-রচিত বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস' [ভারতী, পৌষ ১২৮৭] প্রবন্ধটি কিভাবে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটির উপাদান রূপে কাজ করেছিল; রাজর্ষির ক্ষেত্রেও তাঁর লিখিত 'ত্রিপুরার ইতিহাস' প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে [রাজর্ষি-র শেষ দুই অনুচ্ছেদ এই রচনা থেকে উদ্ধৃত বলে পাদটীকায় উল্লিখিত]। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুকুট' গল্পটিও ত্রিপুরার ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে রচিত।

রাজর্ষি-র প্রথম খণ্ডের আঠারোটি পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় খণ্ডে ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বালক পত্রিকার আষাঢ় থেকে মাঘ মোট সাতটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। পরে ত্রিপুরা-রাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য প্রেরিত তথ্য, স্টুয়ার্ট-কৃত বাংলার ইতিহাস প্রভৃতি অবলম্বনে অবশিষ্ট আঠারোটি পরিচ্ছেদ ও উপসংহার যুক্ত হয়ে পৌষ ১২৯৩-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৩৬-৪০ 'শ্রীচরণেষু' দ্র চিঠিপত্র ২।৫১১-১৪ [২]

১৪৮-৫২ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬।৪৫-৪৯ ['পেটে ও পিঠে']

হেঁয়ালি-র উত্তর : 'ডানপিটে'।

১৫২-৫৩ 'আকবর সাহের উদারতা'

['গান অভ্যাস' পর্যায়ে প্রতিভা দেবী রবীন্দ্রনাথের দু'টি গানের স্বরলিপি করেন :

১৪৪-৪৫ জয়জয়ন্তী—কাওয়ালি। ভাসিয়ে দে তরী নীল সাগর পরি

১৪৬-৪৮ কর্ণাটী—তালফেরতা। আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে

প্রথম গানটি দীর্ঘতর আকারে ভারতী, ভাদ্র ১২৮৬ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল; কিন্তু এটি রবিচ্ছায়া-র অন্তর্ভুক্ত হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি-গীতিমালা-য় 'কথা:-শ্রীজ্যো—/—শ্রীর' পরিচয়-সহ 'দেশ-ত্রিতাল'-এ নিবদ্ধ স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। গীতবিতান-এর গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে : "সুরকারের উল্লেখ না থাকায় 'হিন্দিভাঙা' সুর বলিয়া মনে হয়", কিন্তু গানটি শুনলে এই অনুমানের যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া শক্ত। দ্বিতীয় গানটি ১২৮৯ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত।]

১১ শ্রাবণ [রবি 26 Jul] বিকেলে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রবীন্দ্রনাথ 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১] শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতী-র ১৮৮-৯৮ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ও ভাদ্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ৯৪-১০২] সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত্মক টীকা-সহ [পৃ ১০১] পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভারতী-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় [পৃ ২৮৭-৯২] গোবিন্দলাল দত্তের 'প্রতিবাদ' এবং সোমপ্রকাশ-এর ২৩ ও ৩০ অগ্র° সংখ্যায় [৩০/৪-৫, পৃ ৬৫-৬৭ ও ৮২-৮৪]

‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়/ সাং শাশা’—কৃত একটি সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র মুদ্রিত হয়। দুঃখের বিষয়, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

নব্যহিন্দুসম্প্রদায়ের শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মুখপাত্রগণ পুরাণের আধুনিক ব্যাখ্যা প্রদান করে মূর্তিপূজার সমর্থন করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত তাঁদের প্রচারের বিরুদ্ধে এই ভাষণে বললেন : ‘সম্প্রতি কিছুকাল হইতে সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া তীব্রভাবে সমালোচনা চলিতেছে। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা এম্‌নি ভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নিরাকার উপাসনা যেন হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। এইজন্য তাহার প্রতি কেমন বিজাতীয় আক্রোশে আক্রমণ চলিতেছে। এইরূপে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অসম্ভম প্রকাশ করিতে তাঁহাদের পরম হিন্দুত্বের অভিমান কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছে না। তাঁহারা মনে করিতেছেন না, ব্রাহ্ম বলিয়া আমরা বৃহৎ হিন্দুসম্প্রদায়ের বহির্ভূত নহি। হিন্দুধর্ম্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধপক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।’[২] বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ এখানে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতের প্রতিধ্বনি করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর অপ্রমত্ত চিন্তার পরিচয়ও দুর্লভ নয়, যেখানে সাকারবাদীদের প্রতি তীব্র উপহাসের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকারবাদী ব্রাহ্মদের উদ্দেশেও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে :‘পৌত্তলিকতার এক মহদ্দোষ আছে। চিহ্নকে [যদ্দৃষ্টং] যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায় এই জন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেইদিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরির নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যকই বোধ হয় না। ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্ত্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন [যদ্দৃষ্টং] নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্যমাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে। এবং সেই জন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষা-চিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।’[১] তবু এই প্রবন্ধে নব্যহিন্দুসম্প্রদায়ের ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। আমরা জানি, চন্দ্রনাথ বসু নবজীবন-এ ‘ষোড়শোপচারে পূজা’ প্রবন্ধ লেখার পর রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি যেন লেখনী ধারণ করেন [দ্র চন্দ্রনাথ বসুর ১৭ আশ্বিন ১২৯১-এর পত্র], কিন্তু চন্দ্রনাথ লিখেছিলেন দু-টি প্রবন্ধ : ‘তেত্রিশ কোটি দেবতা’ [কার্তিক] ও ‘প্রতিমা’ [অগ্র°]। এছাড়াও অন্যদের লেখা অনুরূপ প্রবন্ধ নবজীবন ও অন্যান্য পত্রিকায় মুদ্রিত হচ্ছিল, যেখানে পৌরাণিক বহু দেববাদকে রূপক আখ্যা দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে —শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্মব্যাখ্যা-মূলক ভাষণ তো ছিল-ই। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রবন্ধে তাঁদের সকলকে আক্রমণ করেছেন : ‘বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধি রূপককে লইয়াও এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকেই জ্ঞানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া লই, ও জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাহারই গলে বরমাল্য প্রদান করি—অবশেষে ভ্রম ভাঙিলেও সহজে হৃদয় ফিরাইয়া লইতে পারি না। ইহার পরিণাম শুভ হয় না। কারণ,

জ্ঞানোদয় হইলে, অজ্ঞানের প্রতি আমাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না, অথচ অভ্যাস অনুসারে শ্রদ্ধাসূচক অনুষ্ঠানও ছাড়িতে পারি না। এই জন্য তখন টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, হাড়গোড় বাঁকানো ব্যায়াম করিয়া জ্ঞানের প্রতি এই ব্যভিচারকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া কোনমতে দাঁড় করাইতে চাই। নিজের বুদ্ধির খেলায় নিজে আশ্চর্য্য হই, সুচতুর ব্যাখ্যার সুচারু ফ্রেমে বাঁধাইয়া ধর্ম্মকে ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখি এবং তাহার চাক্‌চিক্যে পরম পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু এইরূপ ভেল্কিবাজির উপরে আত্মার আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করা যায় না। ইহাতে কেবল বুদ্ধিই তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু আত্মা প্রতিদিন জড়তা, কপটতা, ঘোরতর বৈষয়িকতার রসাতলে তলাইতে থাকে। ইহা ত ধর্ম্মের সহিত চালাকী করিতে যাওয়া। ইহাতে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায়। ইহার আচার্য্যেরা অভিমানী, উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কারণ ইঁহারা জানেন ইঁহারাই ঈশ্বরকে ভাঙিতেছেন ও গড়িতেছেন, ইঁহারাই ধর্ম্মের সেতু।'[২]

চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিরা নিশ্চয়ই এই সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকার ফাইল আমাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ-সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু উত্তরের প্রকৃতি যে যথেষ্ট কটুস্বাদী ছিল, তা অনুমান করা যায় প্রিয়নাথ সেনকে কবিতায় লেখা পত্রে ['জলে বাসা বেঁধেছিলেম', ভারতী, ফাল্গুন। ৫৪২-৪৪] কিংবা ১ চৈত্রের সঞ্জীবনী-তে মুদ্রিত 'দামু ও চামু' কবিতায়—যেখানে ব্যঙ্গোক্তির উৎপীড়নে রবীন্দ্রনাথও ভাষার শালীনতা রক্ষা করতে পারেননি।

শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রজীবনের অন্যান্য ঘটনার মধ্যে কয়েকটির কথা আমরা জানতে পারি ক্যাশবহি থেকে : '১৬ রোজের [31 Jul] খরচ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের পীড়া হওয়ায় বাবু নীলমাধব হালদার ডাক্তর আসায় উহার যাতায়াতের গাড়িভাড়া।' এই অসুস্থতা নিশ্চয়ই গুরুতর আকার ধারণ করেনি, কারণ ৩০ শ্রাবণ [শুক্র 14 Aug] তিনি প্রতিভা দেবীকে সঙ্গে করে চুঁচুড়ায় মহর্ষির কাছে যান; তার আগে ২৭ শ্রাবণের হিসাব : 'হিতেন্দ্রবাবুর বিবাহের পাণপত্র ৫৫ / কন্যাকে আসির্ব্বাদ করিতে রবীন্দ্রবাবু লইয়া জান মোহর ২ থান'—হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় গণেন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী ধীরবালার [স্বামী অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়] কন্যা সরোজিনীর সঙ্গে [দ্র বংশ-লতিকা, রবিজীবনী ১। ২৭]। অমিয়নাথ ছিলেন মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্র। বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় অবশ্য দু' বছর পরে—২০ মাঘ ১২৯৪-তে—কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব কিভাবে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের উপর এসে পড়ছে!

বালক পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় [১। ৪] রবীন্দ্র-রচনার পরিমাণ সাতটি :

১৬২-৬৩ 'ন্যায় ধর্ম্ম'

বালক-পাঠ্য এই রচনাটি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

১৬৭-৭২ 'বীর গুরু' দ্র ইতিহাস [১৩৬২]। ৮৯-৯৭

বালক-এর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'কাজের লোক কে' প্রবন্ধে শিখধর্মের উদ্গাতা নানকের জীবনকথা বর্ণনা করেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে রচনা করলেন দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনবর্ণনা সূত্রে ধর্মপ্রাণ শিখজাতির বীর জাতিতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস। এই প্রবন্ধ দু'টি ও আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত 'শিখ স্বাধীনতা' প্রবন্ধটি প্রধানত বালকদের উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও রবীন্দ্রনাথের সমকালীন জাতীয়তাবোধের অন্যতম দিক্-নির্দেশক রূপে গণ্য হতে পারে। ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলা দেশে, রাজনৈতিক সচেতনতার

সঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটছিল তাকে একজন জাতীয় বীরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা স্বাভাবিক। নব্যহিন্দুসম্প্রদায়ের একজন হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র সেই আদর্শ মানবকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন পৌরাণিক কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে [তিনি অবশ্য কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।] অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ অনুসন্ধান করলেন ইতিহাসের মধ্যে, আপাতত শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনকাহিনীতে। রাজর্ষি উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্যের ঐতিহাসিক চরিত্রে তিনি রাজা ও ঋষির সমন্বয় দেখতে চাইলেও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রাজকীয় দার্ঢ্য সঞ্চার করতে পারেননি [বরং বিল্বনের কাল্পনিক চরিত্রে এই অনুপাতটি যথাযথ], সেই জিনিসটিই পেলেন গুরুগোবিন্দের মধ্যে।[১] তাঁর সংগঠনশক্তি ও বীরত্বের মধ্যে নির্জন সাধনার অংশটিও রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে : 'তাড়াতাড়ি করিলে তো কিছুই হয় না; এখনও সুসময়ের জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আয়োজন করিতে হইবে, বহুদিন অবিশ্রাম চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত সংকল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাহারা দুই দিনেই দেশের উপকার করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিতে চায়, যাহাদের ধৈর্য নাই, যাহারা অপেক্ষা করিতে জানে না, তাহাদের তড়িঘড়ি কাজ ও আড়ম্বর দেখিয়া লোকের চমক লাগিয়া যায়, কিন্তু তাহারা বড়ো লোক নহে, তাহাদের কাজ স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত জীবন দিতে চাহে না, জীবনের গোটাকতক দিন দিতে চাহে মাত্র, অথচ তাড়াতাড়ি বড়ো লোক বলিয়া খুব একটা প্রশংসা পাইতে চাহে। গোবিন্দ সেরূপ লোক ছিলেন না।'[২] প্রায় একই ভাবনা ইতিপূর্বে 'চেঁচিয়ে বলা', 'ন্যাশনল ফণ্ড', 'অকাল কুষ্মাণ্ড', 'হাতে কলমে' প্রভৃতি প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে, পরেও নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জাতিগঠনের ভূমিকা হিসেবে অনুরূপ ব্যবস্থাপত্রের সুপারিশ করেছেন—ইন্দিরা দেবীকে 28 Feb 1893 মঙ্গলবার [১৮ ফাল্গুন ১২৯৯] কটক থেকে লেখা একটি পত্রে একই চিন্তা গুরুগোবিন্দের নামের সঙ্গে জড়িত হয়েই প্রকাশিত : 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাণ্ডবরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন—গুরুগোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্বে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্ট ভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি—যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই, সম্পূর্ণতা লাভ করবার পূর্বেই ক্রমাগত নিজের অসমাপ্ত কাজ দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহবা নেবার ইচ্ছে করি—তা হলে কিছুই হবে না।'[৩] এই প্রসঙ্গে আমরা 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' ভাষণটির কথাও স্মরণ করতে পারি, সেখানেও গুরুগোবিন্দের নির্জন সাধনার কথা একই তাৎপর্যে উল্লিখিত।[৪] পরবর্তীকালে 'শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ'[৫] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য সংশোধন করেছেন, কিন্তু তা কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে আমরা যথাস্থানে তার আলোচনা করব।[১]

'বীরগুরু' ও 'শিখ-স্বাধীনতা' রচনা দু'টিই Joseph Davey Cunningham-এর 'History of the Sikhs' [1849-এ প্রথম প্রকাশিত] গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, কোনো-কোনো অংশ স্পষ্টতই ভাবানুবাদ -। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কোনো গ্রন্থের সাহায্যও গ্রহণ করেছিলেন, কেন-না তেগবাহাদুরের মৃত্যু ও ধনের প্রতি গোবিন্দসিংহের বিরাগ-সংক্রান্ত কাহিনীগুলি কানিংহামের গ্রন্থে নেই।

১৭৯-৮০ 'হাসিরাশি' দ্র শিশু ৯। ৬৭-৬৮

কবিতাটি প্রথমে কড়ি ও কোমল-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮২-৮৮ 'রাজর্ষি' চতুর্থ-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ রাজর্ষি ২। ৩৮৩-৯০

১৮৯-৯১ 'চিরঞ্জীবেষু' দ্র চিঠিপত্র ২। ৫১৫-১৮ [৩]

১৯৫-৯৮ 'বর্ষার চিঠি'

যৌবনে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতেন তাঁদের অন্যতম নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত Phoenix সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে 1884-এ করাচি-প্রবাসী হন। এই পত্রাকার প্রবন্ধটি তাঁরই উদ্দেশ্যে রচিত। কৌতুক, বাল্যস্মৃতির রোমন্থন, কবিত্বময় কল্পনার সংমিশ্রণে উপভোগ্য এই রচনাটি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। স্মৃতিচারণের অংশটি জীবনস্মৃতি-র কোনো কোনো বর্ণনাকে মনে করিয়ে দেয়। আর যখন তিনি লেখেন : 'বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে অসম্ভব উপকথাগুলো কেমন যেন সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। ঘনবৃষ্টিধারার আবরণে পৃথিবীর আপিসের কাজগুলো সমস্ত ঢাকা পড়ে যায়।…এই জন্যে মনুষ্যসমাজের সাংসারিক আবর্তের বাইরে বসে উপকথাগুলিকে সহজেই সত্য মনে করা যায়, কেউ তার ব্যাঘাত করে না। …সংসারের সংশ্রবে আসলেই তবে আমরা সম্ভব অসম্ভব বিচার করি, আমাদের বুদ্ধি জেগে ওঠে, আমাদের বয়স ফিরে পাই।' —তখন তাকে ভারতী-র ফাল্গুন ১২৯১ সংখ্যায় মুদ্রিত 'উপকথা' [কড়ি ও কোমল ২। ৩৫-৩৬] কবিতাটির ভাষ্য বলে মনে হয়।

১৯৯-২০১ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬। ৪৩-৪৫ ['ছাত্রের পরীক্ষা']

হেঁয়ালি-র উত্তর : 'মারপিট'।

[১৯২-৯৪ 'গান অভ্যাস' পর্যায়ে প্রতিভা দেবী রবীন্দ্রনাথের দু'টি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন : 'এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!' ও 'রিম ঝিম ঘন ঘনরে বরষে'।]

ভারতী, শ্রাবণ ১২৯২ [৯/৪]:

১৮৮-৯৮ 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা'

১৯৮ 'শান্তি' ['থাক্, থাক্, চুপ কর্ তোরা'] দ্র কড়ি ও কোমল ২। ৪৮

পুপাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির আদি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোকের অভিঘাত কবিতাটির ভাবপরিমণ্ডলে বর্তমান। মূল রচনার সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের যথেষ্ট পার্থক্য আছে, দ্র 'রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি-বিবরণ/পুষ্পাঞ্জলি', বি. ভা: প:, ২৫। ১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ৭১-৭২

বালক-এর ভাদ্র সংখ্যায় [১। ৫] রবীন্দ্রনাথের চারটি রচনা মুদ্রিত হয় :

২২৬-৩০ 'পুরোনো বট' দ্র শিশু ৯। ৯০-৯৪

বালক-এর জন্যে কবিতা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর বাল্যস্মৃতির জগতে ফিরে গেছেন তার নিদর্শন পাই 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'সাত ভাই চম্পা' ও 'পুরোনো বট' কবিতায়। শ্রাবণ-সংখ্যার 'বর্ষার চিঠি'-র মধ্যেও আমরা একই জিনিস লক্ষ্য করেছি। বালক এবং কড়ি ও কোমল-এর পাঠে ১৬টি ছত্র অতিরিক্ত আছে।

২৩৫-৪৩ 'রাজর্ষি' সপ্তম-নবম পরিচ্ছেদ দ্র রাজর্ষি ২। ৩৯০-৯৯

অষ্টম পরিচ্ছেদে ধ্রুবের কণ্ঠে একটি গান আছে : 'হরি তোমায় ডাকি—বালক একাকী'; 'ঝিঁঝিট—একতালা' সুরে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গানটি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে ও গীতবিতান-এ [৩। ৮৪০] সংকলিত হয়েছে; স্বর ৪৫।

২৪৮-৫১ 'শ্রীচরণেষু' দ্র চিঠিপত্র ২। ৫১৮-২১ [৪]

২৫৪-৫৭ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬। ৫০-৫৩ ['অভ্যর্থনা']

হেঁয়ালি-র উত্তর : আগুন।

[২৪৩-৪৮ 'গান অভ্যাস' পর্যায়ে কালমৃগয়া গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্যটির প্রতিভা দেবী-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।]

ভারতী, ভাদ্র ১২৯২ [৯/5] :

২৩৩-৩৭ 'বিবিধ প্রসঙ্গ'

ডায়ারির আকারে লেখা এই প্রসঙ্গগুলি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। দু'একটি প্রসঙ্গের কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

'১৪/জীবনের কাজ দেখিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি কাহার হয় জানি না—যাহার হয় সে আপনাকে চেনে নাই। সে আপনার চেয়ে আপনাকে ছোট বলিয়া জানে। সে জানে না সে যে-কাজ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা বড় কাজ করিতে আসিয়াছিল।…

'১৫/…আমি কি জানি না আমার একেকটি কাজ আমারই একেকটি অংশ—আমারই জীবনের একেকটি দিন! দিনকে ছাড়িয়া দিলেই দিন চলিয়া যায়, কিন্তু দিনের কাজের মধ্যে দিনকে আটক করিয়া রাখা যায়। আমার জীবন ত কতকগুলি দিনের সমষ্টি, সেই জীবনকে যদি রাখিতে চাই তবে তাহার প্রত্যেক দিনকে কার্য্য আকারে পরিণত করিতে হইবে।…

'১৬/কারণ, আমার হৃদয়ের মধ্যস্থিত আদর্শ আমার চেয়ে বড়। তাহা আমার মনুষ্যত্ব। আমি আমার ধর্ম্মজ্ঞানের হাতে একটি যন্ত্র মাত্র। সে আমাকে দিয়া তাহার কাজ করাইয়া লইতে চায়। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে আমি তাহার উপযোগী নহি—আমার দ্বারা তাহার কাজ সম্পন্ন হয় না। আমি দুর্ব্বল। তাহার কাজ করিতে গিয়া আমি ভাঙ্গিয়া যাই। কিন্তু সেই ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আনন্দ আছে। মনে এই সান্ত্বনা থাকে যে, তাহারই কাজে আমি ভাঙ্গিলাম। আমি নিষ্ফল হইলাম বলিতে বুঝায়, আমার প্রভুর কাজ হইল না। মনুষ্যত্ব আমাকে আশ্রয় করিয়া মগ্ন হইল। স্বামিন, তোমার আদেশ পালন হইল না।[১]

'১৭/সাধারণের কাছ হইতে যে ব্যক্তি খ্যাতি উপহার পায় তাহার রক্ষা নাই। এ বিষকন্যার হাতে যদি মৃত না হয় ত বন্দী হইতে হইবে। এই খ্যাতি তাপসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে সাধকের সাধনায় ব্যাঘাত করিতে আসে। যে ব্যক্তি সাধারণের প্রিয় সাধারণ তাহার জন্য আফিম বরাদ্দ করিয়া দেয়, সাধারণের দাঁড়ে বসিয়া সে ঝিমাইতে থাকে, সে আগেকার মত তাহার ডানাদুটি লইয়া মেঘের দিকে তেমন করিয়া আর উড়িতে পারে না। তার পরে এক দিন যখন খামখেয়ালি সাধারণ তাহার সাধের পাখীর বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দিবে, তখন পাখীর গান বন্ধ তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত।' অনুচ্ছেদটি কি রবীন্দ্রনাথ 'ভাই হাততালি প্রবন্ধটি পড়ে লিখেছিলেন?

ভাদ্র মাসের শেষে বা আশ্বিনের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ সোলাপুর যাত্রা করেন। ৩০ ভাদ্র [সোম:14 Sep] তারিখে ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায় : 'ব বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উহার বম্বের শোলাপুর গমনের জন্য ট্রেন ভাড়া দেওয়া যায়···১৫০'; পরের দিনের 'লগেজ ভাড়া' হিসেবে তাঁকে ১০ টাকা দেওয়ার কথা লেখা আছে। ট্রেনভাড়ার অঙ্কটি দেখে মনে হয় তাঁর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী এবং সম্ভবত মৃণালিনী দেবীও সোলাপুর গিয়েছিলেন। এর কয়েকদিন আগেই [ক্যাশবহি-র হিসাবটি ২৫ ভাদ্রের] তাঁকে একবার চুঁচুড়ায় যেতে দেখা যায়, সম্ভবত পিতার কাছে অনুমতি প্রার্থনা কিংবা বিদেশ যাত্রার পূর্বে সাক্ষাৎকারই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

সোলাপুর যাত্রার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বালক-এর কার্যাধ্যক্ষ রূপে আশ্বিন-কার্তিকের যুগ্ম-সংখ্যা [১। ৬-৭] প্রকাশের কাজ সমাপ্ত করে যান। এই সংখ্যায় তাঁর মোট ন'টি রচনা মুদ্রিত হয় ২৬৯-৭৪ 'বাঙ্গলা উচ্চারণ' দ্র শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৩৭-৪২

কৈশোরে বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ শব্দের রহস্যের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন, আর কবি হিশেবে কবিতার শরীর যে শব্দ তাকে নিয়ে চিরন্তন চিন্তা-ভাবনা তে ছিল-ই। কিন্তু বাংলা শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে তিনি সচেতন হন 1879-80-তে লণ্ডনে স্কট-ভগিনীদের বাংলা শেখাতে গিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সে-কথা উল্লেখ করেছেন, জীবনস্মৃতি-তেও প্রাসঙ্গিক বর্ণনা পাওয়া যায়, আমরা ইতিপূর্বে অন্য প্রসঙ্গে সেই অংশগুলি উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু শব্দতত্ত্ব নিয়ে রীতিমত আলোচনার ক্ষেত্রে এই রচনাটিই প্রথমতম। এর পর বালক-এরই কয়েকটি সংখ্যায় এবং সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, জীবনের শেষ পর্বে লিখিত 'বাংলা ভাষা পরিচয়' [1938] গ্রন্থটি থেকে বোঝা যায় শব্দতত্ত্বের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ কত প্রবল ছিল। কিন্তু সমস্ত আলোচনার পিছনে যে আকাঙক্ষাটি জীবন্ত হয়ে ছিল, সেটি তিনি বর্তমান প্রবন্ধেই স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন : 'প্রকৃত বাংলাব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃতব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলাব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।/ বাংলাব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।'[১]

২৮৩-৩০৪ 'রাজর্ষি', দশম-অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, দ্র রাজর্ষি ২। ৩৯৯-৪২৩

৩০৮-১২ 'চিরঞ্জীবেষু' দ্র চিঠিপত্র ২। ৫২১-২৫ [৫]

এই পত্রধারার মধ্যে দুটি স্পষ্ট বিভাগ দেখা যায়, যার একটির সমাপ্তি ঘটেছে বর্তমান পত্রটিতে। সমাজসংস্কার, আধুনিক ভাবধারা প্রভৃতি নিয়ে নাতি ও ঠাকুরদাদার মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও শ্লেষ-মিশ্রিত যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, এই পত্রে প্রবীণ ঠাকুরদাদা 'আজ তোমাতে আমাতে ভাব হইল ভাই!' লিখে আপোষের সুরে তার অবসান ঘোষণা করেছেন। সোলাপুর যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ হয়তো এই বিতর্ক শেষ করতে চেয়েছিলেন বলেই ঠাকুরদাদার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েও দুই বিরোধী ভাবনার মধ্যে সমন্বয় ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু কার্যত পত্রধারা এখানে সমাপ্ত হয়নি, সোলাপুরে অবস্থানকালে ও সেখান থেকে ফিরে এসে উভয়ের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়েছে তার সুরটি মোটামুটি একই তারে বাঁধা—যা বাঙালি

জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত আশাবাদের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কান্বিত। প্রসঙ্গটি নিয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করব।

৩২৩-২৬ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬। ৫৭-৬০ ['চিন্তাশীল']।

হেঁয়ালি-র উত্তর : 'মাছি'।

৩২৭-২৯ 'আকুল আহ্বান'

পুষ্পাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে 15-17 পৃষ্ঠায় কবিতাটির আদি রূপের সন্ধান পাওয়া যায়, যা কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোকের স্মারক বলে গণ্য হতে পারে—সেখানে কবিতাটির ছত্রসংখ্যা ৩৬। কিন্তু বালক-এ 'আকুল আহ্বান' শিরোনামে কবিতাটির ছত্রসংখ্যা ৭৬, মূল রচনার অনেকটাই পরিত্যক্ত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। কড়ি ও কোমল কাব্যের প্রথম সংস্করণে এই কবিতাটির ৮টি ছত্র বর্জিত হয়ে [ছত্র ২৯-৩৬] তিনটি স্বতন্ত্র কবিতায় পরিণত হয় : ছত্র ১-৪০ 'আকুল আহ্বান' [দ্র শিশু ৯। ৮৯, এখানে ১-৪, ২৫-২৮ ছত্র বর্জিত], ছত্র ৪১-৫৬ 'পাষাণী মা' [দ্র কড়ি ও কোমল ২ । ৪৯] এবং ছত্র ৫৭-৭৬ 'মায়ের আশা' [দ্র শিশু ৯। ৯০, ৬৫-৬৮ ছত্র বাদ দিয়ে 'আকুল আহ্বান কবিতার শেষাংশ হিশেবে সংযুক্ত হয়েছে।] প্রতিটি ক্ষেত্রেই অজস্র পাঠভেদ ঘটেছে। পুষ্পাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখিত কবিতাটিতে ব্যক্তিগত শোকের যে ছায়াপাত ঘটেছিল, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেটিকে কিভাবে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলা হয়েছে—পাঠক সেই ইতিহাসটি অনুসরণ করলে রবীন্দ্রনাথের মানস-বিবর্তনের একটি কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় লাভ করবেন।[২]

৩৩৭-৩৯ 'রুদ্ধ গৃহ' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫। ৪৭৭-৭৮

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাহাজী ব্যবসা শুরু করার পর বেশির ভাগ সময় জাহাজে বা বরিশাল প্রভৃতি কর্মস্থলে অতিবাহিত করতেন, কলকাতায় অবস্থান কালেও তাঁর প্রধান আস্তানা ছিল জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ি। তাই জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনের বাহির-তেতালায় যে ঘরটি তাঁর আবাসস্থল ছিল, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর অনেক দিন সেই ঘর বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। এই স্মৃতি সুরভিত রুদ্ধ কক্ষটিকে উদ্দেশ করেই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করেন, যা তাঁর মৃত্যু ও জীবন-ভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক্-নির্দেশক। তিনি লিখেছেন, 'এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত্যু কোথাও টিকিয়া থাকিতে পারে না।…যদি প্রত্যেক ক্ষুদ্র মৃত্যুকে পৃথিবী চিহ্নদ্বারা [যদ্দৃষ্টং][১] জীবিত করিয়া রাখিত, মৃত্যু-চিহ্নে এ পৃথিবী একেবারে কণ্টকিত হইয়া উঠিত, তবে এ পৃথিবীর সূর্য্যালোক ম্লান হইয়া যাইত আমাদের মুখের হাসি বিলীন হইত, আমাদের এই উৎসবময়ী ধরণী সুগভীর নিস্তব্ধ শোকের আবাস-ভূমি হইত। আজ দেখ, চিতাভস্মের [যদ্দৃষ্টং][১] উপরে লতা লুটাইয়া পড়ে ফুল ফুটিয়া উঠে—প্রকৃতি জননীর স্নেহ অবিশ্রাম কাজ করে, আমাদের অশ্রুজল মুছাইয়া দেয়, আমাদের ম্লান মুখে হাসি জাগাইয়া তোলে।…মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে; কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক।'[২] সেই জন্যই তিনি এই রুদ্ধ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন, তা হলেই 'সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।'[৩] পূর্বে সন্ধ্যাসংগীত-

পর্বে হৃদয়-অরণ্যের জটিল শাখাজালে আবদ্ধ কবি প্রভাতসংগীত-এ এসে অনুভব করেছিলেন 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!/ জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'—এখানেও 'যে ভাবাবেগ অশ্রান্ত ও অদম্য দীর্ঘশ্বাসরূপে আপনাকে অপচয় করিতেছিল, তাহাই এক গভীর জীবনসত্যের আধারে বিধৃত হইয়া···মৃত্যুর প্রেতায়িত নিশ্চলতার সহিত জীবনের সবল আনন্দপ্রবাহের যোগ হইয়া জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।'[৪]

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে 'শ্রীঅঃ—'[অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]' তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে একটি চিঠি লেখেন, সোলাপুর থেকে ২৬ আশ্বিন [রবি 11 Oct] রবীন্দ্রনাথ তার দীর্ঘ প্রত্যুত্তরে 'রুদ্ধগৃহ'-এর মূল ভাবটি ব্যাখ্যা করেন—দু'টি পত্র 'উত্তর প্রত্যুত্তর' শিরোনামে পৌষ সংখ্যা [পৃ ৪২৭-৩০] বালক-এ মুদ্রিত হয়।[৫]

৩৪১-৪৪ 'বরফ পড়া/(দৃশ্য)'

কয়েকটি কবিতায় ও 'বর্ষার চিঠি'-তে পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনের যে প্রবণতা লক্ষিত হয়, বর্তমান রচনাটিকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। 1878-এ ইংলন্ডে অবস্থানকালে তুষারপাতের দৃশ্য দেখার রোমাঞ্চকর প্রথম অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ এখানে বর্ণনা করেছেন। রচনাটি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি, তাই তার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করছি : 'ছবির রেখা মন হইতে কেমন অল্পে অল্পে অস্পষ্ট হইয়া আসে; প্রতিদিন যে সকল জিনিস দেখি, তাহাদেরই ছায়া অগ্রবর্তী হইয়া মনের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, কিছু দিন আগে যাহা দেখিয়া ছিলাম, তাহাদের প্রতিবিম্ব গোলেমালে কোথায় মিলাইয়া যায়, ভাল করিয়া ঠাহর করিবার যো থাকে না।···ছবিগুলি মাঝে মাঝে রৌদ্রে বাহির করিয়া ঝাড়িয়া.দেখিতে হয়। সেই জন্য আজ স্মৃতিপট রৌদ্রে বাহির করিয়াছি।'[৬]

জীবনস্মৃতি-র সূচনার সঙ্গে পাঠক এই অংশটি মিলিয়ে দেখতে পারেন!

৩৪৭-৫০ 'শিখ স্বাধীনতা দ্র ইতিহাস [১৩৬২]। ৯৮-১০২

শিখদের দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দসিংহের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বীর গুরু' প্রবন্ধে, বর্তমান রচনায় তাঁর উত্তরাধিকারী বন্দার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এবং দীর্ঘ মরণপণ যুদ্ধের ফলে শিখেদের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। হয়তো পাঞ্জাবে ইংরেজ-শাসনের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইতিবৃত্ত লেখার ইচ্ছা তাঁর মনে ছিল, কারণ তিনি লিখেছেন : 'তার পরে রণজিৎসিংহের অভ্যুদয়। তার পরে ব্রিটিশ-সিংহের প্রতাপ। তার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষ লাল হইয়া গেল। রণজিতের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। সে সকল কথা পরে হইবে।[৭] —কিন্তু সেই সংকল্প কার্যে পরিণত হয়নি। উল্লেখযোগ্য যে, এই রচনায় বর্ণিত বন্দা ও তরুসিংহের আত্মত্যাগের কাহিনী যথাক্রমে 'বন্দী বীর' [৩০ কার্তিক ১৩০৬ তারিখে রচিত, দ্র কথা ৭। ৫৫-৫৯] ও 'প্রার্থনাতীত দান' [২ কার্তিক ১৩০৬ তারিখে রচিত, দ্র কথা ৭। ৬২] কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করেছে।

৩৫১-৫৪ 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ'

সম্ভবত বিভিন্ন বিদেশি পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন করে ১২টি কৌতূহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক তথ্য এই রচনায় পরিবেশিত হয়েছে।

[৩১৬—১৭ 'গান অভ্যাস' পর্যায়ে প্রতিভা দেবী-কৃত কালমৃগয়া-র দ্বিতীয় দৃশ্যের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়।]

বালক-এর জন্য এই সব রচনা লিখে ও তার মুদ্রণ কার্য সমাপ্ত করে রবীন্দ্রনাথ সোলাপুর যাত্রা করলেন। সোলাপুরে তিনি কিঞ্চিদধিক এক মাস অবস্থান করেন। এই একটি মাস তাঁর জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চার বছর পরে 'আশ্বিন। সপ্তমীপূজা। ১৮৮৯' [১৬ আশ্বিন ১২৯৬ মঙ্গল 1Oct 1889] তারিখে 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-এ লিখিত শরৎকাল'-শীর্ষক একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ সোলাপুর-বাসের সুখস্মৃতি রোমন্থন করেছেন : বছর তিন চারের পূর্ব্বে একটি শরৎকাল আমি অন্তরের সহিত উপভোগ করিয়াছিলাম। বাড়ীর প্রান্তে একটী ছোট্ট ঘরে একটী ছোট্ট ডেস্কের সম্মুখে বাস করিতাম। আরো দু'একটী ছোট্ট আনন্দ আমার আশে পাশে আনাগোনা করিত। সে বৎসর যেন আমার সমস্ত জীবন ছুটী লইয়াছিল। আমি সেই ঘরটুকুর মধ্যে থাকিয়াই জগতে ভ্রমণ করিতাম, এবং বহির্জগতের মধ্যে থাকিয়াও ঘরের ভিতরটুকুর মধ্যে যে স্নেহপ্রেমের বিন্দুটুকু ছিল তাহা একান্ত আগ্রহের সহিত উপভোগ করিতাম। আমি যেন এক প্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়া ছিলাম। মনের উপর হইতে সমস্ত ভার চলিয়া গিয়া, আমি একপ্রকার লঘুভাবে জগতের সমস্ত মধুরতার মধ্য দিয়া অতি সহজে সঞ্চরণ করিতাম। বোধহয় সেই বৎসরই শরৎকালের সহিত আমার প্রথম বন্ধুভাবে পরিচয় হইয়াছিল।'[১] জীবনস্মৃতির 'বর্ষা ও শরৎ' এবং 'কড়ি ও কোমল' অধ্যায়েও [দ্র জীবনস্মৃতি ১৭।৪২৭, ৪৩২] তাঁর কবি-জীবনে এই শরতের ভূমিকা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে, যা কড়ি ও কোমল কাব্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত : 'আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রং নহে, সেখানে মাটির ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।' আমাদের ধারণা, সনেটের কঠিন বন্ধনে ভাবকে সংহত রূপে প্রকাশ করার চেষ্টা এই সময় থেকেই শুরু হয়, যার অনেকটাই তীব্র ইন্দ্রিয়বাসনার রঙে অনুরঞ্জিত। দেহ তার রক্ত মাংস উত্তাপ নিয়ে এখানে যতটা সচেতনভাবে উপস্থিত, রবীন্দ্রকাব্যের অন্যত্র তা একান্তই দুর্লভ। মনে হয়, কিশোরী বধূ মৃণালিনীকে দেহে-মনে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার আবেশ-বিহ্বলতা সনেটগুলির ভাবাবহ রচনা করেছে। বালক-এর চৈত্র সংখ্যায় 'শ্রীচরণেষু' পর্যায়ে নবীনকিশোর লিখেছে :'যেমন বালিকা স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যতই স্বামীপ্রেমের মর্ম অবগত হইতে থাকে ততই তাহার হৃদয়ের সমুদয় প্রবৃত্তি স্বামীর অভিমুখিনী হইতে থাকে—তখন শরীরের কষ্ট, জীবনের ভয় বা কোনো উপদেশই তাহাকে স্বামীসেবা হইতে ফিরাইতে পারে না'[২]—এই বক্তব্যকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-নিঃসৃত বলে মনে করতে পারি।[৩]

সোলাপুর-বাস পর্বেও তাঁর লেখনী যথেষ্ট সচল ছিল। 'পথপ্রান্তে' এই পর্বের প্রথম দিকের রচনা, যা 'রুদ্ধগৃহ'-এর ভাবনাকেই অনুসরণ করেছে : 'প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত। নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর-সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়।'[৪] শিউলিফুলের গাছ'ও হয়তো তাই—যার সাদৃশ্য দেখা যায় 'পুষ্পাঞ্জলি'র কোনো কোনো অনুচ্ছেদের সঙ্গে। অবশ্য 'পুষ্পাঞ্জলি'র বেদনা-বিহ্বলতা 'শিউলিফুলের গাছ'-এ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।[১]

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বিষণ্ণতার রেশটুকু পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছেন। 'শ্রীচরণেষু'-তে নবীনকিশোরের জবানীতে লিখেছেন : 'এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এই সুদূরবিস্তৃত মাঠ, এই অশোকের ছায়ায় বসিয়া, আমাদের সেই কলিকাতা শহরকে একটা মস্ত ইঁটের খাঁচা বলিয়া মনে হইতেছে।…ইঁট-কাঠ চুন-সুরকি মৃত্যুভারের মতো আমার উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে।…কিন্তু এখানে এই গাছপালার মধ্যে প্রাণের হিল্লোল। হৃদয়ের মধ্যে যেখানে জীবনের সরোবর আছে, প্রকৃতির চারিদিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে।[২] যে রুদ্ধগৃহ তার নিষ্করুণ অস্তিত্বের স্মৃতিভার নিয়ে তাঁর মনের উপর চেপে বসেছিল, এবং তত্ত্বায়িত করে যা থেকে তিনি মুক্তি পেতে চাইছিলেন, সোলাপুরের উদার-বিস্তৃত প্রকৃতির স্পর্শে সেই ভার নিজে থেকেই নেমে গেছে—ফলে প্রকৃত ছুটির স্বাদ তিনি অনুভব করেছেন এবং তাঁর সজীব দেহ-মন নূতন সৃষ্টির কল্পনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। সোলাপুর ত্যাগের পূর্বদিন প্রিয়নাথ সেনকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাই: 'এখানে এসে অব্‌ধি এম্‌নি ছুটির হাঙ্গমে পড়েছি যে ঠিক চিঠি লেখ্‌বার অবসরটুকু খুঁজে পাইনে। এখেনে চারিদিকে শরতের রৌদ্র, অশোকের গাছ, ছায়াময় পথ, তরঙ্গিত মাঠ, সুমধুর বাতাস—সমস্ত দিন এক্‌টা গড়িমসি ভাব—কখন লিখি বল? … এখেনে এই মাঠের মধ্যে এসে আমার মনের মধ্যে একরকম অস্থিরতা জন্মেছে। এক্‌টা কি আমার কাজ বাকী আছে মনে হচ্চে। এক্‌টা মহত্ত্বের জন্যে আকাঙক্ষা জাগ্‌চে। মনে হচ্চে আমি নিস্ফল। কি করব ঠিক সেইটে মনে করতে পারচি নে। কিন্তু বাঙ্গালীর হয়ে এক্‌টা কিছু করবই এইটে আমার মনে হচ্চে।'[৩] এই কথাগুলিকেই অন্য ভাষায় পাই পূর্বোল্লিখিত 'শ্রীচরণেষু'র মধ্যে : 'যখন বঙ্গদেশের ভিতরে বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড়ো আশা হইত না।… কিন্তু আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব **জ্যোতির্মণ্ডল** দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ—প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে, সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে। …আমার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন-সকল বড়োলোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের শামিল করিবেন ও এইরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।'[৪] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই বাঙালির এই আশা পূর্ণ হয়েছিল, এ-কথা আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

একই ভাব রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি রচনার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—দু'টিই সম্ভবত সোলাপুর-বাসের দ্বিতীয় পর্বে রচিত—একটি গদ্য রচনা 'লাইব্রেরি', অপরটি কবিতা 'আহ্বানগীত'। বালক-এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'লাইব্রেরি', 'আহ্বান গীত' ও পূর্বোক্ত 'শ্রীচরণেষু' একই ভাব-উৎস থেকে নির্গত হয়ে তিনটি শাখায় প্রবাহিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের সমৃদ্ধ লাইব্রেরিটির কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র 'আমেদাবাদ' অধ্যায়ে [দ্র ১৭। ৩৫৭] উল্লেখ করেছেন—সোলাপুর পর্বে পুস্তক-সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে তা নিশ্চয়ই সমৃদ্ধতর—এরই অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য সম্ভবত 'লাইব্রেরি' রচনাটির প্রেরণা রূপে কাজ করেছে। কিন্তু ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল সম্ভারের পাশে বাংলা গ্রন্থের অপ্রতুলতার চিত্রটি দেখেই হয়তো তিনি লিখেছিলেন : 'দেশ-বিদেশ হইতে, অতীত-বর্ত্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানব-জাতির পত্র আসিতেছে;… সকল দেশ

অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙ্গালীর নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পতেই লেখা থাকিবে।··· বাঙ্গলা দেশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একবার কাঁদিয়া সকলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে—বলিতে ইচ্ছা করে—"ভাই সকল, আপনার ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া গান কর। ··· বাঙ্গলা ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া মা বলিয়া ডাক। কেরাণীগিরির ভাষা আপিসের দেরাজের মধ্যে বন্ধ রাখিয়া মাতৃস্তনধারায় পুষ্ট মাতৃভাষায় জগতের বিচিত্র সঙ্গীতে যোগ দাও। বাঙ্গালী কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।'[১] —এই কথাগুলিই কাব্যভাষায় রূপ পেয়েছে 'আহ্বান গীত'-এ :

তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে জগতের নিমন্ত্রণ—
দীনহীন বেশ ফেলে যেয়ো পাছে, দাসত্বের আভরণ।···
উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ,
জগতের লোক সুধার আশায় সে ভাষা করিবে পান।···
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।
এক বার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়, ঘুচে যায় অপমান।[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্ভবত এই কবিতাটি অবলম্বন করেই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বাঙ্গালীর গান' প্রবন্ধে [বালক, ফাল্গুন। ৫১৭-১৯] লেখেন : 'জগতের এই যে মহাসঙ্গীত এই যে কালবিজয়ী গান, ইহাতে বাঙ্গালী কখন যোগ দিতে পারিবে কি? এমন কথা কখন কি বাঙ্গালীর মুখ দিয়া বাহির হইবে যে সেই কথা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য জগতের অন্যান্য জাতি কাড়াকাড়ি করিবে?··· বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সুকবি অনেক হইয়াছেন। ইনি আমাদের বায়রণ, ইনি আমাদের পোপ, ইনি আমাদের শেলি, এমন কথা অনেক শুনিতে পাই। কিন্তু ইনি আমাদের কবি, সমগ্র জাতির অহঙ্কারের সামগ্রী, জগতের একটী শ্রেষ্ঠ রত্ন, এ কথা এখনো শুনিতে পাই নাই।···আমরা সিংহাসন রচনা করিতেছি, বাঙ্গালীর কবি সেই সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিবেন। আমাদের মাথায় পা রাখিয়া তিনি যে গান গাহিবেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেই গান ধ্বনিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুরা তাঁর সম্পর্কে কী আশা পোষণ করতেন তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র হিশেবে উদ্ধৃতিটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয়নাথ সেনের একটি চিঠিতেও [দ্র চিঠিপত্র ৮। ২৩০—৩২] এই স্বপ্ন অভিব্যক্তি লাভ করেছে।[৩]

রবীন্দ্রনাথ সোলাপুর থেকে ঠিক কোন্ তারিখে কলকাতা ফিরে আসেন নিশ্চিত করে বলা শক্ত! প্রিয়নাথ সেনকে পূর্বোল্লিখিত পত্রে তিনি লেখেন : 'কাল আমরা কল্‌কাতামুখে যাচ্চি···বোধ করি আগামী শুক্রবারের ডাকে First delivery-তেই আমরা কলকাতায় গিয়ে 'পৌঁছব'[৪] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে 'তারিখ ঠিক জানিনে।/ অক্টোবর।/সোমবার।'—লিখিত পত্রেও আছে : এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলকাতায় বিলি হব।'[৫] সম্ভবত দ্বিতীয় চিঠিটি থেকে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রত্যাবর্তনের তারিখটি '১ কার্তিক ১২৯২'[৬] [শুক্র 16 oct 1885] বলে অনুমান করেছেন। আমাদের তা মনে হয় না। ৩০ আশ্বিন [বৃহ 15 oct] সপ্তমীপূজার দিন ছিল; পুজোর ছুটি কাটাতে বিদেশে গিয়ে তারই ভিড়ের মধ্যে ফিরে আসা একটু অস্বাভাবিক লাগে।

ক্যাশবহিতে ৭-২৮ কার্তিকের পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া যায়নি, পেলে হয়তো প্রত্যাবর্তন-সংক্রান্ত কোনো হিসাবের সন্ধান মিলত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'কলিকাতায় আসিয়াই সংবাদ পাইলেন মহর্ষি বোম্বাইএর নিকটবর্তী বন্দোরায় থাকিতে থাকিতে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—কলিকাতা হইতে লোক যাওয়া প্রয়োজন। বোধ হয় সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ…বন্দোরা রওনা হইয়া গেলেন।[১] কিন্তু তথ্যটি যথার্থ নয়। মহর্ষি বোম্বাই যান পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়ে [Dec 1885]—১৪ ফাল্গুন [বৃহ 25 Feb 1886]' ব° শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট বাঁন্দরায় দং উঁহার নিকট পাঠান যায় তিন হাজার টাকার তিন কেতা নোট ডাকে রেজেষ্টরি করিয়া' পাঠানোর হিসাব ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে ৮ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec 1885] 'চুঁচুড়ার বাটীতে রবীন্দ্রবাবুর-বড়দিদিঠাকুরাণীর যাতায়াতের ব্যয়'-সংক্রান্ত হিসাবের সাক্ষাৎ মেলে। সোমপ্রকাশ [৩০। ১৭, ২৫ ফাল্গুন ৪ Mar] লেখে : 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষণে বোম্বাইনগরে আছেন। বোম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজের যাবতীয় সভ্যগণ সমবেত হইয়া ইঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন। মহর্ষি যেখানে যান স্থানীয় লোক সকল তাঁহার ক্ষণিক সহবাসেও আপনাদিগকে পরম আপ্যায়িত বোধ করেন।'—এ সবই তাঁর অসুস্থতার পূর্বের ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বন্দোরায় যান জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩-এর [Jun 1886] শেষ দিকে, সে বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ চুঁচুড়ায় গিয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ২৯ কার্তিক [শুক্র 13 Nov] তারিখে [ক্যাশবহির ৩ অগ্র°-এর হিসাব : '২৯ কার্ত্তিক রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের চুঁচুড়ার বাটী যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া ও গাড়ি ভাড়ার ব্যয়—৩৲']

প্রবাসে অবস্থানের জন্য কার্যাধ্যক্ষ হিশেবে অগ্রহায়ণ সংখ্যা বালক-এর মুদ্রণাদির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। অবশ্য এই সংখ্যাতেও তাঁর পাঁচটি রচনা মুদ্রিত হয় :

৩৬৪-৭৩ 'রাজর্ষি' : দ্বিতীয় খণ্ড। ঊনবিংশ-দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ দ্র রাজর্ষি ২।৪২৩-৩৩ রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী-র 'সূচনা'য় লিখেছেন : 'আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।/বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। …সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়।' কিন্তু বিসর্জন [১২৯৭]-এ রাজর্ষির নাট্যরূপান্তর ঘটাতে গিয়ে তিনি অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনা আশ্রয় করেছেন। সেদিক দিয়ে উপরোক্ত মন্তব্য এই দ্বিতীয় খন্ডের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। অবশ্য 'মাসিক পত্রের পেটুক দাবি' মাত্র ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত আদায় করতে পেরেছিল, এর পরে আরও ১৮টি পরিচ্ছেদ তিনি স্ব-ইচ্ছাতেই রচনা করেছিলেন এ-কথাও মনে রাখা দরকার।

৩৭৬-৮০ 'পথপ্রান্তে' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৭৯-৮২

গদ্যগ্রন্থাবলী-র প্রথম খণ্ড [১৩১৪] হিশেবে প্রকাশের সময় বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে এই রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি, মাঘ ১৩৪২ সংস্করণে প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়।

৩৮৫-৮৭ 'শিউলিফুলের গাছ'

এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

৩৯৮ - ৪০০ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬। ৬০-৬২ ['ভাব ও অভাব']

হেয়ালির উত্তর : বাগান।

৪০২ 'একটি প্রশ্ন' 'দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২।৫২৯

২৪ অগ্রহায়ণ [মঙ্গল 4 Dec.] রবীন্দ্রনাথ চুঁচুড়ায় পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এর কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে দেখা যায় গঙ্গাবক্ষে 'রাজহংস' স্টীমারে। প্রিয়নাথ সেনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্রে তিনি লেখেন : 'আমরা এখন দিনকতক জলের উপর আছি। আমাদের স্টীমারের নাম "রাজহংস"। হাওড়া তেলকল ঘাটের উপরেই নোঙর করা। কলকাতা কয়লাঘাটের ঠিক পরপারে।'[২] এই বর্ণনা থেকে মনে হয় জলপথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নয়, কেবল জলের উপর কিছুদিন বসবাসের জন্যই তিনি উক্ত স্টীমারে গিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও ইন্দিরা দেবী ও যে এই স্টীমারে ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের খাতায়। 26 Nov [১২ অগ্র°] 'রাজহংস'তে 'Positivism পাঠরতা' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও 13 Dec [রবি অগ্র° ২৯] 'In Peril of his life পাঠরতা' ইন্দিরা দেবীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অবশ্য ইন্দিরা দেবী হয়তো পরে সেখানে গিয়েছিলেন, কারণ ইন্দিরা দেবীকে 'স্টীমার "রাজহংস"। গঙ্গা' ঠিকানায় যে পত্র-কবিতা লেখেন [বালক, ফাল্গুন। ৫০৮-১২], তা থেকে বোঝা যায় অন্তত সেই সময়ে তিনি সঙ্গে ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ ১ পৌষের [মঙ্গল 15 Dec] পূর্বেই নৌকাযাত্রা থেকে ফিরে এসেছিলেন, কারণ ক্যাশবহি থেকে জানা যায় ঐ দিনই তিনি চুঁচুড়ায় পিতার সঙ্গে দেখা করতে যান। ৬ পৌষ তিনি চুঁচুড়ায় যান ও ৮ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] পুনরায় যান বড়োদিদি সৌদামিনী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। মহর্ষি সম্ভবত এই সময় থেকেই বোম্বাই যাবার আয়োজন করছিলেন, তারই আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটির জন্য হয়তো এই ঘন ঘন যাতায়াত।

বালক-এর পৌষ সংখ্যায় [১।৯] রবীন্দ্রনাথের ছ'টি রচনা মুদ্রিত হয়, যাদের অধিকাংশই সোলাপুর-বাসের সময়ে রচিত :

৪১৩-১৭ 'রাজর্ষি' ত্রয়োবিংশ – চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ দ্র: রাজর্ষি ২।৪৩৩-৩৮

৪১৭-২০ 'লাইব্রেরি' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৩৯-৪০ [সংক্ষেপিত]

৪২০-২২ 'আহ্বান গীত' দ্র কড়ি ও কোমল ২।১১০-১৫

[৪২৩-২৬ 'গান অভ্যাস' পর্যায়ে কালমৃগয়া-র তৃতীয় দৃশ্যটির প্রতিভা দেবী-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।]

৪২৭-৩০ 'উত্তর প্রত্যুত্তর।/(রুদ্ধগৃহ সম্বন্ধে)' দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫। ৫৬০-৬৪ [গ্র°প°]

৪৩৬-৪০ 'শ্রীচরণেষু' দ্র চিঠিপত্র ২। ৫২৫-৩০[৬]

৪৪১-৪৩ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬। ৬৩-৬৫ ['রোগীর বন্ধু']

হেঁয়ালির উত্তর : উচিত বা হাত।

[অগ্র°-সংখ্যা বালক-এ রাস্কিনের একটি গদ্যাংশ উদ্ধৃত করে 'তর্জ্জমা'-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, যোগেন্দ্রনাথ লাহা শ্রেষ্ঠ অনুবাদের জন্য প্রফেসর ব্ল্যাকি

সংকলিত The Wisdom of Goethe বইটি পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কৃত অনুবাদটি ও 'নিম্নলিখিত সরল ও প্রায় অবিকল অনুবাদটি একটি অল্পবয়স্কা-বালিকার রচনা। স্থানে স্থানে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে' মন্তব্য-সহ আর-একটি অনুবাদ ৪৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। 'শ্রীমতী ইঃ-' স্বাক্ষরিত এই অনুবাদটি সম্ভবত ইন্দিরা দেবী-কৃত, সেদিক দিয়ে এইটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা। এই সংখ্যায় আর একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় : 'পাঠকদের প্রতি।/বালকের যে কোন গ্রাহক "হুজুগ", "ন্যাকামি" ও "আহ্লাদে" শব্দের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংক্ষেপ সংজ্ঞা (definition) লিখিয়া পৌষ মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন তাঁহাকে একটি ভাল গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। এককেটি সংজ্ঞা পাঁচটি পদের অধিক না হয়।' প্রতিযোগিতাটি রবীন্দ্রনাথই আহ্বান করেছিলেন; ফাল্গুন-সংখ্যায় 'সংজ্ঞা বিচার' নাম দিয়ে তিনি এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।]

১৫ পৌষ [মঙ্গল 29 Dec. 1885] ইন্দিরা দেবীর ত্রয়োদশতম জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'একটি কাঠের বাক্স' উপহার দেন এবং সেই সূত্রে 'জন্মতিথির উপহার' [বালক, চৈত্র। ৫৬০-৬১] কবিতাটি রচনা করেন। ইন্দিরা দেবী এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'আমার জন্মদিনে একটি সুন্দর পিয়ানোর মতো গড়নের দোয়াতদানি উপহার দিয়ে তার সঙ্গে যে কয়েক ছত্র লিখেছিলেন সেও তাঁর হাতের স্পর্শে উজ্জ্বল'।[১] উল্লেখ্য যে, ঠাকুরবাড়িতে জন্মদিন পালনের প্রথা প্রবর্তন করেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর সন্তানদের ক্ষেত্রে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন তখনও পর্যন্ত পালিত হয়নি, সরলা দেবীর বর্ণনানুসারে তার সূচনা ১২৯৪ বঙ্গাব্দে তাঁর সপ্তবিংশতিতম জন্মদিনে।[২] যদিও তাঁর নিজের জন্মদিন সম্বন্ধে সচেতনতার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ১২৯৩-এর বৈশাখ মাসে [? 30 Apr. 1886] লেখা একটি পত্রে।[৩]

পৌষ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে [25-27 Dec. 1885] ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গৃহে জাতীয় মহাসভার [National Conference] দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এতে উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা যায় নি, কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর লেখনী আশ্চর্যরকম নীরব। বস্তুত এই সময়ে তাঁর বিভিন্ন রচনায় ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবনার যতটা প্রতিফলন দেখা যায়, রাজনৈতিক চিন্তার অনুপস্থিতি ততটাই লক্ষণীয়।

বালক-এর মাঘ-সংখ্যায় [১।১০] রবীন্দ্রনাথের মাত্র তিনটি রচনা মুদ্রিত হয়, যা পত্রিকাটি সম্পর্কে তাঁর ক্রমিক অনাগ্রহেরই লক্ষণ [ফাল্গুন-সংখ্যাতেও তাঁর রচনার সংখ্যা মাত্র দুটি] :

৪৮৩-৮৯ 'রাজর্ষি' পঞ্চবিংশ-ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ দ্র রাজর্ষি ২। ৪৩৮-৪৫

বালক পত্রিকা আরও দু-মাস চললেও রাজর্ষির আর কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয়নি, সম্ভবত পূর্বোক্ত অনুৎসাহই এর কারণ।

৪৮৯-৯৬ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬। ৬৬-৭৩ ['খ্যাতির বিড়ম্বনা']

হেঁয়ালির উত্তর : আদায়।

এই রচনাটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কিছু কৌতুকজনক অথচ করুণ অভিজ্ঞতারই প্যারডি। জীবনস্মৃতির 'বালক' অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন : 'আমার ছোটো ঘরটাতে কত অদ্ভুত মানুষ যে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার আর সীমা নাই; ...উহারই মধ্যে দুই-একজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত।...আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘদিন

পড়িবার বেতন দিয়াছি যাহাদের পক্ষে বেতন নিষ্প্রয়োজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ-পর্যন্তই অনধ্যায়। [১] একবার একটি ছেলে এসে তাঁকে বলল, মাথার ব্যামোতে তার বি এ পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, তাঁর স্ত্রী পূর্বজন্মে তার মা ছিলেন—তাঁর পাদোদক খেলেই সে আরোগ্যলাভ করবে। স্ত্রীর পাদোদক বলে একটু সাধারণ জল খাইয়ে দিলেও সে আশ্চর্য উপকার বোধ করল এবং 'অভিব্যক্তির পর্যায়ে জল হইতে অতি সহজে সে অন্নে উত্তীর্ণ হইল' এবং ক্রমে তাঁর ঘরের একটি অংশ অধিকার করে বসল। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, ঘরের কিছু কিছু বই ক্রমশ অন্তর্হিত হতে থাকলে ছেলেটি জানায় যে সে সত্যবাবুকে মাঝে মাঝে ঐ ঘরে আসতে দেখছে।[২] 'ইহার পরে পূর্বজন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠিল। দেখিলাম, এ-সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন চিঠি পাইলাম, আমার গতজন্মের একটি কন্যাসন্তান রোগশান্তির জন্য আমার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল, পুত্রটিকে লইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু গতজন্মের কন্যাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।'[৩] এই করুণ অভিজ্ঞতাই হয়তো 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'য় কৌতুকরসের মিশ্রণে পরিবেশিত হয়েছে।

৪৯৬-৯৮ 'চিরঞ্জীবেষু' দ্র চিঠিপত্র ২। ৫৩০-৩২ [৭]

[৪৭৪-৭৮ 'গান অভ্যাস' পর্যায়ে কালমৃগয়ার চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমার্ধের ('…নাচিব, সখী, সবে নবঘন-উৎসবে/ বিকচ বকুলতরু-মূলে' পর্যন্ত) প্রতিভা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয়। এর পরে রবীন্দ্রনাথ কালমৃগয়ার অনেকগুলি গান নিয়ে বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করেন, এই কারণেই হয়তো প্রতিভা দেবী এর ক্রমানুসৃতি ঘটাননি।]

পৌষ ও মাঘ দুটি মাসই রবীন্দ্রনাথ সংগীতের রসে সম্পূর্ণ ডুবে থাকেন। ব্রাহ্মসম্মিলন ও মাঘোৎসবের জন্য ২৪টি গান রচিত হয়। বোঝাই যায়, গান-রচনা, সুর-যোজনা ও গানের দলকে প্রস্তুত করার জন্য তাঁকে কী কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেইকথাই লিখেছেন প্রিয়নাথ সেনকে একটি তারিখ-হীন পত্রে : '১১ই মাঘের আবর্ত্তের মধ্যে অহোরাত্র ঘূর্ণিত। তুমি এসে দেখা না করলে আমার পক্ষে নড়া বড় কঠিন।[৪] এরই মধ্যে ৮ মাঘ [বুধ 20 Jan 1886] কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে বিখ্যাত বেহালা বাদক রেমিনির বাজনা শুনতে যান, কারণ 'যাঁরা রেমিনির বেহালা শুনেছেন তাঁরা বলেন একবার এই বেহালা শুনলে চিরজীবন সার্থক হয়—এমন মধুর সঙ্গীত তাঁরা জন্মে কখনও শোনেননি।'[৫]

৯ মাঘ [বৃহ 21 Jan] পূর্ববৎসরের মতোই 'ব্রাহ্মসম্মিলন' হয় : 'গত ৯ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। ঐ দিন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কয়জন বেদির আসন গ্রহণ করেন।' [তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২১১] রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে অনুষ্ঠানটিকে 'তিন সমাজের একত্র উপাসনা' ও 'তিন সমাজের মহারথীরা একত্র হবেন' বলে উল্লেখ করলেও প্রতাপচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথ এই সময়ে নববিধান সমাজের যথার্থ প্রতিনিধি ছিলেন না এবং শিবনাথ ও উমেশচন্দ্রের মতো সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান দুই নেতা

উপস্থিত থাকলেও উক্ত সমাজের মুখপত্র তত্ত্ব-কৌমুদী কোনো অজ্ঞাত কারণে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করে। এই উপলক্ষে পাঁচটি গান গীত হয়, তার মধ্যে দু'টি রবীন্দ্রনাথ-রচিত :

ঝিঁঝিট—একতালা। একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্ দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৫-১৬; গীতবিতান ৩।৮২০; স্বর ৪৭। [গানটির মধ্যে 'আহ্বান গীত'-এর আশাবাদের সুরটি ধ্বনিত হয়েছে, সেইজন্য এটি রবীন্দ্রনাথের 'জাতীয় সংগীত'-এর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।]

বাহার—একতালা। পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৬; গীতবিতান ৩। ৮৩৮; স্বর ২৪। গানটি ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

১১ মাঘ [শনি 23 Jan 1886] ষড়পঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনা হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে গীত ১১টি গানের মধ্যে ৯টিই রবীন্দ্রনাথের রচনা :

[১] টোড়ি—ঢিমা তেতালা। শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীতবিতান ১।১৫৪; স্বরলিপি নেই; মূলগান : হো নর হর দ্র ত্রিবেণীসংগম। ৩২।

[২] যোগিঞা কাওয়ালি। নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯-২০; গীতবিতান ১। ১২১; স্বর ২৫; মূলগান: আজু মন ভাবন যোগী আয়ে [যোগিয়া আড়াঠেকা] দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৭০।

[৩] মিশ্র ললিত—একতালা। ডাকিছু শুনি জাগিনু প্রভু দ্র তত্ত্ব° ফাল্গুন। ২২০; গীতবিতান ১। ৭৭-৭৮; স্বর ৪।

[৪] ধুন—ঠুংরি। অন্ধ জনে দেহ আলো দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২২; গীতবিতান ১।৫২-৫৩; স্বর ২৭।

[৫] ভৈরবী—ঝাঁপতাল। হেরি তব বিমল মুখভাতি দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন! ২২২; গীতবিতান ১। ১৩৭; স্বর ২৩।

[৬] রামকিরি [রামকেলি] ঝাঁপতাল। আমি দীন অতি দীন দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৯১; গীতবিতান ১। ১৯১; স্বর ২৩। এটি পূর্ববর্তী কোনো গানের আদর্শে রচিত।

[৭] মিশ্র বেলাওল—ঝাঁপতাল। শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২২-২৩; গীতবিতান ১। ১৭৯; স্বর ৪।

[৮] খট্—ঝাঁপতাল। পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৩; গীতবিতান ১। ১৭৮-৭৯; স্বর ২৩। মূল গান : ঈশ্বরী নাম জপ নর অমর হোত হৈ দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৪৪।

[৯] আসা ভৈরবী—ঠুংরি। মিটিল সব ক্ষুধা। দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৩; গীতবিতান ৩। ৮৪২; স্বর ২৩।

প্রাতঃকালীন উপাসনায় গীত সংগীত সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ২২৩] লিখিত হয় : 'খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমস্ত সঙ্গীতের মধ্যে কএকটী গীত স্বয়ং গাহিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত-সুধায় মুগ্ধ হন নাই প্রাতঃকালীন উপাসনায় এরূপ লোক বিরল। ঐ দিন অনেকেরই এই প্রাচীন কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস হইয়া ছিল অনন্ত ফলংহি সাম।' কোন্ গানগুলি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন প্রতিবেদনে তার উল্লেখ করা হয়নি।

সায়ংকালীন উপাসনা হয় মহর্ষিভবনে; 'লোকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার হইয়াছিল। বহিঃপ্রদেশের তোরণ ও প্রাঙ্গণে বৈদ্যুতিক আলোক ও সভাস্থলের চতুর্দিকে গ্যাসের আলোক। সর্বত্র পুষ্পপত্রের নানা রূপ রচনা গৃহের

অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিল।' [তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৩] নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ মৌখিক ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে গীত মোট ষোলোটি ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে তেরোটিই রবীন্দ্রনাথের রচনা :

[১] ইমন কল্যাণ—চৌতাল। শোন তাঁর সুধাবাণী শুভমুহূর্তে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৩; গীতবিতান। ১। ১২১; স্বর ২৭। মূল গান : শুধমুদ্রা শুধবাণী দ্র ত্রিবেণীসংগম। ৩২।

[২] খাম্বাজ—ধামার। ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৩-২৪; গীতবিতান ১। ১৭২; স্বর ২২। মূলগান : হাঁ রে ডফ বাজন লাগে খেলন চলিয়ে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা। ৩। ৪৪।

[৩] বাহার—ধামার। এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায় দ্র তত্ত্ব° ফাল্গুন। ২২৪; গীতবিতান ১। ১৩৮; স্বর ২৬। মূল গান : আজু ব্রজমেঁ সৈয়াঁ খেলোঁগী হোরি দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৩৮।

[৪] কানাড়া—একতালা। কি গাব আমি কি শুনাব দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৪৬; গীতবিতান ১। ১২৮; স্বর ৪।

[৫] বাহার—তেওরা। আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৪৬; গীতবিতান ১। ১২৯; স্বর ২৩। মূলগান : যদুভট্ট-কৃত 'আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৬২

[৬] বেহাগ—যৎ। কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৪৬; তত্ত্বকৌমুদী [৯।১], ১ বৈশাখ ১২৯৩।১; গীতবিতান ১।১৬৫-৬৬; স্বর ২৬।[১]

[৭] মিশ্র কেদারা—একতালা। যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৪৬-৪৭; তত্ত্বকৌমুদী [৮। ২৪], ১৬ চৈত্র। ২৭৭; গীতবিতান ১।১৬৬; স্বর ৪।[১]

[৮] কাফি—যৎ। তার তার হরি দীন জনে দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৪৭; গীতবিতান ৩। ৮৪২; স্বর ২৫। ইন্দিরা দেবী উল্লেখ না করলেও মনে হয় এটি পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত।

[৯] ইমন ভূপালি—একতালা। তোমার কথা হেথা কেহত বলে না দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র/২৪৭; গীতবিতান ১। ১৬৩; স্বর ৪।

[১০] গৌড় মল্লার—কাওয়ালি। তোমার দেখা পাব বলে দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৪৭; গীতবিতান ১। ১৭৪; স্বর ২৬।

[১১] দেশ—কাওয়ালি। হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৪৭; গীতবিতান ১। ১৬৯; স্বর। ২৩। মূল গান : তানানা দ্রে দে দ্র ত্রিবেণীসংগম। ৩৪।

[১২] ঝিঁঝিট—চৌতাল। তোমারি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৪৭-৪৮; গীতবিতান ১। ২০৮; স্বর ২২। মূলগান : তেরো হি নয়নবাণ, ভৌহে ধনুক : দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ১৫-১৭

[১৩] পরজ—কাওয়ালি। তব প্রেম সুধারসে মেতেছি দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৪৮; গীতবিতান:১। ৮৪২; স্বর ২৬। মূল গান : কারি কারি কামলিয়া গুরুজী দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৭৫-৭৬

মাঘোৎসবের গানের পালা শেষ হয়ে গেলেও গীতসুধারস রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করল না। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিভিন্ন ব্যক্তির দানে পুষ্ট হলেও তার অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহিত হত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে। সমাজের তরুণ সম্পাদক নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে স্বয়ংভর করে তুলতে চাইলেন। এই উপলক্ষে

১২৮৭ বঙ্গাব্দে রচিত ও অভিনীত গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা-কে তিনি সম্পূর্ণ ঢেলে সাজালেন। প্রথম সংস্করণে মোট ২৬টি গান ছিল, তার থেকে একটি বাদ গেল ['হৃদয়ে রাখ গো দেবি, চরণে তোমার'] এবং ন-টি গান 'পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে' কালমৃগয়া গীতিনাট্য থেকে গৃহীত হল :

[১] মিশ্র সিন্ধু। আঃ বেঁচেছি এখন

[২] মিশ্র ঝিঁঝিট। এনেছি মোরা এনেছি মোরা

[৩] মল্লার। রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে

[৪] ইমনকল্যাণ। এই বেলা সবে মিলে চল হো

[৫] বাহার। গহনে গহনে যা রে তোরা

[৬] অহং। চল্ চল্ ভাই

[৭] মিশ্র মল্লার। কে এল আজি এ

[৮] দেশ। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে

[৯] শঙ্করা। সর্দার মশায় দেরি না সয়

দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য নূতন গান রচিত হল মোট আঠারোটি :

[১] সিন্ধু-কাফি। সহে না সহে না কাঁদে পরাণ

[২] মিশ্র মল্লার। ওই মেঘ করে বুঝি গগনে

[৩] মিশ্র ঝিঁঝিট। মরি ও কাহার বাছা, মূল গান : Go where glory waits thee

[৪] ঝিঁঝিট। কি দোষে বাঁধিলে আমায়

[৫] মিশ্র বাগেশ্রী। ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ভাই

[৬] কানাড়া। রাজা মহারাজা কে জানে

[৭] খাম্বাজ। আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা

[৮] মিশ্র সিন্ধু। আঃ কাজ কি গোলমালে

[৯] বেহাগ। অহো আস্পর্দ্ধা একি তোদের নরাধম মূল গান : দ্রারা দিম্ তানা না, তু° চরাচর সকলি মায়া

[১০] ভৈরবী। আয় মা আমার সাথে। তু° মা একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন

[১১] বেহাগ। কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই

[১২] সুরট। কেন রাজা ডাকিস কেন

[১৩] গৌরী। বলব কি আর বলব খুড়ো

[১৪] বাহার। রাখ্ রাখ্ ফে ধনু

[১৫] মিশ্র পূরবী। দেখ্ দেখ্ দুটো পাখী বসেছে গাছে

[১৬] তিলককামোদ—কালাংড়া। নমি নমি ভারতী

[১৭] রামপ্রসাদী। শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা

[১৮] ভৈঁরো। বাণী, বীণাপাণি করুণাময়ী

এছাড়া প্রথম সংস্করণের ‘নিশুম্ভমর্দিনী অম্বে’ গানটির পরিবর্তে অক্ষয় চৌধুরী রচিত ‘রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা’ গানটি এবং তাঁরই লেখা আরো একটি গান ‘এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী’ এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়-পত্রী হিশেবে প্রকাশিত হয় 20 Feb 1886 [শনি ৯ ফাল্গুন]। এই সংস্করণের মলাটে আছে :

বাল্মীকি-প্রতিভা।/গীতি-নাট্য।/দ্বিতীয় সংস্করণ।/কলিকাতা /৫৫ নং চিৎপুর রোড। / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত/ ও প্রকাশিত। /ফাল্গুন ১২৯২ সাল।/ মূল্য ।০ চারি আনা।[১]

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৯; মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে এই নবরূপায়িত গীতিনাট্যটি অভিনীত হয় মহর্ষিভবনে ৯ ফাল্গুন [শনি 20 Feb] তারিখে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘একবার বাল্মীকিপ্রতিভা নাটক করে আদিব্রাহ্মসমাজের জন্য এক পত্তন টাকা তোলা হয়ে গেছে। বেশ কয়েক হাজার টাকা উঠেছিল এই নাটক করে।’[২] রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বাল্মীকি সেজেছিলেন এবং প্রতিভাদেবী সরস্বতী, কিন্তু তিনিই বালিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কিনা ও অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনেতা অভিনেত্রীদের তালিকা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত। সঞ্জীবনী-র [৩।৪৪, পৃ ১৭৫] ১৬ ফাল্গুন [শনি 27 Feb] ‘সংখ্যায় সমালোচনা।/ বাল্মীকি প্রতিভা।’ শিরোনামে এই অভিনয়ের একটি বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হয় :

‘বিগত শনিবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যার্থ বাল্মীকি-প্রতিভা নামক গীতি নাট্যের অভিনয় হইয়াছিল; মহর্ষির পরিবারের মত সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত পরিবার বঙ্গদেশে নাই, ভারতবর্ষে আছে কিনা জানি না। সুকুমার বিদ্যার উৎকর্ষের জন্য এই পরিবারের পুরুষ রমণীগণ সুবিখ্যাত। এই দেব পরিবারের বালিকা ও যুবকগণের নাট্যাভিনয় দর্শন করিবার জন্য হাইকোর্টের জজ, বারিষ্টার উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক, সংবাদপত্র সম্পাদক প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। টিকিটের মূল্য ৮ টাকা ও ৪ টাকা ছিল তথাপি ন্যূনাধিক দুই শত লোক অভিনয় দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন।···

‘গীতিনাট্যখানি যেমন গভীর ভাবপূর্ণ, অভিনয়ও তদনুরূপ হইয়াছিল। বালিকার বিলাপ সঙ্গীত, নিবিড় বনের শান্তিহরণে বনদেবীগণের খেদ, বাল্মীকির অনুতাপ ও বিরহ গীত শ্রবণে দর্শকগণের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। একদিকে দস্যুগণের অবিরাম রঙ্গ-ভঙ্গী ও অট্ট হাস্য অপর দিকে ধীরে ধীরে বাল্মীকির প্রাণে নবজীবন সঞ্চার, তুলনায় অতি সুন্দর হইয়াছিল। সরস্বতীর আবির্ভাব ও সেতার বাদ্য দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল।···’

মহর্ষি এই অভিনয়ের সংবাদ পেয়ে বান্দোরা থেকে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি পাওয়া যায় নি, কিন্তু প্রিয়নাথ সেন এটি সম্পর্কে লেখেন : ‘তুমি যে সেদিন তোমাদের বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর যে পত্রখানি দেখিয়েছেলে সেখানি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল—তাহার সুন্দর অকপট স্নেহময় ভাষায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি।’[১]

এই সময়ে মহর্ষিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির সংবাদ পাওয়া যায় ২৬ ফাল্গুন [9 Mar] তারিখে ক্যাশবহির একটি হিসাবে : ‘শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্র বাবু মহাশয় (রবীন্দ্রবাবুর

দেওয়া) এক পত্র রেজেস্টারি করিয়া পাঠান তাহার ব্যয় ২/০'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে দ্বিপেন্দ্রনাথ জমিদারি ও পারিবারিক হিসাবপত্র দেখাশোনা করতেন।

বালক-এর ফাল্গুন সংখ্যায় [১/১১] রবীন্দ্রনাথের মাত্র দু'টি রচনামুদ্রিত হয় :

৫০৮-১২ 'চিঠি' ['চিঠি লিখব কথা ছিল']

'স্টীমার "রাজহংস"। গঙ্গা' থেকে অগ্রহায়ণের শেষে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত এই পত্র কবিতাটি কড়ি ও কোমল-এর প্রথম সংস্করণের [১২৯৩] অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে [১৩০১] বর্জিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে [১৩৮৮] কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। [পৃ ২৮৯-৯২]।

৫২৯-৩২ 'সংজ্ঞা বিচার' দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২। ৫৩০-৩৫

পৌষ সংখ্যায় সংজ্ঞা বিষয়ে যে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল, তাতে 'শ্রী বঃ-' [? বলেন্দ্রনাথ] পুরস্কৃত হন। এই প্রবন্ধে তাঁর ও অন্যদের প্রেরিত সংজ্ঞাগুলির যাথার্থ্য বিচার করা হয়েছে।

ভারতী, ফাল্গুন ১২৯২ [৯/১১]:

৫৪২-৪৪ 'পত্র/সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিঃ-/স্থলচরবরেষু' দ্র কড়ি ও কোমল ২।৫০-৫২

'যোড়াসাঁকো।/পৌষ। ১৮৮৫' স্থান-কাল বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে যে পত্র-কবিতা লেখেন [দ্র চিঠিপত্র ৮। ২৩-৩০, চারটি কার্ডে লেখা মূল পত্রটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে], সেটি 'নৌকা যাত্রী [যদ্দৃষ্টং] হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত' পাদটীকা-সহ মুদ্রিত হয়।

আমরা দেখেছি, পৌষ মাস থেকে আরম্ভ করে বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সংগীতের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু সেটি তাঁর সমকালীন জীবনচর্যার আংশিক পরিচয় মাত্র। সোলাপুরের উদার বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে বহু দূর থেকে বঙ্গজননীর যে উজ্জ্বল রূপ তিনি ভাবনেত্রে দর্শন করেছিলেন এবং বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন, দেশে ফিরে এসে সেই মনোভাব বেশি দিন বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধর্ম ও সমাজ নিয়ে যে তর্কবিতর্কের ও সেই সূত্রে ব্যক্তিগত গালিগালাজের ফোয়ারা সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলিতে [বঙ্গবাসী প্রভৃতি কয়েকটি বহুল-প্রচারিত পত্রিকার ফাইল লুপ্ত হওয়ায় যার সঠিক চিত্রটি অঙ্কন করা শক্ত] উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, তার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যই তিনি গঙ্গাবাসের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন উপরে উল্লিখিত দু'টি পত্র-কবিতাতেই সেকথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রিয়নাথ সেনের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাটিতে তা তীব্র ধিক্কারের রূপ নিয়েছে :

> কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়ছে কাগজ হাতে নিয়ে—
> বাঙলা থেকে শান্তি বিদায় তিন-শ কুলোর বাতাস দিয়ে
> খুদে খুদে 'আর্য' গুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
> ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
> তাঁরা বলেন, "আমিই কল্কি", গাঁজার কল্কি হবে বুঝি!
> অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিখুঁজি।
>
> পাড়ায় এমন কত আছে কত কব তার,
> বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা-অবতার।
> দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
> দাঁতকপাটি লাগে, তাদের দাঁত-খিচুনির ভঙ্গি দেখে।

আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল,

জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।[১]

এই ধিক্কারই প্রায় ব্যক্তিগত আক্রমণের রূপ নিল 'পত্র/শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু/ সম্পাদক সমীপেষু' কবিতায়। কবিতাটি সঞ্জীবনীর ১ চৈত্র [শনি 13 Mar 1886] সংখ্যায় [৩৪৬, পৃ ১৮৩] 'প্রাপ্ত' কলমে 'দামু ও চামু। (বাউলের সুর)' শিরোনামায় বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, 'আমাদের সন্দেহ হয় চন্দ্রনাথ বসু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১২৬১-১৩১২) ছিলেন এই কবিতার আক্রমণস্থল। ...এই দুই 'বসু'ই উল্লিখিত কবিতার দামু বসু ও চামু বসু বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।[২] যোগ্রেন্দ্রচন্দ্র বসু ছিলেন বঙ্গবাসী সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। কোনো রকম আদর্শ নয়, ব্যবসায়ই ছিল তাঁর পত্রিকা-পরিচালনার উদ্দেশ্য। তাই প্রথম দিকে সংস্কার-আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বা কৃষ্ণকুমার মিত্রের সাহায্য যেমন নিয়েছেন কিংবা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের মতো সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান্ ব্যক্তিকে সম্পাদকপদে নিযুক্ত করেছেন, তেমনি সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস-জনিত জন-বিক্ষোভ থেকে ব্যবসায়িক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে [পঞ্চানন্দ] আহ্বান করে নিয়ে এসেছেন 'সুরেন্দ্রায়ণ' লেখার জন্য।[৩] তাই যখন শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলেন, তখন ব্যবসার খাতিরে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করতে যোগেন্দ্রচন্দ্র তিলমাত্র বিলম্ব করেননি। এইভাবেই বঙ্গবাসী হিন্দুধর্মের প্রধান ধ্বজাধারী হয়ে ওঠে। এই সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিই ধিক্কৃত হয়েছে 'দামু ও চামু' ব্যঙ্গকবিতায় :

দামু বোস আর চামু বাসে/কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে!/ (আমার দামু আমার চামু!) ...
রব উঠেছে ভারতভূমে/হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন/ভয় নেইকো আর।/(ওরে দামু, ওরে চামু!)
নাই বটে গোতম অত্রি/ যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন/কাগজ হাতে করে!/ (আহা দামু আহা চামু!)
লিখছে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র/এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা/চামু দিচ্ছে গাল।/ (হায় দামু হায় চামু!) ...
দামু চামু কেঁদে আকুল/কোথায় হিঁদুয়ানি!
ট্যাঁকে আছে গোঁজ' যেথায়/সিকি দুয়ানি।/ (থলের মধ্যে হিঁদুয়ানি!)
দামু চামু ফুলে উঠল/হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন/বেড়ায় নেচে নেচে!/ (যেটের বাছা দামু চামু!) ...
পয়সা চাও তো পয়সা দেব/থাকো সাধুপথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ/যাবৎ ন ভাষতে!/ (হে দামু হে চামু!)[৪]

চন্দ্রনাথ বসুও বঙ্গবাসীর লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু নবজীবন, প্রচার প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি পড়লে মনে হয়, হিন্দুয়ানির সমর্থনে কোথাও কোথাও কুযুক্তির আশ্রয় নিলেও 'চামু দিচ্ছে গাল'-জাতীয় অশালীনতা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। সেইজন্যই মনে হয়, যোগেন্দ্রনাথের মতো 'কাগজওয়ালা'দের বোঝানোর জন্যই রবীন্দ্রনাথ দামু বোসের সঙ্গে চামু বোসকে যুক্ত করেছিলেন, চন্দ্রনাথ বসু ব্যক্তি হিশেবে তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিলেন না।

কবিতাটি কড়ি ও কোমল এর প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হলেও পরবর্তী সব সংস্করণ থেকে বর্জিত হয়েছে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বালক-এর জন্য আরও দু'টি ব্যঙ্গ-রচনা লেখেন, যেগুলি একই মনোভাব থেকে রচিত বলে মনে হয়—'বানরের শ্রেষ্ঠত্ব' ও 'হেঁয়ালি নাট্য' ['আর্য ও অনার্য']। 'বানরের শ্রেষ্ঠত্ব'-তে লিখলেন : 'বানর বলিতেছেন—আমরা বানর, অতি শ্রেষ্ঠ পুরাতন মনুবংশ জাত, অতএব আমরাই সকল জীবের প্রধান। ...আমরা যে শ্রেষ্ঠ, তার প্রমাণ এই যে, আমাদের ভাষায় বানর অর্থই শ্রেষ্ঠ—আর আর সকল জীবই অশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যদের আমরা ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকি।...তাহারা সাতজন্মে গায়ের উকুন বাছিয়া খায় না এম্‌নি অশুচি! আত্মীয় বান্ধবের সহিত দেখা হইলে তাহারা পরস্পরের গায়ের উকুন বাছিয়া দেয় না তাহাদের সমাজে এম্‌নি সহৃদয়তার অভাব।... আমাদের কিচিকিচি-পুরাণ মানুষের পিতৃপুরুষের সাধ্য নাই যে বুঝে—কারণ শ্রেষ্ঠ জাতির শাস্ত্র নিকৃষ্ট জাতি কখনই বুঝিতে পারে না।'[১] এখানে যা রূপকের অন্তরালে আবৃত, 'হেঁয়ালি নাট্য'-তে তা অনেকটাই নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে; সেখানে 'আর্য' চিন্তামনি কুণ্ডু বলছে : 'য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ—আমি প্রমাণ করে দেব।' এরপর সে স্নানের পূর্বে মাটিতে তৈল নিক্ষেপ, হাই তোলার সময় তুড়ি দেওয়া এবং পাখা গায়ে লাগলে ভূমিতে ঠেকানোকে যে-পদ্ধতিতে ও যে-ভাষায় ম্যাগনেটিজম তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে, তা স্পষ্টতই কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনকে [কৃষ্ণানন্দ স্বামী] স্মরণ করিয়ে দেয়—ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকাটি এই ধরনের ব্যাখ্যায় পূর্ণ—শশধর তর্কচূড়ামণির ছায়াটিও অলক্ষিত থাকে না।

১ বৈশাখ ১২৯৩ [মঙ্গল 13 Apr 1886] নববর্ষের দিন মধ্যাহ্নে সিটি কলেজ গৃহে রবীন্দ্রনাথ 'সত্য' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি বর্তমান বর্ষে রচিত ও উপরের আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে আমরা এখানেই আলোচনা করে নিচ্ছি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোন জাতি করে কিনা জানি না! আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়েও অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা কথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না।...প্রবাদ আছে, "হুজুতে বাঙ্গালী।" বাঙ্গালী মনে করে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম না করিয়াও গোলেমালে কাজ সারিয়া লওয়া যায়, বীজ রোপণ না করিয়াও কৌশলে ফললাভ করা যায়, তেমন ফন্দী করিতে পারিলে মিথ্যার দ্বারাও সত্যের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এই জন্য বাঙ্গালী কাগজ লইয়া দাম দেয় না, দাম লইয়া কাগজ দেয় না, কাজ না করিয়াও দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, বিশ্বাস করে না তবু লেখে ও এই উপায়ে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করে।..যেখানে সহজে ফাঁকি চলে সেখানে বাঙ্গালী ফাঁকি দিবেই। এইরূপে পৃথিবীকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী প্রতিদিন বঞ্চিত হইতেছে। কেবলি কি বাঙ্গালীকে মিষ্ট মিথ্যা কথা সকল বলিতে হইবে? কেবলি বলিতে হইবে, আমরা অতি মহৎজাতি, আমরা আর্য শ্রেষ্ঠ, ইংরাজেরা অতি হীন, উহারা ম্লেচ্ছ যবন! ...এই উপায়ে ক্ষুদ্রের অহঙ্কার ক্রমিক পরিতৃপ্ত করিয়া কি "পপ্যুলার" হইতেই হইবে!

—এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'দামু ও চামু', 'বানরের শ্রেষ্ঠত্ব' ও 'আর্য ও অনার্য' হেঁয়ালি নাট্য একটি বিশেষ তির্যকতা লাভ করেছে। কিন্তু প্রবন্ধটি শুধু, বাঙালীর নিন্দাবাদেই পর্যবসিত হয়নি, তরুণ রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম সত্যপ্রিয়তা ও দেশানুরাগই যে তাঁকে এই অপ্রিয় কার্যে প্রবৃত্ত করেছিল সেকথাই বলেছেন ভাষণের শেষাংশে :

আমার আর সকল কথা লোকের বিরক্তিজনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমার একটি কথা পুরাতন হইলেও বোধ করি অনেকের কর্ণে অত্যন্ত নূতন ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্য কথা বল, সত্যাচরণ কর, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। একথা সচরাচর শুনা যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন ফেযানের যে, কাহারো বলিয়া সুখ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাতে সুগভীর চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদ্দীপনা উত্তেজনা নাই যাহাতে করতালি আকর্ষণ করিতে পারে। দেশহিতৈষিরা

কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিম্ন্যাষ্টিক কর, কেহ বলেন সভা কর, আন্দোলন কর, ভারত-সঙ্গীত গান কর, কেহ বলেন মিথ্যা বল মিথ্যা প্রচার কর কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্য বল ও সত্যানুষ্ঠান কর। উপরিউক্ত সকল ক'টার মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটেই। সকলের চেয়ে আবশ্যক বেশী, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সত্য সকলের শেষে, আরম্ভে সত্য বীজ রোপন করিলে শেষে সত্য ফল পাওয়া যায়, মিথ্যায় যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ।

এই অংশটি বৎসরাধিক পূর্বে কথিত 'একটি পুরাতন কথা'-শীর্ষক ভাষণটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির প্রতিবাদ বক্তৃতাটির অব্যবহিত উপলক্ষ হলেও, বক্তব্যটি যে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার প্রমাণ আছে বিতর্কমূলক অংশগুলি বর্জন করে 'সমালোচনা' [১২৯৪] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তিতে। সম্ভবত সেই কথাগুলি পুনরুক্ত হয়েছে বলেই বর্তমান প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকেরা যে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন তার প্রমাণ প্রবন্ধটির ব্যাপক পুনর্মুদ্রণ। চৈত্র-সংখ্যা। বালক [পৃ ৫৭১-৮১] ছাড়াও সঞ্জীবনী-র ২৯ চৈত্র সংখ্যায় [৩।৫০, পৃ ১৯৮-৯৯], তত্ত্ববোধিনী-র বৈশাখ ১৮০৮ শক সংখ্যায় [পৃ ১৪-২০] ও তত্ত্বকৌমুদী-র ১৬ বৈশাখ [পৃ ১৯-২০] ও ১ জ্যৈষ্ঠ [৩১-৩৪] সংখ্যায় প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ভাষণটি প্রদত্ত হবার পূর্বেই সঞ্জীবনী-তে মুদ্রিত হয়েছিল, এ তথ্যটিও লক্ষণীয়।

চৈত্র সংখ্যা বালক-এ প্রকাশিত 'ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্য' ব্যঙ্গ-রচনাটি অবশ্য অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত—ডেঞ্জে জাতি সেখানে সভ্যতাভিমানী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতিভূ রূপে কল্পিত হয়েছে :

'পিঁপড়েদের দেখে আমার অত্যন্ত মায়া হয়, ওদের উপকার করবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত বলবতী হয়ে ওঠে। এমনকি আমার ইচ্ছা করে, সভ্য ডেঞ্জে সমাজ কিছুদিনের জন্য ছেড়ে, দলকে-দল ডেঞ্জে-ভ্রাতৃবৃন্দকে নিয়ে পিঁপড়েদের বাসার মধ্যে বাসস্থাপন করি এবং পিঁপড়ে-সংস্কারকার্যে ব্রতী হই…তাদের শর্করকণা গলাধঃকরণ করে এবং তাদের বিবরের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে কোনোক্রমে আমরা জীবনযাপন করতে রাজি আছি, যদি এতেও তারা কিছুমাত্র উন্নত হয়।…হয়তো আহার এবং বাসস্থানের অকুলান হতেও পারে, কিন্তু এটা তাদের ধৈর্য ধরে বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের দীর্ঘপদস্পর্শে ক্রমে তাদের পদবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা আছে। শৃঙ্খলা এবং শান্তির কিছুমাত্র অভাব থাকবে না।…শর্করাভাবে এবং অতিরিক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার ভারে যদি পিঁপড়ে জাতি মারা পড়ে? তা হলে আমরা অন্যত্র উন্নতি প্রচার করতে যাব—কারণ, আমরা ডেঞ্জে জাতি, উচ্চ পদের প্রভাবে অত্যন্ত উন্নত।'[১]

—ইংরেজ কর্তৃক ব্রহ্মদেশ জয় কী এই রচনার উপলক্ষ?

রবীন্দ্রনাথ কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবে যোগদান করেন। ৭ চৈত্র তারিখে ক্যাশবহির হিসাব : 'কোন্নগর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজে রবীবাবু মহাশয়ের ও সত্যবাবু মহাশয়ের যাতায়াতের ব্যয়…৬ '। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও রামকুমার বিদ্যারত্ন উপাসনা করেন। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে ১ বৈশাখ ১৮০৮ শকের তত্ত্বকৌমুদী-তে [৯।১, পৃ ৮] লিখিত হয় : 'সুকবি ও গায়ক শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন্নগর উৎসবে মধুর সঙ্গীতে উপাসকদিগের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন।' পত্রিকাটি এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও সংবাদ পরিবেশন করে : 'আমরা অতীব আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, রবীন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে আমাদের উপাসনালয়ে আগমন করিয়া মধুর সঙ্গীতদ্বারা উপাসকগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন : এবং অবসর থাকিলেই সমাজের সাপ্তাহিক সায়ংকালীন উপাসনায় সঙ্গীত করিবেন বলিয়াছেন।' লক্ষণীয়, ব্রাহ্মসম্মিলন-এর বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে নয়, সংগীতের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ আদি ও

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে গ্রথিত করেছিলেন এবং শুধু সিটি কলেজের হলে নয়, সমাজের উপাসনা গৃহেও তিনি সাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। অথচ পরবর্তীকালের গোঁড়ামির ক্রমিক অনুপ্রবেশের ফলে এই উপাসনাগৃহে তাঁকে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়াতে গিয়ে [১৩১৭] কিংবা 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত করার [১৩২৭] জন্য সমাজের তরুণ সদস্যদের ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছিল!

৯ চৈত্র [রবি 21 Mar] রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রী লাইব্রেরির সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেন। এই দিন বিকেল ৫টায় বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে জাহ্নবী-সম্পাদক বীরেশ্বর পাঁড়ে 'হিন্দুরীতিনীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে' শীর্ষক প্রবন্ধটি [দ্র সাবিত্রী (১২৯৩)। ১৮৫-২১৫] পাঠ করেন। 'বক্তার প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিলেন। ... অবশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত দুইটী সঙ্গীত গীত হয়। শেষোক্ত সঙ্গীতটী স্বয়ং রবীন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক গীত হয়।'[২] পঠিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু দেখে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করেননি।

বালক-এর চৈত্র সংখ্যা [১।১২] সম্ভবত যথাসময়ে প্রকাশিত হয়নি। 'কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'কার্য্যাধ্যক্ষের অপটুতাবশতঃ কিছুকাল হইতে বালক প্রকাশে ও বিতরণে অনিয়ম ঘটিয়াছে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, এই জন্য পাঠকদিগের নিকটে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। বালক-কার্য্যাধ্যক্ষ সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—তিনি কর্ম্মিষ্ঠতা ও কার্য্যনিপুণতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার হাতে অন্যান্য কাজের ভার আছে, ভরসা করি এই সকল বিবেচনা করিয়া বালকের গ্রাহকেরা প্রসন্ন মনে তাঁহাদের কার্য্যাধ্যক্ষকে বিদায় দিবেন।' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বালক-এর সম্পাদিকা হলেও কার্যত সম্পাদনা ও প্রকাশনার প্রধান দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথকেই বহন করতে হত—লেখার দায় তো ছিলই। ফলে বালক একসময়ে তাঁর কাছে বোঝার মতো হয়ে উঠেছে। সেইজন্য শেষ সংখ্যা প্রকাশের পর ভারমুক্ত রবীন্দ্রনাথ 17 Apr 1886 [শনি ৫ বৈশাখ ১২৯৩] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন :'এতদিন মাথার উপরে 'বালক' কাগজের [মূল পত্রে : বালকের] বোঝাটা থাকাতেই মাথা যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল, নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছিল—এখন সমস্ত খোলাসা—দক্ষিণে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চার দিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।'[১] বস্তুত কর্মোদ্যোগের উৎসাহ ও বাধ্যবাধকতার ক্লান্তি একই সঙ্গে অনুভব করা তাঁর স্বভাবের অঙ্গ ছিল। তাই সাধনা পত্রিকা [১২৯৮-১৩০২] সম্পাদনার পর্বে 4 Feb 1895 [২২ মাঘ ১৩০১] ইন্দিরা দেবীকে লেখেন : 'বছরের মধ্যে ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলে ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়—কারণ, সম্বৎসর পাগলামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সুম্বৎসর sanity বজায় রেখে চলাও আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য।'[২] জীবনের অন্যান্য পর্বেও তাঁর অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য নয়।

বালক-এর চৈত্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ৮টি রচনা প্রকাশিত হয় :

৫৪৭-৪৮ 'ডেঞ্চো পিপড়ের মন্তব্য' দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৫০৪-০৫

৫৪৯-৫০ 'বানরের শ্রেষ্ঠত্ব'

৫৬০-৬১ 'জন্মতিথির উপহার/(একটি কাঠের বাক্স)' দ্র কড়ি ও কোমল ১ [১৩৮৮]। ২৮৮-৮৯

কাব্যগ্রন্থ সপ্তম ভাগ [১৩১০]-এর অন্তর্গত 'শিশু'-তে কবিতাটি সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত হয়ে 'উপহার' নামে মুদ্রিত হয়, দ্র শিশু ৯। ৭৩-৭৫

৫৬৭-৬৯ 'শ্রীচরণেষু' দ্র চিঠিপত্র ২। ৫৩২-৩৫ [৮]

৫৬৯-৭১ 'চিরঞ্জীবেষু' দ্র চিঠিপত্র ২। ৫৩৫-৩৭ [৯]

এই পত্র-প্রবন্ধ দুটি সম্ভবত পৌষ-মাঘ মাসের কোনো সময়ে রচিত; কারণ দুটিরই মধ্যে যে প্রসন্ন উদার আশাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে, ফাল্গুন-চৈত্রের তিক্ত তির্যক ও ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের সঙ্গে তার বিরাট পার্থক্য দেখা যায়।

৫৭১-৮১ 'সত্য'

৫৮৫-৮৬ 'অবসাদ' দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী [শতবার্ষিক সং] ৪। ৮৫১

২৩ আষাঢ় ১২৮৫ শনি 6 Jul 1878 তারিখে মালতীপুঁথির 56/৩০ক পৃষ্ঠায় আমেদাবাদে লিখিত এই কবিতাটি [দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ৮৩-৮৪] সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আললাচনা করেছি। ৫৮৭-৯১ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬। ৭৩-৭৮ ['আর্য ও অনার্য']।

হেঁয়ালির উত্তর : নানা।

প্রচার, ফাল্গুন-চৈত্র ১২৯২[৩] [২। ৮-৯] :

৩৪২-৪৩ 'কো তুঁহু'! দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২। ২৬-২৭

কবিতাটি প্রথমে কড়ি ও কোমল [১২৯৩] কাব্যে গ্রন্থভুক্ত হলেও কাব্যগ্রন্থাবলী-তে [১৩০৩] ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী অংশে গৃহীত হয়। কবিতাটি কোন্ সময়ে রচিত নিশ্চিত করে বলা শক্ত। পুরানো পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে যেমন 'অবসাদ' কবিতাটিকে উদ্ধার করে এনেছিলেন, হয়তো এই কবিতাটিও তিনি সেইভাবেই সংগ্রহ করে থাকবেন [দু'টি কবিতার প্রকাশকালের নৈকট্য লক্ষণীয়]।

সঞ্চয়িতা-য় [১৩৩৮] ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-র যে দু'টি মাত্র কবিতা গ্রহণ করেছিলেন, এটি তার অন্যতম। ৩১ চৈত্র [সোম 12 Apr 1886] সন্ধ্যায় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে বর্ষশেষের উপাসনা হয়। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ কোনো গান রচনা করেছিলেন কি না জানা যায়নি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

এই বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের উল্লেখ্যযোগ্য পারিবারিক ঘটনাগুলির মধ্যে প্রথমটি হল ১১ আষাঢ় [বুধ 24 Jun] শরৎকুমারী দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা সুপ্রভার সঙ্গে মহর্ষির অন্তরঙ্গ বন্ধু রাখালদাস হালদারের পুত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুকুমার হালদারের বিবাহ। এই বিবাহ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : "আমার পিসতুতো বোন সুপ্রভাদিদির বিবাহের সময়ে, মনে পড়ে, পুজোর দালান থেকে বরকনে দোতলার বাসরে পৌঁছবার আগেই কনের হল ফিট্। তখন বাড়িতে কি জানি কেন হিস্টিরিয়া রোগটির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। আমি আর উষাদিদি [ইনিও বিবাহরাত্রে মূছা গিয়েছিলেন] কোনোরকম করে সেই মূর্ছিত

কনেকে দুদিক থেকে ধরে অতিকষ্টে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বাসরঘরে এনে ফেললুম।...এই অবস্থায় আমাদের সেই 'বিবাহ-উৎসব' অভিনীত হয়। দিনুর মা সুশীলা-বউঠান নায়ক সেজেছিলেন। তিনি গান এবং অভিনয় দুইই সুন্দর করতেন। তাঁর একটি গান 'ও কেন চুরি করে চায়' তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নায়িকাকে দেখে মোহিত হয়ে তিনি গাইতেন, "ওই জানালার পাশে বসে আছে করতলে রাখি মাথা'।...তার উত্তরে সরলাদিদি সখা সেজে তাঁর মোহভঙ্গের উদ্দেশ্যে ..গান করতেন 'তুমি আছ কোন্ পাড়া'...।"[১] তাঁর বিবাহ-পরবর্তী জীবনের কথা লিখেছেন সরলা দেবী : '... ডেপুটিগৃহিণী হয়ে মহকুমায় এঁর অন্দরে মেয়েদের একটি খাস এজলাস বসত। মজলিসের সদস্যদের সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে তথাকথিত অপৌত্তলিক ব্রাহ্মমন্ত্র-দীক্ষিতা মেয়ে হয়েও তিনি সে দীক্ষার বন্ধন ছিন্ন করে পৌত্তলিক গুরুর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করলেন, শিবপ্রতিমার পূজারত হলেন।...কিন্তু জোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে আনাগোনা সমান বজায় রাখলেন—এ বাড়ির সংস্কার ভঙ্গ করেছেন বলে তিলমাত্র অপ্রতিভ হলেন না।'[২] এঁর পুত্র বিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বে চিত্রকলা চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, ১৪ অগ্র°। শনি 28 Nov] সত্যপ্রসাদের কন্যার মৃত্যু হয়। এই কন্যাটির জন্ম সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬-তে, কিন্তু তার নাম ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। শুধু পিতা সত্যপ্রসাদের কন্যাস্নেহের একটু আভাস পাই তাঁর 'দার্জিলিং-যাত্রা' [দ্র বালক, বৈশাখ ৯-১৩] ভ্রমণকাহিনীতে : 'আমিও আমার মেয়েটিকে বড় ভালবাসি, তাকে ফেলে কোথাও যেতে পারিনে—যদিও বা যাই তবু মনটা তার কাছে পড়ে থাকে।'

মৃণালিনী দেবীর জন্য Dec 1885 পর্যন্ত লরেটো স্কুলের বেতন দেওয়া হয়েছে, ক্যাশবহিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পরে সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ার জন্যই সম্ভবত তাঁর বিদ্যালয়-শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।

হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ Apr 1885-এ অনুষ্ঠিত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিশেবে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 1886 -এর এন্ট্রান্স পরীক্ষা 29 Mar [সোম ১৭ চৈত্র] আরম্ভ হয়; এই পরীক্ষায় সরলা দেবী বেথুন স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে স্কলারশিপ লাভ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

আমরা জানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজী ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়েছিল বৈশাখ ১২৯০-তে [May 1883] এবং তাঁর প্রথম স্টীমার 'সরোজিনী' বরিশালের কর্মস্থলে যাত্রা শুরু করেছিল ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ [23 May 1884] তারিখে, রবীন্দ্রনাথ সে যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রথম থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ফ্লোটিলা কোম্পানির [The Bengal Central Flotilla Co. Ltd.] সঙ্গে একটি অশুভ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। ফলে তাঁকে যাত্রীবহনের সুবিধার জন্য ক্রমে স্টীমারের সংখ্যা বাড়াতে হয়। এতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধি হোক্ না হোক্, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যে প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তা জানা যায় সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে :

লর্ড রিপণ নামক জাহাজ খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একদিন অন্তর যাতায়াত করিতেছে।··· বরিশাল ও খুলনা অঞ্চল নিবাসী লোকের স্বদেশের উপর এবং স্বদেশীয় অনুষ্ঠানের উপর যেরূপ আন্তরিক টান দেখিলাম তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি। একদিন দৈববশতঃ বাগেরহাটে লর্ড রিপণ পৌঁছিতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হয়। সেদিন বাদলার দিন। ফ্লটিলা কোম্পানীর জাহাজ সময় মত পৌঁছিলে যাত্রীগণের একপ্রাণীও তাহাতে না গিয়া সমস্তক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া লর্ড রিপণ জাহাজের প্রতীক্ষায় ঘাটে দণ্ডায়মান ছিলেন। লর্ড রিপণ পৌঁছিলে উৎসাহের সহিত তাঁহারা তাহাতে উঠিলেন।··· এরূপ চমৎকার কাণ্ড, এরূপ একতা, এরূপ জাতীয় অনুরাগ বোধ হয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।··· এক্ষণে আমি তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভারত নামক আর একখানি জাহাজ সত্বর খুলনায় পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।/সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে আগামী সোমবার [১৩ ফাল্গুন ১২৯১, [23 Feb 1885] হইতে 'ভারত' ও 'ভারত বন্ধু রিপণ' উভয়ে মিলিয়া প্রতিদিন তাঁহাদের কাজে নিযুক্ত থাকিবেন।'[১]

বালক-এর শ্রাবণ ১২৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বরিশালের পত্র' [পৃ ১৭২-৭৮]তেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থানীয় অধিবাসীদের উৎসাহ-উদ্দীপনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ১০ শ্রাবণ ১২৯২ [25 Jul] তাঁর এজেন্ট হরকান্ত সেন সঞ্জীবনী-তে [৩।১৫] বিজ্ঞাপন দেন : 'বরিশাল হইতে খুলনা পর্য্যন্ত ভাড়া ১ টাকা বরিশাল হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আর একটি পথ শীঘ্রই খোলা হইবে।' 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'স্বদেশী' নামের দুটি স্টীমার নিয়ে এই পথও খোলা হয়েছিল। কুমিরা-নিবাসী জনৈক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সোমপ্রকাশ-এ [২৯।৪২, ১৬ ভাদ্র] চিঠি লিখে কপোতাক্ষ নদের উপর স্টীমার চালাননার অনুরোধ জানান। কিন্তু ফ্লোটিলা কোম্পানীও চুপ করে বসে ছিল না। মধ্যবঙ্গ রেলওয়ের বিদেশী কর্তৃপক্ষ নানাভাবে ফ্লোটিলা কোম্পানীকে সাহায্য ও ঠাকুর কোম্পানীর অসুবিধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকে। 22 Jul [৭ শ্রাবণ] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একজন কর্মচারী খুলনা স্টেশনে নামলে পাছে তিনি যাত্রী নিয়ে যান সেইজন্য ক্যানি নামক একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান গার্ড তাঁকে ধাক্কা দিয়ে স্টেশন থেকে বের করে দেন, আদালতে নালিশ করলে ম্যাজিস্ট্রেট ক্লে গার্ডের মাত্র ছ'টাকা জরিমানা করেন।[২] এছাড়াও ফ্লোটিলা কোম্পানী 1Aug [১৭ শ্রাবণ] থেকে ভাড়া কমিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে থাকে : 'এক্ষণে খুলনা হইতে বরিশাল কেবল চারি আনা ভাড়ায় ডেক ক্লাসের আরোহীগণকে লইবেন এবং তন্মধ্যবর্তী ষ্টেশন সকলে ঐ পরিমাণে কম ভাড়া লাগিবেক।/সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বরিশাল হইতে একেবারে কলিকাতা আগমনের জন্য অত্যন্ত কম ভাড়া বন্দোবস্ত করা গেল মেলগাড়ি ও জাহাজের সর্ব্বসুদ্ধ ভাড়া কেবল (সাত সিকা) করিয়া লাগিবেক।' প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও ভাড়া কমাতে হল এবং বলা বাহুল্য রেলওয়ের সঙ্গে কোনো বন্দোবস্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর পরের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ব্যক্ত করা যেতে পারে : 'ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল—বরিশাল-খুলনার স্টীমার-লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনাভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল।···যাত্রীরা যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই।'[৩] বোঝা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বালক-এ যখন 'মুখ-চেনা' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে মানুষের মুখ দেখে তাদের মানসিক প্রকৃতি অনুমানের পদ্ধতি বর্ণনা করছিলেন, তখন তাঁর কর্মচারীরা উক্ত বিদ্যার সাহায্য ছাড়াই তাঁদের মালিককে চিনে নিয়েছিলেন! যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তখন খুলনা-বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়পরাজয়ের সংবাদ-আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না।'[৩] এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো জাহাজেই বাস করতেন, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গে এক বা একাধিকবার খুলনা

গমনাগমন করেছিলেন -ইন্দিরা দেবীকে লেখা দুটি পত্র-কবিতার ['মাগো আমার লক্ষ্মী' ও 'বসে বসে লিখলেম চিঠি'[৪]] শীর্ষে 'স্টীমার। খুলনা' ঠিকানা দেখা যায়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আসল বিপদ এল অন্য পথ দিয়ে। ১১ আশ্বিনের [26 Sep 1885] সঞ্জীবনী [৩।২৪।৯৫] লেখে : 'আমরা দুঃখিত হইলাম যে বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি ষ্টীমার মেরামতের জন্য বরিশাল হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল কিন্তু গঙ্গার পোলের সহিত ঠেকিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। শুনা যায় ষ্টীমার তুলিতে এক হাজার টাকা লাগিবে।' 'স্বদেশী' নামক স্টীমারটি খুলনা থেকে মাল বোঝাই করে কলকাতায় আসছিল। স্টীমার ও মালের এক কণাও তোলা সম্ভব হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এবার এই দুর্ঘটনার জন্য এক ক্ষতিপূরণ ব্যাপারেই আমি অত্যন্ত জেরবার হইয়া পড়িলাম, এমন সময় ফ্লোটিলা কোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়…আমার নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন। তিনি বলিলেন, 'উভয়পক্ষেই আর এরূপ বৃথা অর্থব্যয়ে লাভ কি? আপনি নিজেই একটা মূল্য ধার্য করিয়া দিউন। ফ্লোটিলা কোম্পানী আপনার সমস্ত কারবার কিনিতে প্রস্তুত আছে।'…আমি মগ্নাবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্তই ফ্লোটিলা কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া দিলাম। ফ্লোটিলা কোম্পানীর নিকট হইতে যাহা ন্যায্য তাহাপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাইলেও, আমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না।'[১] রাজনারায়ণ বসুকে '২৫২ সৌথ সার্কুলার রোড্' থেকে 1 May [? 1886] লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখেছেন : '…আমার সাংসারিক অবস্থা এক্ষণে অত্যন্ত শোচনীয়। আপনি বোধ হয় জানেন আমি জাহাজ চালানি কারবারে প্রবৃত্ত ছিলাম—ইংরাজ কোম্পানীদিগের সহিত ভয়ানক প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল—সেই কারবারে আমি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি—ঋণজালে একেবারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি—যে টাকা মাসহারা পাই তৎসমস্তই সুদ দিতে ব্যয় হইয়া যায়। আমার নিজের নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হয়।'[২] তাঁর 'সর্বনাশ' কত ব্যাপক ছিল, এই চিঠিটিই তার অন্যতম প্রমাণ। 'কিন্তু তবু এ-কথা মনে রাখিতে হইবে, এই-সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী ললাকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিস্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে-বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে'।[৩] কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা তাঁর কবি-ভ্রাতাকে যে কিছুমাত্র শিক্ষা দিতে পারেনি তার দৃষ্টান্ত মেলে মাত্র দশ বছরের মধ্যে [১৩০২ : 1895] কুষ্টিয়ায় 'ঠাকুর-কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করে ভুষিমাল ও পাট কেনাবেচা, আখ-মাড়াইয়ের কল ইত্যাদির ব্যবসায়ে নেমে একই পরিণতি লাভ করায়। আমরা যথাস্থানে সে-কথা আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

আশ্বিন ১২৯১ থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হবার পর রবীন্দ্রনাথের যে কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়েছিল, বর্তমান বৎসরেও তা অক্ষুণ্ণ ছিল। নববর্ষ-মাঘোৎসব-বর্ষশেষ প্রভৃতির মতো প্রথাগত অনুষ্ঠান

ছাড়াও অন্যবিধ কাজকর্মেও তাঁর নিষ্ঠা দেখা যায়। তবে তাঁর জীবনকাহিনীর সূত্রেই সেই-সব প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

ভারতে ইংরেজ শাসনাধিকারের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ ও রাজনৈতিক চেতনা কিভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল, তার কিছু-কিছু বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী ছিল বলে অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানত কলকাতা-কেন্দ্রিক হলেও দেশের অন্যান্য অংশেও ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল এবং সুবিচারের দাবী আন্দোলনের চেহারা নিচ্ছিল। 1876-এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে এই ভারতব্যাপী অসন্তোষকে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক রূপ দেবার প্রয়াস পান। ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্র সেন প্রায় সারা ভারত পরিভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, কিন্তু তার প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল হিন্দু সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের ভিতর; কিন্তু 1877-এ সুরেন্দ্রনাথ যখন সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার সংকোচনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী জনমত-সংগঠনের জন্য ভারত সফর করেন, তখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে শিক্ষিত ভারতীয়দের একটি বড়ো অংশ এই আন্দোলনে যোগদান করেন। লর্ড লিটন-প্রবর্তিত নিপীড়ন-মূলক অনেকগুলি আইন ভারতীয়দের আরও বেশি পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগায়।

লর্ড রিপনের শাসনকালে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। তিনি 1882-তে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পরিধি বিস্তৃত করে নির্বাচনমূলক গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতির প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধির সহায়তা করেন। এরপর ইংরেজ অপরাধীদের দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন করার মাধ্যমে বিচারবিভাগীয় বৈষম্য দূর করতে চেয়ে তিনি 1883-তে তাঁর আইন-সদস্য মিঃ ইলবার্টকে দিয়ে একটি বিল আনয়ন করেন, যা 'ইলবার্ট বিল' নামে বিখ্যাত। 1849-এ লর্ড ডালহৌসীর আমলে অনুরূপ একটি প্রয়াসকে ইংরেজরা 'কালা আইন' [Black Act] নামে অভিহিত ক'রে আন্দোলনের দ্বারা প্রতিহত করে। 1883-তে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইংরেজদের আন্দোলন আরও তীব্র আকারে প্রকাশ পায়। প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরক্ষা সমিতি [Defence Association] গঠন করে তারা বড়লাটের বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সমবেত প্রতিরোধের ফলে লর্ড রিপন পিছু হটলেন এবং বিলটিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করে আইনে পরিণত করা হল, যা মূল উদ্দেশ্যের বহু দূরবর্তী।

ভারতীয়েরা এতদিন রাজনৈতিক আন্দোলন করছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রাপ্তির পরিমাণ খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁরা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কার্যকারিতা লক্ষ্য করে চমৎকৃত হলেন। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময়ে ইংরেজেরা ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে যে কুৎসা কীর্তন করছিল, তার দ্বারা দেশীয় আত্মমর্যাদাও যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়েছিল। এরই মধ্যে 5 May 1883 আদালত অবমাননার তুচ্ছ অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথকে দু'মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সভা করে ধিক্কার দেওয়া হয় ও সুরেন্দ্রনাথকে সহানুভূতি জানিয়ে অজস্র পত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরিত হতে থাকে। 4 Jul

মুক্তি পেয়ে তিনি বীরের সংবর্ধনা প্রাপ্ত হন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার [National Fund] গঠন করেন। 4 Dec 1883 লর্ড রিপন কলকাতায় বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বাংলার রাজনৈতিক নেতারা এই সুযোগ ত্যাগ করলেন না। তাঁরা জানতেন, বড়োদিনের ছুটিতে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক প্রধান ব্যক্তি এই প্রদর্শনী দেখতে কলকাতায় আসবেন। তাঁদের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশে সংগঠিত করার উদ্দেশে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এই মাসের শেষ দিকে [28-30 Dec 1883] কলকাতায় একটি জাতীয় মহাসভা [National Conference] আহ্বান করে। শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রামতনু লাহিড়ীর সভাপতিত্বে 28 Dec অ্যালবার্ট হলে জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। পরবর্তী দু'টি অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন কালীমোহন দাস ও অন্নদাচরণ খাস্তগীর।

সুরেন্দ্রনাথ এই সভার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরের বছর [1884] উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে 1885-এর 25-27 Dec [১১-১৩ পৌষ ১২৯২, শুক্র রবি] ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গৃহে জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন আহূত হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও সেন্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনও এবার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগ দেয়। তিন দিনের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে দুর্গাচরণ লাহা, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—তিনজনেই জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি। মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে এই হাত-মেলানোটি লক্ষণীয়। সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে ব্রিটিশ শাসকদের চক্ষুশূল ছিলেন—অভিজাত জমিদারশ্রেণীর সংশ্রব তাঁর কার্যকলাপের উপর আবরণ হিসেবে ব্যবহৃত হল।

'ব্যবস্থাপক সভা সমূহের পুনর্গঠন, ভারতবাসীর ভলন্টিয়ার হইবার অধিকার দান, সৈনিক বিভাগে ব্যয়াধিবৃত্ত [? ব্যয়সংকোচ], ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা ও ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারির প্রত্যুত্তর, শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্য বিধান এবং পুলিযের কার্যপ্রণালীর পঙ্কোদ্ধার'[১] —জাতীয় মহাসভায় প্রধানত এই বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল। শেষ দিনের অধিবেশনে স্থির হয়, প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন শহরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হবে।

জাতীয় মহাসভার অধিবেশন যেদিন শেষ হল, তার পরদিন 28 Dec [সোম ১৪ পৌষ] বোম্বাইতে বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তিন দিন-ব্যাপী প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের জন্ম-ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। অনেকে বলেন, Dec 1884-এ মাদ্রাজের অ্যাডিয়ারে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির যে বার্ষিক সম্মেলন হয়, সেখানে সিভিল সার্ভিস থেকে অবসরপ্রাপ্ত অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম [Allan Octavian Hume] রাজনীতিকদের একটি বার্ষিক সম্মিলনের প্রস্তাব করেন এবং সেই অনুযায়ী Mar 1885-এর একটি সভায় স্থির হয় যে, সেই বছর বড়োদিনের সময়ে পুনা সার্বজনিক সভার উদ্যোগে পুনায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসবে। একথা ঠিকই যে, হিউম-সহ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের অনেক নেতাই থিয়োসফিষ্ট ছিলেন; মহর্ষির জামাতা জানকীনাথ ঘোষাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একথা বলা হয়, ভারতীয়দের মনে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল, তা প্রশমিত করার জন্য 'safety valve' হিশেবে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের পরামর্শে হিউম কংগ্রেসের পরিকল্পনা করেন। লক্ষণীয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রথম দিকে কংগ্রেস সংগঠন থেকে দূরে

রাখা হয়। ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে গ্রহণযোগ্য নন, এমন নেতাদের সান্নিধ্য বর্জন করাই ছিল তখন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ হিউমকে জেনারেল সেক্রেটারি করে রাজনৈতিক আন্দোলনে ইংরেজদের সহযোগিতাকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছিল। পরবর্তীকালে একই উদ্দেশ্যে ভারতহিতৈষী ইংরেজদের বহুবার কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করা হয়েছে। অবশ্য প্রাথমিক সহযোগিতার পর্ব শেষ হতে দেরি হয়নি, মাত্র তিন বছর পরে 1888 থেকেই রাজপুরুষেরা নখদন্ত প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের জন্য পুনা সার্বজনিক সভা সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পার্বতী পাহাড়ের কাছে পেশোয়া উদ্যানে কংগ্রেসের অধিবেশন ও প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু বড়োদিনের অব্যবহিত পূর্বে পুনা শহরে কলেরা দেখা দেয় এবং বোম্বাই নগরীতে অধিবেশন স্থানান্তরিত হয়। গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের হলে 28 Dec 1885 ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ হিউমের দ্বারা প্রস্তাবিত এবং এস সুব্রামানিয়া আয়ার ও কে টি তেলাঙ-এর দ্বারা সমর্থিত হয়ে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২ জন মুসলমান-সহ ৭২ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। রয়েল কমিশন নিয়োগ, ইন্ডিয়া কাউন্সিলের বিলোপ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে ব্যবস্থাপক সভাগুলির পুনর্গঠন, ইংলন্ডে ও ভারতে যুগপৎ আই সি এস পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ও পরীক্ষার্থীদের বয়স বৃদ্ধি, সামরিক ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি দাবী কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত ন'টি প্রস্তাবের অন্যতম ছিল। লক্ষণীয়, জাতীয় মহাসভার মঞ্চ থেকে প্রায় একই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। আগামী বৎসর 28 Dec মঙ্গলবার [১৪ পৌষ] কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে বর্তমান অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

---

১ 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬। ৪৫৫

২ 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬। ৫৯২

১ **দ্র রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী** [১৩৮০]। ১৬৪-৬৫

১ দ্র রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ১৬৬-৬৭

২ 'ব্রহ্ম সঙ্গীত শিক্ষা প্রণেতা আমাদের বন্ধু বাবু চুণীলাল মিত্র মহাশয়ের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে এককালীন ৫০ টাকা দান করিয়েছেন।'—তত্ত্বকৌমুদী, ১ কার্তিক [৯।৩৩।১৫৫]।

৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৩

১ 'কবির মন্তব্য', কড়ি ও কোমল ২। ৩০

২ দ্র জীবনস্মৃতি ১৭।৩৮৫

১ সা-সা-চ ৮। ৮৩। ৩৪

২ দ্র নবজীবন, জ্যৈষ্ঠ। ৬৮৯-৭১১, আষাঢ়। ৭৬৬-৭৬; সাবিত্রী [১২৯৩]। ১৬১-৮৪

৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪২৫

১ প্রবন্ধের একটি অংশ তাঁর একটি বাল্যরচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় : 'যে হতভাগ্যের ভগ্নীকে বিবাহ করিব তাহার তহবিলে রস্‌কস্ কিছু বাকি থাকিবে না। তাহার পাতে পিঁপ্‌ড়ার হাহাকার উঠিবে।' আর একটি বাক্য রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে যথেষ্ট কৌতুকরস সৃষ্টি হয় : 'বোধ করি যত সব স্কুল-পালানে ছেলেই কবি হয়, এক্‌জামিনের যন্ত্রণা তাহারা জানে না।' জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও সকৌতুকে বাক্যটি তাঁর 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ উদ্ধৃত করেন।

২ বালক, জ্যৈষ্ঠ। ৬২

৩ ঐ। ৬২-৬৩; শ্রাবণ-সংখ্যায় [পৃ ২০১-০৪] 'পরীক্ষা।/(বালিকার রচনা)' শিরোনামে 'য়ুনিবার্সিটির পরীক্ষার্থিনী—জনৈকা বালিকা।' [? সরলা দেবী] স্বাক্ষরে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন, বার্ষিক সূচীতে লেখিকার নাম 'শ্রীমতী'। উল্লেখ্য, সরলা দেবী 1886-এ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১ ঘরোয়া [১৩৭৭]। ১৩৭

২ অবশ্য বাংলাভাষায় হেঁয়ালি নাট্য বা charade রচনায় রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ নন। ১২৮২ বঙ্গাব্দে কলেজ রি-ইউনিয়ন সভায় 'প্রহেলিকা অভিনয়'নামে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রযোজনায় যে অভিনয়টি হয়েছিল, সম্ভবত সেটিই এই শ্রেণীর প্রথম বাংলা রচনা। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। দ্র রবিজীবনী ১। ২৮৮-৮৯

৩ রবীন্দ্রস্মৃতি [১৩৮০]। ২৭

১ হাস্যকৌতুক, র°র° ৫ [প.ব., ১৩৯১]। ৪৬৭

২ জীবনের ঝরাপাতা [১৩৮২]। ৯৪

১ দ্র সাধারণী [১৬। ১৪], ৩ শ্রাবণ ১২৮৮। ১৬১-৬২; উল্লেখ্য, সঙ্গীত-কল্পতরু গ্রন্থে গানটির সুর-তাল : তিলক কামোদ-ঝাঁপতাল।

২ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' [৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ], ভারতী, জ্যৈষ্ঠ। ৭৩

৩ তত্ত্ববোধিনী-র 'বিজ্ঞাপন'-এ 'একত্রিংশ বার্ষিক উৎসব'-রূপে অনুষ্ঠানটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয় 1852-তে, সুতরাং ত্রয়স্ত্রিংশ সাংবৎসরিক উল্লেখটিই ঠিক।

১ অবন্তী সান্যাল, ভারতবর্ষ দিন-পঞ্জী [1976]। ২৭৮

২ মহিমচন্দ্র লিখেছেন, 'তখনকার দিনে সহপাঠী কবি ঁ বলেন্দ্রনাথের সহযোগে ঠাকুর পরিবারে মিলিবার অধিকার লাভ করি। বাংলায় প্রকাশিত নূতন নূতন গ্রন্থ মহারাজ বীরচন্দ্রের নিকট পেশ করিবার ভার আমার মত কিশোর সেবকের উপর অর্পিত ছিল, সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।'—'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ', দেশীয় রাজ্য [১৩৩৪]। ২১০

১ '১১ শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।'—সঞ্জীবনী [৩। ১৫], ১০ শ্রাবণ। ৫৮

২ ভারতী, শ্রাবণ ১২৯২। ১৮৮

১ ভারতী, শ্রাবণ ১২৯২। ১৯২-৯৩

২ ঐ। ১৯৫

১ আমরা যে বিষয়টিকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিচ্ছি না তার প্রমাণ 'গুরুগোবিন্দ' [২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫], 'নিষ্ফল উপহার' [২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫] ও 'শেষ শিক্ষা' [৬ কার্তিক ১৩০৬] কবিতা তিনটি, যা 'বীর-গুরু'-র তথ্যবস্তু অবলম্বনে রচিত; বোঝা যায় বিষয়টি বহুদিন তাঁর মনে সজীব প্রেরণার আকারে বর্তমান ছিল।

২ ইতিহাস। ৯০-৯১

৩ ছিন্নপত্রাবলী [১৩৬৭]। ১৮১, ৮৪ সংখ্যক পত্র

৪ দ্র রাজা প্রজা ১০। ৪০৩ [সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০ সংখ্যায় প্রকাশিত]

৫ দ্র ইতিহাস। ৬১-৭৪; প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৬।১০৩৬-৪০ [শরকুমার রায়ের 'শিখগুরু ও শিখজাতি' গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত]

১ এ-বিষয়ে প্রমথনাথ বিশী সবিস্তারে আলোচনা করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার' প্রবন্ধে, দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ১৯৮-২১১; ২১৭-২১

১ অনুচ্ছেদটি ২৯ মাঘ ১৩০২ তারিখে রচিত 'জীবনদেবতা' [দ্র চিত্রা ৪। ১০৬-০৮] কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

১ শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৪২

২ দ্র কানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-বিবরণ/পুষ্পাঞ্জলি', বি.ভা.প, [২৫। ১], শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ৬৯-৭১

১ 'চিহ্ন' 'ভষ্ম' প্রভৃতি বানানগুলি [অন্যত্র 'ভুল'-ও] আমাদের মতে মুদ্রণপ্রমাদ নয়, পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ দিন এই বানানে অভ্যস্ত ছিলেন।

২ 'রুদ্ধ গৃহ', বালক, আশ্বিন-কার্তিক। ৩৩৭-৩৮

৩ বিচিত্র প্রবন্ধ ৫। ৪৭৮

৪ ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা ১ [১৩৭২]। ২২৯

৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রুদ্ধ গৃহ' সোলপুরে লেখা বলে উল্লেখ করেছেন, দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ২০০; কিন্তু সঞ্জীবনীর বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা বালক আশ্বিনের গোড়াতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

৬ বালক, আশ্বিন-কার্তিক। ৩৪১-৪২

৭ ইতিহাস [১৩৮২]। ১০২

১ মানসী, ৫/৮, আশ্বিন ১৩২০। ৬৯৮

২ চিঠিপত্র ২। ৫৩৩

৩ এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, তাঁদের প্রথম সন্তান [মাধুরীলতা] ৯ কার্তিক ১২৯৩ [25 Oct 1886] তারিখে ভূমিষ্ঠ হয়।

৪ বিচিত্র প্রবন্ধ ৫। ৪৮০

১ দ্র জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী ১ [১৩৭৭]। ৩১৬-১৯

২ চিঠিপত্র ২। ৫২৫-২৬

৩ চিঠিপত্র ৮ [১৩৭০]। ১৭-১৯, পত্র ২৬

৪ 'শ্রীচরণেষু', চিঠিপত্র ২। ৫২৬-৩০

১ 'লাইব্রেরি', বালক, পৌষ। ৪১৯-২০

২ বালক, পৌষ। ৪২২; কড়ি ও কোমল ২/১১৫

৩ প্রিয়নাথ তাঁর পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যের ৭ম সর্গ 'শান্তিপ্রয়াণ' থেকে ১১০ ও ১১৮ সংখ্যক [৩য় সংস্করণ অনুযায়ী] শ্লোক দু'টি উদ্ধৃত করেছেন [পাঠে কিছু ভুল আছে], আমরা তার প্রথমটি তুলে দিচ্ছি :

'ধন্য সুখী তুমি এ দুঃখের ধামে
চিরজীবী হয়ে থাক ধরণী পুরুক তব নামে
চূড়া হও দেশের—কুলের হও জ্বলন্ত মাণিক
ধর্ম্ম-অর্থ-মহত্ত্বের আলোকে উজল দশদিক।'

৪ চিঠিপত্র ৮। ২০, পত্র ২৬

৫ ছিন্নপত্র [১৩৬২]। ৮, পত্র ২

৬ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ২০১

১ রবীন্দ্রজীবনী ১। ২০১

২ চিঠিপত্র ৮। ২২

১ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩৯

২ দ্র জীবনের ঝরাপাতা। ৫২

৩ দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ৪। ৮৪

১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৪

২ রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে 'সত্যবাবু'র পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের নাম করেছিলেন [দ্র তীর্থংকর ১৮৮], কিন্তু আমাদের মনে হয়, এখানে সত্যপ্রসাদকেই লক্ষ্য করা হয়েছিল।

৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৪-১৫

৪ চিঠিপত্র ৮। ৩২, পত্র ৩১

৫ চিঠিপত্র ৮। ৩১, পত্র ৩০

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, গান তিনটি আলোচনা পত্রিকার ফাল্গুন ১২৯২ সংখ্যায় 'পুষ্পস্তবক' নামে প্রকাশিত হয়, দ্র গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী ১। ৫০; কিন্তু তথ্যটি যথার্থ নয়।

১ পুলিনবিহারী সেন জানিয়েছেন, 'ফাল্গুন ১২৯২' তারিখে প্রকাশিত কতকগুলি কপিতে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' শব্দ দুটি নেই, রবীন্দ্রভারতী সমিতির গ্রন্থাগারে এইরূপ একটি কপি আছে। দ্র রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ১৭

২ ঘরোয়া। ১২৩

১ চিঠিপত্র ৮। ২৪১, ৪ শ্রাবণ ১২৯৩ [19 Jul 1886] তারিখে লিখিত]

১ কড়ি ও কোমল ২। ৫১

২ রবীন্দ্রজীবনী ১। ২০৬।

৩ অনুরূপ উদ্দেশেই রুশ-আক্রমণের হুজুগে বঙ্গবাসী-কার্যালয় থেকে এক পয়সা মূল্যের দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক' বৈশাখ ১২৯২ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই হুজুগ থেমে গেলে পত্রিকাটি গালগল্পের পসরা সাজাতে থাকে। দ্র 'যোগেন্দ্র-স্মরণী', যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী ১[1976]। ৫৬-৫৭

৪ কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ [প. ব., ১৩৮৮]। ২৯২-৯৫

১ বালক, চৈত্র। ৫৪৯-৫০

১ ব্যঙ্গকৌতুক ৭।৫০৪-০৫

২ সাবিত্রী লাইব্রেরী/৮ম বার্ষিক বিবরণী [১২৯৪]। ৮-৯

১ ছিন্নপত্র [১৩৬২]। ১১। পত্র ৩

২ ছিন্নপত্রাবলী [১৩৬৭]। ৩৯৭, পত্র ১৮৬

৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, কবিতাটি বৈশাখ ১২৯৩ সংখ্যা প্রচার-এ মুদ্রিত হয়, দ্র গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী ১। ৫৫; কিন্তু তথ্যটি ঠিক নয়।

১ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩১/২

২ জীবনের ঝরাপাতা। ১৮

১ সোমপ্রকাশ [২৯।১৪], ৬ ফাল্গুন ১২৯১; বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪ [১৯৬৬] ১৭৯-এ প্রদত্ত তারিখ ও সংখ্যাটি নির্ভুল নয়।

২ সঞ্জীবনীর ২৪ শ্রাবণ [৩।১৭] ও সোমপ্রকাশ-এর ২৩ ভাদ্র [২৯।৪৩] সংখ্যার এ-বিষয়ে দীর্ঘ 'প্রেরিত পত্র' সম্পাদকীয় টীকা প্রকাশিত হয়।

৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪২০-২১।

৪ প্রথম সংস্করণ কড়ি ও কোমল-এর অন্তর্ভুক্ত, দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ [প. ব, ১৩৮৮]। ২৮৫-৮৭

১ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' [২য় সং, ১৩৮৯]। ৮১

২ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৬৯। ৮২৮

৩ জীবনস্মৃতি ১৭।৪২০

১ সোমপ্রকাশ, ৭ পৌষ [৩০।৬]

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

১২৯৩ [1886-87] ১৮০৮ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ষড়্‌বিংশ বৎসর

১ বৈশাখ ১২৯৩ [মঙ্গল 13 Apr 1886] প্রাতে মহর্ষিভবনে নববর্ষের উপাসনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গান রচনা করেন, সেগুলি 'নববর্ষের গান' শিরোনামায় তত্ত্ববোধিনী-র বৈশাখ সংখ্যায় [পৃ ২০] মুদ্রিত হয় : [১] ভৈঁরো-ঝাঁপতাল। আমারেও কর মার্জনা দ্র গীতবিতান ৩। ৮৪২-৪৩; স্বর ৪৫। [২] ললিত-আড়াঠেকা। বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায় দ্র গীতবিতান ১।১৭৭; স্বরলিপি নেই। [৩] টোড়ী-ভৈরবী-আড়াঠেকা। ফিরোনা, ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে দ্র গীতবিতান ৩।৮৪৩; স্বর ৪৫।

এই দিন মধ্যাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে সিটি কলেজ গৃহে নববর্ষ উপলক্ষে কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে 'সত্য' শীর্ষক ভাষণটি পাঠ করেন এবং 'সিটি কলেজ গৃহে শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা' শিরোটীকা-সহ তত্ত্বকৌমুদী-তে মুদ্রিত হয়, আমরা সে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বালক-এর দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এখন আলস্য-রসে নিমগ্ন—সেই কথাই লিখেছেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে [তিনি তখন কৃষ্ণনগর থেকে বদলি হয়ে গয়াতে অবস্থান করছেন] 17 Apr [শনি ৫ বৈশাখ] তারিখে লেখা একটি চিঠিতে : 'আমি-ব্যক্তির হাতে এখন কোনো কাজকর্ম নেই—চাপকানের বোতামগুলো খুলে দেহ এলিয়ে এখন গায়ে বাতাস লাগাচ্ছি,…এ সময়ে আমাকে যদি একটা বাগান দিতে পারতেন। নদীর তীর, গাছের ছায়া, মাঠের বাতাস, আঁবের বোল, কোকিলের কুহু, বসন্তী রঙের চাদর, বকুল ফুলের মালা, এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও চাচ্ছি।'[১]

এই পত্রেই তিনি লেখেন, 'আগামী কল্য [অর্থাৎ রবি ৬ বৈশাখ] সাবিত্রী লাইব্রেরীতে আমাদের নিমন্ত্রণ'[২] —এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতাদি হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে হয়তো তাঁর 30 Apr [শুক্র ১৮ বৈশাখ]-এর পত্রে এই সম্মিলনের কথা আছে : 'ইতিমধ্যে একদিন গোবিন্দ [গোবিন্দলাল দত্ত, সাবিত্রী লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা] বাবুদের ওখানে যাওয়া গিয়েছিল। সেখানে আমি আপনার 'বাঙ্গালার বসন্তোৎসব'এর [চৈত্র-সংখ্যা বালক-এর ৫৬২-৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত] কথা পাড়লুম, আশ্চর্য হলুম, তাঁরাও সকলে একবাক্যে আপনার এই লেখার প্রশংসা করলেন।'[৩] এই পত্রের ছিন্নপত্র-তে বর্জিত অংশে তরুণ রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ রূপ পাওয়া যায়, যা তাঁর জীবনে ও রচনায় খুব সুলভ নয় : 'প্রবোধচন্দ্রের [প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের আকৈশোর বন্ধু] প্রবোধচন্দ্র তাঁর চন্দ্রানন নিয়ে গয়াধাম এবং প্রবোধের হৃদয়াকাশ উজ্জ্বল করে বিরাজ করচেন —এখন আপনার একমুখ দাড়ির বিরহ প্রবোধের অসহ্য বোধ হবে না। শুন্‌চি নাকি সেখানে তিনি পুনশ্চ

তাঁর ভাবী পিণ্ডপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করেছেন তাঁর গয়াবাসিনী অমুক নাকি আবার—!! আপনি খোঁজ নেবেন দেখি কথাটা সত্য কিনা!'[৪]

এই পত্রের 'পুনশ্চ'-তে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, : 'আজ আমার জন্মদিন—পঁচিশে বৈশাখ—পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পঁচিশে বৈশাখে আমি ধরণীকে বাধিত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলুম—জীবনে এমন আরও অনেকগুলো পঁচিশে বৈশাখ আসে এই আশীর্ব্বাদ করুন। জীবন অতি সুখের। রবি'[৫]—নিজের জন্মদিন সম্পর্কে সচেতনতার প্রথম লিখিত পরিচয় এই পত্রাংশটি। অবশ্য সরলা দেবী প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী তাঁর জন্মদিন প্রথম উদ্‌যাপিত হয় পরের বৎসর [১২৯৪] এবং তিনিই তার সূচনা করেন।[১]

শ্রীশচন্দ্রকে লেখা পত্রে বন্ধুসঙ্গলাভের যে বাসনা প্রকাশিত হয়েছে তা অবশ্য তিনি মিটিয়ে এসেছেন আশুতোষ চৌধুরীর [1860 -1924] সান্নিধ্যে। বৈশাখ ১২৮৮-তে সত্যপ্রসাদ-সহ তিনি যখন দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করেন তখন আশুতোষ ছিলেন তাঁদের সহযাত্রী। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দুর্গাদাস চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র আশুতোষ 1881-এ একই বছরে বি.এ এবং এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জনের পর তখন চলেছিলেন কেমব্রিজের সেন্ট জনস্ কলেজে পড়াশুনোর জন্য। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে মাদ্রাজে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের যাত্রাবিরতি ঘটে, 'কিন্তু দেখা গেল, পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহৃদয়তার দ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিল না সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।'[২]

1884-এ অঙ্কশাস্ত্রে ট্রাইপোস্ পেয়ে ও 1885-এ ব্যারিস্টারি পাশ করে আশুতোষ দেশে ফিরে আসেন। Mar 1886-এ [ফাল্গুন ১২৯২]। পারিবারিক কিছু-কিছু দায়িত্ব কিভাবে রবীন্দ্রনাথের উপর এসে পড়ছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। এবার বন্ধুসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্য ও অনুরূপ একটি দায়িত্ব নিয়ে তিনি কৃষ্ণনগরে আশুতোষের বাড়িতে যান ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গী করে। রমণীমোহন আশুতোষের সহপাঠী ও আকৈশোর বন্ধু ছিলেন। পারিবারিক দায়িত্বটি হল আশুতোষের সঙ্গে প্রতিভা দেবীর বিবাহসম্বন্ধের ঘটকালি। প্রতিভা দেবীর বয়স তখন একুশ বৎসর—ঠাকুর পরিবারের পক্ষে অস্বাভাবিক রকম বেশি। দুর্গাদাস সম্বন্ধটি অনুমোদন করেন। বিবাহ হয় তিন মাস পরে ৩০ শ্রাবণ তারিখে।

আশুতোষের চতুর্থ ভ্রাতা অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক প্রমথ চৌধুরী এখানেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের দর্শন লাভ করেন। তাঁর স্মৃতিচারণে রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার দৈহিক রূপের একটি সুন্দর বর্ণনা মেলে : 'আমি এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ কখনও দেখিনি। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, আকৃতি দীর্ঘ, কেশ আপৃষ্ঠ লম্বিত ও কৃষ্ণবর্ণ, দেহ বলিষ্ঠ, চর্ম মসৃণ ও চিক্কণ, চোখ-নাক অতি সুন্দর। ···রবীন্দ্রনাথ সে-কালে গায়ে জামা দিতেন না। পরতেন একখানি ধুতি আর গায়ে দিতেন একখানি চাদর।···তাঁর সর্বাঙ্গ ছিল প্রাণে ভরপুর, প্রাণ তাঁর দেহে ও মুখে টগ্‌বগ্ করত। তিনি ছিলেন একটি জীবন্ত ছবি। রূপের যদি প্রসাদগুণ থাকে ত সে গুণ তাঁর দেহে ছিল।'[৩]

চার বন্ধুর কয়েকটি দিন হাসি-ঠাট্টাতে আনন্দে কেটেছিল। বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে সংগীতেরও একটি স্থান ছিল। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন : 'এই সময়ে আমি তাঁর গানও শুনেছি। ···তিনি একটি হিন্দী গান গেয়েছিলেন,

যা আজও আমার মনে আছে। তার প্রথম কথাগুলি "জন ছুঁয়া মোরি বঁইয়া নাগরওয়া।" এ গানটির সুর বোধ হয় তোড়ী, নয়ত সেই ঘরের।'[৪] এখানে তাঁর সংগীত পরিবেশনের একটি পরোক্ষ বর্ণনা পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবীর রচনায় : "কৃষ্ণনগরে তখন রামতনু লাহিড়ীর ছেলে সত্য লাহিড়ীকে কেন্দ্র করে একটি উচ্চাঙ্গের গানের আসর ছিল, আমার স্বামীও তাতে যোগ দিতেন। পরে তাঁর কাছে শুনেছি যে, সেই আসরে রবিকাকাকে গান গাইতে বলায় তিনি 'বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই' গানটি গেয়েছিলেন। এবং সেই-সব উচ্চাঙ্গ-সংগীতপ্রিয় শ্রোতাদের কাছ থেকে নাকি অনেক বাক্যবাণ তাঁর উপরে বর্ষিত হয়েছিল, যেমন, 'হ্যাঁ, বাঁশরী অনেকে বাজাতে চায়, কিন্তু বাঁশরী বাজাতে চাইলেই কি বাঁশরী বাজে। বাঁশরী বাজাতে হলে শিক্ষা চাই' ইত্যাদি। কারণ সে সরল সুরের ভিতর তাঁদের অভ্যস্ত তানকর্তব তাঁরা খুঁজে পাননি।"[৫] প্রমথ চৌধুরীর বিবরণ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ তিনচারদিন পরে কলকাতায় ফিরে যান।

প্রমথ চৌধুরীর লেখায় রবীন্দ্রনাথের দৈহিক রূপের যে বর্ণনা দেখি তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় কবি দীনেশচরণ বসুর [1851–98] ১৬ বৈশাখ লেখা একটি পত্রে, তিনি পূর্বদিন [১৫ বৈশাখ মঙ্গল 27 Apr] জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন : '···দোতলার সিঁড়ির মুখেই রবি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল।···দেহচ্ছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা চক্ষু ভ্রূ সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ (curls) স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধান ধুতি।···সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইল।···স্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট, রমণীজনোচিত। রবি ঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি নাই। তাঁহাকে গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন। গানটি এই,—"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না···।"[১]

পাঠকের স্মরণ আছে, রাজর্ষি উপন্যাস বালক-এর মাঘ সংখ্যায় ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে বন্ধুদের বা নিজেরই তাগিদে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা জাগে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের কাছে ২৩ বৈশাখ [বুধ 5 May] একটি পত্র প্রেরণ করেন '···মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্বসময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করি। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্বাসনদশায় চট্টগ্রামের কোন স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতে পাই তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়।···'[২]

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য এই পত্রের উত্তর দেন ১৮ জ্যৈষ্ঠ [সোম 31 May] তারিখে: '···মুকুট ও রাজর্ষি নামক দুইটি প্রবন্ধই আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যে স্থলন হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা আপনার বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।/···আপনি যে ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয় আমি আদরের সহিত পূর্বোক্ত নানা মূল হইতে সংকলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।···'[৩] মহারাজ

‘রাজরত্নাকর নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস’ থেকে ‘মহারাজগোবিন্দমাণিক্যস্য চরিতম্’[৪] অংশটি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন ও সেটি পরিশিষ্ট-রূপে রাজর্ষি-র প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়।

ভগ্নহৃদয় পাঠ করে মহারাজ তাঁর অমাত্যকে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এই পত্রবিনিময়ের ফলে ত্রিপুরা-রাজবংশের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক স্থাপিত হল তা আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

কার্যাধ্যক্ষ হিশেবে রবীন্দ্রনাথ বিদায় গ্রহণ করলে বালক-কে ভারতী-র সঙ্গে সম্মিলিত করা হয় ও পত্রিকাটি ‘ভারতী ও বালক’ নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

এই সম্মিলনের ফলে প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটে [‘এবারকার নূতন বন্দোবস্তে অর্থাৎ ভারতীর সহিত বালক মিলিত হইল বলিয়া—পত্রিকা বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে’]। রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এই সংখ্যায় তাঁর রচনা মাত্র দুটি : ‘হেঁয়ালি নাট্য’ দ্র হাস্যকৌতুক ৬।৮৩-৮৭ [‘সূক্ষ্ম বিচার’]

হেঁয়ালির উত্তর : কেবল।

৬০-৬১ ‘আশীর্ব্বাদ’ দ্র শিশু ৯।৯৫-৯৬

কবিতাটি কড়ি ও কোমল-এর প্রথম সংস্করণে গ্রন্থভুক্ত হয়। বৈশাখ মাসে কৃতীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, যশঃপ্রকাশ, জ্ঞানপ্রকাশ, সরোজচন্দ্র ও প্রমোদচন্দ্রের উপনয়ন হয় [দ্র ‘আয় ব্যয়’, তত্ত্ব°আশ্বিন।১২০]; সম্ভবত এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই কবিতাটি লিখিত হয়েছিল। কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবক দুটি নিয়ে গঠিত একটি গীতরূপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’-এ ‘ঝিঁঝিট-কাওয়ালি’ সুর-তাল-নির্দেশে বহুকালাবধি মুদ্রিত হয়, কিন্তু সুরটি রক্ষিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। গীতরূপটির জন্য দ্র গীতবিতান ৩।৮৬৫-৬৬। গ্রন্থপরিচয়-এ সম্পাদক লিখেছেন : ‘কবি স্বয়ং ইহার সুরকার কিনা তাহা জানা যায় না কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় বিশিষ্ট গ্রন্থে বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ায় মনে করা অন্যায় হইবে না যে, অন্ততপক্ষে তাঁহার অনুমোদন ছিল।’

দুটি পত্রিকার সম্মিলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 29 Apr [১৭ বৈশাখ] প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি পত্রে : …‘ভারতী এবং বালকের মিলন হয়ে বেশ হয়েচে। এখন উভয়ের বিশেষত্বটুকু বজায় রাখার দরকার। রবিবাবু তত আর নাই থাকুন, কিন্তু কিছুদিন সে উদ্দেশে তাঁর পরিশ্রম করা চাই। বাঙ্গলার মাসিকপত্রগুলো নিতান্ত নির্জীব, বুড়ো এবং সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেচে। ভারতীকে সে দলে ফেলা যায় না বটে, কিন্তু বালক আমার মনে হয় দেশের মাসিক পত্র সকলের ঐসব রোগ বুঝতে পেরে ঠিক পথে চলছিল। বালক ভারতীতে সেই ভাবটুকু প্রকাশ করাতে পারলেই অনেক কাজ হবে। বাস্তবিক, একটা মিথ্যা আড়ম্বরপূর্ণ সাহিত্যের যে সৃষ্টি হবার যো উঠেছে, তা কালে টিকবে না বলে সময়ের সাগরে হাল ছেড়ে দেওয়া ভাল নয়—তার যথাসাধ্য প্রতিকার এখন করায় উপকার আছে।…’[১] শ্রীশচন্দ্রের বিশ্লেষণ নিখুঁত ও রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর দাবী অন্যায্য ছিল না, কিন্তু কাব্যরসে নিমগ্ন রবীন্দ্রনাথ অন্তত এই সময়ে তাঁর প্রত্যাশানুযায়ী কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই সমগ্র ১২৯৩ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় ‘কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট’ ছাড়া তাঁর লিখিত কোনো প্রবন্ধের সাক্ষাৎ মেলে না—রাজর্ষি-র অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি ব্যতীত গদ্যরচনাও নেই। তাছাড়া ভারতী হস্তান্তরিত হবার পর সম্পাদকীয় নীতিকে প্রভাবিত করা থেকেও তিনি বিরত ছিলেন, এই তথ্যটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতী ও বালক-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় [১০।২] রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা মুদ্রিত হয় :

৬৫-৬৬ 'চিরদিন' দ্র কড়ি ও কোমল ২।১০৬-০৮

চারটি সনেটের সূত্রে গ্রথিত এই কবিতাটির কয়েকটি ছত্র বহুবার উদ্ধৃত হলেও সমগ্রভাবে খুব কম কাব্যসমালোচকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সম্ভবত দু' বছর আগের একটি মৃত্যুস্মৃতি কবিতাটির ভাবকেন্দ্রে অবস্থিত, আবার তা থেকে উত্তরণের প্রয়াসটি 'রুদ্ধগৃহ' গদ্য-রচনাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথকে এই সময়ে আর একবার বিদেশে যেতে হয়। আমরা জানি, মহর্ষি পৌষ ১২৯২-এর মাঝামাঝি সময়ে [Dec 1885] বোম্বাই অঞ্চলে যাত্রা করেন। মহর্ষির জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন : 'ইহার পর বন্দোরায় সমুদ্রের উপরে তাঁহার জন্য এক বাড়ি ভাড়া করা হইল। সমুদ্রের জোয়ার আসিলে সে বাড়ির নিচের সিঁড়ি পর্যন্ত জলে ভরিয়া যাইত।···

দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে, সমুদ্রতীরেই তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইবেন। কিন্তু ছয়মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার মাথা ঘোরার ব্যামো দেখা দিল। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু, তাঁহার জামাতা জানকীবাবু, শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী প্রভৃতি তাঁহার শুশ্রূষার জন্য গেলেন।'[২]

মহর্ষির অসুস্থতার পূর্বেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নাসিকে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। শ্রীশচন্দ্রকে 30 Apr [১৮ বৈশাখ] তারিখে লেখা পত্রে তিনি লিখেছিলেন : 'আমি হয়ত ইতিমধ্যে একবার মেজদার কাছে যেতে পারি।'[৩] সেই ইচ্ছা ও পিতার অসুস্থতা দু'টি কারণ মিলিয়ে তিনি সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকে [Jun 1886] বন্দোরা [Bandra] যাত্রা করেন। 24 Jun [বৃহ ১১ আষাঢ়][৪] বিন্দোরা সমুদ্রতীর' থেকে শ্রীশচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে তিনি লেখেন : 'ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগতই বৃষ্টি।···আমার বারান্দার কাঁচের জানালা সমস্ত বন্ধ ক'রে চুপ মেরে বসে আছি। নিতান্ত মন্দ লাগছে না, আপনাতে আপনি বেশ একরকম আচ্ছন্ন হয়ে আছি—কোনোপ্রকার emotionএর প্রাবল্য নেই—ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু সমস্তই বাহিরে।'[৫]

'Emotion-এর প্রাবল্য' না থাকলেও কাব্যরচনার দিক দিয়ে বন্দোরা-বাস ব্যর্থ হয়নি। প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন : "আমি এখন বান্দোরায় সমুদ্রতীরে বাবামশায়ের সঙ্গে আছি। নির্জ্জনে আমি ভাল আছি আপনার উন্নতির চেষ্টা করচি। কখন কখন দুয়েকটা কবিতা লিখ্‌চি—নিতান্ত চুপচাপ করে আছি।[১] আমাদের ধারণা, কড়ি ও কোমল-এর বেশ কয়েকটি কবিতা—'হাসি' [২।৮৪-৮৫], 'রাত্রি' [২।৯২-৯৩], 'সিন্ধুগর্ভ' [২। ৯৪-৯৫], 'সমুদ্র' [২।৯৬], 'অস্তমান রবি' [২।৯৭], 'অস্তাচলের পরপারে' [২।৯৭-৯৮], 'সিন্ধুতীরে' [২। ১০২] প্রভৃতি—বন্দোরা-বাসের সময়ে লেখা, সবগুলি কবিতার মধ্যেই সমুদ্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অনুভব করা যায়। বন্দোরা বাসকালে তিনি নাসিকে পিতার কর্ম্মস্থলে অবস্থানরতা বালিকা ইন্দিরার উদ্দেশ্যে তিনটি পত্র-কবিতা প্রেরণ করেন—'মঙ্গল-গীত ১' [২।৫৫-৬০], '২' [২।৬০-৬২] ও '৩' [২/৬২-৬৪]—তিনটিই 'পত্র' নামে কড়ি ও কোমল-এ মুদ্রিত হয়; তিনটিরই শীর্ষে 'শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক' ঠিকানা লেখা, প্রথম দু'টি কবিতার শেষে রচনা-স্থল হিসেবে 'বান্দোরা' উল্লিখিত হয়েছে, তৃতীয়টিও যে একই স্থানে রচিত এ-কথা অনুমান করতে বাধা নেই। কবিতাগুলিতে বালিকা ইন্দিরার প্রতি স্নেহ ও মঙ্গলকামনা ব্যক্ত হয়েছে—এইভাবে দেখলে অনুরূপ আরও বহু পত্র-কবিতার সঙ্গে এগুলির বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু

'শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি/অতি তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথা।/পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি/শকুনির মতো নির্মমতা' কিংবা 'চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,/কথায় কথায় বাড়ে কথা।/সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়/কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা' প্রভৃতি ছত্রের অন্তরালে একটি পারিবারিক জটিলতার ইতিহাস সংগুপ্ত হয়ে আছে বলে আমাদের ধারণা। ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'ছোটবেলায় রবিকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সভাসমিতিতে চলে' যেতুম। সেদিনও গিয়েছি, আর বড়ঠাকুরও [আশুতোষ চৌধুরী] দৈবক্রমে সেই গাড়িতেই ছিলেন।···সেজকাকিমারা একটু সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন, তাঁরা তখনি ধরে' নিলেন আমার মা বুঝি আমার বিয়ে দেবার চেষ্টায় এই সব ষড়যন্ত্র করছেন,···এই তুচ্ছ সন্দেহের উপর দুই পরিবারের মধ্যে একটু মনোমালিন্য বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল।' এই সন্দেহের মূলোচ্ছেদ করার জন্যই সম্ভবত জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কন্যাকে নিয়ে নাসিকে চলে যান এবং ইন্দিরাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ পত্র-কবিতাগুলি রচনা করেন। কিন্তু এই তুচ্ছতার দ্বারা উৎপীড়িত হলেও পিতার সান্নিধ্যের মহৎ প্রভাব তাঁকে সঞ্জীবিত করেছে। কিছুদিন পরে নাসিক থেকে প্রিয়নাথ সেনকে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন : 'আমি তাঁর কাছে দিন কতক থেকে অত্যন্ত হৃদয়ের শান্তিলাভ করেছি—আমরা সমুদ্রতীরে থাক্‌তুম এবং তাঁকে সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মত বোধ হত। আমি কিছুদিন তাঁর বৃহৎ জীবনের তীরে থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি। তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে বই লিখেচেন সেটা পড়ে আশ্চর্য্য হতে হয়। সে বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল।'[২]

মহর্ষির এই আত্মজীবনী-তে তাঁর '১৮ বৎসর [২১ বৎসর] হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত [1838–58] ···জীবনকাহিনী ঊনচল্লিশ পরিচ্ছেদে' বর্ণিত হয়েছে। বইটি লেখা শুরু হয়েছিল অবশ্য অনেক আগে; 'ব্রাহ্মসমাজের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা' প্রবন্ধে [দ্র আলোচনা, জ্যৈষ্ঠ ১৮০৮ শক। ৩৯৮] লিখিত হয় : '···বিগত বৎসর যখন আমরা কএকটি বন্ধু একত্র হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই, তখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার স্বরচিত জীবন চরিত হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন; স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রার্থনার একাগ্রতা, চিন্তার গভীরতা, চিত্তের স্থিরতা ও প্রসন্নতা এবং কার্য্য করিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার একটি মনোহর ছবি তাহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন।' মহর্ষিকে দিয়ে তাঁর জীবনের পরবর্তীকালের কাহিনী বর্ণনার প্রয়াসও তাঁর পুত্রেরা করেছিলেন, আত্মজীবনী-র পাণ্ডুলিপির খাতায় মহর্ষির নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত নোট [দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৭৮] তার প্রমাণ। কিন্তু এই চেষ্টা সার্থক হয়নি, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের পর যে জটিলতা সৃষ্টি হয় মহর্ষি সম্ভবত তার তিক্ততা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন—আধ্যাত্মিক উপলব্ধির একটি বিশেষ স্তরে উত্তরণ পর্যন্তই তিনি যথার্থ আত্মজীবনী বলে মনে করেছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় : 'এবার একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে,'[১] তার বিবরণ পত্র-পত্রিকায় ও বিভিন্ন দলিলপত্রে রক্ষিত আছে, তা 'আত্ম'-জীবনীর পক্ষে

বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথও যে এই আদর্শেই কড়ি ও কোমল-পর্বের পরেই জীবনস্মৃতি সমাপ্ত করেছেন, এই তথ্যটিও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুরেন্দ্রনাথও এই সময়ে স্কুলে গ্রীষ্মবকাশের সুযোগে নাসিকে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বন্দোরায় পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পত্রালাপে নিযুক্ত ছিলেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি পাওয়া যায়নি, কিন্তু দেবভাষা সংস্কৃতের শ্রাদ্ধ করে লেখা সুরেন্দ্রনাথের দু'টি তারিখ-হীন পত্র রক্ষিত হয়েছে। একটি রবীন্দ্রনাথের বন্দোরা-গমনের অব্যবহিত পরে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা : 'ঘোল/তব চিঠি প্রাপ্য সন্তোষং প্রাপ্নোতি। তব পেটস্য পীড়তাৎ ন ভক্ষয়সি শুত্বা বড়ং কষ্টং প্রাপ্লেমি। বন্দোরায়াম কানি করোসি কানি পশ্যসি কানি…ন শৃণোমি তানি সব্বাণি মাম ব্রুহি। কর্তাদাদামহাশয়স্য গৃহং কিং প্রকারং? উত্তমং বাগাণং তিষ্ঠতি? কস্মাৎ কারণাৎ মাম গুসমুভাবাপন্ন ব্রবীসি? …' পরেরটি 'এবার আর সংস্কৃত অক্ষরে লেখা গেল না' মন্তব্য-সহ বঙ্গাক্ষরে নাসিক থেকে প্রত্যাগমনের পূর্বে লিখিত : 'ঘোল/তব পত্রং মঙ্গলবারে প্রাপ কিন্তু নানা কারণাৎ গরমাৎ ঘুমাচ্চ অহম তুভ্যম উত্তরং ন দদৌ। ত্বাম অনেকং বাক্যং প্রক্ষ্যামি তন্মধ্যে একং ত্বম কস্মিন দিবসে কলিকাতায়াম গমিষ্যসি। কস্মিন দিবসে জোড়াসাঁকোস্য লোকাঃ ইদম সুখম প্রাপ্স্যন্তি? ত্বম পত্রেণ উববিথঃ কর্ত্তাদাদা মহাশয়স্য নিকটে স্থানং নাস্তি, অস্মিন স্থানে আগত্য নাসিকস্য মেঘাবৃত গগণং তব কিরণেন উজ্জ্বল কুরু।/বয়ম শনিবারে কলিকাতায়াম গমিষ্যামঃ, বিবি pa চ ত্বম entertainং করিষ্যথঃ।/কর্ত্তাদাদা মহাশয়স্য বড়ং গৃহং যস্মিন কালে ভবিষ্যতি তস্মিন কালে তত্র পুনর্গচ্ছ। ইদম fairং propasalং।…' এমন অনিন্দনীয় পত্রের যথাযোগ্য উত্তর রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই দিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলি পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার কিছু নমুনা পাওয়া যায় ঈষৎ পরবর্তীকালে নাসিক থেকে কলিকাতা-প্রত্যাগত সুরেন্দ্রনাথকে প্রেরিত হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত অত্যদ্ভুত ভাষায় লেখা একটি পত্র-কবিতায় :

'কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু মেরা,
সুরেনবাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মহিনা-ভর্ কুছু খবর মিলে না ইয়ে তো নহি আচ্ছা!…
মন্‌কা দুঃখে হুহু কর্‌কে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেক্‌তা কানে বাঙ্গলাকো জবানী।
মেরা উপর জুলুম কর্‌তা তেরা বহিন বাই,
কী করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই!
বহুৎ জোরসে গাল টিপ্‌তা দোনো আঙ্গুলি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজ্‌না বাজাতা থেকে থেকে,
কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিম্‌টি কাটতা,
কাঁচি লে কর কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা,…'[২]

—উক্ত 'বহিন বাই' হচ্ছেন ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। কবিতায় কিছু অতিরঞ্জন থাকলেও এইরকমই ছিল তাঁদের সম্পর্ক। সুরেন্দ্রনাথের পত্রে 'ঘোল' সম্বোধনটি লক্ষণীয়—প্রিয় রবিকা'র নূতন নূতন নামকরণে

ভাইবোন ছিলেন সদা তৎপর। 'দশ দিনের ছুটি' শীর্ষক ভ্রমণকাহিনীতে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এদিকে ইঁহার ছোট বোনটি মাঝে মাঝে আসিয়া আবদার করিতেছেন—'কাকা', 'কাকা' বলিলে ত রক্ষা ছিল, দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া আমার নূতন নামকরণ হয়, কোন সভ্য দেশে সেরূপ সৃষ্টিছাড়া নাম প্রচলিত নাই; এই ছেলেপিলেদের দৌরাত্মে আমার জিনিসপত্রও সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, আমার নিজের নামেরও একটা ঠিকানা থাকে না। আমার নিজের নাম যে আমার নিজের সম্পত্তি, এটা কিছুতেই তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না।'[১] —এখানে ঈষৎ অনুযোগের সুর শোনা গেলেও অন্যত্র তিনি এই কাজকেই সমর্থন করেছেন :

এক জনেতে নাম রাখ্‌বে/অন্নপ্রাশনে।

বিশ্ব সুদ্ধ সে নাম নেবে/বিষম শাসন এ।

নিজের মনের মত সবাই/করুক নামকরণ।···

আমি বাপু ডেকে বসি/ যেটা মুখে আসে,

যারে ডাকি সেই তা বোঝে/আর সকলে হাসে![২]

ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা-সম্বোধিত এইরূপ একটি নাম 'বুজি'—রবীন্দ্র-রচনাতেও তার স্বীকৃতি আছে :

'একবার যদি মনে পড়ে তোর/"বুজি" বলে ছিল কেউ![৩] -ইন্দিরা দেবীর লেখায় এই বুজি'র সাক্ষাৎকার যথাস্থানে পাওয়া যাবে।

বন্দোরায় মহর্ষি কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠলে চিকিৎসকের পরামর্শে চুঁচুড়া ফিরে যান আষাঢ়ের শেষ দিকে। 'শ্রীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ হিসাবের কেস বহি'-তে [এই বছরের সরকারী ক্যাশবহি-টি পাওয়া যায়নি] ৩১ আষাঢ়ের হিসাব : 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের বম্বে হইতে শুভাগমন হওয়ায় হুগলির ষ্টেসেন হইতে চুঁচুড়ার বাটী হইতে আসিবার গাড়ি ভাড়া ৪12/০', দু'দিন আগে ২৯ আষাঢ়ের হিসাব : 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট চুঁচুড়ার বাটীতে ২৮ আষাঢ় [রবি 11 Jul] তারিখে ফলকরা আম মোচা লাউ মানকচু পাঠান হয়··· ৩১২/৬'-এর কিছু পূর্বে মহর্ষি চুঁচুড়ায় ফিরে এসেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পিতার সহযাত্রী হন নি, তিনি যান নাসিকে সত্যেন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্রে। প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন : 'নাসিকে এই মাঠের মধ্যে আমি আছি ভাল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে রৌদ্র হচ্চে—আমি আমাদের একটা দীর্ঘ ঢাকা বারান্দায় বাসা বেঁধেছি—সেখেন থেকে মাঠের পরপারবর্ত্তী দূরের নীল পাহাড়গুলো এবং তার উপরকার শাদা মেঘগুলো স্পষ্ট দেখা যায়—আমাদের এই বাড়ির পাশের ক্ষেত্রে সমস্ত নিস্তব্ধ দুপুরবেলা চাষার চাষ করতে করতে এ দেশের একপ্রকার অদ্ভুত মেঠো সুরে গান করচে।'[৪] এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ তখন কর্মহীন আলস্যবিজড়িত এক ছুটির মেজাজে রয়েছেন। সেই মেজাজেরই পরিচয় আছে সুরেন্দ্রনাথকে লেখা পূর্বোক্ত পত্রে :

এদিকে আবার party হোতা খেল্‌নে কোবি যাতা

জিম্‌খানামে হিম্‌ঝিম্ এবং থোড়া বিস্কুট খাতা।

এই নির্ভার জীবনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথকে আর্থিক সমস্যা যে পীড়ন করছে তার নিদর্শন আছে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিতে : 'পুরোণো বই বিক্রি করা বিষম হাঙ্গাম আমি জানি। থাক্—ও বইগুলো আর বিক্রি করে কাজ নেই—আমি অন্য কোন উপায়ে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা দেখ্‌ব।'[৪] কিছুদিন আগে বন্দোরা থেকে লেখা

পত্রেও অর্থাভাব ও বই বিক্রির কথা আছে : 'আমাকে এখেনে সেই পঞ্চাশ টাকাটা যদি কোনমতে পাঠিয়ে দিতে পার ত বড় ভাল হয়। তোমাকে বার বার টাকার জন্যে বিরক্ত করচি কিছু মনে কোরো না—কিন্তু আমার টাকার নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলেই বই বেচ্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম।'[৫] পরবর্তীকালে ব্যবসা, কন্যার বিবাহ প্রভৃতি কারণে রবীন্দ্রনাথের বারবার ঋণের প্রয়োজন হলেও বর্তমান অর্থাভাবের কারণ সম্ভবত কিছুটা কাপড়চোপড় তৈরি করার জন্যে এবং বেশিরভাগটাই বই কেনার তাগিদে, যার জন্যে পুরোনো বই বিক্রিও করতে হত। 'আমার বইগুলো সব এয়েচে এই খবর হয়ত তোমাকে টেনে আন্‌বার একটা উপায় হতে পারে' [পৃ ৩৭, পত্র ৪২], 'Thacker-এর ওখান থেকে যদি বই পেয়ে থাক ত এই লোকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো [পৃ ৩৮, পত্র ৪৩],'দোকানে গময়িষ্যামি থ্যাকারস্য স্পিঙ্কস্য চা/কখনং যাইতে হৈবে টাইমমবধারয়' [পৃ ৩৮, পত্র ৪৪]—প্রভৃতি পত্র তাঁর পুস্তকপ্রীতির কিছু নিদর্শন। পড়ুয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্রটি সুস্পষ্ট করা অসম্ভব—রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহটি নিতান্তই অসম্পূর্ণ—কিন্তু এই সব চিঠি অন্তত ইঙ্গিত দেয় জ্ঞানসাধনার কী দুস্তর পথ তাঁকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে।

নাসিক থেকে রবীন্দ্রনাথ কবে কলকাতায় ফিরেছিলেন নিশ্চিত করে বলা শক্ত। ক্যাশবহির ২ ভাদ্রের হিসাব–"ব°বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উহার বম্বে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু/মহাশয়ের নিকট গমনাগমনের ব্যয় শোধ গুঃ খোদ২০০্' —তারিখটি নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করে না। তবে অনুমান করা চলে, শ্রাবণের প্রথম দিকেই তিনি ফিরে এসেছিলেন; প্রিয়বন্ধু আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে ভ্রাতুস্পুত্রী প্রতিভা দেবীর বিবাহ হয় ৩০ শ্রাবণ [শনি 14 Aug] রাখীপূর্ণিমার দিন, এই বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর উপস্থিতি প্রায় আবশ্যিক ছিল। আশুতোষ তখনও ব্যারিস্টারিতে পসার জমাতে পারেন নি, সিটি কলেজে সামান্য বেতনে আইনের শিক্ষকতা এবং স্কুলপাঠ্য ইংরেজি গ্রামার ও এলিমেন্টারি ট্রিগোনোমেট্রি লিখে সামান্য আয়ে স্কট্‌স্ লেনের একটি ছোটো বাড়িতে ভাইবোনেদের নিয়ে বাস করেন—কিন্তু মন ছিল সাহিত্যরসে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তখনো ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ল-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মক্কেলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণ বিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্যবনের মধু সঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন।'[১] এই উৎসাহ নিয়ে তিনি ভারতী ও বালক-এর আষাঢ় সংখ্যা [পৃ ১৩৫-৪৩] থেকে আশ্চর্য পরিণত বাংলা গদ্যে 'কাব্যজগৎ'[২] নাম দিয়ে বিদেশী খ্যাত অখ্যাত কবিদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের বম্বোরা যাত্রার পূর্বেই কলকাতায় স্কট্‌স্ লেনের বাসায় আশুতোষের কাছে যাতায়াতের সূত্রপাত হয়েছিল, নাসিক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তা প্রায় নিত্যকর্মে পরিণত হল। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ বোধহয় হপ্তায় দু'তিন দিন আমাদের বাসায় আসতেন। সেই সময়েই আমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হই। তাঁর 'কড়ি ও কোমল' সম্পাদনের ভার দাদা নিয়েছিলেন, এবং এ বিষয়ে তাঁদের যা আলোচনা হ'ত তাতে যোগ না দিলেও সে ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকতুম।'[৩] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই সকল লেখায় তিনি ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ

পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূলকথা।

'আশু বলিলেন, "তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব।" তাঁহারই 'পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।[৪]

সম্ভবত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এই-সব আলাপ-আলোচনা ও সম্পাদনার কাজ চলে, অগ্রহায়ণের প্রথমেই কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন বন্দোরায় পিতার কাছে রয়েছেন, তখন তত্ত্ববোধিনী-র আষাঢ় সংখ্যায় '৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন/যোড়াসাঁকো' ঠিকানায় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় : 'রাজর্ষি ।/উপন্যাস।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/ইহা সম্পূর্ণ হইয়া আশ্বিন মাসের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবেক। আষাঢ় মাসের মধ্যে ভারতী ও বালকের গ্রাহকেরা ০ আনা এবং অন্যেরা ১্ টাকা নিম্নঠিকানায় প্রকাশকের নিকট মণি অডার বা পোষ্টাল নোট যোগে পাঠাইলেই যথাসময়ে উক্ত উপন্যাস পাইবেন।'—বিজ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি, বইটি প্রকাশিত হয় মাঘ মাসে। পাঠকের স্মরণ আছে, ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ১৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরার ইতিহাস-সংক্রান্ত তথ্যাদি পাঠাবার কথা লিখেছিলেন। এই চিঠি পেয়েই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষি সম্পূর্ণ করার কাজে হাত দিয়েছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে বন্দোরা চলে যেতে হওয়ায় তিনি হয়তো গ্রন্থটির ব্যাপারে আর অগ্রসর হতে পারেন নি এবং ফিরে এসে প্রতিভা দেবীর বিবাহ, কড়ি ও কোমল প্রকাশ ইত্যাদি কার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাজর্ষি-র শেষাংশে যে অসংলগ্নতা ও প্রতিভার স্ফুর্তির অভাব লক্ষ্য করা যায়, তার মূল কারণ সম্ভবত তাড়াহুড়ো—অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসের কোনো সময়ে তিনি কোনোমতে গ্রন্থটি শেষ করে দায়মুক্ত হন এমন ভাবা বোধ হয় অসংগত হবে না। বন্দোরা বাসকালেই রবীন্দ্রনাথের বৌ-ঠাকুরানীর হাট-এর কেদারনাথ চৌধুরী-কৃত নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়'[১] গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় ২০ আষাঢ় শনি 3 ও Jul তারিখে। ভূমিকালিপি ছিল—বসন্ত রায় : রাধামাধব কর, প্রতাপাদিত্য : মতিলাল সুর, উদয়াদিত্য : মহেন্দ্রলাল সুর, রামচন্দ্র : নীলমাধব চক্রবর্তী, রমাই ভাঁড় : অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, মোহন : পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বিভা : সুকুমারী [মতান্তরে হরিমতি], সুরমা : রাণী (ছোটো), মঙ্গলা : ক্ষেত্রমণি [মতান্তরে লক্ষ্মী], রাণী : ভবতারিণী [মতান্তরে কাদম্বিনী]।[২] রাধামাধব কর সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, তাঁর কণ্ঠের 'আজ তোমারে দেখতে এলেম' গানটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৩]

রাজা বসন্ত রায় নাটকটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, মুদ্রিত হয়েছিল বলেও জানা যায় না। সুতরাং নাট্যরূপান্তরে কি কি পরিবর্তন করা হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা ছিল কি না ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।[৪] তবে সেই যুগে উপন্যাস বা কাব্যের যে-সব নাট্যরূপ অভিনীত হয়, তাতে লেখকের অনুমতি বা সহযোগিতা সব সময়ে গ্রহণ করা হত বলে মনে হয় না-পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কপি-রাইট আইনের প্রয়োগ বা রয়্যালটি দেওয়ার প্রশ্নও বিবেচ্য ছিল না। তাই কেদারনাথ চৌধুরীর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নাট্যরূপ দেওয়া অসম্ভব নয়; উপন্যাসের ভাবকেন্দ্র যে পরিবর্তিত হয়েছিল তা

'রাজা বসন্ত রায়' নামকরণেই প্রতীয়মান। তবে নাট্যরূপ ও তার অভিনয়ের জনপ্রিয়তা যে রবীন্দ্রনাথের কাছেও গুরুত্ব পেয়েছিল, তার প্রমাণ বৌঠাকুরানীর হাট-এর দ্বিতীয় সংস্করণের [1887] আখ্যাপত্রে বন্ধনীর মধ্যে 'রাজা বসন্ত রায়/উপন্যাস' শব্দগুলির সমাবেশ। বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং বইটি পুনর্মুদ্রণে যে উৎসাহী হয়েছিলেন, তারও অন্যতম কারণ নাটকটির জনসমাদর— নইলে গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণের বিক্রির যে হতাশাব্যঞ্জক হিসাব আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, তা কোন ব্যবসায়ীকে প্রলুব্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

নাটকটির প্রথম অভিনয় রবীন্দ্রনাথ দেখেন নি, কারণ সে-সময়ে তিনি কলকাতায় ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী কোনো অভিনয় তিনি অবশ্যই দেখেছিলেন। ইন্দিরা দেবী এইরূপ একটি অভিনয়ের স্মৃতিচারণ করেছেন : '…একবার স্টার থিয়েটারে রাজা বসন্ত রায় নামে বউঠাকুরানীর হাটের রূপান্তর দেখতে গিয়ে বুড়ো বসন্ত রায়ের গান ও অভিনয়ে খুব কেঁদেছিলুম মনে পড়ে।'[৫] 'স্টার থিয়েটার' উল্লেখটি অবশ্য স্মৃতিবিভ্রম-জনিত। সোমপ্রকাশ [৩০।৩৯, ২৫ শ্রাবণ, পৃ ৬৪৬] লেখে : 'আমাদিগের একজন দর্শক গত ১৬ই ও ১৭ই শ্রাবণ [শনি-রবি 31 Jul -1 Aug] গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে আনন্দমঠ এবং রাজা বসন্ত রায় নামক নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। রাজা বসন্ত রায় নামক নাটকখানির অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। বিশেষ রাজা বসন্ত রায়ের অমায়িকতা এবং উদয়াদিত্যের অসহ্য যাতনা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী করুণারসে ভাসমান হইয়াছিলেন। দৃশ্যপটগুলিও দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে।…' সমকালীন বিবরণ হিশেবে প্রতিবেদনটি মূল্যবান।

রাজা বসন্ত রায়-এর প্রধান আকর্ষণ ছিল গান। ড সুকুমার সেন লিখেছেন : 'বৌঠাকুরাণীর-হাটে যে গানগুলি ছিল সেগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত আরও কয়েকটি গান যোগ করা হইয়াছিল।'[১] এ প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র লিখেছেন : 'ইহার গানগুলি সবই রবীন্দ্রনাথের নয়। গানে-অভিনয়ে রাজা বসন্ত রায় বেশ জমিয়াছিল, এবং এই অভিনয়ের জন্যই রবীন্দ্রনাথের গান জনসাধারণের মধ্যে প্রথম ছড়াইয়া পড়ে। সেকালের বটতলা-প্রকাশিত গানের বইগুলিতে ইহার প্রচুর সাক্ষ্য মিলিবে।'[২]

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট-এ ছিল না এমন দু'টি গানের কথা বহু জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে :

ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি টুটবে না দ্র গীতবিতান ৩।৭৯৮-৯৯; প্রায়শ্চিত্ত [১৩১৬] নাটকের ৫ম দৃশ্যে সুরমার গান দ্র প্রায়শ্চিত্ত ৯।১১৪; স্বর ৯।

মুখের হাসি চাপলে কি হয় : গানটি গীতবিতান-এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে ও এর স্বরলিপি স্বরবিতান ৫১-তে সংকলিত হলেও বর্তমানে বর্জিত হয়েছে। এর কারণ রবীন্দ্রনাথকে ১৬ আশ্বিন ১৩০২ [2 oct 1895] তারিখে লেখা ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি : "মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়" গানটা আমারও, আপনার বলিয়া ধারণা ছিল; এখন দেখিতেছি, ভাগ্যে তাহার প্রথম ছত্রটা ছাড়া আর অধিক জানিতাম না! সমস্তটা জানিয়া তাহা আপনার বলিয়া ভ্রম করিলে আমি আমার "কাব্যবিচারক্ষমতা"কে খুব একহাত লইতাম।'[৩] তাঁর পূর্ব পত্রেই গানটির উল্লেখ ছিল, রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি পাওয়া না গেলেও উপরের অংশ থেকে অনুমান করা চলে যে, গানটি তাঁর লেখা নয় বলে তিনি প্রভাতকুমারকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সঙ্গীতপ্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২/১৯৭-তে গানটি 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামাঙ্কিত হয়ে স্বরলিপি-সহ

মুদ্রিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত-তে গানটির একটি পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায় : হাসিরে কি লুকাবি লাজে [দ্র গীতবিতান ২।৪২০]। পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তি ও তুলনামূলক বিচারের জন্য বর্জিত গানটি উদ্ধৃত করছি :

মুখের হাসি চাপলে কি হয়,
হৃদয়ের ভার লুকিয়ে কি রয়,
লাজের শাসন মানে কি মন
ব্যথার ব্যথী হয় লো যে জন
প্রাণের হাসি চোখে খেলে।
প্রেমের তুফান ঢেউয়ে চলে ॥
শরম ভূষণ নারীর ব'লে—
তারে কি ভুলাবি ছলে ॥

নাটকটি পরেও অনেকবার অভিনীত হয়।

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন প্রায়শ্চিত্ত [১৩১৬] নামে, যা আরও পরে পরিত্রাণ [১৩৩৬] নাটকে পুনঃসংস্কৃত হয়।

শ্রাবণ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে রবীন্দ্রনাথের দু'টি সনেট 'সত্য' শিরোনামে মুদ্রিত হয় :

৭৯ 'সত্য' (১) 'ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে' দ্র কড়ি ও কোমল ২।১০২-০৩

(২) 'জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবিশশী' দ্র ঐ ২।১০৩

ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৩ [১০।৪] :

২৩৪-৩৫ 'পাখীর পালক' দ্র শিশু ৯।৭৬-৭৭

কবিতাটি কড়ি ও কোমল [১২৯৩]-এ প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়।

ভারতী ও বালক, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৩ [১০৫-৬] :

৩১৪-১৫ 'বিরহীর পত্র' দ্র কড়ি ও কোমল ২।৫৩-৫৪

৩১৬-২০ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬।৯৪-৯৮ ['অন্ত্যেষ্টি-সকার']

হেঁয়ালি-র উত্তর : বাকি।

৩২০-২১ 'কত রচিব শয়ন' দ্র কড়ি ও কোমল ২।৬৮-৬৯ ['বিরহ']

কড়ি ও কোমল প্রথম সংস্করণে সুর-তাল : ভৈরবী—একতালা। দ্র গীতবিতান ২। ৩৯১-৯২; স্বর ১০। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, 'বস্তুত এই বিরহ কবিতাটিকেই আধুনিককালের প্রথম সরল কলামাত্রিক রচনার গৌরব দিতে হয়। এই ছন্দোরীতিটি মানসীতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে বটে, কিন্তু কড়ি ও কোমলের বিরহ কবিতাটিতেই তার প্রথম নিখুঁত নিদর্শন পাওয়া যায়।'[১]

৩২৬-২৭ 'নাসিক হইতে খুড়ার পত্র' দ্র প্রহাসিনী [সংযোজন] ২।৩৪১-৪২

[৩৫২-৫৪ 'সহজে গান অভ্যাস' পর্যায়ে 'আয় তবে সহচরি' গানটির প্রতিভা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয়।]

ভারতী ও বালক, কার্ত্তিক ১২৯৩ [১০।৭] :

৪২৪-৩১ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬।৮৭-৯৪ ['আশ্রমপীড়া']।

হেঁয়ালি-র উত্তর : নাকাল।

আশ্বিন ১২৯৩-এ সাবিত্রী লাইব্রেরি থেকে সাবিত্রী[২] নামে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—এতে রবীন্দ্রনাথের সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পঠিত 'অকালকুষ্মণ্ড' [১১ চৈত্র ১২৯০] ও 'হাতে কলমে' [৯ ভাদ্র ১২৯১] প্রবন্ধ-দুটি পুনর্মুদ্রিত হয়, দুটিই ভারতী-তে যথাসময়ে মুদ্রিত হয়েছিল। পুনর্মুদ্রণের সূত্রে প্রবন্ধ দুটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়; নব্যভারত, মাঘ ১২৯৩ [৪।১০।৪৪৯-৫৬] সংখ্যায় বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'সাবিত্রী।/ সমালোচন' প্রবন্ধে যে বিরূপ মত প্রকাশ করেন, আষাঢ় ১২৯৪ [৫।৩।১১১-১৪] সংখ্যায় গোবিন্দলাল দত্ত তার প্রত্যুত্তর দেন। আশুতোষ চৌধুরী ভারতী ও বালক-এর ফাল্গুন সংখ্যায় 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা/সাবিত্রী' [পৃ ৬৮৪-৮৮]-তে লেখেন : '…লেখা অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী, তাহা বলা আবশ্যক নাই; কিন্তু তাহাতে এত অধিক উপস্থিত সভ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথা আছে যে, তাহার স্থায়ী ভাব কম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যাঁহারা প্রবন্ধ পাঠ কালে উপস্থিত, তাহা ভিন্ন অন্য অনেক লোকে রবীন্দ্র বাবুর লেখা পড়িতে ইচ্ছুক, সেই জন্যই তাঁহাকে স্থায়ী ধরণে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতে ইচ্ছা হয়।' প্রিয়বন্ধুর উপযুক্ত অনুযোগ বটে!

ভাষণগুলি পূর্বপ্রকাশিত, কিন্তু জীবনীকারের কাছে সাবিত্রী গ্রন্থটির প্রকৃত মূল্য এতে প্রকাশিত একটি 'বিজ্ঞাপন'-এর জন্য :

'বিদ্যাপতির পদাবলী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত/ও/শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রায় দশ বৎসরকাল রবীন্দ্রবাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী যথাসম্ভব নির্দ্দোষ ও নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত কয়েকটি সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল। ফল কথা, সেই প্রাচীন, শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে—এবং যাবতীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাষা বুঝিতে হইলে—রবীন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর, মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত।

১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত।/মূল্য আট আনা মাত্র।

অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

পিপেল্স্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।'

আশ্চর্যের বিষয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা, মূল্য, প্রকাশের তারিখ প্রভৃতি যথাযথ বিজ্ঞাপিত হবার পরও গ্রন্থটি সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশ না-হওয়ার কারণটি সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত।

আমরা আগেই দেখেছি, 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' পর্যায়ে 'বিদ্যাপতি' [১২৮১] প্রকাশের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি'র প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন এবং সেগুলির অনুকরণে পদরচনা থেকে আরম্ভ করে ভারতী-র বিভিন্ন সংখ্যায় বিদ্যাপতির পদের ভাব, ভাষা, অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর পর ১ ফাল্গুন ১২৯০ [12 Feb 1884] তিনি যখন George A. Grierson সংগৃহীত ও সম্পাদিত '*An Introduction to the Maithili Language*…' গ্রন্থটির

অন্তর্গত 'The Poems of Vidyapati Thakur' সংকলনটি পেলেন, তখন সেটিকে কত যত্নে পাঠ করেছেন তার নিদর্শন আছে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত উক্ত গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত কপিটিতে [অভিজ্ঞান সংখ্যা : ৩০২]।[১] বেশ কয়েকটি পদের পদ্য ও গদ্যানুবাদ করেছেন, যার অনেকগুলি রূপান্তর [১৩৭২] গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে এর আগে মোট ৫২টি পদের অনুবাদ [সম্পূর্ণ বা আংশিক] প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গীয় শব্দকোষ [১৩৪০-৫৩]-প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের অগ্র°-ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসী-তে। অনুমান করা যায়, সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ, পদরত্নাবলী ও গ্রিয়ার্সন-সংগৃহীত পদগুলি অবলম্বনেই রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাপতির পদাবলী' সম্পাদনা পরিকল্পনা করেছিলেন। কাজ কতটুকু এগিয়েছিল বলা সম্ভব নয়, তবে ৯ কার্ত্তিক প্রথমা কন্যা মাধুরীলতার [বেলা] জন্ম, কড়ি ও কোমল মুদ্রণের আয়োজন প্রভৃতি ব্যস্ততায় নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশের লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি। এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো পরিকল্পনাটিই পরিত্যক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর রচনাবলী-সংস্করণের 'সূচনা'য় লিখেছেন : '…পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি।' কালীপ্রসন্ন [1861-1907] প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ-এর আদর্শে একটি গ্রন্থমালা প্রকাশের সংকল্প করেন। তিনি 17 Feb 1884 [৬ ফাল্গুন ১২৯০] লর্ড রিপনকে একটি পত্র লেখেন তাঁকে গ্রন্থ উৎসর্গ করার অনুমতি প্রার্থনা করে। '২১শে আশ্বিন ১৩০১ সাল', [6 Oct 1894] লিখিত 'পূর্ব-ভাষ'-এ বিষয়টির উল্লেখ আছে : '…দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন যাবতীয় বঙ্গকবির জীবন বৃত্তান্ত, রচনার সার-সংগ্রহ ও সমালোচনা প্রকাশের কল্পনা করি, তখন মহামতি লর্ড রিপণ বাহাদুর উপহার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন…'। তাঁর সংকল্প কার্যকরী হয় দশ বছর পরে, আষাঢ় ১৩০১-এ 'প্রসাদ-পদাবলী অর্থাৎ রামপ্রসাদের সমগ্র রচনা সংগ্রহ' এবং আশ্বিনে 'বিদ্যাপতি/ বঙ্গীয় পদাবলী' প্রকাশিত হয়। 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন'-এ [আশ্বিন ১৩০৫] তিনি লেখেন : 'এই সংস্করণে কতকগুলি নূতন পদের সন্নিবেশ এবং টীকার পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। টীকা বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন।' এই ভূমিকা থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই 'স্বতঃপ্রবৃত্ত' সাহায্য এসেছিল দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতের সময়ে এবং তাঁর পূর্বোল্লিখিত 'সূচনা'-য় বর্ণনার কালানুক্রম থেকে অনুমান করা যায় 'পুরাতন খাতাটি' রবীন্দ্রনাথ-কথিত একটি ভালো বাঁধানো খাতা' যেটি তিনি প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ-এর অন্তর্গত বিদ্যাপতি অবলম্বনে শব্দ-সমুচ্চয়ে পূর্ণ করেছিলেন —এটি প্রস্তাবিত বিদ্যাপতি পদাবলীর পাণ্ডুলিপি নয়।

৯ কার্ত্তিক [সোম 25 Oct 1886] সন্ধ্যা ৬টা ২ মিনিটে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার [বেলা] জন্ম হয়। বলেন্দ্রনাথের ডায়ারি থেকে তাঁর রাশিচক্র ও অন্যান্য বিবরণ প্রদত্ত হল :
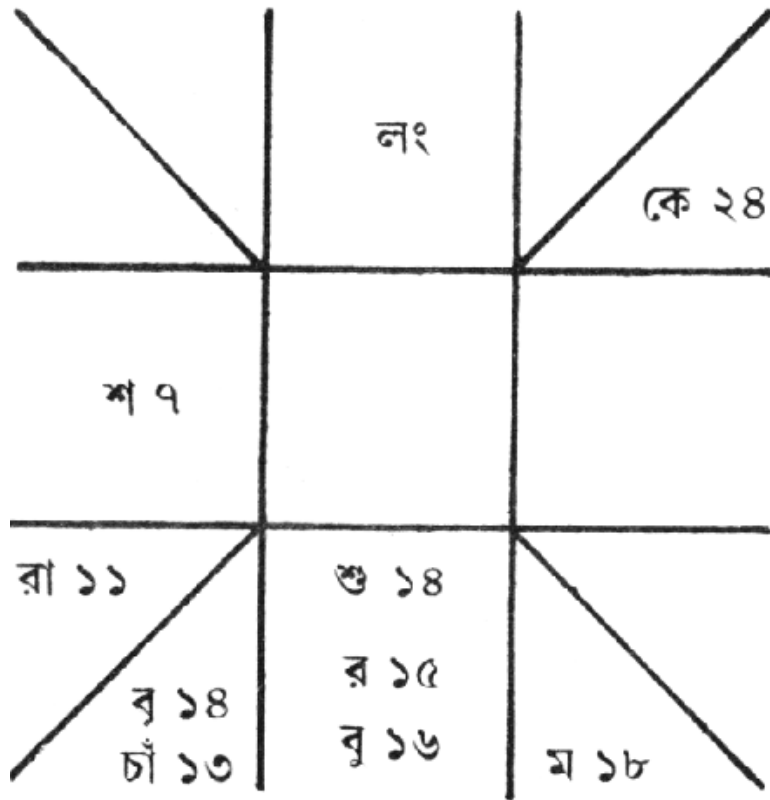
ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : ‘বেলা যেন মোমের পুতুলটির মতো হয়েছিল। তাকে দেখতে প্রথম দিন যখন বাড়ির ভিতরে গেলুম তখন স্থির করলুম তার দৈনন্দিন জীবনী আমি রোজ লিখব। কিন্তু কয়দিনের বেশি সে সংকল্প স্থায়ী হয়নি।…রবিকাকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে, বেলা তাঁর রঙ কতক পরিমাণে পেয়েছিল—আমাদের বাবার মতে তদতিরিক্ত।’[১]

‘দৈনন্দিন জীবনী’র কোনো নমুনা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তার একটি বার্ষিক সংকলন করেছিলেন ইন্দিরা দেবী ‘পুস্পাঞ্জলি’র পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায়। মাধুরীলতার প্রথম জন্মবার্ষিকীর দিন [৯ কার্ত্তিক ১২৯৪ মঙ্গল 25 Oct 1887] ৪৯ পার্ক স্ট্রীটে তিনি লেখেন : ‘বেলি সোমবার ২৫শে অক্টোবর অথবা ৯ই কার্ত্তিক, ১৮৮৬এ জন্মেছিল। সময়টার একটু গোল আছে, কেউ বলে সন্ধ্যে ৬টা বাজতে ছয় মিনিট, কেউ বলে ৬টা বাজতে দু’ মিনিট। যাহোক ওটুকু সময়ের তফাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, একরকম মোটামুটি ৬টা বল্লেই হয়। মা তার নাম বেলা রেখেছিলেন কারণ বুজি বেল ফুল ভালবাসেন, তা ছাড়া বেল ফুলের মতনই দেখতে হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাড়িভিতরে বুজিদের যে ঘর ছিল বেলি সেখানে হয়েছিল, আমরা যখন দেখতে গেলুম তখন মা তাকে কোলে করে ছিলেন। আমি প্রায় রোজ সকালে তাকে তেতালায় আনতুম, সেখানে একটু হাওয়া খেয়ে আবার বাড়িভিতরে যেত। সে একমাসের না হতে হতেই “হ্যাগ্গাঃ” বতে আরম্ভ করেছিল, এক মাসের যখন হল তখন এই বাড়িতে এল। কিছুদিন পরে বেলি নানান শব্দ বের করতে লাগল তার মধ্যে প্রধান হচ্চে “গী”।’[২] —প্রায় সমকালীন রচনা বলে বিবরণটির বিশেষ মূল্য আছে। ‘বুজি’ শব্দটি লক্ষণীয়—এটি যে ইন্দিরা দেবীর দেওয়া রবীন্দ্রনাথের অজস্র ডাকনামের একটি, তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের কত ভালোবাসতেন সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমরা তার কিছুটা আভাস আগেই পেয়েছি। সুতরাং আত্মজার জন্ম তাঁর কাছে যে একটি বিশেষ ঘটনা বলে পরিগণিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি-কোনো গান বা কবিতা রচনা করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই; শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি অন্তরঙ্গ বন্ধুদের পত্রের মাধ্যমে তিনি নিশ্চয়ই এই সংবাদ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেইরূপ কোনো পত্র এখনো পাওয়া যায়নি।

মাধুরীলতার জন্মের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স সাড়ে পঁচিশ বছর, মৃণালিনী দেবী তেরো বছরের কিছু কম। বালিকা মাতার পক্ষে সন্তান পালন কষ্টসাধ্য হবে বিবেচনা করে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁদের নিয়ে যান পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে নিজের কাছে। নবীন পিতাও আত্মজার লালনে তৎপর ছিলেন, তা জানা যায় মাধুরীলতার বিবাহের পর তাঁকে স্বামীগৃহে রেখে এসে শান্তিনিকেতন থেকে স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে [20 Jul 1901 শনি ৪ শ্রাবণ ১৩০৮] : 'কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশবস্মৃতি আমার মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম্য করত—সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত—কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল—আমি ওকে নিজে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম—দার্জ্জিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম—যে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেই সব কথা বারবার মনে উদয় হয়।'[৩] এই স্মৃতিচারণের মধ্যে পরবর্তীকালের কথাও আছে—তবু পিতৃহৃদয়ের সমকালীন অবস্থাটিও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

মাধুরীলতার জন্মের প্রায় এক মাস পরে রবীন্দ্রনাথের নবম কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হল [? 17 Nov 1886 বুধ ২ অগ্র°]—২৬৩ পৃষ্ঠার বিরাট বই, ১১৭টি বিচিত্র বিষয়ের কবিতার সংকলন। রচনাকালের দিক দিয়ে এর মধ্যে প্রথমটি ['নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম'—Moore-এর কবিতার অনুবাদ] ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল—শেষ কবিতা 'শেষ কথা মনে হয় গ্রন্থ প্রকাশের কিছু পূর্বে লেখা। আর 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ'-শীর্ষক অনুবাদ কবিতাগুলি বাদ দিলে ভারতী, কার্ত্তিক ১২৯১-তে প্রকাশিত 'যোগিয়া' থেকে দু' বছরের মধ্যে লেখা কবিতা 'কড়ি ও কোমল'-এ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে আছে :

কড়ি ও কোমল।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।/ শ্রীআশুতোষ চোধুরী/ কর্ত্তৃক/ সম্পাদিত।/ ৭৮ নং কলেজ স্ট্রীট, পীপল্‌স্ লাইব্রেরি হইতে/ প্রকাশিত।/ মূল্য এক টাকা।

আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় মুদ্রাকরের নাম ইত্যাদি লিখিত হয়েছে : কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।/ ৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।/ সন ১২৯৩।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় সত্যেন্দ্রনাথকে : 'উৎসর্গ।/ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর/ দাদা মহাশয়/ করকমলেষু।' পৃষ্ঠা সংখ্যা : [10]+ল০[২]+২৬৩; মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০।

আগেই বলা হয়েছে যে, 'কড়ি ও কোমল' সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন আশুতোষ চৌধুরী—তিনিই 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' সনেটটি গ্রন্থের প্রথমেই বসিয়ে দেন। এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। 'তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ

পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূলকথা।'[১]

কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনোভাবও অনুরূপ : 'আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপোস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই-সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।'[২]

আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এখানেই জীবনস্মৃতি-র পালা শেষ করেছেন। 'এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখ-দুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবল ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন।'[৩] একটা সময় ছিল 'কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ'—তখন মনের মধ্যে যত চাঞ্চল্য, বাইরে তার প্রকাশ ততটা অকুণ্ঠিত নয়, ভাষা ও ছন্দের উপর যথেষ্ট দখল না থাকাটাও তার একটি কারণ। তাই জীবনস্মৃতির পাঠককে সেই পর্বের অন্তরমহলের ছবিটি এঁকে দিতে তাঁর খুব একটা অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কড়ি ও কোমল-এর সময় থেকেই 'মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে'–এর সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটি জীবন ও রচনায় নানাভাবে ছাপ ফেলে গেছে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য তাঁর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। সেইজন্য 'খাসমহলের দরজার কাছ পর্যন্ত' এসেই তিনি জীবনস্মৃতি-র পাঠকের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে সমকালীন পাঠকদের প্রতিক্রিয়া বিমিশ্র ধরনের। আশুতোষ চৌধুরীর মতো পাঠক এর কবিতাতে কোনো কোনো ফরাসি কবির সঙ্গে ভাবের মিল দেখতে পেয়েছিলেন—আমাদের দুর্ভাগ্য, কোনো প্রবন্ধে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেননি। অনুমান করা যায়, প্রিয়নাথ সেনের মতো ফরাসি কাব্য-রসিক একই রকম মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। এই মুগ্ধতার চরম রূপ দেখা যায় নগেন্দ্রনাথ বসুর 'কড়ি ও কোমল'[৪] সমালোচনায় : '··· 'কড়ি ও কোমল' আজ আমি সমালোচনা করিতে বসি নাই।···আজ আমি প্রতিভার পূজা করিতে আসিয়াছি। সন্দেহ নেই, নগেন্দ্রনাথ বসু এক শ্রেণীর পাঠকের মনোভাব প্রতিফলিত করেছিলেন। সে-তুলনায় নব্যভারত-এর সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী[৫] অনেক সংযমের সঙ্গে কাব্যটির দোষ-গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন : 'অনেক ছাইপাশ ঘাটিয়া আমরা একখানি প্রকৃত কবির হৃদয়ের ছবি পাইয়াছি। আমরা যে আনন্দিত হইয়াছি, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। কড়ি ও কোমল যে জীবনের

ছবি—তাহাতে প্রতিভা আছে, সহৃদয়তা আছে, প্রেম আছে, জ্ঞান আছে। আর তার সঙ্গে একটু বাল-চঞ্চলতাও আছে।'

আর এক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'কাব্যি-সমালোচনা'য়[১] : 'কল্পনা কি ছায়াময়ী? আমি ত বলি, কল্পনা সুস্পষ্ট-অবয়বা, সুদৃষ্ট-ভঙ্গিমতী এবং উজ্জ্বল বর্ণা। কল্পনার প্রিয় সহচরী কবিতাও ত ছায়াময়ী নহে; তবে তোমরা এরূপ কুয়াসার কুহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গ সাহিত্য গো-ধূলি গোধূলি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন? ···

জগদ্গ্রন্থের প্রথম পাঠ না পড়িয়া, আপনাকে আপনারা বুঝিতে না পারিয়া, আত্মপ্রতারিত হইয়া, তোমরা অনর্থক নিরাশার কুহকে পড়িয়াছ, কাজেই কুহেলিকা দেখিতেছ; আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে শিক্ষা করিয়া, সেই বাষ্পময় শ্বাসে কেবল কুহেলিকা নিঃসরণ করিতেছ। না—ও রূপ আর করিও না; ও রূপ চলিবে না।

তোমাদের কথায়, শেলির সেই নদীগর্ভে নৌকার উপর ন-পুং ন-স্ত্রী জীব সৃষ্টি মনে পড়ে। তোমাদের গুরুভক্তি ধন্য; তোমাদের মহাগুরুর আদর্শ---তোমাদের কবিতার সর্বত্রই বিরাজমান। তোমাদের উচ্ছ্বাস—ন কাব্য, —ন কবিতা। কেবল কাব্যি। না মরদ, না মহিলা। কেবল কাব্যি।'

প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হয়নি—কিন্তু লেখাটি পড়লে সমালোচ্য লেখকের পরিচয়টি গোপন থাকে না। অযৌক্তিক সমালোচনা কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সহনীয় ছিল না। বিশেষত অক্ষয়চন্দ্র সরকার রবীন্দ্রনাথের বাল্যাবধি তাঁর রচনার বিরূপ সমালোচনা করে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথও নানাভাবে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হল 'কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' প্রবন্ধে [ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৩/৭১৩-১৭] ':···কাব্যে অনেক সময় দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল লক্ষ করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন, 'ধুয়াঁ', কেহ বলেন, ''ছায়া', কেহ বলেন 'ভাঙা ভাঙা' এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকমহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে 'কাব্যি' নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি অথবা নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।'[২]

অক্ষয়চন্দ্র কবিকঙ্কণ-রচিত ফুল্লরার বারমাস্যা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে 'সার্থক কবিত্ব সার্থক কল্পনা'র উদাহরণ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন : 'ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে' সে তো আরো কবিত্ব। ইহার ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য করিতে গেলে হয়তো ভাষ্যকারের করুণরস উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেও পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকলেই স্বীকার করিবেন ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, যাঁহার নামকরণের ক্ষমতা আছে তিনি ইহার আর-কোনো নাম দিন। যিনি ভঙ্গী করিয়া কথা কহেন তিনি না হয় ইহাকে কাব্যু বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহারও হাসি পাইতেও পারে।'[৩]

এই অংশটুকুর সঙ্গে ভারতী ও বালক-এর ফাল্গুন ১২৯৩-সংখ্যায় মুদ্রিত 'হেঁয়ালি নাট্য'-এর 'আর সকলে ভগ্নী বলে, রসিকবাবু বলেন ভেগ্নী! হা হা হা!'[৪] অংশটি মিলিয়ে পড়লে ব্যঙ্গের লক্ষ্যটি চিনতে ভুল হয় না।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথকেও তীব্র ব্যঙ্গের সম্মুখীন হতে হয়েছে রাহু [কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ]-রচিত 'মিঠে কড়া' [17 Apr 1888 : ৬ বৈশাখ ১২৯৫] ব্যঙ্গকাব্যের মাধ্যমে। বাংলা দেশে রবীন্দ্র-বিরোধীর অভাব

কোনোদিনই ঘটেনি—সুতরাং জনপ্রিয় এই ব্যঙ্গকাব্যটি ১৩২৮ সনেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।[৫]

রবীন্দ্রনাথের আর একটি গ্রন্থ কিছুদিন পরে প্রকাশিত হয়, সেটি হল তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি'। বালক পত্রিকার আষাঢ়-মাঘ ১২৯২ সাতটি সংখ্যায় ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হওয়ার পর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এর পর তত্ত্ববোধিনী-র আষাঢ় সংখ্যার তৃতীয় মলাটে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান যে আশ্বিন মাসের মধ্যেই উপন্যাসটি 'সম্পূর্ণ হইয়া' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে, এ কথা আমরা আগেই জানিয়েছি। বিজ্ঞাপনটি শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যাতেও মুদ্রিত হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্রন্থটি আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়নি। পৌষ-সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী-র দ্বিতীয় মলাটে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় : 'নূতন পুস্তক।/ রাজর্ষি।/ উপন্যাস / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/ মূল্য ১।০ মাত্র।/ ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ এস্ কে লাহিড়ী কোম্পানীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।' কিন্তু উক্ত বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হলেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না, কারণ বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ-অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ 11 Feb 1887 [৩০ মাঘ শুক্র]। গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

রাজর্ষি।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রণীত।/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক/ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ অপার চিৎপুর রোড ৫৫ নং/ সন ১২৯৩ / মূল্য ১ এক টাকা।

পৃষ্ঠা সংখ্যা : [ল০]+২৪২; মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০।

লক্ষণীয়, উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে 'এস্ কে লাহিড়ী কোম্পানীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য' বলে উল্লিখিত হলেও গ্রন্থে তার কোনো উল্লেখ নেই এবং মূল্যেরও পার্থক্য রয়েছে। 30 Apr 1887 এবং পরবর্তী বহু সংখ্যায় মুদ্রিত *The Bengalee*-তে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে s. K. Lahiri & Co. -র 'New Publication' হিশেবে গ্রন্থটি বিজ্ঞাপিত হয়েছে এবং মূল্য ১।০ উল্লেখ সর্বত্র দেখা যায়। এই বৈষম্যের কারণ কী বলা শক্ত। তবে গ্রন্থটির প্রকৃত প্রকাশক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত তাঁর হিসাব-খাতায় দেখা যায় যে, মুদ্রণ ব্যয় সমস্তই তিনি বহন করেছেন এবং গ্রন্থ বিক্রয়ের আয় তাঁর হিসাবেই জমা হয়েছে। এমন-কি ৩ চৈত্র ১২৯৮ [15 Mar 1892] তারিখে ৪৬৬ খণ্ড রাজর্ষি অর্ধমূল্যে ২৩৩ টাকায় বিক্রয় করার হিসাব তাঁর খাতাতেই পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে, বালক-এ রাজর্ষি-র ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হয়েছিল। সপ্তবিংশ থেকে চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ও উপসংহার অংশ গ্রন্থাকারে মুদ্রণকালে লিখিত হয় এবং পরিশিষ্টে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য-প্রেরিত 'রাজরত্নাকর' নামক সংস্কৃত ভাষায় লেখা ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত 'মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যস্য চরিতম্' সংযুক্ত হয়।

পাঠকের দাবী মান্য করে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হল, কিন্তু গ্রন্থের প্রথমাংশের স্বাভাবিক স্ফূর্তি পরবর্তী অংশে রক্ষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথও সে-কথা স্বীকার করেছেন : বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। ফসল-খেতের যেখানে কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়েনি, আগাছায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে।'[১]

জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ'-এর কথা বলেছেন, কিন্তু অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তিনি 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—উপন্যাসটি অবলম্বনে লিখিত নাটক 'বিসর্জন'-এও মোটামুটি অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটনা নাট্যকাহিনী রূপে গৃহীত হয়েছে।

পূর্ণচন্দ্র বসু রাজর্ষি-র একটি দুদীর্ঘ সমালোচনা লেখেন 'কল্পনা' পত্রিকার শ্রাবণ ১২৯৪ সংখ্যায় [পৃ ১২১-৩২]। সেখানে তিনি উপন্যাসটির উক্ত তুটি উল্লেখ করে তার নাটকীয় সম্ভাবনার কথাও ব্যক্ত করেন : 'মুখপাত ভাল দেখিয়া যদি কোন গ্রন্থকে ভাল বলিতে হয়, তবে এ গ্রন্থখানি নিশ্চিত ভাল। যেরূপ উপকরণে ইহার প্রথম ভাগ রচিত, তদ্রুপ উপকরণে যদি ইহার দ্বিতীয় ভাগ গঠিত হইত, তাহা হইলে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় সামগ্রী হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে রূপ উপাদেয় সামগ্রী লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। যাহা হউক, গ্রন্থের প্রথম ভাগ ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র আয়তনে একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ হয়, তাহা প্রায় নাটকীয় গুণে অলঙ্কৃত হইয়া পড়ে। ইহার প্রথম ভাগে তাহাই ঘটিয়াছে। কি দৃশ্য-যোজনা, কি ঘটনা-সংস্থান, কি হৃদয়-বেদনা,সর্ব্বাংশেই এ ভাগকে নাটকীয় রসে পূর্ণ করিয়াছে।'[২] 'কল্পনা' পত্রিকা সাবিত্রী লাইব্রেরির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত—রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার লেখক ছিলেন, সুতরাং এই সমালোচনা নিশ্চয়ই তাঁর চোখে পড়েছিল।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কর্মতৎপরতার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠান নিকটবর্তী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হল। আদি ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি নির্মিত হয়েছিল 1829-30 খৃস্টাব্দে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে বাড়িটির বয়স প্রায় সাতান্ন-আটান্ন বৎসর। বাড়িটি সংস্কারাভাবে জীর্ণ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ১১ মাঘের প্রাতঃকালের উৎসবের জন্য অন্য কোনো স্থান নির্ধারণ করে দেবার প্রার্থনা জানিয়ে প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথকে ২৫ অগ্র° [শুক্র 10 Dec] চুঁচুড়ায় এক পত্র লেখেন। প্রত্যুত্তরে ২৬ অগ্র° মহর্ষি তাঁকে পত্র মারফৎ জানান : '···আমার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে তদুপযোগী স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলাম। সেই স্থানে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা সুসম্পন্ন হইয়া গেলে আমি আহ্লাদিত হইব।'[১] এই নির্দেশ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক স্বাক্ষরিত 'বিজ্ঞাপন' তত্ত্ববোধিনী-র পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

এতদিন পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে অনুষ্ঠিত প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান ছিল বৈচিত্র্যহীন—প্রধানত মহর্ষি-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রী-পুরুষ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের মুষ্টিমেয় সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মহর্ষিভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানটি স্থানান্তরিত হওয়াতে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী নন এমন জনসাধারণও উপস্থিত হন বিপুল পরিমাণে—আগে এঁদের আকর্ষণ ছিল রাত্রের অনুষ্ঠানটির প্রতি। তত্ত্ববোধিনী-তে লেখা হয় : 'এবারে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন মহোৎসব হইয়াছিল। তথায় অতি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপের নিম্নে ও বাহিরে বহু সংখ্য লোক উপবিষ্ট হন। প্রাতঃকালে এরূপ জনতা ও উৎসাহ কখন দৃষ্ট হয় নাই।'[২] রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সাজিয়েছিলেন গানের মালায়—মোট তেরোটি গান অনুষ্ঠানে গীত হয়েছিল—এত গান প্রাতঃকালীন উপাসনায় এর আগে আর কখনও গাওয়া হয়নি, পরেও নয়।

সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের জন্য রবীন্দ্রনাথ মোট ২৬টি গান রচনা করেন—প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের জন্য ১২টি ও ১৪টি[৩] সায়ংকালীন অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য। সকালের গানের মধ্যে মাত্র একটি [সারঙ্গ-ঝাঁপতাল। অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়] বলেন্দ্রনাথের রচনা, অন্যান্যগুলি রবীন্দ্রনাথের—তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টিশীলতার পরিচায়ক।

গানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

[১] গুর্জরী তোড়ি—চৌতাল। প্রভাতে বিমল আনন্দে দ্র তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন। ২১১; গীতবিতান ১। ২১৩; স্বরবিতান ২৩; মূল গান : নাদনগর বসায়ে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ১৭-১৮

[২] রামকেলী—কাওয়ালি। নিকটে দেখিব তোমারে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১১; গীত ১। ১৭৪; স্বর ২৫; মূলগান : আনু আইল ভোর কি দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৮

[৩] হেমখেম—চৌতাল। সবে মিলি গাওরে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৩; গীত ৩। ৮৪৩, স্বর ২৪; মূল গান : সব মিল গাও দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩ ২৬

[৪] আসাবরি-কাওয়ালি। অনেক দিয়েছ নাথ দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৩; গীত ১। ১৬৭-৬৮; স্বর ৪; গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা-তে সুরটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া বলে উল্লিখিত।

[৫] গৌড়সারং—চৌতাল। পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৪; গীত ১। ১৮৩; স্বর ২৪; গানটি পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত জানা গেলেও মূল গানের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি

[৬] যোগিয়া বিভাস—একতালা। নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৪; গীত ১। ১৯২; স্বর ২৭

[৭] ভৈরবী-ঝাঁপতাল। তোমারে জানিনে হে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৪; গীত ৩। ৮৪৪; স্বর ৮

[৮] ভৈঁরো-ঝাঁপতাল। [কেন] বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৪; গীত ১। ১৬৩; স্বর ৮

[৯] দেওগিরি-সুরফাঁকতাল। দেবাধিদেব মহাদেব দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৪; গীত ১। ২০২; স্বর ২৩; মূল গান : দেবনদেব মহাদেব দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৩০

[১০] ভৈরোঁ-একতালা। ভয় হয় পাছে তব নামে আমি দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৪-১৫; গীত ১। ১৯৫; স্বরলিপি নেই [সম্ভবত কীর্তনের সুরে গাওয়া হয়েছিল]

[১১] মিশ্র বিভাস-আড়াঠেকা। এবার বুঝেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৫; গীত ৩। ৮৪৪; স্বর ৪৫

[১২] আলাইয়া—একতালা। বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৫; গীত ১। ৭৭; স্বর ২৫

'রাত্রিকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক আলোক ও গ্যাসালোক এবং পত্র পুষ্পের নানারূপ রচনায় প্রাঙ্গণ অত্যন্ত সুদৃশ্য হইয়াছিল। লোকসমাগমও যথেষ্ট হয়।'[১] এই অধিবেশনে রবীন্দ্র-রচিত ব্রহ্মসংগীতের সংখ্যা চৌদ্দটি :

[১৩] ইমন কল্যাণ-তেওরা। সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৮; গীত ১। ১৭৯; স্বর ২৩; মূল গান : দুষ্ট দুর্জন দূর করো দেবী দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৬৩-৬৪

[১৪] কেদারা-সুরফাঁকতাল। স্বরূপ তাঁর কে জানে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৮-১৯; গীত ৩। ৮৪৩; স্বর ২৭,

[১৫] হাম্বীর—চৌতাল। আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীত ১। ১৯১-৯২; স্বর ৪; মূল গান : আজু রচ্যো করতার দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ১০

[১৬] শঙ্কর-ঝাঁপতাল। কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীত ১। ১৯১; স্বর ২৬; মূল গান : নিডর ডর নমাই, শাহে জহাঙ্গীর দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৪৯-৫০

[১৭] রামপ্রসাদী সুর। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীত ১। ২৪৭; স্বর ৪৭

[১৮] গোঁড়-চৌতাল। তুমি জাগিছ কে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীত ১। ১৮৪; স্বর ২৬; মূল গান : তুম নয়ন মে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ১৪-১৫

[১৯] মূলতান-একতালা। আমার ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীত ৩। ৮৪১; স্বর ২২; গানটি রাজর্ষি উপন্যাসে ধ্রুবের গান হিশেবে রচিত হয়েছিল দ্র রাজর্ষি ২। ৪৫২-৫৩

[২০] পূরবী-চৌতাল। তোমা লাগি নাথ জাগি জাগিহে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীত ১। ১৭৩; স্বর ২২; মূল গান : তুম বিন রহো দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৬

[২১] বেহাগ-চৌতাল। স্বামী তুমি এস আজ দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ১। ১৬৯; স্বর ২৭; মূল গান : সাঁই তো না আওয়ে আজ দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ২৭

[২২] মিশ্র ঝিঁঝিট-কাওয়ালি। চাহিনা সুখে থাকিতে হে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ৩। ৮৪৪-৪৫; স্বর ৮

[২৩] নট্‌মল্লার-চৌতাল। চির দিবস নব মাধুরী দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ১। ২১২; স্বর ২২; মূল গান : নব ভবন নব রাঘব দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ১৭

[২৪] দেশসিন্ধু-একতালা। আমার যা আছে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ১। ৮২; স্বর ৮

[২৫] সাহানা কাওয়ালি। আজ বুঝি আইল প্রিয়তম দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ৩। ৮৪৫; স্বর ২৫; মূল গান : ফুল রহী কলিয়াঁ, মধুবন দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮২।

[২৬] মিশ্র জয়জয়ন্তি-একতালা। তুমি বন্ধু, তুমি নাথ দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ১। ৩৪; স্বর ৪

লক্ষণীয়, ২৬টি গানের মধ্যে কয়েকটি গানে কীর্তন, রামপ্রসাদী প্রভৃতি দেশজ সুর ব্যবহৃত হয়েছে, ১৩টি গান স্পষ্টতই হিন্দি-ভাঙা—আরও কয়েকটি গান শুনলে মনে হয় সেগুলি সম্ভবত পূর্ববর্তী কোনো কোনো গানের সুরের আশ্রয়ে রচিত। এ থেকে বোঝা যায়, একটি সংগীতচর্চার আবহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বাস করছিলেন।

এই বৎসরের মাঘোৎসবের গানগুলি সম্পর্কে তাঁর একটি আনন্দময় স্মৃতির কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন : 'একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন।[১] তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম।···

'একবার মাঘোৎসবের সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।'

'পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

'গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।'[২]

মহর্ষির নিজস্ব হিসাবের ক্যাশবহি-তে এই উপহারের বিবরণ পাওয়া যায় ২৩ মাঘের [4 Feb 1887] হিসাবে : 'ব°বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ দং উঁহাকে দেওয়া যায় গুঃ খোদ বিঃ ৭৭৩ ন বাঙ্গাল বেঙ্কের এক চেক ৫০০৲'। এটি দেওয়া হয়েছিল সম্ভবত আরও আগে—কারণ এই সময়ে মহর্ষি সংকটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত। বর্তমান বৎসরের সরকারী ক্যাশবহিটি পাওয়া যায়নি—সেটি পেলে রবীন্দ্রনাথের এবং পরিবারের আরও অনেকের বহুবার চুঁচুড়া যাওয়ার বিবরণ সংকলন করা যেত।

এর মধ্যে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেছে 28 থেকে 30 Dec 1886 [১৪-১৬ পৌষ] সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরজী। রবীন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি জানকীনাথ ঘোষাল প্রথমাবধি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক। প্রধানত তাঁরই আগ্রহে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। কথিত আছে, বহুবাজার স্ট্রীটের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন হলে প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে শোনান—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'; রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, 'শুনিয়াছি গানটি এই সভা উপলক্ষে রচিত হয়।'[৩] আমরা অবশ্য এই তথ্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি।[৪]

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলে ভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন স্থানে সংবর্ধিত করা হয়। এইরূপ একটি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও সংগীত পরিবেশনের সংবাদ পাওয়া যায় তত্ত্বকৌমুদী-তে : 'জাতীয় সমিতির অভ্যর্থনা—জাতীয় সমিতি উপলক্ষে আগত ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা এবং তাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য বিগত ১লা জানুয়ারি সিটী কলেজ গৃহে একটি সভা হয়। তাহাতে বিদেশীয় ভ্রাতাগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন এবং বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা ও মিঃ নরসিমালু নায়দু তামিল সঙ্গীত করেন।'[৫]

এই বৎসর মাঘোৎসবের অঙ্গ হিশেবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ স্থির করেন তাঁরা একদিন চুঁচুড়ায় গিয়ে মহর্ষিকে অভিনন্দন জানাবেন এবং তাঁর উপদেশ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। মহর্ষির শরীর তখন অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্মতি দিলে ১৭ই মাঘ [শনি 29 Jan] সরস্বতী পূজার দিন 'নানা রঙের নিশান ও ফুলপাতা দিয়া সাজানো একখানি স্টীমারে প্রায় পাঁচশত ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দেবেন্দ্রনাথের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থলপথে আরো অনেক ব্রাহ্ম আসিলেন—সবসুদ্ধ প্রায় হাজার লোক তাঁহার অতিথি। দেবেন্দ্রনাথের স্নানাহারের সময় অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট থাকিত; তাঁহাকে নিয়মিত সময়ে স্নানাহার করাইবার জন্য বিশেষ বিশেষ ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু সেদিন তাঁহার বাড়িতে এত অতিথি; তিনি বেলা ২টা পর্যন্ত সেই ভগ্ন শরীরে আতিথ্যের বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত।···ব্রহ্মসংকীর্তন ও ব্রহ্মোপাসনা হইয়া গেলে আহার হইল এবং তার পরে ২টার সময় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে সভাতে উপস্থিত করিলেন। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিলেন; পণ্ডিত শিবনাথ

শাস্ত্রী মহাশয় অভিনন্দন পাঠ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেই অভিনন্দনের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার আদেশে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী তাহা পড়িলেন।'[১]

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সংবাদটি দিয়ে লেখে : 'গত ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসবের পর কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম সম্প্রদায় চুঁচুড়ায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই শেষদশায় মহর্ষি তাঁহার সযত্নসেবিত ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।···আমন্ত্রিতগণের অভ্যর্থনার জন্য বাবু রবীন্দ্রনাথ এবং বৃদ্ধের পরিবারবর্গ যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। আমন্ত্রিতগণকে সমাদরে ভোজন করাইয়া মহর্ষি ভোজন করেন।···'[২]

কিন্তু এই অনুষ্ঠানের পর মহর্ষি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসকেরা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। মাসাধিককাল এই সংকটজনক অবস্থায় কাটে। ১৫ ফাল্গুন [শনি 26 Feb] রাজনারায়ণ বসু দেওঘর থেকে চুঁচুড়ায় এসে তাঁর ডায়ারিতে লেখেন : 'অদ্য রেলগাড়িতে চুঁচুড়ায় আসি, আসিয়া দেখি প্রধান আচার্য মহাশয়ের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। সকলেই মনে করিলেন যে, অদ্যই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবেন।'[৩] কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থা কেটে গেল। সম্ভবত চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রেরিত স্টীমারে মহর্ষি কলকাতায় আসেন ও চৌরঙ্গিতে তাঁরই একটি বাড়িতে [৩, মিডলটন স্ট্রীট] আশ্রয় গ্রহণ করেন। 18 Apr [৬ বৈশাখ ১২৯৪] *The Hindoo patriot* পত্রিকায় লিখিত হয়, '···we are glad to learn that he has rallied so far that his recovery is considered only a question of time.' এর কিছুদিন পরেই বায়ু-পরিবর্তনের জন্য ১৯ বৈশাখ মহর্ষি দার্জিলিং যাত্রা করেন।

স্বভাবতই এই কয়মাস মহর্ষির পুত্র-কন্যাদি আত্মীয়স্বজন খুবই উদ্বিগ্নভাবে কাটিয়েছেন। ১২৯৩ সালের ক্যাশবহিটি পাওয়া যায়নি, কিন্তু অন্যান্য বৎসরের হিসাবের সূত্রেই আমরা জানি, মহর্ষির কাছে প্রায়ই যাতায়াত করা পুত্রকন্যাদের ও পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের অবশ্যকর্ম ছিল। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও পূর্ব-পূর্ব বৎসরে অনুরূপ যাতায়াতের কিছু কিছু হিসাব আমরা উদ্ধৃত করেছি, ভবিষ্যতেও সেই সুযোগ পাওয়া যাবে। বর্তমান ক্ষেত্রেও, অনুমান করতে বাধা নেই, উদ্বেগক্লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবারই চুঁচুড়া যাতায়াত করেছেন। সম্ভবত এই কারণেই এ সময়ে তাঁর রচনার পরিমাণ বেশ কম। কবিতা তো নেই-ই, একটি মাত্র গান রচনা করেন—'আঁধার সকলই দেখি তোমারে দেখি না যবে'—সম্ভবত পিতার মৃত্যু-আশঙ্কার পটভূমিতে বিরচিত। কানাড়া-আড়াঠেকা-য় নিবদ্ধ গানটি [দ্র গীতবিতান ৩।৯৫৫] তত্ত্ববোধিনী-র চৈত্র-সংখ্যায় [পৃ ২৩৪] মুদ্রিত হয়। সুরটি অবশ্য রক্ষিত হয়নি।

অন্যান্য রচনার প্রকাশ-তালিকাটি দেওয়া হল :

ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৩ [১০/১১] :

৬৮০-৮৩ 'হেঁয়ালিনাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬/৯৮-১০১ ['রসিক'] [উত্তর : 'হানি']

ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৩ [১০/১২] :

৭১৩-১৭ 'কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' দ্র সাহিত্য [১৩৬১] : সংযোজন। ১৬৭-৭২

৭১৮-২২ 'হেঁয়ালি নাট্য' দ্র হাস্যকৌতুক ৬।১০১-০৫ ['গুরুবাক্য'] [উত্তর : 'বাসনা']

আরও অনেকগুলি 'হেঁয়ালিনাট্য'-এর মতো এটিতেও নব্যহিন্দুধর্মধ্বজীদের বিচারপদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-র দ্বিতীয় মলাটে রবীন্দ্রনাথের নামে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উপাসনা বিষয়ে একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় : 'আগামী ৩০ চৈত্র মঙ্গলবার বর্ষশেষ। প্রত্যেকের জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্ন প্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।'

—স্পষ্টতই এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের। পরবর্তী বহু বৎসর এই 'বিজ্ঞাপন'টিই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রুচি সামান্য বিজ্ঞপ্তির ভাষাকেও কিভাবে পরিবর্তিত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, তার এই নিদর্শনটি যথেষ্ট কৌতূহলজনক।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য :১

১২৯৩ বঙ্গাব্দে ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক বিবরণে সবচেয়ে মুখ্য বিষয় মহর্ষির অসুস্থতা। এই বৎসর দুই দফায় তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন : 'তাঁহার মনের ইচ্ছা ছিল যে জীবনের বাকি কয়টা দিন বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে কোনো নির্জন জায়গায় কাটাইয়া দিবেন।' সেই ইচ্ছানুযায়ী পৌষ ১২৯২-এর মাঝামাঝি [Dec 1885] তিনি বোম্বাই যাত্রা করেন। কয়েকদিন আমেদাবাদে অবস্থান করে তিনি বোম্বাইয়ের বন্দোরা [Bandra] অঞ্চলে সমুদ্রতীরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতে থাকেন। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩-এ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে চুঁচুড়ায় নিয়ে আসা হয়, এ সম্পর্কে আমরা আগেই লিখেছি। তিনি দ্বিতীয়বার অসুস্থ হন মাঘমাসের মাঝামাঝি। জ্বর ও পেটের অসুখে তাঁর অবস্থা এমনই সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায় যে সকলেই তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দেন। কিন্তু আশ্চর্যভাবে এ যাত্রাও তিনি বেঁচে ওঠেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৭০ বৎসর।

৩০ শ্রাবণ [শনি 14 Aug] হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হয়। তাঁর দিদি কবি প্রসন্নময়ী দেবীর রচনায় এই বিবাহের একটি পটভূমিকা আনুষঙ্গিক বিবরণ-সহ পাওয়া যায়, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও উক্ত রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি : '...খুল্লতাতের মুখে সবিশেষ অবগত হইয়া মনোমত পাত্র বিবেচনায় প্রতিভাদেবীও মনে মনে আশুকেই বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কথাটা ভ্রাতার কর্ণগোচর হইল। ক্রমে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। পিতৃদেবের মত না হইলে ত আশু বিবাহে সম্মত হইবে না। অবশেষে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করা হইল। তিনি কন্যার রূপ গুণের সুখ্যাতি চারিদিকে শুনিয়া ঐ কন্যার সহিতই পুত্রের বিবাহে মত দিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রতীক্ষা করিবার আর সময় পাওয়া গেল না ও বেশী দরদস্তুর হইল না। পিতৃদেবের অনুপস্থিতিতে শ্রীমান যোগেশ, কুমুদ, প্রমথ, মনো উপস্থিত থাকিয়া

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে "দাদার" বিবাহ দিয়া নববধূ গৃহে আনিল। পিতৃদেব দিনাজপুরেই রহিয়া গেলেন। স্কট্স লেনের ক্ষুদ্র বাড়ীতে আশুরা তেমনি রহিল! ...তকালে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ও সত্য [প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়] বাবু আশুর গৃহে সদাসর্ব্বদা আসিয়া ক্ষুদ্র গৃহটীকে আনন্দ নিকেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন।:-মহর্ষিদেব আশুর সহিত পৌত্রীর বিবাহ দিয়া বড় আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন "আশু আমার একটা অর্জ্জন। অনেক সাধনায় প্রতিভা এমন পাত্রে পরিণীতা হইয়াছে।"[১]

এই বিবাহ মহর্ষির কাছে অন্য কারণেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঠাকুর পরিবার ছিলেন রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, চৌধুরীরা বারেন্দ্র—বল্লালসেনের আমল থেকে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং 'শ্রেণীভঙ্গ' করে এই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে একে 'সমাজ সংস্কার' আখ্যা দিয়ে লেখা হয় : '...ইনিই মহারাজ বল্লালের ৮০০ শত বৎসর পরে এই শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিবার সূত্রপাত করিলেন। '...রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির ভ্রাতারা সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া এত দিনের পর একহৃদয় একপ্রাণ হইল, এবং বহু দিনের পর কবি ভট্টনারায়ণের এক বংশধর হইতে এই বিবাদ সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গেল।'[২]

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে আর একটি পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল। মহর্ষি বাড়িতে মূর্তিপূজা বন্ধ করে দেবার পর গিরীন্দ্রনাথের স্ত্রী যোগমায়া দেবী যখন বৈঠকখানা বাড়িতে উঠে যান, তারপর থেকে দুই পরিবারের পুরুষদের মধ্যে আসা-যাওয়া অব্যাহত থাকলেও মেয়েদের মধ্যে যেন পাঁচিল উঠে গিয়েছিল—বিবাহ ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানেও এক বাড়ির মেয়েরা অন্য বাড়িতে যেতেন না। কিন্তু বর্তমান বৎসরে একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে : 'শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর এ বাটীতে আয়ুবড় ভাত খাওয়াইবার মধ্যে আসাযাওয়ার পাল্কী ভাড়া ২৫ ফাল্গুনের ১ বৌচর'। অনুরূপ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ হয়েছিল বৈঠকখানা বাড়িতে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা দীর্ঘদিন পরে ঘটল। কয়েকদিন পরেই সুনয়নী দেবীর বিবাহ হয় রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এঁর দুই দাদা মোহিনীমোহন ও রমণীমোহন দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা। আবার ১৩ চৈত্রের হিসাব : 'শ্রীযুত গগনবাবু মহাশয়ের স্ত্রী ও সুনয়নী দেবী এ বাটিতে আসায় খাবার ক্রয়'—গগনেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রমোদকুমারী সত্যপ্রসাদের স্ত্রী নরেন্দ্রবালার সেজ বোন। মনে হয়, নানাবিধ সম্পর্কের এই টানাপোড়েনেই দুটি পরিবারের ছিন্ন সূত্র জোড়া লেগেছিল।

বৈশাখ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ, শরৎকুমারী দেবীর পুত্র যশঃপ্রকাশ ও জ্ঞানপ্রকাশ এবং বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র সরোজচন্দ্র ও প্রমোদচন্দ্রের উপনয়ন হয়। উপনয়ন উপলক্ষে প্রত্যেকে আদি সমাজে চার টাকা করে 'আনুষ্ঠানিক দান' করেন। [দ্র তত্ত্ব°, আশ্বিন। ১২০]। আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই উপলক্ষে 'আশীর্বাদ' কবিতা রচনা করেন।

৯ কার্ত্তিক [সোম 25 Oct] রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান মাধুরীলতা [বেলা]-র জন্ম হয়।

ইন্দিরা দেবী লরেটো হাউস থেকে 1887-এ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিশেবে রবীন্দ্রনাথ এই সমাজের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁর জীবন-বর্ণনা সূত্রেই আমরা সমাজের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর বেদীর অধিকার নিয়ে নববিধান সমাজে যে স্বার্থ-সংঘাতের সূত্রপাত হয়, তার ফলে এই সমাজের কাজকর্ম অচলাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তখন বৃহত্তম সভ্যসংখ্যা নিয়ে কর্মচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। এ ব্যাপারে তাঁরা আদি সমাজের সঙ্গে যে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, বর্তমান বৎসরেও তা অব্যাহত থেকেছে। নববর্ষের উৎসবে তাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন, আবার মাঘোৎসবের অঙ্গ রূপে ১৭ মাঘ [শনি 29 Jan 1887] মহর্ষিকে অভিনন্দন পত্র দেবার উদ্দেশ্যে স্টীমারে ও রেলপথে তাঁর চুঁচুড়ার বাসভবনে গমন করেন। সেখানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে একটি ও এই সমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দনপত্র মহর্ষিকে দেওয়া হয়। মহর্ষি আলাদা করে দু'টি অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। 'তার পরে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "উপহার" বা ব্রাহ্মদিগের প্রতি তাঁহার শেষ উপদেশ দিলেন। সে "উপহার" ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও অনুশাসনেরই সংক্ষিপ্তসারের মতো।'[১] এই 'উপহার' ও তার ইংরেজি অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

1886-এ কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যে-সমস্ত ব্রাহ্ম প্রতিনিধি আসেন, তাঁদের সংবর্ধনার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'বিগত ৩১এ ডিসেম্বর [শুক্র ১৭ পৌষ] ছাত্রসমাজের উদ্‌যোগে সিটী কলেজ গৃহে একটি সভা হয়। জাতীয় সমিতি (ন্যাসন্যাল কংগ্রেস) উপলক্ষে দেশের নানা স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিদিগের মনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে দেশের কর্ত্তব্যজ্ঞান মুদ্রিত করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। বোম্বাই মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানবাসী বহু সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবার্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনেকগুলি ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। ১লা জানুয়ারি উপাসনা মন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইহাতেও জাতীয় সমিতির সভ্যগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।'[২] আমরা অন্যত্র বলেছি, রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে ব্রাহ্ম প্রতিনিধিদের এইরূপ সম্মেলন কয়েক বছর পর 1889-এ বোম্বাইতে Theistic Conference রূপে সংগঠিত হয়।

১ ভাদ্র [সোম 16 Aug] ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেহত্যাগ করেন। খুবই আশ্চর্য যে, তত্ত্ববোধিনী-তে এ-সম্পর্কে কোনো সংবাদ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। বরং পর বৎসর 2 Dec 1887 [শুক্র ১৭ অগ্র° ১২৯৪] দ্বিজেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত থিয়োলজিক্যাল সোসাইটিতে 'সমাধি' বিষয়টিকে সমালোচনা করে একটি বক্তৃতা দেন ও ঐ মাসের ভারতী ও বালক-এ 'সমাধি বস্তুটা কি?' শিরোনামে [পৃ ৪৩৭-৫৪] প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

১২৯৩ বঙ্গাব্দের শুরুতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরা মিলিত হয়ে 'ভাই-বোন-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গুণেন্দ্রনাথদের 'কমিটি অব্ ফাইভ'-পরিচালিত জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বিদ্বজ্জন সমাগম, সারস্বত সমাজ, ড্রামাটিক ক্লাব, খামখেয়ালী সভা, বিচিত্রা—এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতির ইতিহাসটি খুব ছোটো নয়। এর মধ্যে প্রথমটি ছাড়া আর সবগুলির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন [জীবনস্মৃতির বর্ণনা-সূত্রে প্রথমটিও বিখ্যাত]—ফলে উক্ত সভাগুলি সম্পর্কে সকলেই কম-বেশি ওয়াকিবহাল। কিন্তু 'ভাই-বোন-সমিতি'র সেই পরিচিতি নেই। এইজন্য সমিতিটি সম্পর্কে সামান্য যে তথ্য পাওয়া যায়, এখানে সংকলন করে দেওয়া হচ্ছে।

এই ধরনের একটি সমিতি স্থাপন করা হয়েছে জেনে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সাজাদপুর জমিদারী কাছারী' থেকে ২৯ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 11 Jun] জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কোনো ছেলেকে [? হিতেন্দ্রনাথ] যে চিঠিটি[১] লিখেছিলেন, এই সমিতি সংক্রান্ত তথ্যের সেইটিই প্রধান আকর। তিনি লিখছেন : 'তোমরা যে "ভাই-বোন্ সমিতি" স্থাপন করেছ, তা-থেকে নানান্ কথা আমার মনে আসছে—কৈ—তোমাদের এই বয়সে, "ভাই-বোন্ সমিতি"র মত কোনও উচ্চতর কল্পনা তো আমাদের মাথায় আসেনি। সব ভাই বোন্ মিলে জ্ঞানের চর্চ্চা করা —বড় ভাই ছোট ভাইয়ের শিক্ষার ভার স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করা—পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধন করবার চেষ্টা করা—জ্ঞান চর্চ্চা ও কর্ত্তব্য-সাধনের উচ্চতর আনন্দ এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীতের বিশুদ্ধ আমোদ বিশুদ্ধভাবে উপভোগ করা—এ প্রকার ভাব, সেকালে আমাদের মনে তো উদয় হয়নি'—এর মধ্য থেকে আমরা সমিতিটির ঘোষিত উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে জানতে পারি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পত্রটি শেষ করেছেন এই উপদেশ দিয়ে : 'যেমন তোমাদের মধ্যে কেহ বা বিজ্ঞানশিক্ষা—কেহ বা সঙ্গীত শিক্ষা দেবার ভার নিয়েছ—সেইরূপ কেহ যদি ব্যায়াম শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ কর তো ভাল হয়।' প্রকৃতপক্ষে হেমেন্দ্রনাথ এক সময়ে স্বেচ্ছাবৃত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ প্রভৃতি বালকদের, এমন-কি জ্ঞানদানন্দিনী প্রভৃতি ভ্রাতৃজায়াদেরও, শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু অভিভাবকত্বের দূরত্ব ও শাসনবিধির কঠোরতা তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছাটি অনুভব করায় বাধা দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সাহিত্য ও সংগীত-চর্চায় রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে 'সমশ্রেণীতে' 'প্রমোশন' দিয়েছিলেন। কিন্তু এগুলি তো ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যাপার, সেইজন্য 'সমিতি' স্থাপন করে পাম্পরিক সহযোগিতার চেষ্টাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল।

সম্ভবত ১২৯৫ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবের সময়ে ভাই-বোন-সমিতি-র এক সভায় দ্বিজেন্দ্রনাথ আচার্য-রূপে 'উপদেশ'[২] দেন। এইটি থেকে আমরা সমিতির সদস্যদের সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলেছেন : '…কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের পাতা গজ্য়েচে বা গজাচ্চে—যেমন বর্তমান সমিতি[র] উদ্যোগী শ্রীমান্ বাবাজিদিগের অন্তঃকরণে; কে তাঁরা? না

হিতু নীতু ক্ষিতু কৃতু, সুরেন বিবি, বলু সুধী।
জ্যোৎস্না সরলা—কি আর বল্‌ব—সর্ব্বগুণে গুণাম্বুধি ॥'

অর্থাৎ তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র-ভ্রাতুস্পুত্রী-ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের মধ্যে অনেকেই এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—যাঁদের নাম এখানে নেই তাঁরা যে এই দলে ছিলেন না, এমন কথা বলা যায় না।

সমিতির খরচপত্রাদি বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে পাওয়া চাঁদার দ্বারা নির্বাহিত হত। সত্যপ্রসাদের ব্যক্তিগত হিসাব-খাতায় ৩০ চৈত্র ১২৯৫-এর একটি হিসাব : 'ভাইবোন সমিতির চৈত্র মাস তক চাঁদা শোধ—৩্', আবার ২০ বৈশাখ ১২৯৬ তিনি বৈশাখ মাসের দরুন ১ টাকা চাঁদা দিয়েছেন।এইরূপ মাসিক চাঁদা নিশ্চয়ই অন্যদের কাছ থেকেও আদায় করা হত।

ভাই-বোন-সমিতি-র ঘোষিত বহুবিধ উদ্দেশ্য সম্ভবত সাহিত্য-চর্চায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত পত্রটি অবলম্বনে বলেন্দ্রনাথ সমিতির এক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; 'ভাইবোন-সমিতি প্রবন্ধপাঠে' শিরোনামে প্রবন্ধটি তিনি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামক বিখ্যাত পাণ্ডুলিপি-খাতায় লিখে রাখেন[১]—সেই প্রবন্ধটি থেকেই এই প্রবণতাটির কথা জানা যায়। এই সমিতি সম্বন্ধে সর্বশেষ উল্লেখ উক্ত খাতায় ১৪ বৈশাখ ১২৯৭ [শনি 26 Apr 1890] তারিখে লিখিত ঋতেন্দ্রনাথের 'ভাই বোন সমিতি—গাড়ি'-শীর্ষক প্রস্তাবেও[২] প্রবণতাটির সমালোচনা করে লেখা হয়েছে : 'অলস বাবুমাত্রেরই জুড়ি গাড়িতে চেপে হাওয়া খাবার ইচ্ছে হয়। সাহিত্যপ্রিয় অলস্ বাবুরাও সেইরূপ কোন এক সমিতিরূপ্ জুড়ি গাড়িতে চেপে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করতে ইচ্ছা করেন। আমরাও আর বচ্ছরে বেড়াবার জন্য এইরকম একটী গাড়ী করেছিলুম্ সেটা মধ্যে ভেঙে যাওয়াতে আবার সারিয়ে ফেলা গেছে। আমরা হচ্ছি বাবু আমরা বেড়াতে যাব।…সাহিত্য ও সঙ্গীত জুড়ি ঘোঁড়া। স্থায়ী সভাপতি মহাশয়কে বাবুরা চালক্ ঠিক্ করেছেন্। ঘোড়ার পিছনে যে দুজন্ করে সহিস থাকে তাও এর আছে সেসব বিষয়ে কোন ত্রুটি নাই তবে যে বাবুরা দানরুপ দানা দেন্ সেটা এক্‌বার দেখা ভাল যে সহিসরা্ ঘোঁড়াকে খাওয়ায় কি না।'

ভাই-বোন-সমিতি সম্পর্কে এর পরে আরও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

1886-এর 28-30 Dec [মঙ্গল-বৃহ ১৪-১৬ পৌষ] কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় অধিবেশন করার প্রস্তাব আগের বছরেই গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া বাংলা দেশে কোনো রাজনৈতিক সম্মেলনকে সফল করা শক্ত এই বিবেচনায় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিঃ হিউম কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে কংগ্রেসে যোগ দিতে সম্মত করান। আগের বারের তুলনায় এবার কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধি সংখ্যাও ছিল অধিক—গত বছর মাত্র ৭২ জন প্রতিনিধি-রূপে উপস্থিত ছিলেন—এবারের সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৩১ জন।[৩] তাছাড়া দর্শকদের উপস্থিতিও ছিল বিপুল—ফলে প্রথম দিন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে সকলের স্থান-সংকুলান না হওয়ায়, পরের দু'দিন প্রশস্ত টাউন হলে সভার আয়োজন করতে হয়।

মূল অধিবেশনের পূর্বদিন [27 Dec সোম ১৩ পৌষ] একটি সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। মূল সভাপতি দাদাভাই নৌরজী এই সভাতেও সভাপতিত্ব

করেন। ব্যারিস্টার আমীর আলির নেতৃত্বে গঠিত মুসলমান সমিতি মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের বিরোধিতা করে। ফলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার আলোচনা এই সভায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। উত্তর প্রদেশের নবাব রেজা আলি খাঁ ও বোম্বাইয়ের রহিমতুল্লা এম. সেয়ানী এক শ্রেণীর মুসলমানের বিরোধিতার তীব্র নিন্দা করেন। ৩৮ জন মুসলমান প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন।

তিন দিনের অধিবেশনে মোট ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্নসমূহ আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন ও কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ এই অধিবেশনের উল্লেযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পঞ্চদশ প্রস্তাবে সভা অভ্যর্থনা সমিতি, জানকীনাথ ঘোষাল ও গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ প্রদান করে।

রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনের শুরুতে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গেয়েছিলেন বলে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা সমকালীন যে-ক'টি সংবাদপত্রাদি দেখেছি, তার কোনোটিতেই এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়নি। আমাদের অনুমান, 1 Jan 1887 [শনি ১৮ পৌষ] কংগ্রেস উপলক্ষে আগত ব্রাহ্মপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনার জন্য সিটি কলেজ হলে যে অনুষ্ঠান হয়, রবীন্দ্রনাথ সেখানেই এই গানটি পরিবেশন করেন। ব্রাহ্মদের সভায় গাইবার জন্য রচিত হওয়ায় সহজেই গানটি পরবর্তী মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণ-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয় 16 Feb 1887 [বুধ ৫ ফাল্গুন] তারিখে। ক্যাশবহির হিসাবে দেখা যায়, 'ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে বাটীতে আলো দিবার ব্যয় ৫ লত'—অন্যান্য জমিদারদের তুলনায় খুবই সামান্য ব্যয়, কিন্তু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও যে উপলক্ষটি উদ্‌যাপিত হয়েছে এই খবরটির তাৎপর্য কম নয়। 1875-এ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কলকাতা আগমন উপলক্ষে তাঁকে দেখবার জন্য ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে বহুবাজারে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল [দ্র রবিজীবনী ১।২৬৬], Jan 1890-তে 'প্রিন্স অলবারট ভিক্টর আগমন উপলক্ষে রিসেপসন কমিটি (ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে) দান' হিসেবে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে; আবার 22 Jan 1901-এ মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর মাঘোৎসবের সায়ংকালীন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ শোক-প্রবন্ধ সাম্রাজ্যেশ্বরী' পাঠ করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কেউই উপাধি-লোলুপতার জন্য রাজভক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হননি বটে, কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ শাসক-পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কোনো অভাব তাঁদের মধ্যে দেখা যায়নি।

এই কংগ্রেসের সময়ের একটি ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথ পুলিনবিহারী সেনকে লিখেছিলেন 20 Nov 1937 [৪ অগ্র ১৩৪৪] তারিখের চিঠিতে : 'তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল রাজপ্রাসাদের দুর্গম উচ্চ শিখর থেকে প্রসাদকণা বর্ষণের প্রত্যাশায়। একদা কোনো জায়গায় তাঁদের কয়েকজনের সান্ধ্য বৈঠক বসবার কথা ছিল তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি। আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে না। শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনা করেছিলেম —

আমায় বোলো না গাহিতে ইত্যাদি —

এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হন নি।' রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথা *On the Edges of Time* (1981, pp 8-9) ও 'পিতৃস্মৃতি' [১৩৭৮, পৃ ১১-১২]-তে ঘটনাটির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত [1831-1914]-কে উক্ত 'পরিচিত ব্যক্তি' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অনুষ্ঠানে 'যাবার পূর্বক্ষণেই' 'আমায় বোলো না গাহিতে' [কড়ি ও কোমল ২। ১০৯-১০, 'বঙ্গবাসীর প্রতি'] গানটি রচনা সম্পর্কে আমাদের কিছু সংশয় আছে। উক্ত অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই কংগ্রেস অধিবেশনের সমকালে [অর্থাৎ Dec 1886-এর শেষে বা Jan 1887-এর প্রথমে] আয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। সুতরাং মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি এ-বিষয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিল।

---

১ ছিন্নপত্র। ১১, পত্র ৩। এই দিনই কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে একটি পত্র লেখেন : 'আপনার কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে—ভারতীতে পাঠাইয়া দিব।' দ্র সা-সা-চ ৮৩/৩৪; নববর্ষ শীর্ষক কবিতাটি ভারতী ও বালক-এর বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

২ রবীন্দ্রবীক্ষা ৪ [১৩৮৪-৮৫]। ৮৩

৩ ছিন্নপত্র। ১৩, পত্র ৪

৪ রবীন্দ্রবীক্ষা ৪/৮৪ : বালক-এর চৈত্র সংখ্যায় (পৃ ৫৮১-৮৫] প্রবোধচন্দ্র 'গয়া' নামে একটি ভ্রমণকাহিনী লেখেন

৫ ঐ ৪।৮৪, এই পত্রাংশটি একটু তথ্যগত সমস্যা সৃষ্টি করে। খামে '30APR86' পাওয়া গেলেও ত্রের বক্তব্য অনুযায়ী এটি লিখিত হয় ২৫ বৈশাখ [শুক্র 7 May]

১ দ্র জীবনের ঝরাপাতা। ৫২

২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪২৯

৩ রবীন্দ্রনাথ [১৩৬৮]। ২২-২৩

৪ ঐ। ২৩; গানটির ইন্দিরা দেবী-সংগৃহীত শুদ্ধ পাঠ: 'জিন ছুঁয়া মোরি 'বেঁয়া নগরওয়া' [রামকেলি ত্রিতাল], দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩/৭৯-৮০; বৎসরাধিক পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গানটি ভেঙে 'আখিজল মুছাইলে জননী' ব্রহ্মসংগীতটি রচনা করেন, দ্র তত্ত্ব° অগ্র° ১২৯১।১৬৬

৫ রবীন্দ্রস্মৃতি। ২২

১ দীনেশচন্দ্র সেন, 'দীনেশচরণ বসু', প্রদীপ [২।৩ ফাল্গুন ১৩০৫। ৭৪; সা-সা-চ ২। ৪২ ৩৩-এ উদ্ধৃত।

২ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২২০-২১, গ্রন্থপরিচয়

৩ ঐ। ২২১

৪ দ্র রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী। ১৮৮-৯১

১ দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯।৫০

২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫০১

৩ রবীন্দ্রবীক্ষা ৪।৮৪

৪ খামের গোলমালে পত্রটি দীর্ঘদিন '৩০ অক্টোবর ১৮৮৫' তারিখ-যুক্ত হয়ে 'ছিন্নপত্র'-তে মুদ্রিত হত। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ফাইলে একটি খামে পোস্টমার্ক 'BAND.....24 JUN' দেখে তারিখটি সংশোধিত হয়েছে।

৫ ছিন্নপত্র। ৭, পত্র ১

১ চিঠিপত্র ৮।২১, পত্র ২৭

২ চিঠিপত্র ৮।৪৫-৪৬, পত্র ৬১। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, 'পত্রখানি নাসিক হইতে ১৮৮৬ জুলাই ১৩ (১২৯৩ আষাঢ় ৩০) প্রিয়নাথ সেনকে কলিকাতায় লিখিত' দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ২০২, কিন্তু তাঁর তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি। প্রিয়নাথ ৪ শ্রাবণ [19 Jul অর্থাৎ ১।২ শ্রাবণ] পত্রটির উত্তর দিতে গিয়ে লেখেন, 'তোমার স্নেহ-মমতাপূর্ণ ক্ষুদ্র পত্রখানি আজ দিন চার হ'ল পেয়েছি' দ্র চিঠিপত্র, ৮।২৩৭, পত্র ৪। তখনকার দিনে নাসিক থেকে এত কম সময়ে, কলকাতায় পত্র পৌঁছানো সম্ভব ছিল না।

১ জীবনস্মৃতি ১৭/৪৩২

২ 'নাসিক হইতে খুড়ার পত্র', ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৩।৩২৬; প্রহাসিনী ২৩।৪১

১ 'দশদিনের ছুটি', বালক, বৈশাখ ১২৯২।

২ 'চিঠি', ঐ ফাল্গুন ১২৯২। ৫১৮-১১

৩ 'জন্মতিথির উপহার' বালক, চৈত্র ১২৯২।৫৬১

৪ চিঠিপত্র ৮/৪৫, পত্র ৬১

৫ চিঠিপত্র ৮/২১, পত্র ২৭

১ জীবনস্মৃতি ১৭।৪২৯

২ শ্রাবণ-সংখ্যায় 'কাব্যজগৎ'-এর যে কিস্তি মুদ্রিত হয়, তাতে 'গোটিয়ে-র একটি ফরাসী কবিতার অনুবাদ আছে—'বলরে যুবতী বালা কোথা যাবি তুই?'—তার নীচে 'T' অক্ষরটি লেখা, এটি কি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ? কবিতাটির সঙ্গে সোনার তরী-র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার দূরান্বিত সাদৃশ্য আছে। দ্র ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র চর্যা। ৯৯

৩ রবীন্দ্রনাথ। ২৫

৪ জীবনস্মৃতি ১৭।৪২৯-৩০

১ ড. সুকুমার সেন নাটকটির পুরো নাম উল্লেখ করেছেন 'রায়গড়াধিপ রাজা বসন্ত রায়'। তিনি লিখেছেন : 'প্রথম অভিনয় হইয়াছিল নবসংস্কৃত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (৬ বিডন স্ট্রীট)২০ আষাঢ় ১২৯৩ সালে রাত্রি নয় ঘটিকায়।' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২ [১৩৮৬]/৩৬৫

২ দ্র শিশির বসু, একশ বছরের বাংলা থিয়েটার। ২৩০-৩১; হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ [1947]! ১২১

৩ দ্র হরীন্দ্রনাথ দত্ত, 'রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথ : স্মৃতিচারণ', মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ [1978]। ১৮; ইনি জানিয়েছেন : 'ঐ গানটির রেকর্ড আছে বেদানা দাসীর।'

৪ "১১, ৬ ১৯৫৩ তারিখের একখানি চিঠিতে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় আমাদের জানাইয়াছেন, রাধারমণ করের [ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর ও রাধামাধব করের ভ্রাতা, এঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমার সঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদের বিবাহ হয়] আগ্রহে ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতিতে কেদারনাথ চৌধুরী 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর এই নাট্যরূপ প্রণয়ন করেন।" গীতবিতান ৩[1957]। ৯৭৮

৫ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩৪

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৩। ২৭৬

২ ঐ ২। ৩৬৫

৩ দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫।১৫২, পত্র ১৯

১ 'কড়ি ও কোমলের ছন্দ পরিচয়', বি: ভা: প ৭।২, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৫।১১৮

২ 'সাবিত্রী।/ অর্থাৎ/ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে/ পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে/ পুরস্কার প্রাপ্ত নারী রচনা।/ সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।/ পিপেলস লাইব্রেরী,/ ৭৮নং কলেজ স্ট্রীট-কলিকাতা/ আশ্বিন, ১২৯৩ সাল।

১ দ্র বিশ্বনাথ রায়, 'বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ', সাহিত্য ও সংস্কৃতি [১৭। ১] বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৮।৬১-৮২

১ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫৫-৫৬

২ দ্র পুস্পাঞ্জলি-পাণ্ডুলিপি, পৃ 6

৩ চিঠিপত্র ১। ৬৮ পত্র ৩৪

১ জীবনস্মৃতি ১৭।৪২৯-৩০

২ ঐ ১৭।৪২৮

৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪৩২

৪ কল্পনা, আষাঢ় ১২৯৪ [৫। ৩]। ১০২-০৬

৫ নব্যভারত, অগ্র° ১২৯৪ [৫। ৮]। ৪৩৫-৩৮

১ নবজীবন, অগ্র° ১২৯৩ [৩।৫]। ৩১৫-২০

২ সাহিত্য [শ্রাবণ ১৩৬১]। ১৬৮

৩ ঐ। ১৭০

৪ দ্র 'রসিক', হাস্যকৌতুক ৬। ৯৯

৫ দ্র 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী'। ১৮৫

১ 'সূচনা', রাজর্ষি ২। ৩৭৩

২ কল্পনা, শ্রাবণ ১২৯৪ [৫। ৪]। ১২১

১ দ্র তত্ত্ব°, পৌষ ১৮০৮ শক। ১৭৯; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [১৩৭৫]। ২০১-০২

২ তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮০৮ শক। ২০৭

৩ এর মধ্যে দু'টি—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' এবং 'আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায়' —ভিন্ন প্রয়োজনে লেখা।

১ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৫

১ দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ২৯৫

২ ঐ ১৭। ৩১৭

৩ রবীন্দ্রজীবনী ১। ২২০

৪. দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

৫ তত্ত্ব-কৌমুদী, ১ মাঘ ১৮০৮ শক [৯। ১৯]। ২২৫

১ অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৩৭৭]। ৫০২

২ সোমপ্রকাশ, ২৬ মাঘ [৩১। ১১]। ১৬৬

৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫০৩

১ প্রসন্নময়ী দেবী, 'আশুতোষ', ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩২। ৫০৯

২ 'সমাজ সংস্কার', তত্ত্ব°, আশ্বিন ১৮০৮ শক। ১১৭

১ অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। ৫০২

২ তত্ত্ব-কৌমুদী, ১ মাঘ [৯। ১৯] ২২৫

১ পত্রটি 'ভুক্তভোগীর পত্র' নামে ভারতী, শ্রাবণ ১৩২০। ৪৪৯-৫৫-এ মুদ্রিত হয়, আমাদের ধারণা, পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ ৫৭-সংখ্যক প্রস্তাবরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই পত্রটি নকল করে রেখেছিলেন, পরবর্তীকালে পাতাগুলি খুলে নিয়ে সম্পাদকীয় টীকা-সহ ভারতী-তে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধারযোগ্য : '…ওদিকে আবার আর একটি "নব ভানু" আমাদের পারিবারিক সাহিত্য-আকাশে উদয় হয়েছিল—সেই ভানু এখন পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করচে এবং তার প্রদীপ্ত কিরণ এখন আমাদের পারিবারিক গগনকে অতিক্রম করে' সমস্ত বঙ্গভূমিকে আলোকিত করচে।

"ভারতী পত্রিকা" এই পারিবারিক সাহিত্য-আন্দোলনের আর একটি ফল। এই পত্রিকা আমাদের জ্ঞানচর্চ্চার একটি উর্ব্বর ক্ষেত্রস্বরূপ। উহাতে যে সকল সাহিত্য-বীজ রোপণ করা হয়েছিল, তা রবির কিরণে, সতেজ ও পরিপুষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয়ে এখন স্বর্ণফল প্রসব করচে!'

২ 'ভাই বোন সমিতি।/আচার্য্যের উপদেশ', তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮১০ শক। ২১৩-১৬

১ দ্র ড পশুপতি শাশমল, 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে বলেন্দ্রনাথ', বি. ভা. প., কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৭ [২৭।২]। ১৫১-৫২

২ ঐ।১৫৩

৩ দ্র Bimanbehari & Bhakat Prasad Mazumdar, *Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era 1885-1917* [1967], p. 18

সপ্তবিংশ অধ্যায়

১২৯৪ [1887-৪৪] ১৮০৯ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের সপ্তবিংশ বৎসর

'১ বৈশাখ [বুধ 13 Apr 1887] নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্ন প্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্তে' মহর্ষিভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনার আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি কোনো গান রচনা করেননি—হয়তো পুরোনো কোনো গানেই নববর্ষকে বরণ করা হয়েছিল।

আমরা আগেই বলেছি, বহু আত্মীয়-পরিকীর্ণ জোড়াসাঁকোর বাড়ির চেয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ভাড়াটে বাড়ির বিদগ্ধ পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের বেশি ভালো লাগত। তাই ছবি ও গান রচনার সময় থেকেই [১২৯০ : 1883] তাঁকে অনেক সময়ে দেখা গেছে লোয়ার সার্কুলার রোড, পার্ক স্ট্রীটের খোলামেলা আবহাওয়ায়। তাঁর সমগ্র জীবনে আমরা বারবার দেখেছি যে, গতানুগতিকতা তাঁকে পীড়িত করে—একই ধরনের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্তির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছেন; বর্তমান ক্ষেত্রে বাড়ি বদল তারই স্বল্পব্যয়-সাপেক্ষ সংস্করণ। ইন্দিরা দেবী জানিয়েছেন, মাধুরীলতার জন্মের এক মাস পর থেকেই পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বর্তমান বৎসরের শুরুতে রবীন্দ্রনাথও আনুষ্ঠানিক ভাবে 'বাসস্থান পরিবর্তন' করলেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে 'পত্র' কবিতায় লিখলেন :

দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়,   চুকেছে লোকের ভিড়;
বকুনির বিড় বিড় গেছে থেমে থুমে।···
যারা আছে কাছাকাছি   তাহাদের নিয়ে আছি—
শুধু ভালোবেসে বাঁচি, বাঁচি যত কাল।
কিছু নাহি করি দাওয়া,   ছাতে বসে খাই হাওয়া
যতটুকু পড়ে-পাওয়া ততটুকু ভালো—
যারা মোরে ভালোবাসে   ঘুরে ফিরে কাছে আসে
হাসিখুশি আশেপাশে নয়নের আলো।

—এর পর দীর্ঘকাল তাঁর ঠিকানা ছিল ৪৯নং পার্ক স্ট্রীট।

কেবলমাত্র পুরোনো পরিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে বাসস্থান পরিবর্তনে প্রণোদিত করেনি, আমাদের মনে হয়, আরও কোনো গূঢ়তর প্রেরণা এক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল। আমরা জানি, কাদম্বরী দেবী তাঁর বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতো বিদগ্ধতা তিনি তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে আয়ত্ত করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু হৃদয়ের অনুভাবে, অন্তত বাংলা কাব্যরসের উপভোগে তিনি অনুপম নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন—তখনকার দিনের বাংলাদেশের পটভূমিকায় সেটি খুব সুলভ ছিল না। তাঁর এই গুণ রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। আর কেবলমাত্র নারীত্বের আকর্ষণ তো ছিলই। দেবর-বৌদির মধুর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিরন্তর সাহচর্য একধরনের বিড়ম্বিত যৌনবোধের উন্মেষ ঘটাতে পারে—যা সময় বিশেষে অসামাজিক রূপ লাভ করে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রখর নীতিবোধের আবহাওয়ায় লালিত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই স্তরে উত্তরণ সহজ ছিল না—তাই হৃদয়-অরণ্যের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ানোই ছিল তাঁর নিয়তি। কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দিয়েছে বটে, কিন্তু এবার সংকট এসেছে অন্য পথ দিয়ে। পিতার আদেশে সেরেস্তার কুড়ি টাকা বেতনের এক সামান্য কর্মচারীর মেয়েকে তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছিল—অসুন্দরী, স্বাস্থ্যসম্পদে দীন, প্রায়-অশিক্ষিত সেই মেয়েটি কোনো ভাবেই রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত ছিলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বধূরাও বিবাহকালে এই রকমই ছিলেন কিন্তু পারিবারিক রীতি অনুযায়ী সেখানে ক্ষোভের কোনো কারণ ছিল না বা কারণ থাকলেও ধীরে ধীরে নিজেদের উপযুক্ত করে তোলার সুযোগ তাঁদের কাছে অবারিত ছিল। রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন—কিন্তু নতুন বৌঠানের সাহচর্য-ধন্য, আনা তড়খড় বা লুসি স্কটের অনুরাগে অভিষিক্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ কবির পক্ষে প্রাথমিক নৈরাশ্যটি কম বেদনাদায়ক নয়। মনে রাখতে হবে, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম বয়সে—যথাক্রমে ১৭ ও ১৯ বছর—রবীন্দ্রনাথের বয়স সেক্ষেত্রে সাড়ে বাইশ। তিনি বালিকা বধূকে অন্তরঙ্গভাবে পান সম্ভবত ১২৯২ বঙ্গাব্দের শরৎকালে সোলাপুর বাসের সময়ে—তাঁর সমসাময়িক রচনায় যে আশ্চর্য স্ফূর্তি দেখা যায়, তার অব্যবহিত কারণ হয়তো এইটিই। কড়ি ও কোমল-এর দেহবাসনামূলক সনেটগুলি সম্ভবত এই সময়ের রচনা। কিন্তু—

> এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
> কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
> কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
> মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।[১]

—দেহ যে আসক্তি বিস্তার করে বারবার তারই টানে ফিরে ফিরে আসতে হয় ঠিকই, কিন্তু আন্তরসম্পদের মহিমা তাকে সমৃদ্ধ না করলে তা কেবল রিরংসায় পর্যবসিত হয়। তাই বালিকা বধূর দেহের আড়ালে সেই অন্তরটিকে খুঁজে পাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের আকূতি তাঁকে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করিয়েছে—হয়তো ভেবেছেন ঠিক পরিবেশটি পাওয়া যাচ্ছে না ব'লেই প্রিয়ার অন্তরটিকে অনুভব করা যাচ্ছে না, উপযুক্ত স্থানে ঘর বাঁধতে পারলেই সেই গোপন কক্ষটি উদঘাটিত হয়ে যাবে। ১২৯৪-৯৫ সালের কালসীমার মধ্যে হয়তো সেই কারণেই স্ত্রীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পার্ক স্ট্রীট, দার্জিলিং ও গাজিপুরে বাসা বেঁধেছেন। আর তারই মধ্যে ফিরে ফিরে এসেছে কাদম্বরী দেবীর সেই অপ্রতিরোধ্য স্মৃতি এবং তজ্জনিত আক্ষেপ ও আকাঙ্ক্ষা—

কত কাল ছিল কাছে, বলি নি তো কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্যপরিহাস, বাক্য-হানাহানি,
তার মাঝে রয়ে গেছে হৃদয়ের বাণী।
মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।[২]

বর্তমানকে আমরা নানাভাবে অতিক্রম করতে পারি—কিন্তু অতীত, যা স্মৃতি হয়ে গেছে, তাকে ভোলা শক্ত। আমৃত্যু এই স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে গুঞ্জরিত হয়েছে।

এই বৎসর ২৫ বৈশাখ [শনি 7 May 1887 রবীন্দ্রনাথ ২৬ বৎসর পূর্ণ ক'রে ২৭ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। আগের বছরেই জন্মদিন সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা লক্ষ্য করা গেলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে এবারই তাঁর প্রথম জন্মদিন পালন করা হল সরলা দেবীর উদ্যোগে। তিনি লিখেছেন : 'রবিমামার প্রথম জন্মদিন উৎসব আমি করাই। তখন মেজমামা ও নতুনমামার সঙ্গে তিনি ৪৯নং পার্ক স্ট্রীটে থাকেন। অতি ভোরে উল্টাডিঙির কাশিয়াবাগান বাড়ি থেকে পার্ক স্ট্রীটে নিঃশব্দে তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের নিজের হাতে গাঁথা মালা ও বাজার থেকে আনান বেলফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য ফুল ও একজোড়া ধুতি-চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠলেন—পাশেই নতুনমামার ঘর। "রবির জন্মদিন" বলে একটি সাড়া পড়ে গেল। সেই বছর থেকে পরিজনের মধ্যে তাঁর জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ হল।'[৩] তাঁর দাদা জ্যোৎস্নানাথও রবীন্দ্রনাথকে একটি বই উপহার দেন : '*The Poems of Heine*'[১]—রবীন্দ্রনাথ নিজেই অর্ধ-নামপত্রে তথ্যটি লিখে রেখেছেন : 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/২৫ বৈশাখ—/জন্মদিনের/উপহার/১৮৮৭/ জ্যোৎস্নার/কাছ হইতে/৪৯ পার্ক স্ট্রীট। অন্য আত্মীয়রাও নিশ্চয় উপহারাদি দিয়েছিলেন। 'মেজ বোঠান।/ রবি।/১২ই শ্রাবণ।/১২৯৪' লিখে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জন্মদিনে 'GOETHE'S FAUST' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি উপহার দিয়ে এইরূপ উপহারের প্রতিদান দিয়েছেন, মনে করা যেতে পারে।

'হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নববর্ষের নূতন পত্র পুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ', তখন রবীন্দ্রনাথের মনে কী ধরনের তত্ত্বকথার উদয় হয়েছিল কিছুদিন পরে সেকথা জানাচ্ছেন বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে : 'সাতাশ হওয়াই কি কম কথা! কুড়ি-কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। ··· আর তো ফাঁকি দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অল্প ছিল, ভবিষ্যতে সাবালক অবস্থার ভরসায় লোকে ধারে খ্যাতি দিত। এখন ত্রিশ বৎসর হতে চলল, আর তো তাদের বসিয়ে রাখলে চলে না। কিন্তু পাকা কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশবাবু! যাতে পাঁচজনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পারছিনে। দুটো গান বা গুজব, হাসি বা তামাশা, এর চেয়ে বেশি আর কিছু হয়ে উঠল না।'[২] এই চিঠিতেই পরে লিখেছেন : 'আর নূতন প্রেমের আশাও রইল না, নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এ একরকম মন্দ নয়। Nomadic জীবনের অস্থির বৈচিত্র্য ত্যাগ ক'রে গৃহীজীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল। আপনাকেও বোঝা গেল এবং অন্যদের বোঝা গেল। ভাবনা গেল।'[৩] অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে

এই ‘ভাবনা’ কখনোই যায়নি—তাঁর মনে ‘অস্থির বৈচিত্র্য’ ও ‘আরামজনক স্থায়িত্ব’ দু’টির প্রতিই প্রবল আকর্ষণ ছিল, এদের মধ্যে সংগতি স্থাপনের চেষ্টাই তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

সম্ভবত বৈশাখ মাসেই রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম প্রবন্ধগ্রন্থ ‘চিঠিপত্র’ প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 2 Jul [শনি ১৯ আষাঢ়]। কিন্তু *The Bengalee* পত্রিকার 30 Apr [শনি ১৮ বৈশাখ] সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :

‘New Publication···13. বৌ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাস, ২য় সংস্করণ/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ১।০ 14. রাজর্ষি, ঐ ঐ ঐ ১।০/ 15. চিঠিপত্র ঐ ঐ ঐ ।০/s.K. LAHIRI & Co.,/Publishers and Book-Sellers,/.54, College Street, Calcutta' এই বিজ্ঞাপনটি 24 Sep পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

এর থেকে বোঝা যায়, গ্রন্থটি ১৮ বৈশাখের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

‘চিঠিপত্র/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/কলিকাতা/শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক ৫৪ নং কলেজ স্ট্রীট/ হইতে প্রকাশিত/১৮৮৭’

পৃষ্ঠাসংখ্যা : [ল০]+৬৯। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী গ্রন্থটির মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, মূল্য চার আনা।

বালক পত্রিকার [১২৯২] বিভিন্ন সংখ্যায়. দাদামশাই ষষ্ঠিচরণ ও নাতি নবীনকিশোরের মধ্যে ‘চিরঞ্জীবেষু’ ও ‘শ্রীচরণেষু' আখ্যায় পত্রের আকারে সামাজিক সমস্যার যে আলোচনা হয়েছিল, গ্রন্থটিতে সেগুলি সংকলিত হয়েছে। স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ‘চিঠিপত্র’ আর কখনও মুদ্রিত হয়নি, পরে গদ্যগ্রন্থাবলী-র অন্তর্গত ‘সমাজ’ [১৩১৫] গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়। বর্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪ [১১/১] :

১। ‘আগে চল্’ [বেহাগ/আগে চল্, আগে চল্ ভাই] দ্র গীত ১। ২৫৩-৫৪

২। ‘প্রাণ সমর্পণ’ [সিন্ধু/(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ] দ্র গীত ৩। ৮১৯-২০

পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে এই দুটি গান ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় কর্ত্তৃক আহূত কালেজের ছাত্র সম্মিলন উপলক্ষে গীত হয়।’

২১-২৩ ‘সাহিত্যের উদ্দেশ্য’ দ্র সাহিত্য [১৩৬১]। ১৭৩-৭৬

৩২-৩৫ ‘সাহিত্য ও সভ্যতা’ দ্র সাহিত্য [১৩৬১]। ১৭৭-৮২

চৈত্র ১২৯৩-সংখ্যায় ‘কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা শুরু করেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধ দুটিতে তারই ক্রমানুসরণ করেছেন।[১]

৪৯-৫৬ ‘হেঁয়ালি নাট্য’ দ্র হাস্যকৌতুক ৬।৭৯-৮৩ [‘একান্নবর্তী’]

হেঁয়ালি-র উত্তর : জামাই।

নব্যহিন্দুগণ বাল্যবিবাহ সমর্থন করতে গিয়ে ভারতীয় একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শের গুণগান করে পত্রপত্রিকার পাতা ভরিয়ে তুলছিলেন, বর্তমান রচনায় বিষয়টিকে নিয়ে ঈষৎ কৌতুক করা হয়েছে।

৫৬-৫৮ ‘পত্র ।/(বাসস্থান পরিবর্তন উপলক্ষে)’ [‘দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়’]

দ্র মানসী ২/১৫৪-৫৭

কল্পনা, বৈশাখ ১২৯৪ [৫।১]

২৯ 'বুঝেছি আমার।/(গান)/ভূপালী-একতালা ['বুঝেছি আমার নিশার স্বপন'] দ্র মানসী ২/১২১-২৩ ['ভুল-ভাঙা']।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মানসী-র পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 128, পৃ 194-96] কবিতাটির কোনো শিরোনাম নেই, পত্রিকাতেও প্রথম ছত্রের কিয়দংশ শিরোনাম হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, নামটি গ্রন্থমুদ্রণের সময়ে দেওয়া। কবিতাটি ৪৯ পার্ক স্ট্রীটে লেখা। এই সময়ে লেখা কয়েকটি কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সুরযোজনা করেন। কিন্তু এই কবিতাটি সুর-তাল নির্দেশসহ সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হলেও এটিকে গান-রূপে পাওয়া যায় না।

পছন্দসই পরিবেশের মধ্যে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রা এই সময়ে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে তাঁর মাসোহারার পরিমাণ ছিল ১০০ টাকা, বৈশাখ ১২৯২ থেকে তিনি পাচ্ছিলেন মাসিক ১৫০ টাকা, সম্ভবত কন্যার জন্মের পর থেকে তা বেড়ে মাসিক ২০০ টাকায় পরিণত হয় [১২৯৩-এর ক্যাশবহিটি পাওয়া যায়নি, ১২৯৪-এর ক্যাশবহির ১০ বৈশাখের হিসাবে দেখা যায়, ফাল্গুন মাসের ২০০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা তাঁকে দেওয়া হচ্ছে]। এছাড়া 'খোরাকী' হিশেবে মাসিক ৩০ টাকা ও মৃণালিনী দেবীর মাসোহারা ৩০ টাকা [আগে ছিল ২৫ টাকা] আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটিয়েছিল বলে মনে হয়। এই নিরুদ্বেগ মানসিক অবস্থায় মানসী-র কবিতাগুলি লেখা শুরু, যা পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমল-এর কবিতা থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। এদের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে স্তবক-রচনার বৈচিত্র্য। এত বিভিন্ন ধরনের স্তবক এর আগে বাংলা কবিতায় দেখা যায়নি, মিলের বিচিত্র বিন্যাসে তা হয়ে উঠেছে আরও মনোরম। আর উপরে উল্লিখিত 'ভুল-ভাঙা' কবিতায় বাংলা ছন্দের বন্ধন-মুক্তি ঘটল :

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধন পাশ
বাহুতে মোর।[২]

—যুক্তাক্ষরকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার সমস্যা বাংলা ছন্দের অন্যতম গ্রন্থি ছিল এতদিন, সেটি মোচিত হল ঐ 'বন্ধন' শব্দটিতে। এই নতুন শক্তি আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এরূপ নতুন কোনো আবিষ্কার তাঁর রচনাস্রোতে যে গতি সঞ্চার করেছে, বর্তমানে তেমন কিছু দেখা যায় না। মাসে একটি-দুটি কবিতা লিখে বা না লিখেও তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন।

বৈশাখে লেখা আর একটি কবিতা 'ভুলে' ['কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া'] ভারতী ও বালক-এর আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ পরে গানে পরিবর্তিত করেন ১, ৩, ৪ ও ৫ স্তবকগুলিতে সুর দিয়ে। গীতিরূপটি স্বরলিপি-সহ প্রথম মুদ্রিত হয় কাব্যগীতি [পৌষ ১৩২৬]-তে; দ্র গীতবিতান ২।৩৪৫-৪৬, স্বর ৩৩। জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখেন একটি কবিতা 'বিফল মিলন' ['মিলন হল যদি']—ভারতী ও বালক-এর ঐ মাসের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় [পৃ ৮৩-৮৬]। ছন্দ এবং স্তবক, মিল ও পংক্তি

বিন্যাস নিয়ে পরীক্ষারত কবি 'এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক' নির্দেশ-সহ ভারতী ও বালক-এ কবিতাটি ছেপেছিলেন এইভাবে :

মিলন হল যদি
নিরবধি
কাঁদিয়া, ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে প্রথম দুটি স্তবক বাদ দিয়ে 'বিরহানন্দ' নামে কবিতাটির বাকি অংশ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে [দ্র ২।১২৩-২৫] মুদ্রিত হয়। বর্জিত দ্বিতীয় স্তবকটিকে 'ক্ষণিক মিলন' কবিতার তৃতীয় স্তবক হিশেবে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন, বাকি তিনটি স্তবক রচনা করেন দু বছর পরে ৯ ভাদ্র ১২৯৬ তারিখে জোড়াসাঁকোয় [দ্র ২। ১২৬]।

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'কল্পনা' [৫। ২] পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় [পৃ ৪১-৪৪], প্রবন্ধটির শিরোনাম 'আপনি-বড়'। প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি এবং পত্রিকাটি স্বল্প-প্রচারিত হওয়ায় রচনাটি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়েছিল। রচনাটির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ সম্পর্কে যে তীব্র ধিক্কার প্রকাশিত হয়েছে, তার ফলেই এটি সাময়িকতার সীমা অতিক্রম করতে পারেনি—রচনাটি গ্রন্থভুক্ত না হওয়ার এটি অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে। আরম্ভের খানিকটা অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

'মুখে যাহারা বড়াই করে তাহারা সুখে থাকে, তাহাদের অল্প অহঙ্কার অল্পেই উদ্বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে মনে যাহারা বড় হইয়া বসিয়া আছে, অথচ বুদ্ধির আতিশয্য বশতঃ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, তাহাদের অবস্থা সুখের নহে। যেমন বাষ্পের ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হওয়া, তেমনি অহঙ্কারের ধর্ম্মই প্রকাশ পাওয়া। যে তাহাকে অন্তরে আটক করিয়া রাখিতে চায় সে তাহার সেই রুদ্ধ অহঙ্কারের অবিশ্রাম আঘাতে সর্ব্বদাই পীড়িত হইতে থাকে। বরং নিজের দুঃখশোক নিজের মনের মধ্যে রোধ করিয়া রাখিলে মহৎ ধৈর্যজনিত এক প্রকার গভীর সুখ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু চপল অহঙ্কারকে হৃদয়ের গোপন কক্ষের মধ্যে পোষণ করিয়া সেই মহত্ত্বের সুখটুকুও পাওয়া [যায়] না।'

প্রবন্ধটি পড়ে প্রায় এক বৎসর পরে লেখা 'দেশের উন্নতি' [১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫] কবিতার শেষ স্তবকটির কথা মনে পড়ে :

বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির,
অসংশয়ে করিব স্থির
মোদের বড়ো এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর!
নয়ন যদি মুদিয়া থাকো।
সে ভুল কভু ভাঙিবে নাকো,
নিজেরে বড়ো করিয়া রাখো
মনেতে আপনার!

বাঙালি বড়ো চতুর, তাই
আপনি বড়ো হইয়া যাই,
অথচ কোনো কষ্ট নাই।
চেষ্টা নাই তার।[১]

এরই মধ্যে নিজস্ব দায়দায়িত্বও রবীন্দ্রনাথকে পালন করে যেতে হয়েছে। পারিবারিক দায়িত্ব কম, সাংসারিক দায়িত্ব নেই বললেই চলে, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিশেবে কিছু কাজ করতেই হয়। উক্ত সমাজের নিয়মানুযায়ী প্রতি বাংলা মাসের প্রথম রবিবার প্রাতে 'মাসিক ব্রাহ্মসমাজ' উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা অনুষ্ঠিত হত। ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী গায়ক ব্রহ্মসংগীত গাইতেন, তারপর আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ উপদেশ দিতেন—অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকলে এতে উপস্থিত থাকতেন, আত্মীয়েরাও তাঁর সঙ্গী হতেন। এ-সম্পর্কে ক্যাশবহি থেকে কয়েকটি হিসাব উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে : ১৩ শ্রাবণের হিসাব—'শ্রীযুক্ত রবীবাবু সুরেণবাবু ও বিবি এবাটীতে আসায় আহারাদির ব্যয় ২ জ্যৈষ্ঠ [রবি 15 May] ও ৬ আষাঢ়ের [রবি 19 Jun] ২ বৌচর'; ৬ শ্রাবণের হিসাব–'১ শ্রাবণ রবিবার [16 Jul] মাসিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে রবীন্দ্রবাবু, শুরেণ, বিবি, রমণীবাবু [রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়],শুকুমারবাবু [সুকুমার হালদার], আশুবাবু [আশুতোষ চৌধুরী] দিগের খাবার খরচ', ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, সব ক'টি হিসাবেতেই খাবার খরচের কথা লেখা হয়েছে; বোঝা যায়, মাসের প্রথম রবিবারের দুপুরটি আত্মীয় বন্ধুদের সমাগমে মুখর হয়ে উঠত। জোড়াসাঁকোর আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দিনটি নির্দিষ্ট ছিল। উপরের হিসাবে সুরেন [সুরেন্দ্রনাথ] ও বিবি [ইন্দিরা দেবী]-র উল্লেখ আছে—এই দুই ভাইপো-ভাইঝির প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর স্নেহের কথা আমরা বহুবার বলেছি, এই সব সভা-সমিতিতেও তাঁরা সঙ্গী হতেন। 'মাসিক সমাজ'-এ যোগ দেবার স্মৃতিচারণও করেছেন ইন্দিরা দেবী : 'সেকালে আদি ব্রাহ্মসমাজে দুই থাকের একটি সুন্দর অগ্যান-যন্ত্র ছিল। তার উপরের থাক পিয়ানোর মতো, আর নীচের থাকটা হারমোনিয়মের মতো বাজত। এক সময় আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রতিমাসেই উপাসনা হত। সেই মাসিক সমাজে রবিকাকার গানের সঙ্গে আমি হারমোনিয়ম বাজাতাম মনে আছে।'[১]

১২ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 25 May] বঙ্গোপসাগরে এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পড়ে Retriever নামক একটি স্টীম টাগ ও Sir John Lawrence নামক একটি স্টীমার ৭৩৫ জন যাত্রীসহ সাগরদ্বীপের কাছে নিমজ্জিত হয়, টাগের একজন খালাসী ছাড়া আর সকলেই প্রাণ হারান--পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে এরা যাচ্ছিলেন, যাঁদের একটি বড় অংশই মহিলা ও শিশু। তখনকার দিনের সংবাদপত্রগুলি এই শোচনীয় ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেছিল। এই ঘটনার অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে বসে একটি কবিতা লিখলেন আষাঢ় মাসে—ততদিনে দুর্ভাগা যাত্রীদের পরিণতি সম্পর্কে সকল তথ্যই সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের জানা হয়ে গিয়েছিল। 'পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে মন্তব্য-সহ কবিতাটি ভারতী ও বালক-এর শ্রাবণ সংখ্যায় [পৃ ২৩০-৩২] 'মগ্ন তরী' নামে মুদ্রিত হয়, মানসী কাব্যগ্রন্থে তার নাম 'সিন্ধুতরঙ্গ' [দ্র ২।১৫৭-৬১]। কবিতাটি সকলেই পড়েছেন বা পড়ে নিতে পারবেন, সুতরাং এ-সম্বন্ধে বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু

লক্ষণীয় সংবাদপত্রের ছোটো একটি খবর—'One Ooriyah was picked up with a child clinging to his arms'[২]—কিভাবে সংবেদনশীল কবির কবিত্বে ও দার্শনিকতায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে :

… ওই-যে জন্মের প'ড়ে   জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষ-'পরে সন্তান আপন।
মরণের মুখে ধায়,   সেথাও দিবে না তায়—
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন।
আকাশেতে পারাবারে   দাঁড়ায়েছে এক ধারে
এক ধারে নারী,
দুর্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি?, …
পাশাপাশি এক ঠাঁই   দয়া আছে, দয়া নাই—
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা-আশা   একত্র বেঁধেছে বাসা,
এক-সাথে রয়।
কে বা সত্য, কে বা মিছে,   নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্ধ্বে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে,   মিনতি নাহিক মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার   দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময়?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয়?

—কবিপ্রতিভাকে যিনি 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা' বলেছেন, তিনি ভুল বলেন নি!

আষাঢ় মাসে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে লেখা আর একটি কবিতা হ'ল 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙক্ষা' [দ্র মানসী ২।১২৭-৩০]—ভারতী ও বালক-এর শ্রাবণ সংখ্যায় [পৃ ২০৩-০৫] 'নূতন প্রেম' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। কবিতাটির প্রথম দু'টি ও শেষ দুটি স্তবকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সুর যোজনা করেন। গানটি স্বরলিপি-সহপ্রথমে কাব্যগীতি [পৌষ ১৩২৬]-তে প্রকাশিত হয়; দ্র গীতবিতান ৩।৮৯০-৯১, স্বর ৩৩।

'পত্র', 'মগ্নতরী' ['সিন্ধুতরঙ্গ'], 'নূতন প্রেম' ['শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা] এবং পরে ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রাবণে পত্র' কবিতাগুলির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, পাণ্ডুলিপিতে ও সাময়িক পত্রে মুদ্রণের সময়ে 'ক'রে', 'ব'সে', 'নেমে', 'ফুটে' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি দ্বিজেন্দ্রনাথের রীতি অনুযায়ী 'কর্যে', 'বস্যে', 'নেম্যে', 'ফুট্যে' প্রভৃতি বানানে লেখা ও ছাপানো হয়। হয়তো বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা-সূত্রে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর রচনায় এই রীতি স্থায়ী হয়নি, পুস্তকাকারে মুদ্রণের সময়েই প্রচলিত বানান ফিরে এসেছিল।

আষাঢ় মাসে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনার তালিকা :

ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৪ [১১/৩]

১৬১-৬৪ 'হেঁয়ালিনাট্য'

'বৈকুণ্ঠ, তস্যপুত্র খগেশ এবং অন্যান্য পাঁচজন'কে রচিত এই হেঁয়ালিনাট্যটি বার্ষিক সূচীপত্রে রবীন্দ্রনাথের নামে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও হাস্যকৌতুক গ্রন্থে সংকলিত হয়নি।

১৬৪-৬৫ 'এসেছি ভুলে' ['কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া']

দ্র মানসী ২।১১৯-২১ ['ভুলে']

আমরা আগেই বলেছি, গত বৎসর মাঘ মাসে চুঁচুড়াতে মহর্ষি মরণাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন, সংকট কেটে গেলে তাঁকে চৈত্র মাসের গোড়াতে চৌরঙ্গির একটি বাড়িতে আনা হয়। মাসখানেক সেখানে থেকে আরেকটু সুস্থ হয়ে ১৯ বৈশাখ [রবি 1 May] তিনি দার্জিলিং যাত্রা করেন। সেখানে তাঁর থাকবার জন্য ২৪৩ টাকা মাসিক ভাড়ায় Castleton House ভাড়া করা হয়। ১৭ আষাঢ় [বৃহ 30 Jul] তিনি দার্জিলিং থেকে চুঁচুড়ায় ফিরে আসেন। তাঁকে দেখবার জন্য পরদিনই রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্তী কুঁচুড়া যান।[১] এর কয়েকদিন পরেই মহর্ষি স্টীমারে চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় আসেন এবং চৌরঙ্গি অঞ্চলে ৩নং মিডলটন রোডের ভাড়া বাড়িতে বাস করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে পার্ক স্ট্রীটেই থাকতেন, সুতরাং পিতার কাছে প্রায় প্রতিদিন যাওয়া-আসার কোনো অসুবিধা ছিল না।

শ্রাবণ মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়:

ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪ [১১/৪]

২০৩-০৫ 'নূতন প্রেম' ['আবার মোরে পাগল করে্য'] দ্র মানসী ২।১২৭-৩০

['শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা']

পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 128, পৃ 1-6] আরও তিনটি স্তবক আছে, পত্রিকায় ও গ্রন্থে বর্জিত।

২০৫-১০ 'আলস্য ও সাহিত্য' দ্র সাহিত্য [১৩৬১]।১৮৩-৯১

বৈশাখ-সংখ্যায় মুদ্রিত 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' ও 'সাহিত্য ও সভ্যতা' প্রবন্ধদ্বয়ের অনুবৃত্তি। প্রথম প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় লিখেছিলেন, 'সাহিত্যও সেইরূপ অবসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে'। [১]বর্তমান প্রবন্ধে যেন এই কথাটিকে বিশদ করে দেখিয়েছেন।

২৩০-৩২ 'মগ্নতরী' ['দোলে রে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র-কোলে']

দ্র মানসী ২।১৫৭-৬১ ['সিন্ধুতরঙ্গ']

পাণ্ডুলিপিতে.[পৃ 7-13] লিখিত কবিতাটির কয়েকটি স্তবক মুদ্রণের সময়ে অন্যভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

১০ শ্রাবণ [সোম 25 Jul] রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার অন্নপ্রাশন হয়। 27 Jul [বুধ ১২ শ্রাবণ] তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি পত্রে লেখেন : '··· গত পরশ্ব মদীয় কন্যার নামকরণ হয়ে গেছে। নাম মাধুরীলতা। আপনি উপস্থিত ছিলেন না।'[২] কয়েকদিন আগে প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছিলেন : '···বেলার

অন্নপ্রাশনের দিন সকালে এলে হানি কি? সমস্ত দিনটাই গোলমাল করা যাবে।'[৩] খরচের হিসাব যা পাওয়া যায়, তা দেখে মনে হয় যথেষ্ট সমারোহের সঙ্গেই অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়েছিল, সুতরাং গোলমালের অভাব হয়নি। খরচটির শুরু হয়েছিল ৬ শ্রাবণ তারিখে, ২৮ অগ্র° শেষ হিসাবটি তৈরি হয়েছে ৩৭১ টাকা ১০ আনা ৩ পাই—তখনকার দিনের মূল্যমান অনুযায়ী যথেষ্ট বেশি খরচ! এর মধ্যে একটি হিসাব আবার 'সংগীত হওয়ায় দেওয়া বিঃ ১ বৌচর ৫' টাকা—রীতিমত গানের আসর বসানোর প্রমাণ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, 'ওহে নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন' [দ্র গীত ২। ৬১১-১২, স্বর ৫৫] মিশ্র বারোয়াঁ সুরে রচিত এই গানটি রবীন্দ্রনাথ মাধুরীলতার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রচনা করেন।[৪] এই অনুমান সঠিক হ'লে মনে করা যায় যে, গানটি উক্ত আসরে গীত হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের দু'দিন পরে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি দীর্ঘপত্র লেখেন, যার কিছু-কিছু অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। সাতাশ বৎসর বয়সে উত্তীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে খানিকটা দার্শনিকতা করার পর তিনি যা লিখেছেন, সেইটিই বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক: 'আজকাল আমাদের এখানে বর্ষা পড়েছে। ঘন মেঘ ও অবিরাম বৃষ্টি। এই সময়ই তো বন্ধুসংগমের সময়। এই সময়টা ইচ্ছে কচ্চে, তাকিয়া আশ্রয় ক'রে প'ড়ে প'ড়ে যা-তা বকাবকি করি।··· আমাদের সেই শত শত গান গল্প সাহিত্যচর্চার স্মৃতিতে ও তুলোতে পরিপূর্ণ তাকিয়াই বা কোথায়, আমিই বা কোথায়, এবং আপনিই বা কোথায়!'[৫] এরপর বন্ধুর 'বিশেষরূপ মনে থাকবে ব'লে' চিঠিটির শেষাংশ পদ্যে অনুবাদ করে পাঠিয়েছেন, সেটি ভারতী ও বালক-এর ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় [পৃ ৩৫২-৫৩] 'শ্রাবণে পত্র' নামে মুদ্রিত ও মানসী গ্রন্থে [২।১৬২-৬৩] সংকলিত হয়েছে। অবসর-চচার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে আহ্বান করেছিলেন :

লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি
অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি
বসি একবার।

—কিন্তু পরিবর্তে এসে পড়ল কর্তব্যের আহ্বান।

কিছুদিন ধরেই বাল্যবিবাহ, হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা, একান্নবর্তী পরিবারের মহত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সভা-সমিতিতে ও পত্র-পত্রিকায় তুমুল বিতর্ক আরম্ভ হয়েছিল। গোঁড়া ও নব্য হিন্দুরা বিষয়টি নিয়ে অনেক বাগ্‌বিস্তার করলেও, বর্তমান বিতর্কের সূচনা *Christian Herald* পত্রিকার সম্পাদক দেশীয় খ্রীস্টানদের নেতা জয়গোপাল সোমের Calcutta Missionary Conference-এ প্রদত্ত একটি বক্তৃতা থেকে, তাতে তিনি বাল্যবিবাহ সমর্থন ও আইনের সাহায্যে বাল্যবিবাহ রহিত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। [বক্তৃতাটি একটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়]। নব্য হিন্দুরা খ্রীস্টান-সমাজের একজন প্রতিনিধিকে দলে পেয়ে উৎসাহে মেতে ওঠেন। ২৩ শ্রাবণ [শনি 7 Aug] শোভাবাজার রাজবাড়িতে কুমার নীলকৃষ্ণ ও কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের আহ্বানে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি বিরাট সভায় জয়গোবিন্দ সোম, ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বাল্যবিবাহের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। তত্ত্ব-কৌমুদী অভিযোগ করে : 'সভাতে বাল্য বিবাহের

বিপক্ষগণকে কিছু বলিতে দেওয়া হয় নাই। আমাদের কোন বন্ধু [? বিপিনচন্দ্র পাল] বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি আছে তাহা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সভা আহ্বানকারী কুমার বাহাদুরেরা তাঁহাকে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিতে দেন নাই—সভা সুতরাং নিরপেক্ষ হয় নাই, সবই একতরফা হইয়াছিল।'[১] কাজেই উভয়পক্ষের প্রবক্তাদের একত্রিত করার ব্যবস্থা করা হল এবং রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হল বাল্যবিবাহের বিরোধীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য।

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন দীর্ঘ সামাজিক প্রবন্ধ 'হিন্দু বিবাহ' এবং ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে ১৯ ভাদ্র [রবি 4 Sep] বউবাজার-স্থিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন হলে প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন সাবিত্রী লাইব্রেরির অন্তর্গত সাবিত্রী সভা। *The Bengalee* পত্রিকায় এই উদ্যোগ সম্বন্ধে লিখিত হয় : '···It is worth mentioning in this place that the meeting was not called by the reforming opponents of child-marrige. It was a meeting convened by the Savitri Sabha, comprising a body of Orthodox Hindu gentlemen, and we rejoice to find that so important a subject was discussed in such a truly liberal spirit by a society associated with the name of one of the purest and noblest characters that adorned the womanhood of ancient India.'[২] সভার বিবরণ দিতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে : 'A great and enthusiastic meeting was held on Sunday last at the hall of the Science Association, under the presidency of the Hon'ble Dr. Mahendra Lal Sirkar, Babu Rabindra Nath Tagore read an admirable paper on the subject···. ··· we notice with pleasurethat the friends of child-marriage have somewhat altered their position. ···At the meeting on last Sunday, Babu Chundernath [Bose] has, we are glad to find, modified his position. He could not deny the evils of child-marriage, and he thought that itwouldbe desirable if the age for the marriage of girls were raised owing to the difficulty of procuring suitable husbands. Babu Haro Prasad Sastri, another champion of early marriage at the Sobha Bazar meeting, differed from Mr. R. C. Dutta in the view that the Rigvedas did not countenance early marriage. Of course, he said, there are many; instances in the ancient Hindoo times where girls were married after they had attained maturity···.Pundit Mohesh Chunder Nayratna said that it was desirable that the age for the marriage of girls should be raised.'[৩] তত্ত্ব-কৌমুদী-তে 'সম্পাদকীয় মন্তব্য'-এ লেখা হয় : '··· বেঙ্গল গবর্নমেন্টের অনুবাদক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, হিন্দুপত্নী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন সেই প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব লিখিত হয়। রবীন্দ্রবাবু এরূপ গবেষণা, ধীরতা, সদ্‌যুক্তি ও চিন্তাশীলতার সহিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিপক্ষ চন্দ্রনাথবাবু পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই···।··· সভাপতি বলিয়াছিলেন যে যাঁহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে তিনি কখনই বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বহুকাল পূর্বে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার লেশমাত্র পরিবর্তন করিবার কোন কারণ দেখিতে পান নাই। নিতান্ত বুদ্ধিভ্রংশ না হইলে এ সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব।'[১] রবীন্দ্রনাথের

প্রবন্ধটি ভারতী ও বালক-এর ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় [৩১৪-৪৮] মুদ্রিত হয় [দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২। ৪১৩-৪৯]। এই দীর্ঘ প্রবন্ধের দু'টি ভাগের প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হিন্দুবিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য চন্দ্রনাথ বসু-কথিত আধ্যাত্মিক নয়, নিতান্তই ব্যবহারিক ও সাংসারিক। দ্বিতীয় ভাগে তিনি বাল্যবিবাহ ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথার দোষগুণ বিবেচনা করেছেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে অপ্রমত্ত চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অধিকাংশ আলোচকের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, 'শৈশববিবাহের যে নিন্দাই করিতে হইবে, এমন তো কোনো কথা নাই। অবস্থাবিশেষে তাহার উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যদি স্ত্রীশিক্ষা না থাকে এবং একান্নবর্তী পরিবার থাকে, তবে শিশুস্ত্রীবিবাহ সমাজরক্ষার জন্য আবশ্যক। কিন্তু তাহার জন্য আরও গুটিকতক আবশ্যক আছে; তাহার প্রতি কেহ মনোযোগ করেন না। পুরাকালে যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল সেইরূপ শিক্ষা আবশ্যক এবং তখন সাংসারিক অবস্থা যেরূপ ছিল সেইরূপ অবস্থা আবশ্যক।'[২] তাঁর মতে, অর্থনৈতিক ও নানা সামাজিক কারণে বাল্যবিবাহ স্বাভাবিক ভাবেই অন্তর্হিত হবে, এর জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন, 'কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রাজবিধির সহায়তা লইয়া সমাজসংস্কার, আমার মত নহে। জীবনের সকল কাজই যে লাল-পাগড়ির ভয়ে করিতে হইবে, আমাদের জন্য সর্বদাই যে একটা বড়ো দেখিয়া বিজাতীয় জুজু পুষিয়া রাখিতে হইবে, আপন মঙ্গল অমঙ্গল কোনোকালেই আপনারা বুঝিয়া স্থির করিতে পারিব না, ইহা হইতেই পারে না; জুজুর হস্তে সমাজ সমর্পণ করিলে সমাজের আর উদ্ধার হইবে কবে।'[৩] 'আত্মশক্তি'র এই ধারণা রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

উপরে সংবাদপত্রের যে প্রতিবেদনগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বাল্যবিবাহের প্রবক্তাগণ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সারবত্তা মেনে নিয়েছিলেন এমন ধারণারই সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা অন্যরূপ। চন্দ্রনাথ কার্তিক-সংখ্যা নবজীবন-এ [পৃ ১৯৩-২২৯] 'হিন্দু বিবাহ' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খণ্ডনের প্রয়াস পান [পত্রিকাটি প্রকাশে বিলম্ব হয়েছিল]। ৫ অগ্র° [রবি 20 Nov] ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরির অষ্টম বাৎসরিক অধিবেশনে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে চন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন।[৪] সাবিত্রী লাইব্রেরির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আসরে যেমন চন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, তেমনই বর্তমান সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু এই বক্তৃতা-সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আর একটি কঠিন সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'বিভা' পত্রিকার পৌষ [১।৪, পৃ ১৬২-৬৯] ও চৈত্র [১।৭, পৃ ৩৩৭-৪২] সংখ্যায়। লেখক 'ভারদ্বাজ' ছদ্মনামের আড়ালে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমালোচনা ক'রে ও 'রবিবাবু নিজে বাল্য বিবাহ করিলেও আমরা সে কথা এখানে তুলিব না' ব'লে তাঁর দিকে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন : 'রবিবাবু বলিতেছেন যে, বিলাতী ডাক্তারগণ বয়স সম্বন্ধে যে মত দিয়াছেন সুশ্রুত-সংহিতারও সেই মত। কিন্তু আমরা বলি, এ কথাটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। রবিবাবুর সাধ্য থাকে, তিনি সুশ্রুত সংহিতা হইতে এমত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, হিন্দু শাস্ত্র সঙ্গত যে বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট আছে, সুশ্রুত তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন বা যৌবন বিবাহের অনুকূলে মত দিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট বলিতেছি যে রবিবাবুর সাধ্য নাই যে, তিনি সেরূপ মত উদ্ধৃত করিতে পারেন। বোধ হয় তিনি

কোন গোবৈদ্যের নিকট শুনিয়া থাকিবেন যে, সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত প্রকার মত আছে। আমরা কলিকাতার প্রধান প্রধান খ্যাতনামা কবিরাজের সহিত এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া জানিয়াছি যে রবিবাবুর উক্ত উক্তিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।'[৫] উদ্ধৃতির শেষের দু'টি শব্দ পাইকা হরফে মুদ্রিত!

রবীন্দ্রনাথ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন কি-না আমরা জানি না। তবে চার বছর পরে আর একবার অকাল বিবাহ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসুর মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয়েছিল, আমরা যথাস্থানে বিষয়টির অবতারণা করব।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচকেরা কত বিচিত্র দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করতেন তার একটি নমুনা আমাদের আলোচ্য সময়ে পাওয়া যায়। পাঠকের স্মরণে আছে, রবীন্দ্রনাথ 12 Jul 1884 [২৯ আষাঢ় ১২৯১] বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে ২৩০৯ টাকায় তাঁর বারোখানি বইয়ের অবিক্রীত সমস্ত কপি বিক্রয় করেছিলেন। গুরুদাসবাবু নানা সময়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কমে এইসব বই বিক্রয় করছিলেন। ২৮ শ্রাবণ, 'অনুসন্ধান' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় তিনি বিজ্ঞাপন দেন : "আর একবার সুলভ। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীঃ—১২ বার খানা পুস্তক যৎপরোনাস্তি ভাল কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা; আশল মূল্য ৯ টাকা। কিন্তু আগামী পূজা পর্যন্ত ৩ টাকা, ডাকমাসুল ॥ আনা, একুনে ৩॥০ টাকায় দিব, ভ্যালুপেএবেলেল০আনা অধিক লাগিবে। পুস্তক বাস্তবিকই দুই শতের অধিক নাই।…'[১] বিজ্ঞাপনটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করা হয় পত্রিকাটির ৩১ ভাদ্র সংখ্যায় [১।৪, পৃ ৬৪] : 'মেডিক্যাল লাইব্রেরীর বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রবাবুর প্রণীত এক সেট পুস্তক উপহার দিয়াছেন। বিশেষ সমালোচনার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুস্তকের লেখা রবীন্দ্রের; একত্রে ওজন আধ পো' কম দু'সের; আকার (৮ পেজি ও ১২ পেজিতে) ১৬৪৪ পৃষ্ঠারও অধিক; ছাপা ও কাগজ ঠাকুর বাড়ীর পছন্দসই; দাম আবার এখন তা'য় মোট তিনটি টাকা!'

'হিন্দু বিবাহ' প্রবন্ধপাঠের এক সপ্তাহ পরে সম্ভবত ২৬ ভাদ্র [রবি 11 Sep] রবীন্দ্রনাথ স-পরিজনে দার্জিলিং যাত্রা করেন। প্রিয়নাথ সেনকে একটি পত্রে লিখেছেন : 'রবিবারে যাওয়া একেবারে ঠিক হয়ে গেছে। অতএব টাকাটা আজই কিম্বা কাল বেলা দুটোর মধ্যে পেলে বড়ই সুবিধে হয়।… কাপড়চোপড় কর্ত্তে অনেক ধার হয়ে গেছে এই সময়ে না পেলে বিদেশে বড় মুস্কিল হবে'[২]—আমাদের মনে হয় পত্রটি এই সময়ে লেখা। শীতের দেশে যাচ্ছেন, সুতরাং যথোপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনে ধার করতে হয়েছে। সত্যপ্রসাদের হিসাবখাতাতেও দেখা যায় ৩১ ভাদ্র তারিখে : 'রবিমামাকে হাওলাত ৫০৲' [২ পৌষ শোধ হয়], ঋণ কয়েকদিন আগেই দেওয়া হয়েছিল, কারণ এই দিনই ইন্দিরা দেবী দার্জিলিং থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি পান।

দার্জিলিং-যাত্রী দলটি বেশ বড়োই ছিল—রবীন্দ্রনাথ, মৃণালিনী দেবী, মাধুরীলতা, বড়োদিদি সৌদামিনী দেবী, ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর দুই কন্যা হিরন্ময়ী ও সরলা, তাছাড়া একটি দাসী। তখনও পদ্মার উপরে সারা ব্রীজ তৈরি হয়নি—সুতরাং স্টীমারে পদ্মা পেরিয়ে মিটার গেজের ছোটো গাড়িতে উঠতে হয়। রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন :'সারা-ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা—জিনিসপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটিমাত্র। নদী পেরিয়ে

একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল—…। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ladies' compartment-এ তোলা গেল—কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি—তবু নদিদি বলেন আমি কিছুই করিনি।'[২] একই সময়ের আর একটি বিবরণ দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী : 'আমরা রেল হইতে নামিয়া দামোদিয়ার ঘাটে জাহাজে যখন উঠিতেছি একজন লোক আমাদের দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ গা ওঁরা কোথা হইতে আসিতেছেন কোথাকার রাজা বুঝি?" এইখানে বলা আবশ্যক, আমাদের অভিভাবকটিকে সাজ গোজে অনেকটা রাজার মতই দেখাইতেছিল। একে সুশ্রী সুন্দর মুখ। তাতে চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা লম্বা—তার উপর হিন্দুস্থানী পাগড়ি—রাজা মনে করা কিছুই আশ্চর্য্য ছিল না। কিন্তু দাসীটি যেরূপ উত্তর দিয়াছিল সেইটিই কিছু মজার—সে বলিল "ওগো ওঁরা ব্রাহ্মণ গো ব্রাহ্মণ!"'[৩] —বর্ণনাটিকে ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য মনে করার দরকার নেই—পাঠক ১২৯৩ বঙ্গাব্দের গোড়ার কবি দীনেশচরণ বসুর বর্ণনাটি স্মরণ করতে পারেন।

শিলিগুড়ি থেকে ন্যারো গেজের টয় ট্রেনে চাপবার পর রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা : '… বেলি ঘুমোতে লাগল, বন পাহাড় পর্বত ঝর্ণা মেঘ এবং বিস্তর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তার পরে মেঘ, তার পরে নদিদির সর্দি, তার পরে বড়দিদির হাঁচি, তার পরে শাল কম্বল বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্‌কন্‌, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার, এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি। মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে।'[১] স্বর্ণকুমারী দেবীর বর্ণনায় অবশ্য একটু অতিরিক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে, যা রবীন্দ্রনাথ সকারণেই বাদ দিয়েছেন : 'আমরা যদিও এই নূতন দারজিলিং আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের অভিভাবকটি … আগে আর একবার আসিয়াছিলেন।[২] ঘুম ষ্টেসনে পৌঁছিবার কিছু আগে হইতে তিনি ভাবিয়া লইয়াছেন এইবার ট্রেন দারজিলিং ষ্টেসনে আসিবে। তিনি যত বাড়ী ঘর দেখিতেছেন ততই প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি ততই নূতন হইয়া উঠিতেছে, গতবারে যে বাড়ীতে ছিলেন তাহার কাছে যে ঝরণাটি ছিল সেটি পর্য্যন্ত তিনি আমাদের দেখাইলেন, সবই মিলিয়া গেল, এখন কেবল গাড়ী থামিলে হয়–দারজিলিং-এ নামা মাত্র বাকী। গাড়িও থামিল, তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন আমাদের কেহ লইতে আসিয়াছে কিনা, দেখিলেন কোথাও কেহ নাই। কাজেই আমরা গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম, লোকজন ডাকিয়া আমাদের যাইবার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া তিনি নামিলেন। … আমাদের ভাব দেখিয়া একজন কুলি একটা বাক্সে হাত দিয়া চোখ মুখ নাড়িয়া বলিল—গুম গুম— ষ্টিসন উতরেগা? আমরা তখন বুঝিলাম এটা দারজিলিং নয়—এই সময় আমাদের অভিভাবকটিও ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঘুম শুনিয়া তাঁহার ঘুম ছুটিয়া গেল।'[৩]

দার্জিলিঙের Castleton House মহর্ষির জন্য মাসিক ২৪৩ টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তিনি ফিরে গেলেও বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হয়নি, নিয়মিত ভাড়া দিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স-পরিজনে এই বাড়িতেই ওঠেন। বাড়িটির বর্ণনা দিয়ে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন : 'লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের বাড়ী ছাড়া দারজিলিং-এ শুনতে পাই এত বড় বাড়ী আর নেই, সেই জন্য এর নাম হচ্ছে কাসলটন হাউস। যখন লেপ্টেনেন্ট গভর্নরের দারজিলিং-এ স্বতন্ত্র বাড়ী তৈয়ার হয়নি—তখন নাকি তিনি এইখানেই থাকতেন। কিন্তু আসলে ধরতে গেলে এ বাড়ীটি তত বড় নয় বাড়ীর হলটা যত বড়।'[৪]

এই হলে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সাহিত্যপাঠের আসর বসাতেন। স্বর্ণকুমারী দেবী এই আসরের একটি বর্ণনা দিয়েছেন :

'সন্ধ্যাবেলা সমস্ত চৌকি একখানা কৌচের কাছে জড় হয়, আর মধ্যে একটা ছোট টিপয়ে আলো জ্বলে তার চারিদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধা মত বসে শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি টেনিসন থেকে ব্রাউনিং থেকে খাবার আসা পর্যন্ত আমাদের কবিতা পড়ে শোনান। বাস্তবিক তিনি কি সুন্দর করে পড়েন, তোমাকে একবার শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে।'[৫] রবীন্দ্রনাথ এই রীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। সুন্দর করে কবিতা পাঠ করে গেলেই তার কাব্যরস অলক্ষ্যে বোধের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়, এই ধারণায় তিনি পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের কাছেও কঠিন ইংরেজি কবিতা পড়ে যেতেন এই ভেবে যে সবটুকু বুঝতে না পারলেও এতে অন্তত কান ও রুচি গড়ে ওঠে। সরলা দেবীও সেই কথা লিখেছেন : আমার সাহিত্যগত রুচিও গড়ে দিয়েছিলেন রবিমামা। ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কীটস্, শেলি প্রভৃতির রসভাণ্ডার যিনি আমার চিত্তে খুলে দেন—সে রবিমামা। মনে পড়ে দার্জিলিঙের 'Castleton House'এ যখন মাসকতক রবিমামা, মা, বড়মাসিমা, দিদি ও আমি ছিলুম—প্রতি সন্ধ্যাবেলায় Browningএর "Blot in the Schuteon" মানে করে করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ে শোনাতেন।'[৬] মনে রাখা দরকার, এই আসরে সৌদামিনী দেবী ও মৃণালিনী দেবীও উপস্থিত থাকতেন—যাঁদের ইংরেজি ভাষায় অধিকার প্রশ্নাতীত ছিল না।

কার্ত্তিক ১২৮৯-তে রবীন্দ্রনাথ যখন দার্জিলিঙে এসেছিলেন, তখন 'প্রতিধ্বনি' ছাড়া আর কোনো কবিতা লেখেননি। এবারেও কোনো কবিতা লেখার কথা জানা যায় না, কিন্তু লিখতে শুরু করলেন একটি ফরমায়েশি রচনা 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'সখিসমিতি'র অন্যতম সদস্যা ব্রাহ্মনেতা দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী সরলা রায়ের [মিসেস্ পি. কে. রায় নামে অধিক পরিচিতা] অনুরোধে এটি লেখা হয় বলে গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। গীতিনাট্যটি পূর্বপ্রকাশিত 'নলিনী' নাটিকার কাহিনীর কঙ্কাল অবলম্বনে গড়ে উঠেছিল। সরলা দেবী লিখেছেন :'সেই সময় পিঠে একটা ফোড়ায় যখন শয্যাশায়ী তখন শুয়ে শুয়ে "মায়ার খেলা" গীতিনাট্য রচনা আরম্ভ করেন। প্রতিদিন একটি দুটি করে গান রচনা করতেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমায় শিখিয়ে দিতেন।'[১] পিঠে ফোড়া হওয়া কথা সম্ভবত স্মৃতিবিভ্রমজনিত, কারণ এই সময়ে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি তখন কোমরে বাতের যন্ত্রণায় শয্যাগত : 'আমার কোমরের সমস্ত খবর সুরির [সুরেন্দ্রনাথ] চিঠিতে পাবি। কোমরটা যে কেবলমাত্র কাছা এবং কোঁচা গুঁজে রাখবার জায়গা তা আর কক্‌খনো মনে করব না—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এই কোমর আশ্রয় করে আছে। এই চিঠিটা যদি একঘেয়ে (dull) রকম হয়, অর্থাৎ যদি এর মধ্যে কোনো movement না থাকে—···তবে জানবি সে আমার এই ভাঙা কোমরের দোষ—তার জন্যে আর কারও দোষ দেওয়া যায় না।'[২]

রবীন্দ্রনাথ মাসখানেকের বেশি দার্জিলিঙে থাকেননি। ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায়, 'রবীন্দ্রবাবু মহাশয় মাসিক সমাজ উপলক্ষে ৭ কার্ত্তিক [রবি 23 Oct] আসিবার গাড়িভাড়া'—সুতরাং এর পূর্বেই তিনি ফিরে এসেছিলেন। আর একটি হিসাবে দেখি . 'শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু নীলমাধব হালদার দিগের আশ্বিন মাসে দারজিলিং বেড়াইতে যাতায়াত ব্যয়··· ৪০৮ ।লত'। ডাঃ নীলমাধব

হালদার ঠাকুরবাড়ির বেতনভোগী চিকিৎসক—তবে কি রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা এতদূর বর্ধিত হয়েছিল যে, কলকাতা থেকে ডাক্তার পাঠাতে হয়েছিল তাঁকে নিয়ে আসার জন্য?

যাই হোক, আসার সময়ে স্ত্রী-কন্যাদিকে দার্জিলিঙেই দ্বিপেন্দ্রনাথ-অরুণেন্দ্রনাথদের হেফাজতে রেখে এসেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখাতেও এই তথ্য পাওয়া যায় : 'তোমাকে যখন চিঠি লিখি, তারপর থেকে আমাদের এখানকার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তখন আমরা এখানে যে কয়জন ছিলাম তার মধ্যে কেহ কেহ বাড়ী গিয়াছেন, আবার বাড়ী হইতেও কেহ কেহ এখানে আসিয়াছেন। আমাদের সে পড়াশুনার মজলিস অনেকদিন বন্ধ হইয়াছে।'[৩]

কলকাতায় ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতেই ওঠেন। কিন্তু কোমরের বাত তখনও তাঁকে ছাড়েনি। পার্ক স্ট্রীট থেকে লেখা একটি পত্রে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তিনি এই খবর দিয়ে লিখেছেন : 'আমি প্রায় এক মাস কাল দার্জিলিঙে কাটিয়ে এলুম। ··· আমার কোমরে বাত হয়ে কিছুকাল শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম, এখনো ভালো করে সারিনি। তবে এখন বিছেনা থেকে উঠে বসেছি। কিন্তু বেশিক্ষণ চৌকিতে বসে থাকতে পারিনে। পা টন্‌টন্‌ করে। আমার কোমর ছাড়া পৃথিবীতে আর আর সমস্ত মঙ্গল। আমার স্ত্রী কন্যা দার্জিলিঙে, আমি কলকাতায় ঘরে ব'সে বিরহ ভোগ করছি—কিন্তু বিরহের চেয়ে কোমরে বাতটা বেশি গুরুতর বোধ হচ্ছে। কবিরা যাই বলুন, আমি এবার টের পেয়েছি বাতের কাছে বিরহ লাগে না।'[৪] শ্রীশচন্দ্র তাঁর চিঠিতে 'হিন্দু বিবাহ'-শীর্ষক বক্তৃতায় উক্ত বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত সম্পর্কে সম্ভবত কোনো প্রশ্ন তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে জানাচ্ছেন : 'বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আপনি প্রশ্ন করেছেন সে বিষয় পরে উত্থাপন করা যাবে; আপাতত এই বলে রাখছি, বাল্যবিবাহ যে ইচ্ছে করুক, কিন্তু কোমরে বাত যেন কারও না হয়।'[৫]

কলকাতায় ফিরে এসেও রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'এখনো মনে পড়ে আমাদের পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির তেতলার ঘরে রবিকাকা একটা একহারা খাটে উপুড় হয়ে পড়ে বুকে বালিশ দিয়ে শ্লেটের উপর মায়ার খেলার গান লিখছেন এবং গুন গুন করে সুর দিচ্ছেন।'[৬] গীতিনাট্যটি এই সময়েই লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল কি-না আমরা জানি না। তবে এর অভিনয় হয়েছিল এক বছরেরও বেশি পরে ১৫ পৌষ ১২৯৫ [শনি 29 Dec 1888] তারিখে। সে-প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব।

মায়ার খেলা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় গীতিনাট্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া-র সঙ্গে এর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন : "'মায়ার খেলা' বলিয়া আর একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।"[১] অন্যত্র তিনি একই কথা বলেছেন একটু অন্যভাবে : 'বাল্মীকিপ্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। ··· মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ

পেল সত্যকার নারী।'[২] বাল্মীকিপ্রতিভা-য় নাট্যসংলাপগুলিকে সুর করে অভিনয় করা হয়েছিল, এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গান ভাব-অনুযায়ী বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখে ব্যবহার করা হয়েছে—সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথকে 'এই নাট্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা' বিবৃত করতে হয়েছিল, নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ হইতে পারে।' 'প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন'-এ এ-ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন : 'ইহার আখ্যানভাগ কোনো সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজনিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীত ভাবে ভরসা করি, এই গ্রন্থে সাধারণ মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই।'—কিন্তু এ-কথা বিশেষভাবে জানাবার কী দরকার পড়েছিল, আমাদের জানা নেই।

মায়ার খেলা-তে তিনটি গান ছাড়া আর সবগুলিই নূতন। পুরোনো তিনটি গান হ'ল : (১) 'সখী, সে গেল কোথায়' (২) 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে' ও (৩) 'কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে'; এদের মধ্যে প্রথমটি রবিচ্ছায়া-তে, দ্বিতীয়টি কড়ি ও কোমল-এ এবং তৃতীয়টি প্রথমে পুষ্পাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে ও পরে রবিচ্ছায়া-য় সংকলিত হয়। তাছাড়া 'দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে' গানটির পূর্বরূপ দেখা যায় ভগ্নহৃদয় কাব্যে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটকে গৃহীত 'দে লো সখি দে পরাইয়ে চুলে' গানটিতে [দ্র রবিজীবনী ২।৯৮-৯৯]।

শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলা-কে নৃত্যনাট্যে পরিণত করেছিলেন [অগ্র° ১৩৪৫]।

মৃণালিনী দেবী, মাধুরীলতা প্রভৃতি কার্ত্তিক মাসের কোন্ সময়ে দার্জিলিং থেকে ফিরে এসেছিলেন, নিশ্চিত করে বলা শক্ত। কিন্তু ইন্দিরা দেবী মাধুরীলতার প্রথম জন্মবার্ষিকী [৯ কার্ত্তিক মঙ্গল 25 Oct] উপলক্ষে তাঁর যে 'জীবনী' লিখেছিলেন, তা থেকে মনে হয় এর আগেই তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'তখন ওঁরা দার্জিলিং থেকে ফিরে এসেছেন এবং আমাকে আনতে লরেটো স্কুলে যে গাড়ি যেত তাতে বেলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—আমি কখনো ভুলব না যে গাড়িতে উঠতে গিয়ে, সেই আপেল ফলের মতো রাঙা টুকটুকে গাল ও কোঁকড়া চুলওয়ালা পুতুলটিকে হঠাৎ দেখে আমার কী অপ্রত্যাশিত আনন্দই না হয়েছিল।'[৩]

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবার [৫ অগ্র° 20 Nov] রবীন্দ্রনাথ যথারীতি মাসিক ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা উপলক্ষে আদি সমাজগৃহে উপস্থিত হন। এইদিনই সন্ধ্যাবেলায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রাঙ্গণে সাবিত্রী লাইব্রেরির অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে চন্দ্রনাথ বসু 'হিন্দু বিবাহ' প্রবন্ধ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খণ্ডন করার প্রয়াস করেন। আমরা আগেই বলেছি, উক্ত সভায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

আশ্বিন-কার্ত্তিক দু'টি মাস 'গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত' হয়েছিল, অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি কাব্যরস সেই স্থান গ্রহণ করল। ১৩ থেকে ২৩ অগ্রহায়ণের মধ্যে তিনি ন'টি কবিতা লিখলেন মাত্র পাঁচ দিনে। কবিতাগুলি হ'ল :

১৩ [সোম 28 Nov] 'নিস্ফল কামনা' ['বৃথা এ ক্রন্দন'] [৪৯, পার্ক স্ট্রীট]

মানসী ২। ১৩২-৩৫

১৪ মঙ্গল [29 Nov] 'বিচ্ছেদের শান্তি' ['সেই ভালো, তবে তুমি যাও'] [,,]

মানসী ২। ১৩৭-৩৮

১৫ [বুধ 30 Nov] 'সংশয়ের আবেগ' ['ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে'] [,,]

১৫ বুধ [,,] 'তবু' ['তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি'] [,,]

মানসী ২। ১৩৮-৩৯

১৮ শনি [3 Dec] 'নিস্ফল প্রয়াস' ['ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন'],,

মানসী ২। ১৬৪

১৮ [,,] 'হৃদয়ের ধন' ['কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি] [,,]

মানসী ২। ১৬৪-৬৫

১৮ [,,] 'নিভৃত আশ্রম' ['সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে'] [,,] মানসী ২। ১৬৫

২১ মঙ্গল [6 Dec] 'নারীর উক্তি' ['মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক'] [,,] মানসী ২। ১৬৬-৬৯

২৩ [বৃহ ৪ Dec] 'পুরুষের উক্তি' ['যেদিন সে প্রথম দেখিনু'],, মানসী ২। ১৬৯-৭৩

কবিতাগুলি মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থে কতখানি এলোমেলোভাবে সাজানো পৃষ্ঠা-নির্দেশের দিকে তাকালেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন। পাণ্ডুলিপিতেও এগুলি পরম্পরাক্রমেই লেখা হয়েছে। জানি না, কড়ি ও কোমল-এর মতো মানসী-র কবিতাগুলি 'যথোচিত পর্যায়ে' সাজানোর দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করেছিলেন কি-না—কিন্তু গ্রন্থে এগুলিকে যেভাবে পাওয়া যায়, তাতে সংগতির অভাব লক্ষিত হয়। আমাদের মনে হয়, উপরের কবিতাগুলি একই ভাবানুষঙ্গে গ্রথিত—ন'টি কবিতার মধ্য দিয়েই প্রেমের চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব, সংশয় ও অতৃপ্তি ভাষারূপ লাভ করেছে।

৪ পৌষ [রবি 18 Dec] মাসিক ব্রাহ্মসমাজের দিন। তাছাড়াও এইদিন একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। গত বৎসর বৈশাখ মাসে দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ও দৌহিত্রদের অনেকের উপনয়ন হয়েছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও মহর্ষি পরিবারের রীতি অনুযায়ী এইদিন তাঁদের ব্রহ্মদীক্ষা হয়। ক্যাশবহি-র হিসাবে আছে : 'নীতেন্দ্র [নীতীন্দ্র], হিতেন্দ্র, সুধীন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র, বলেন্দ্র, জ্যোৎস্না ও সুরেন্দ্রবাবু মহাশয়দিগের ৪ পৌষ দীক্ষা হয় তাহার ব্যয় ২৫৩॥৩' এবং 'দীক্ষা উপলক্ষে রবীবাবু ও ছোটবাবু আসিবার গাড়ীভাড়া ১॥ ০'—অনুষ্ঠানটি সমারোহপূর্ণ হয়েছিল। এই হিসাবে একজনের নাম নেই, তিনি হলেন হেমেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ—তত্ত্ববোধিনী-র 'আয়ব্যয়ে'র হিসাবে এঁর নাম পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু উপনয়ন উপলক্ষে যেমন 'আশীর্বাদ' কবিতা রচনা করেছিলেন, দীক্ষা উপলক্ষে সেরূপ কোনো কবিতা বা গান রচিত হয়েছিল কি-না জানা যায় না। অথবা এই উপলক্ষে রচিত কোনো গান এক মাস পরে মাঘোৎসবের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল?

২ মাঘ [রবি 15 Jan 1888] মাসিক সমাজ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় আসেন : 'মাসিক সমাজ উপলক্ষে রবীবাবু সুরেনবাবু ও বিবি এ বাটীতে আসায় আহারের ব্যয় বিঃ ২ মাঘের ১ বৌচর'। তিনি এই সময়ে সম্ভবত পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে আবার জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসেন। 'বাটীর মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের ঘরের কজা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন কজা দিয়া মেরামত' ও

'বাটীর মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয় যে ঘরে থাকেন ঐ ঘরের নীচে বাগানের দিকের জায়গায় জঙ্গল থাকায় সাফ করানো ব্যয়'—১৫ মাঘের এই দু'টি হিসাব এরূপ অনুমানের কারণ।

১১ মাঘ [মঙ্গল 24 Jan] অষ্টপঞ্চাশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে তিনি ১৭টি গান রচনা করেন, তার মধ্যে প্রাতে মহর্ষিভবনের বহিঃপ্রাঙ্গনে ৮টি ও সন্ধ্যায় ৯টি গান গীত হয়। গানগুলি হ'ল :

[১] ভৈরোঁ-কাওয়ালি। তুমি আপনি জাগাও মোরে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৯৯; গীত ১। ১২১; স্বর ৪; মূল গান : 'জাগো মোহ প্যারে' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৭৯

[২] নাচারী তোড়ি-ধামার। নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০১; গীত ১। ১২১; স্বর ৪; মূল গান : 'স্বতিন মদ মাধো, খেলে হোরি' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৪৩

[৩] বিভাস-চৌতাল। জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহল মাঝে দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০১; গীত ১। ১৫৪; স্বর ২৪; মূল গান : 'উঁচি চিব ক্যোঁ নারী' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ১১

[৪] ভৈরবী-চৌতাল। কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০১-০২; গীত, ১। ১৭৭; স্বর ৪; মূল গান : 'বাবরে কি সঙ্গসাথ' দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৪

[৫] দেওগির বেলাবলী-আড়াচৌতাল। সবে আনন্দ করো দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০২; গীত ১। ১২০; স্বর ২৪; মূলগান : 'সুখ আনন্দ করো' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৫৯

[৬] বেলাবলী-রূপক। হে মন তাঁরে দেখো দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০২; গীত ৩। ৮৪৫; স্বর ২৪; মূল গান : 'এ মনকে আঁখ ভেখ' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৬৫

[৭] বেলাবলী-চৌতাল। আজি হেরি সংসার অমৃতময় দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০২; গীত ১। ২১৩; স্বর ২৩; মূলগান : 'এরি পরমেশ্বর দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২১

[৮] ভৈরবী-একতালা। তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০২; গীত ১। ৫২; স্বর ২৫; মূল গান : 'মেরে গিরিধর গোপাল' দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৭

[৯] পূরবী কাওয়ালি। শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ১৮১; গীত ১। ১৮১; স্বর ৪; গানটি পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত জানা গেলেও মূল গানের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

[১০] কল্যাণ-চৌতাল। পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০৬; গীত ১। ১৭০-৭১; স্বর ; ২২; মূল গান : 'পূর্ণ ব্রহ্ম' দু ত্রিবেণীসংগম। ২৯

[১১] মারু কেদারা-চৌতাল। অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০৬; গীত ১। ১৬৪; স্বর ২৫; মূল গান : 'সকল গুণ প্রকাশ করলে' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ২৫

[১২] কাফি-চৌতাল। আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০৬; গীত ১। ১৭১; স্বর ২২; মূল গান : 'কৈসে অব ধরো ধীর' দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২০

[১৩] কানাড়া-চৌতাল। জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০৭; গীত ১। ১৮৬; স্বর ৮; মূলগান : 'অচল বিরাজ হো' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ১০

[১৪] সিন্ধুড়া-কাওয়ালী। জরজর প্রাণে নাথ বরিষণ কর দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০৭; গীত ১। ২০২; স্বর ২২; মূল গান : 'অব তেরি বাঁকি বাঁকি দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৭৩

[১৫] শঙ্করা-চৌতাল। জাগিতে হবে রে দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০৭; গীত ১। ৮২; স্বর ৪৫

[১৬] সুহা কানাড়া-কাওয়ালি। নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০৭; গীত ১। ১৭০; স্বর ২২; মূল গান : 'বলমারে চুনরিয়া' দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮২-৮৩।

[১৭] সিন্ধু-ঠুংরি। হৃদয় বেদনা বহিয়া দ্র তত্ত্ব°, ঐ। ২০৭; গীত ১। ১৬৫; স্বর ২৫; গানটি পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত জানা গেলেও মূল গানের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

উপরের তালিকায় দেখা যায়, ১৫-সংখ্যক গান 'জাগিতে হবে রে' ছাড়া বাকি গানগুলি পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত ও উক্ত গানটির শব্দবিন্যাস দেখলে ও গানটি শুনলে কোনো সংশয় থাকে না যে, এটিও কোনো ধ্রুপদ ভেঙে রচনা করা হয়েছিল। এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন বদ্রিনাথ শুক্ল।[১] সম্ভবত তাঁর কাছ থেকে মূল গানগুলি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি এই সময়ে আঁকা হয়। ক্যাশবহি ২৬ মাঘ তার হিসাবটুকু মাত্র রক্ষা করেছে : 'ব°বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উঁহার প্রতিমূর্তি তৈয়ারির ব্যয় শোধ দেওয়া যায় ··· ৪০০্ -কে ছবিটি এঁকেছিলেন এবং সেটি কোন্ ছবি তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। আমরা জানি, জে. আরচার নামক এক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও শিশু মাধুরীলতার একটি ছবি এঁকেছিলেন। বর্তমান হিসাবে যে চিত্রটির কথা বলা হয়েছে, সেটি এই ছবি হওয়া খুবই সম্ভব। ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র ঠাকুর এই চিত্রটি সম্পর্কে লিখেছেন : 'কলিকাতায় আমার পঠদ্দশায় Mr. Hocher R A [?] প্রসিদ্ধ চিত্রকর ভারতে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি রবিবাবু ও তাঁহার প্রথমা কন্যার একটা রঙীন (crayon) চিত্র আঁকিতেছিলেন। আমি যখন কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহার চিত্রাগারে গিয়াছিলাম, তখন দেখিয়াছিলাম, এই বৃদ্ধ চিত্রকর অতি সন্তর্পণে ও মনোনিবেশপূর্ব্বক এই চিত্রখানি লিখিতেছেন। চিত্রকরের সহিত আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। রবির ছবি দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "Christ-এর মতন ইঁহার মুখশ্রী। ইনি সময়ে খৃষ্টান না হউন, Christ-কে প্রেম করিবেন।"'[১] উল্লেখ্য, এক বছর পরে জে আরচার মহর্ষির একটি তৈলচিত্র অঙ্কন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার প্রত্যেকটি সিটিং-এ উপস্থিত থাকতেন।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গাজিপুর যাওয়ার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। ১ ফাল্গুন [রবি 12 Feb 1888] তিনি মাসিক সমাজে যোগ দিয়েছিলেন ক্যাশবহি-তে তার হিসাব আছে : 'মাসিক সমাজ উপলক্ষে ছোটবাবু, রবীন্দ্র, রমণীবাবুদিগের খাবার খরচ বিঃ ১ ফাল্গুনের ১ বৌচার'। কিন্তু এর পর কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি যে গাজিপুর চলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ ৯ ফাল্গুনের একটি হিসাব : 'ব°বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উঁহাকে সাহায্য গুঃ বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর গাজিপুর উঁহার নিকট ইনসিওর করিয়া পাঠান হয় ১০০০'। হিসাবটি দেবেন্দ্রনাথের 'নিজ স্বতন্ত্র ক্যাশবহি'-র, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গাজিপুর-বাসের সংকল্পে পিতার অনুমতি ও আনুকূল্যেরই প্রমাণ। অবশ্য মহর্ষির অনুমতি ছাড়া তাঁর জীবৎকালে ঠাকুরপরিবারের কারোর পক্ষে কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল না।

বিশেষ করে গাজিপুরকেই রবীন্দ্রনাথ বসবাসের জন্য কেন বেছে নিয়েছিলেন, বহুকাল পরে তার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্ররচনাবলী-তে মানসী কাব্যের 'সূচনা'-য় [পৌষ ১৩৪৬] : 'বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ

দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহুশতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতন এবং নব নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্রবর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম ভারতের কোনো এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। ··· এত দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত। আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। ··· এখানে ছিলেন আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়, আফিম-বিভাগের একজন বড়ো কর্মচারী। এখানে আমার সমস্ত ব্যবস্থা সহজ হল তাঁরই সাহায্যে। একখানা বড় বাংলো পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়।'[২]

কলকাতা থেকে তখনকার দিনে গাজিপুর যাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। শ্রাবণ ১২৯৫-এ স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গাজিপুর গিয়েছিলেন, তাঁর লেখা 'গাজিপুর-পত্র' থেকে [ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬] পথের খানিকটা হদিশ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, রাত্রে হাওড়া থেকে মেল ট্রেনে চড়ে পরদিন বেলা প্রায় দেড়টার সময়ে দিলদারনগরে নেমে তাড়িঘাটের ট্রেনে চড়তে হয়, তাড়িঘাটে স্টীমারে চড়ে গঙ্গা পেরোলে অপর পারে গাজিপুর। ঘাট থেকে ঘোড়ার গাড়িতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ গেলে ইংরেজ-পাড়ায় রবীন্দ্রনাথ-কথিত সেই বাংলো বাড়ি। পথ কষ্টকর সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আরও বারকয়েক এই পথে যাওয়া-আসা করেছেন—এবং তাও আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে আসার জন্যে—এতে বোঝা যায়, এই পথ-ভ্রমণে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।

গাজিপুর-বাস রবীন্দ্রনাথের জীবনে সুফলপ্রসূ হয়েছিল। অন্তত ২৮টি কবিতা তিনি এখানে রচনা করেছিলেন। গানে-গল্পে-ভ্রমণে ছোটো একটি গণ্ডির মধ্যে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার এমন নিরঙ্কুশ সুযোগ তাঁর জীবনে খুব কমই এসেছে। বিষয়-কর্মের কোনো দায়িত্ব নেই, কিছু পরিমাণে অর্থাভাবের জন্য ঋণ করা ও শোধ দেবার ভাবনা ছাড়া আর কোনো বৈষয়িক চিন্তা করারও প্রয়োজন ছিল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিশেবে যে-টুকু কাজ করতে হ'ত, চৈত্র মাস থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে 'সহযোগী সম্পাদক' নিযুক্ত করে মহর্ষি তা থেকেও পুত্রকে মুক্ত করেছেন। এখন যা কিছু সংকট—তা ব্যক্তি ও কবিমানসের। ব্যক্তি হিসেবে স্ত্রীকে এই প্রথম নিজের সংসারে একান্ত ক'রে পেলেন—নূতন পরিবেশে নূতন করে স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর সুখী হওয়ারই কথা। অপরপক্ষে মৃণালিনী দেবীও স্বামী-সন্তান নিয়ে নিজের ছোট্ট সংসারটিতে তৃপ্তিলাভ করেছিলেন, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়ায় লিখেছিলেন : 'আমি যখন গাজিপুরে থাকতুম তখন ইংরেজরা মনে করত, আমোদ প্রমোদ খেলা ও সঙ্গ-অভাবে আমি বুঝি ভারী ম্রিয়মাণ হয়ে আছি। তাই আমাকে ক্রমাগত নিমন্ত্রণ করত এবং ক্লাবের মেম্বর হবার জন্যে অনুরোধ করত। আমি যে আমার ঘরের কোণে সন্ধ্যেবেলা আলোটি জ্বেলে আমার আপনার লোক নিয়ে কত সুখে থাকতুম তা তারা বুঝতে পারত না।'[১] চৈত্র মাসের মাঝামাঝি তিনি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি আর একটি সন্তানের পিতা হতে চলেছেন। কিশোরী বধূর প্রতি প্রীতি ও যত্ন এই সংবাদে আরো বেড়ে যাবার কথা।

কিন্তু কবিমানসের ছবিটি এই সময়ে দুর্লক্ষ্য। ২৩ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ 'পুরুষের উক্তি' কবিতাটি লেখেন। তারপর মাঘোৎসবের গান রচনা ছাড়া আর কিছু তিনি লেখেননি। গাজিপুরের নূতন পরিবেশে এসেও তাঁর

লেখনী নিশ্চল থেকেছে—ফাল্গুন-চৈত্র মাসেও কোনো কবিতা নেই। আবার কাব্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ মিলেছে পর বৎসর ১১ বৈশাখে। কিন্তু সেই সময়ে যে কবিতাগুলি লিখলেন, তা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর—তাঁর ব্যক্তিমানসের যে আনুমানিক ও সম্ভাব্য রূপটি আমরা এখানে অঙ্কন করেছি, তার সঙ্গে প্রায় কিছুই মেলে না। যথাস্থানে আমরা সে-প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন [1858-1920] গাজিপুরের অধিবাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় গাজিপুরেই। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমি তখন গাজিপুরে অবস্থান করি। একদিন শুনিলাম কবিবর রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে আসিয়াছেন। রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও উর্ম্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার নির্ঝরিণী কাব্যের "আঁখির মিলন" কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।[২] তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আলাপ না থাকিলেও পত্রের দ্বারায় পরিচয় হইল। ··· গাজিপুরে অবস্থানকালে রবিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সে এক মহা আনন্দের—আমার জীবনের দোলপূর্ণিমার দিন ছিল। নিত্য উৎসব, নিত্য পার্ব্বণ! আমার অপ্রকাশিত কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতাম—তিনি আনন্দিত হইয়া শুনিতেন। তিনিও আপনার অপ্রকাশিত নূতন কবিতাগুলি আমাকে শুনাইতেন। আমি হর্ষবিহ্বল হইয়া শুনিতাম। তখনকার রবিবাবুর যেমন দেবকান্তি, তেমনই সুন্দর কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি। আমরা দুইজনে একপ্রকার Mutual Adulation Society করিয়া তুলিয়াছিলাম।'[৩]

এই বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। 'কবি-ভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্য [১৩০০] উৎসর্গ করেন। দেবেন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার। 'শিশু-মঙ্গল' কবিতাগুচ্ছে [সাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩০০।৫৩৮-৪৩] রবীন্দ্র-কন্যা 'মাধুরী'র উদ্দেশে একটি সনেট উৎসর্গিত হয় [পৃ ৫৪২]। 'গাজিপুরে অবস্থিতিকালে কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের "মাধুরী" নামক কন্যাটিকে দেখিয়াছিলাম। তাহার আদরের নাম "বেলা"। কন্যাটি সাক্ষাৎ মাধুরী। এই কবিতাটি তাহার ক্ষুদ্র করকমলে উপহারস্বরূপ অর্পিত হইল' টীকা-সহ কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এর শেষ চারটি ছত্র আমরা উদ্ধার করছি :

> হাসি ফুল্ল মৃণালিনী, "আদুরী" বলিয়া,
> সৌরভে ভরিয়া দিল চুমিয়া চুমিয়া।
> আনন্দ-মদিরা কবি পিয়ে আঁখি ভরি,
> দুহিতার নাম মরি রাখিল "মাধুরী"।

রবীন্দ্রনাথের প্রবাসের একমাস পূর্ণ হবার মুখেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গাজিপুরে গিয়ে তাঁকে সঙ্গ দেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের তালিকায় দেখা যায়, তিনি 18 Mar [রবি ৬ চৈত্র] গগনচন্দ্র রায়ের একটি ছবি এঁকেছেন। ইন্দিরা দেবীও সেখানে ছিলেন—তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই গাজিপুরে গিয়েছিলেন, না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যান বলা শক্ত—তাঁর ছবি আঁকা হয় এক সপ্তাহ পরে 25 Mar [রবি ১৩ চৈত্র]। এইদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি মালীর ছবিও আঁকেন 'with phrenological notes'। মাথার গঠন দেখে মানুষের চরিত্র নির্ণয়ের চেষ্টা তাঁর অন্যতম ব্যসন ছিল, এখানেও সেই কাজে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে আছে : 'সেখানে জেলের ডাক্তার Robertson সাহেবের সঙ্গে তাঁহার খুব আলাপ হইয়াছিল।

… জ্যোতিবাবু তাঁহার মাথা দেখিয়া ও চরিত্রবর্ণনা করিয়া, একখানি কাগজে তাঁর চরিত্রবিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি জ্যোতিবাবুর উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এইখানে জ্যোতিবাবু সাহেবের অনুমতি অনুসারে, জেলের সব বেড়ী-পায়ে বদ্‌মাইস্ কয়েদীদেরও ছবি আঁকিয়া মাথা পরীক্ষা করিয়াছিলেন।'[১] এই উক্তির প্রমাণ আছে তাঁর স্কেচের খাতায়। Dr. Robertson-এর ছবি ছাড়াও 5 Apr [বৃহ ২৪ চৈত্র] জেল-ভাঙা কয়েদী ইয়ানু ['Ianoo'], দাঙ্গাপরাধী আলি শেখ, অস্বাভাবিক অপরাধের জন্য বন্দী সালারু ['Salaroo'] প্রভৃতির স্কেচ করেন। শিরোমিতি-বিদ্যা অনুসারে তিনি এদের মাথাও নিশ্চয়ই পরীক্ষা করেছিলেন।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মাথাও তিনি পরীক্ষা করেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন:'একদিন গ্রীষ্মকালে সেই বাটীতে গিয়া আমি আমার "কবিপঞ্জিকা"র কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম গৃহাভ্যন্তর হইতে একটি সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি যুবক আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। ইনিই বঙ্গসাহিত্য-কণ্ঠহার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। যথাবিহিত পরিচয়ের পর জ্যোতিবাবু আমার মাথা examine করিলেন। শুনিলাম তিনি একজন খুব ভাল phrenologist।'[২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্ভবত বৈশাখ ১২৯৫-এর প্রথম সপ্তাহে ইন্দিরা দেবীকে নিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর ছবির তালিকায় দেখা যায়, গাজিপুর অবস্থানকালের শেষ ছবি আঁকা হয়েছে 15 Apr [রবি ৪ বৈশাখ] রায় লালদা প্রসাদ ও ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক দুই ব্যক্তির। মনে হয়, এর পরেই তিনি কলকাতায় ফিরে যান। ইন্দিরা দেবীর ফিরে যাওয়ার কথা আমরা অনুমান করেছি তার কারণ এই যে, আমাদের ধারণা ২৩ বৈশাখে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'পত্রের প্রত্যাশা [দ্র মানসী ২।১৮১-৮৩] কবিতাটি তিনি ইন্দিরা দেবীকে উদ্দেশ করেই লিখেছিলেন। এর অনতিকাল পরে তিনি কলকাতায় গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ও সরলা দেবীর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীকেও গাজিপুরে নিয়ে আসেন।

এরই মধ্যে 'সমালোচনা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশ তারিখ 26 Mar 1888 [সোম ১৪ চৈত্র], মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

সমালোচনা।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কলিকাতা।/পিপেল্‌স্ প্রেসে/ শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত / সন ১২৯৪ সাল।/মূল্য ১্ এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬ [আখ্যাপত্র; উৎসর্গপত্র, সূচী]+১৬৭

ইতিপূর্বে 'কড়ি ও কোমল' উৎসর্গ করেছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথকে, 'সমালোচনা' উৎসর্গিত হল মেজবউঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে :

উৎসর্গপত্র।/পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কর-কমলে/স্নেহের সামান্য প্রতিদান স্বরূপ এই গ্রন্থ/ সাদরে সমর্পিত হইল।

সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দুর্বলতা ছিল—ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরাকে উৎসর্গ করেছিলেন 'প্রভাতসংগীত', ১২৯৭ সালে সুরেন্দ্রনাথকে 'বিসর্জন' নাটকটি উৎসর্গ করলে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়।

'সমালোচনা' রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ প্রবন্ধ-গ্রন্থ, ১২৮৭-৯১ এই পাঁচ বৎসরের নির্বাচিত রচনা-সংগ্রহ। গ্রন্থটিতে যোলোটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

দেবেন্দ্রনাথ চুঁচুড়ার বাড়ি থেকে কলকাতায় এসে চৌরঙ্গির ৩ নং মিডলটন রোডের বাড়িতে উঠেছিলেন। 'এক মাস সেখানে থাকিয়া তিনি এতটুকু বল পাইলেন যে দুইজন মানুষের কাঁধে ভর করিয়া একটু চলিতে ফিরিতে পারেন। তখন তিনি বলিলেন, "এই কলিকাতার বদ্ধ বাতাস ও আকাশের মধ্যে আর আমি থাকিতে পারি না। আমি দার্জিলিং যাইব।" একবার সংকল্প স্থির হইলে তাঁহাকে টলানো কাহারো সাধ্য ছিল না। তিনি দার্জিলিঙে গেলেন।'[৩] ১৯ বৈশাখ [রবি 1 May 1887] তিনি প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং যাত্রা করেন। ২৪৩ টাকা মাসিক ভাড়ায় তাঁর জন্য Castleton Houseটি নেওয়া হয়। 'কিন্তু দার্জিলিঙের জলহাওয়া তাঁহার দুর্বল শরীরে সহ্য হইল না—তাঁহার কাশি হইল ও অন্ত্রের ব্যথা বাড়িল।'[১] দার্জিলিং থেকে তিনি চুঁচুড়ায় পৌঁছন ১৭ আষাঢ় [বৃহ 30 Jun]; সেখান থেকে কয়েকদিন পরে আবার স্টীমারে কলকাতায় এসে আগের বাড়িতেই ওঠেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল তিনি এই বাড়িতেই থাকবেন, সেজন্য 'এগ্রীমেন্ট লেখাপড়া' করাও হয়—কিন্তু কয়েক মাস পরে ১৮ অগ্র° [3 Dec]-এর হিসাবে দেখি : 'ব' গ্রেগেরী সাহেব উকিল/দং শ্রীযুক্ত কর্তাবাবু মহাশয়ের থাকিবার পার্ক স্ট্রীটের ৫২/২ নং বাটীর ২ বৎসরের জন্য এগ্রীমেন্ট লেখাপড়া হইবায় উক্ত উকীলের ফি দেওয়া যায়'—এই সময় থেকে তিনি উক্ত বাড়িতে বাস করতে থাকেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠাকন্যা সৌদামিনী দেবীও এই বাড়িতে তাঁর সঙ্গী হন। দু' বছর পরে তাঁর জন্য অন্য বাড়ি খোঁজা হলেও শেষ পর্যন্ত এখানেই থেকে যান। ২৬ কার্ত্তিক ১৩০৫ [শুক্র 11 Nov 1898] তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরে আসেন। তার আগে পর্যন্ত সুদীর্ঘ এগারো বৎসর এই ৫২/২ পার্ক স্ট্রীটই ছিল তাঁর বাসস্থান—জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ভাগ্যচক্র এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হত।

এই বছরের শুরুতেই জোড়াসাঁকো-বাড়ির ভূগোলে একটি পরিবর্তন হয়েছিল। জীবনস্মৃতি-তে বর্ণিত পুষ্করিণীটির কথা সকলের মনে আছে : 'জানালার নিচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী।'[২] রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছিলেন : 'কিন্তু হায়, সে-বট এখন কোথায়! যে-পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই'[৩] —সেই পুকুরটি এই বৎসরই বুজিয়ে ফেলা হয়। বটগাছটি আগেই গিয়েছিল—অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সেই বটগাছ আধখানা হয়ে গেল বারে বারে বাল্মীকিপ্রতিভার স্টেজের সাজ জোগাড়ে। যখনই স্টেজ হত, বেচারা বটগাছের উপরে কোপ, তার পরে যেটুকু বাকি ছিল একদিন ঝড়ে সেটুকুও গেল পুবদিকের আকাশ শূন্য করে।'[৪] পুষ্করিণীটির মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হবার পর বৎসরের শুরুতেই ১, ৩ ও ৫ বৈশাখ পুকুরটিকে মৎস্যশূন্য করা হয়, তারপর মাটি ও রাবিশ দিয়ে ভরাট করার 'ব্যয় ২২০০্ টাকার অর্দ্ধেক নিজ বাটীর অংশের ১১০০ টাকার মধ্যে গত ২৫ আষাঢ় ৫০০্ ও ২৬ শ্রাবণ ৩০০্ একুনে ৮০০্ টাকা দেওয়া হইয়াছে বাকী নিজ রোজ সমুদায় শোধ ৩০০্'—হিসাবটি ১ আশ্বিনের। 'সাবেক পুষ্করিণীর জমির উপর বাগান করিবার জন্য একজন সাহেব নক্সা লইয়া আসায় উহার গাড়িভাড়া ব্যয় ২০ অগ্রহায়ণের বৌচর' হিসাবে পরবর্তী পরিকল্পনার কথা জানা যায়—অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বাগানটিকে 'বড়োবাগান' বলে অভিহিত করেছেন।[৫]

১০ শ্রাবণ [সোম 25 Jul] রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার অন্নপ্রাশন হয়, এইদিনই তাঁর নামকরণ হয় 'মাধুরীলতা'—একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

৯ ভাদ্র [বৃহ 25 Aug] প্রতিভাদেবী ও আশুতোষ চৌধুরীর প্রথম পুত্র আর্যকুমার জন্মগ্রহণ করেন।

সম্ভবত অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র অরুণেন্দ্রনাথের সঙ্গে বরিশালের লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়ের কন্যা চারুশীলা দেবীর বিবাহ হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে [ফাল্গুন। ২১৮] 'ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মাসের 'আয় ব্যয়'-এর বিবরণে উল্লিখিত 'শ্রীযুক্ত বাবু অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহের দান ৩০্' এরূপ অনুমানের কারণ এঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুশীলা দেবীকে দ্বিপেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন। দুই বোনই স্বল্পায়ু ছিলেন।

২০ মাঘ [বৃহ 2 Feb] হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্র অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজিনী দেবীর সঙ্গে। অ-ব্রাহ্ম পরিবার থেকে বধূ আহরণ মহর্ষি পরিবারে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এইটি লক্ষণীয় যে 'হিতুবাবুর বিবাহে ২১ রোজ কন্যার বাটীতে সর্য্য [শয্যা] তোলা ১৬্ ও গ্রামভাটী ২৫্' প্রভৃতি বাবদ ব্যয়ও করা হয়। প্রতিভা দেবীর সন্তান জন্মের পূর্বে 'সাধ উপলক্ষে ও পরে 'আটকড়িয়ের খরচ জন্য' ব্যয়ের হিসাবও পাওয়া যায়। পৌত্তলিকতা-মুক্ত হিন্দু আচার পালনে মহর্ষির কোনো আপত্তি ছিল না, এগুলি তারই প্রমাণ।

৪ পৌষ [রবি 18 Dec] হিতেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ ও জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা হয়।

৯ চৈত্র [বুধ 21 Mar] গগনেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান জ্যেষ্ঠ পুত্র গেহেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এই খবর মহর্ষির কাছে পৌঁছলে তিনি কত খুশি হন তার নিদর্শন আছে একটি হিসাবে : 'শ্রীযুক্তবাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পুত্র হওয়ার সম্বাদ শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট উক্ত বাবুর চাকর লইয়া যাওয়ায় তাহাকে পুরস্কার দেওয়া যায় ১৬্'—এই টাকা তখনকার দিনে সামান্য ছিল না। এর আগে তাঁর স্ত্রীকে মহর্ষিভবনে ঘটা করে 'সাধ' দেওয়া হয়—এ-সম্পর্কে আমরা গত বৎসরের 'প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১'-এ বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী-তে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে একটি 'বিজ্ঞাপন' মুদ্রিত হয় [পত্রিকাটির পরবর্তী বহু সংখ্যায় ও তত্ত্ব-কৌমুদী-র ১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ও The Indian Messenger-এর 8 May থেকে 12 Jun ৬টি সংখ্যায় 'বিজ্ঞাপনটি' দেখা যায়] : '৫০/৬০ বৎসর হইতে চলিল এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন। এমন অনেক কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী বিচক্ষণ লোক আছেন যাঁহারা এই সমাজভুক্ত। আবার এমনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা সমাজভুক্ত না হইয়াও ইহার কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও মফস্বলে এই উভয় প্রকার লোকের সংখ্যা অল্প হইবে না। সম্প্রতি আমরা একটী ব্রাহ্মসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। যে কোনরূপে হউক যাঁহারা এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ধাম সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব।' উক্ত পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় [পৃ

৫৫] যাঁরা নাম পাঠিয়েছেন, তাঁদের একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হওয়া ছাড়া এই 'ব্রাহ্মসমিতি'র কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১১ চৈত্র 'অনরেবল্ আনন্দমোহন বসুর প্রস্তাবে কলিকাতা সিটি কলেজ ভবনে একটি কথোপকথন সমিতি হয়', সেখানে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু 'ব্রাহ্মধর্মের আপদ বিপদ' বিষয়ে একটি ভাষণ দেন।[১] দু'দিন পরে ১৩ চৈত্র রাজনারায়ণ মহর্ষিকে একটি পত্রে লেখেন : 'সে দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে আপনি যে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের চিরসম্পত্তি। আপনার দৃষ্টান্তের কথা সকল লোককে তিনি বলিয়া বেড়ান। ইহাতে কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন যে তিনি দৈবেন্দ্রিক হইয়াছেন। পরশ্বদিবস বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং গতকল্য দরবারের দলের সহিত পদ্মকুটীরে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। প্রণয়াস্পদ প্রতাপচন্দ্র বলিলেন** প্রেম না হইলে কেহ কথা শুনে না। অন্য অপেক্ষা দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি লোকের এক্ষণে প্রেম হইয়াছে, ঐক্য সাধনার্থ তাঁহার কথা এখন শুনিবে।'[২] আমাদের মনে হয়, রাজনারায়ণ বসুর উক্ত বক্তৃতা ও এই পত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার মধ্যে আদানপ্রদান বৃদ্ধির শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন। এমন প্রস্তাব বারবারই উঠেছে, কিন্তু কর্তৃত্বাভিলাষী ও আত্মাভিমানী নেতাদের জন্য সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে।

১১ মাঘ অষ্টপঞ্চাশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যের রচিত দু'টি মাত্র গান গীত হয় : (১) কাফি-কাওয়ালি। জানি তুমি মঙ্গলময় [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] ও (২) মেঘ-ধামার। নিশীথ নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখিতারা [বলেন্দ্রনাথ]।

বোলপুরের নিকটবর্তী প্রান্তরে মহর্ষি কুড়ি বিঘা জমি নিয়ে 'শান্তিনিকেতন' নামক অতিথিশালা নির্মাণ করেছিলেন, এ-সব কথা পাঠকদের জানা। পরে বিভিন্ন সময়ে মহর্ষি-পরিবারের অনেকে এবং আত্মীয়-বন্ধুরা শান্তিনিকেতনে গেছেন ও কিছুদিন অবস্থান করেছেন। মহর্ষির ভক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বোলপুরে একটি প্রার্থনা-সমাজ স্থাপিত হয়। বোলপুরের কয়েকজন ব্রাহ্মধর্মানুরাগী ব্যক্তির সহায়তায় ইনি ১৭-১৯ কার্ত্তিক ১২৯১ [শনি-সোম 1.3 Nov 1884] এই তিনদিন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব পালন করেন। তত্ত্বকৌমুদী-তে [১ অগ্র° ১৮০৬ শক। ১৭৯] এই উৎসব-সম্পর্কে লেখা হয় : '১৭ কার্ত্তিক শনিবার প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতনে উপাসকদিগের নির্জন উপাসনা, তৎপর সঙ্গীত ও প্রার্থনা। ...১৯শে কার্ত্তিক সোমবার প্রাতে শান্তিনিকেতনে উপাসনা হয়। বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।...বাবু শশীভূষণ বসু মহাশয় উৎসবের পূর্ব্বে এখানকার ধর্ম্মসভাতে 'মুক্তি কি রূপে লাভ করা যায়' এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, ও তৎপর দিন শান্তিনিকেতনে স্থানীয় ব্রাহ্ম-বন্ধুগণের সহিত উপাসনা করেন।' ১৮-২১ বৈশাখ ১২৯৩ [শুক্র সোম 30 Apr-3 May] বোলপুর প্রার্থনা সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব হয় শান্তিনিকেতনে। '১৮ই বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যার পর উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৯শে শনিবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শান্তিনিকেতনে" উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন।'[১] অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এক বন্ধু রামনাথ সামন্ত কিছুদিন পরে মহর্ষিকে এই সব কথা জানালে তিনি অঘোরনাথকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেন। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ৩২ শ্রাবণ [16 Aug] ও ২৩ কার্ত্তিক [8

Nov] তিনি মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[২] মনে হয়, এই সব ঘটনা একটি সাধন-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে মহর্ষিকে উদ্বুদ্ধ করে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ২৬ ফাল্গুন [বৃহ 8 Mar 1888] দ্বিপেন্দ্রনাথ, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে ট্রাস্টী নিযুক্ত করে একটি ট্রাস্টডীড[৩] সম্পাদন করেন। এই বাংলা ভাষায় লেখা দলিলে লিখিত হয় : '···নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রস্টডীডের লিখিত কার্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন-নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রস্টী নিযুক্ত করিতেছি···। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে।···উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রস্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোনো সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু পক্ষী মনুষ্যের মূর্তির বা চিত্রের বা কোনো চিহ্নের পূজা বা হোমযজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস-আনয়ন রা আমিষভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোনো ধর্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোনো প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজাবন্দনাদি-ধ্যানধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতিধর্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়। কোনোপ্রকার অপবিত্র আমোদপ্রমোদ হইবে না। ধর্মভাব-উদ্দীপনের জন্য ট্রস্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোনোপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না; মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে।···এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথিসৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রমধর্মের উন্নতির বিধায়ক সকলপ্রকার কর্ম করিতে পারিবেন। ট্রস্টীগণ···শান্তিনিকেতনের কার্য নির্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে পরিবর্তন করিতে পারিবেন।···' এই ডীডের উদ্দেশ্য সাধনের ব্যয় সংকুলানের জন্য মহর্ষি আনুমানিক ১৮৪৫২ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেন, যার মধ্যে শিলাইদহের নীলকুঠি এবং মুনসেৎপুর, ভরতিপাড়া ও গালিমপুরের রেশমকুঠি ছিল। ৪ কার্ত্তিক ১২৯৫ [19 Oct 1888] আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনজন ট্রাস্টীর মধ্যে রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৬ শ্রাবণ ১২৯৬ [31 Jul 1889] তাঁর দায়িত্বভার ত্যাগ করলে ৩১ শ্রাবণ [15 Aug] দ্বিপেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী শূন্যস্থানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়োগ করেন।

ট্রাস্ট ডীডের নির্দেশ অনুসারে দেবপ্রতিপালক বাবাজি (ইনি বর্ধমানের সাধুবাবাজি নামে পরিচিত ছিলেন) 'আশ্রমধারী' নিযুক্ত হন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সংবাদ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে তিনি ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ৩ চৈত্র [বৃহ 15 Mar 1888] বোলপুর ধর্মসভা গৃহে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এঁর সম্পর্কে

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'ইনি পঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। বেদান্ত অধ্যয়নের উদ্দেশে বর্দ্ধমানে আগমন করেন। রাজ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্নের নিকট তিনি বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।··· [তিনি] বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, প্রখর বুদ্ধিমান ও সুবক্তা মজলিসী লোক ছিলেন। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া তিনি সভাস্থ লোককে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকা এরূপ লোকের পক্ষে অসম্ভব, এই জন্যই বোধহয় তিনি শান্তিনিকেতনে কএকদিন অবস্থিতি করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন।'[১] অগ্র° ১২৯৫ থেকে অঘোরনাথকেই 'আশ্রমধারী' নিযুক্ত করা হয়। এর পর আট বৎসরের বেশি সময় তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

২০ চৈত্র [1Apr] শান্তিনিকেতনে বোলপুর প্রার্থনা সমাজের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব হয়। এর আগেই দেবপ্রতিপালক বাবাজি আশ্রম ত্যাগ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

1887-এর 27 Dec থেকে 29Dec [মঙ্গল-বৃহ ১৩-১৫ পৌষ] মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন মিঃ [পরে স্যার] বদরুদ্দিন তায়েবজি। ভারতে কংগ্রেসের আন্দোলনে প্রথমাবধিই একটি প্রধান অসুবিধা ছিল মুসলমান সমাজের বিরোধিতা। আলিগড়ের সৈয়দ আহমদ খান প্রকাশ্যেই কংগ্রেসে যোগদান করতে মুসলমানদের নিষেধ করতেন। তায়েবজিকে সভাপতি করার পিছনে মুসলমানদের আকর্ষণ করা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

বাংলা থেকে প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধির একটি দল B. I. S. N. কোম্পানীর S. S. Navassa জাহাজে কলকাতা থেকে মাদ্রাজ রওনা হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এই প্রতিনিধি-দলে ছিলেন। 'শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মাদ্রাজ গমন ব্যয় ২০০/৬'—ক্যাশবহিতে এইরূপ একটি হিসাব পাওয়া যায়। অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ, তৃতীয় দিনে গৃহীত একাদশ সংখ্যক প্রস্তাবটি জোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক সমর্থিত ['seconded'] হয়েছিল। প্রতিনিধিদলটি 'Brindisi' জাহাজ যোগে কলকাতায় ফিরে আসেন। যাতায়াতের পথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতখানি ব্যস্ত ছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর স্কেচের তালিকাটি দেখলে : যে ২৫ জনের ছবি তিনি এঁকেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, জয়গোপাল সোম, হেমচন্দ্র মল্লিক, মতিলাল ঘোষ, অম্বিকা মজুমদার, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নফর পালচৌধুরী, ডাঃ হাসিম, রেভাঃ গগনচন্দ্র দত্ত, রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যো, দুর্গামোহন দাস, নরসিংহ দত্ত, রামেশ্বর মালিয়া, মন্মথ মল্লিক, রাসবিহারী ঘোষের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির মধ্যে সরকারী সহযোগিতা সর্বাধিক পাওয়া গিয়েছিল এই মাদ্রাজ কংগ্রেসে। মাদ্রাজের গভর্নর Lord Connermara গভর্নর জেনারেলের পরামর্শে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু প্রতিনিধিদের সম্মানে মিঃ নর্টন-প্রদত্ত ডিনার পার্টিতে যোগ দেন ও পরের দিন সন্ধ্যায় গভর্নর হাউসে প্রতিনিধিদের চা-পানে আপ্যায়িত করেন, গভর্নরের ব্যান্ড তাঁদের স্বাগত জানায়। মাদ্রাজের শেরিফও প্রতিনিধিদের জন্য ডিনার পার্টির আয়োজন করেন।

১ ‘মোহ’, কড়ি ও কোমল ২। ৮৮

২ ‘আকাঙক্ষা’, মানসী ২। ১৪১

৩ জীবনের ঝরাপাতা। ৫২

১ ‘The Poems of Heine/ complete/ Translated into the original metres with a sketch of his life/ By/ Edgar Alfred Bowring, C. B./ London, George Belland Sons, York Street/ Covent Garden./ 1884’

২ ছিন্নপত্র [১৩৬২]। ২১, পত্র ৮; পত্রের তারিখ 27 Jul [১২ শ্রাবণ]।

৩ ঐ। ২২; রবীন্দ্রবীক্ষা-৪। ৮৬ অবলম্বনে পাঠ সংশোধিত।

১ উল্লেখ্য, বর্তমান সংখ্যার ১০০-০১ পৃষ্ঠায় ‘শ্রীমতী—’ [গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত] ‘গত চৈত্র মাসের “কাব্য। স্পষ্ট অস্পষ্ট নামক” প্রবন্ধটি দেখ’ টীকা-সহ ‘আক্ষেপ’-শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে অক্ষয়চন্দ্রের উদ্দেশে ব্যঙ্গ-বাণ নিক্ষেপ করেছেন :

হায়! কবির ঘটিল ঘোর দায়,
কৈফিয়ৎ কেমনে যোগায়!
আপনারে বোঝে না যে
বোঝাবে কাহায়? …
শোন রে প্রকৃতি শোন,
জ্বলন্ত-ভাষায়,

বরষা বর্ণনে কবি
সন্তাপ নিভায়।
‘জলদের গড়গড়ি,
শিলা ছোটে খই মুড়ি,
ব্যাঙেদের কড় কড়ি
সফুলো গলায়।

থপ্ থপ্ ছপ্ ছপ্,
কর্দ্দমে লাফায়,
ছিটাইয়া লাগে কাদা,
পথে চলা দায়”।
নগর ছাড়িল কবি,
ব্যাঙের জ্বালায়।…’

২ পাণ্ডুলিপিতে এই কবিতার প্রথম ছত্রটি ছিল : ‘বুঝেছি আমার নিশার স্বপ্ন’—‘স্বপ্ন’ শব্দটিকে যদি রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করতেন, তাহলে এই শব্দটিতেই বাংলা কবিতার স্বপ্ন সার্থক হত।

১ মানসী ২। ২০৭

১ রবীন্দ্রস্মৃতি ১৬

২ *The Indian Daily News*, June 2 [Vol. XXIII, No. 257]

১ দ্র ক্যাশবহি-র ৩০ আষাঢ়ের হিসাব : ‘১৮ রোজ ছোটবাবু দ্বিপুবাবু রুক্কিনীবাবু রবীবাবু ৪ জনের চুঁচুড়ার বাটী যাতায়াতের ব্যয়’।

১ সাহিত্য [১৩৬১]। ১৭৮

২ রবীন্দ্রবীক্ষা ৪ [পৌষ ১৩৮৪]। ৮৬, ছিন্নপত্র-এর ৮ নং পত্রের বর্জিতাংশ।

৩ চিঠিপত্র ৮। ৪৬, পত্র ৬২

৪ দ্র গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১ [১৩৮০]। ৬৩; ইন্দিরা দেবী অবশ্য বলেছেন, ‘গানটি কোনো বন্ধুকন্যার অন্নপ্রাশনের জন্য রচিত’— রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৯

৫ ছিন্নপত্র। ২২-২৩

১ তত্ত্ব-কৌমুদী, ১ ভাদ্র [১০।৯]। ১০৭

২ *The Bengalee, Sept* 10 [Vol. XXVIII, No. 37], P. 439

৩ *The Bengalee।Sept*।10 [Vo-. XXVIII, No. 37], P. 439

১ তত্ত্ব-কৌমুদী, ১ আশ্বিন [১০।১১]। ১২৯; *The Indian Messenger, The Indian Nation* প্রভৃতি পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

২ ‘হিন্দুবিবাহ’, সমাজ ১২। ৪৪০

৩ ঐ ১২। ৪২৯

৪ দ্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৯ম—১১শ বার্ষিক বিবরণী (১২৯৪—৯৬)। ১৮

৫ ‘রবিবাবু এবং বাল্য বিবাহ’, বিভা, চৈত্র ১২৯৪ [১।৭]। ৩৪২

১ অনুসন্ধান, ২৮ শ্রাবণ ১২৯৪ [১।২]। ৩২

২ ছিন্নপত্রাবলী [১৩৬৭]। ১ পত্র ১

৩ ‘দারজিলিং পত্র’, ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৫। ১৩০ - ৩১

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৩

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার দার্জিলিং এসেছিলেন আশ্বিন ১২৮৯-এ।

৩ ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৫। ১৩১-৩২

৪ ঐ, বৈশাখ ১২৯৫। ২৪

৫ ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫। ২৪

৬ জীবনের ঝরাপাতা। ৩৪

১ জীবনের ঝরাপাতা। ৩৪

২ ছিন্নপত্রাবলী। ৪, পত্র ২

৩ 'দারজিলিং', ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫। ৯৬

৪ ছিন্নপত্র। ১৯, পত্র ৭; রবীন্দ্রবীক্ষা ৪ অবলম্বনে পাঠ সংশোধিত।

৫ ঐ। ২০

৬ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩৩

১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮৩

২ 'সূচনা', বাল্মীকিপ্রতিভা ১। ২০৫

৩ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩৩

১ ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় এঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'বদ্রিদাস সুকুল নামক হিন্দুস্থানী ওস্তাদ ১৮৮৭ খৃঃ-এ সুরেনকে ও আমাকে বাইরের তেতলার ছাদে হিন্দী গান ও সেতার শেখাতে আসতেন।'

১ কলিকাতা-স্মৃতি' : মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ় ১৩২৮। ৪৩২

২ 'সূচনা', মানসী ২। ১১৫

১ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ২৩৮

২ দ্র রবিজীবনী ২। ১৮০- ৮১

৩ 'স্মৃতি', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। ১৬২- ৬৩

১ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি [২য় সং, ১৩৮৯]। ৬৯

২ 'স্মৃতি', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। ১৬৩- ৬৪

৩ অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। ৫০৪-০৫

১ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। ৫০৭

২ জীবনস্মৃতি ১৭। ২৬৯

৩ ঐ। ২৭০

৪ ঘরোয়া। ১০৫

৫ দ্র দক্ষিণের বারান্দা [১৩৮৮]। ২৪

১ দ্র তত্ত্ব°, জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক। ৩০-৩৩

২ ঐ, বৈশাখ। ১৬

১ দ্র তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৮ শক ৪৪-৪৫

২ দ্র অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন আশ্রম, শান্তিনিকেতনের স্মৃতি ও। শান্তিনিকেতনের কথা [১৩৫৭]। ৩১-৩৭

৩ দ্র তত্ত্ব°, বৈশাখ ১৮১০ শক। ১২-১৪; অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' [১৩৫৮] ৬৩-৬৮

১ শান্তিনিকেতন আশ্রম···। ৫০-৫১

অ ষ্টা বিং শ অ ধ্যা য়

১২৯৫ [1888-1889] ১৮১০ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের অষ্টাবিংশ বৎসর

১ বৈশাখ [বৃহ 12 Apr] রবীন্দ্রনাথ 'নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা (উদ্বোধন)' করতে গিয়ে বললেন : 'গত রজনীতে আমরা সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলাম।…কেবল একমাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বজননী, শ্রান্ত জগতের শিয়রে বসিয়া অসংখ্য অনিমেষ তারকা-আঁখি তাহার উপর স্থাপিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।…

'সেই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্ববিধাতার শিল্পাগার চির উন্মুক্ত—দিবা রাত্রিই তাঁহার কার্য্য অবিরাম চলিতেছে। যখন আর সকলেই নিদ্রিত থাকে, সেই বিধাতা পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার রচিত বিশ্বযন্ত্রের জীর্ণসংস্কার করিতে থাকেন—তাঁহার এই সংস্কার কার্য্য কেমন গোপনে বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে একটা রহস্যময় আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতে ভালবাসেন। যতক্ষণ তাঁহার সৃষ্টি জীবন ও সুখ সৌন্দর্য্যে পূর্ণরূপে ভূষিত না হয় ততক্ষণ তিনি তাহাকে বাহিরের পূর্ণ আলোকে আনিতে চাহেন না।…তিনি জরায়ুর অন্ধকারে অবস্থান করিয়া মানব শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোজনা করেন। তিনি অণ্ডের মধ্যে থাকিয়া পক্ষীশাবকের শরীর গঠন করেন—তিনি বীজ কোষে থাকিয়া বৃক্ষ-লতাকে পরিপুষ্ট করেন। তিনি পুরাতন বর্ষের গর্ভে নববর্ষের প্রাণ সঞ্চার করেন—তিনি করাল মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃতের আয়োজন করেন।…সেই মহা-প্রাণের বিরাম নাই—জগতের মৃত্যু নাই।—তাহা অস্তিত্বের অবসান নহে তাহা আবরণ মাত্র—তাহা প্রাণের লীন অবস্থা—তাহা নবজীবনের গূঢ় আয়োজন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যু আমাদের জীবনরঙ্গভূমির সজ্জা-গৃহ মাত্র। ইহ লোকের অভিনয়-মঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়া কিছুকাল আমরা মৃত্যুরূপ সজ্জাগৃহে বিশ্রাম করি ও পুনর্ব্বার নবসাজে সজ্জিত হইয়া জীবন-রঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করি ও নব উদ্যমে পূর্ণ হইয়া জীবনের নূতন অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

'…আইস এই নব-বর্ষের উৎসবে, আমরা তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করি, বর্ষের এই প্রথম দিনে সেই সর্বসিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের রসনাকে পবিত্র করি—এই পবিত্র দিবসে এই পবিত্র প্রাতঃকালে তাঁহারই কার্য্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।'[১] —অ-চিহ্নিত ও অগ্রন্থিত এই রবীন্দ্র-রচনাটি আনুষ্ঠানিক ও গতানুগতিক হলেও রবীন্দ্রনাথের নববর্ষের প্রথম ভাষণ ও ঈশ্বরভাবনার সমকালীন প্রকাশ হিশেবে গুরুত্ব দাবী করতে পারে [ভাষা ও ভাবের বিচারে রচনাটি রবীন্দ্রনাথের ব'লে আমরা অনুমান করেছি]। গত বৎসরে মাঘোৎসবের জন্য তিনি যে গানগুলি লিখেছিলেন,

সেগুলি ফরমায়েশি ও অধিকাংশ গানই হিন্দি-ভাঙা ব'লে সবগুলিই যে অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে এমন মনে করার কারণ নেই; তবু এর মধ্যে 'তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে' 'নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে' 'কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে' 'হৃদয়বেদনা বহিয়া, প্রভু, এসেছি তব দ্বারে' প্রভৃতি গানগুলি পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত হয়েও ভাবে ও ভাষায় হৃদয়াকূতির আভাস বহন করে। নববর্ষের এই উপাসনা সেই ঈশ্বরভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আরও একটি কারণে উপরের রচনাটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। 'যতক্ষণ তাঁহার সৃষ্টি জীবন ও সুখ সৌন্দর্য্যে পূর্ণরূপে ভূষিত না হয় ততক্ষণ তিনি তাহাকে বাহিরের পূর্ণ আলোকে আনিতে চাহেন না' ইত্যাদি বাক্য কিছুদিন পরে রচিত 'গুরু গোবিন্দ' [২৬ জ্যৈষ্ঠ] কবিতাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয়, এর আগে 'বীরগুরু' [বালক, শ্রাবণ ১২৯২। ১৬৭-৭২] রচনায় এই কথাটিই তিনি অন্যভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন, পরেও বারবার বলেছেন একথা। মানসী কাব্যের বেশিভাগ কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়নি, গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে দীর্ঘকাল পরে—মধ্যবর্তী পর্বে নিরন্তর চলেছে সংশোধন-বর্জন-পরিবর্ধনের পালা। একেও কি সৃষ্টিকার্যের নেপথ্যবিধান বলা যাবে?

নববর্ষের পরের দিন 'বই, বিজনতা এবং বন্ধু'র প্রলোভন দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে গাজিপুরে আহ্বান জানিয়েছেন : 'যদি কোন সুযোগে একবার এদিকে আস্‌তে পার তা হলে দিনকতক সম্মিলনরস সম্ভোগ করা যায়।···আমাদের বাসস্থানটি গঙ্গাতীর, বৃহৎ কানন এবং ক্ষুদ্র কুটীর। গাছে পাখী ডাক্‌ছে এবং পাশে Civil Surgeon-এর বাড়ি।'[১] প্রিয়নাথ সেন আসেননি বটে, কিন্তু তাঁর কুটীরে বন্ধু ও আত্মীয় সমাগমের অভাব ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে এসেছিলেন গত বৎসর ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিকে, কিন্তু কবিতালক্ষ্মীর সাক্ষাৎ মিলল প্রায় দু' মাস পরে বৈশাখ মাসের ১১ তারিখে [রবি 22 Apr]—কবিতার নাম 'শূন্য গৃহে' [দ্র মানসী ২।১৭৪-৭৫]। গৃহ তখন মোটেই শূন্য নয়—তরুণী বধূ, প্রস্ফুটিত বেলফুলের মত শিশু কন্যা ও আর একটি সন্তানের আবির্ভাবের ঘোষণা যখন সংসারের চিত্রটি ক্রমশই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তুলেছে, তখন তিনি কবিতায় লিখলেন :

গভীর বিদীর্ণ প্রাণ নীরব কাতর,
        রুদ্ধ অশ্রু ব্যথিছে ললাট,
স্নেহের প্রতিমা হারা
আকাশ সঙ্কীর্ণ কারা,
সম্মুখে উঠেছে যেন
        লৌহের কপাট।

নিশ্বাসে জাগিয়া উঠে "নাই" "নাই" ধ্বনি,
        চারিদিকে বিশ্বের পাষাণে
হৃদয় খুঁজিতে ধায়,

পাগল নয়নে চায়,

কাহার কঠিন বাহু

ফিরাইয়া আনে।'[২]

বাস্তবজগতের সঙ্গে কল্পনাজগতের এই বৈসাদৃশ্য প্রথমে আমাদের হতচকিত করে। কিন্তু এর একটু পরেই যখন পড়া যায়—

আছে সেই সূর্যালোক, নাই সেই হাসি—

আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ।

শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ—

রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ।[৩]

—কিংবা গ্রন্থে বর্জিত পাণ্ডুলিপির সেই শেষ স্তবকটি—

ক্ষুদ্র মানবের প্রাণে এত ঘোর ব্যথা

নিখিলে কি বুঝিবে না কেহ?

চিরদিন ছিল কাছে,

আজ, হায়, কোথা আছে!

—তখন বোঝা যায়, এই বেদনা কোনো 'মানসী'র জন্যে নয়, চার বছর আগে এই বৈশাখ মাসেই একান্ত প্রিয়জন যে নতুন বউঠানকে হারিয়ে ছিলেন তাঁরই বেদনাদায়ক স্মৃতি এই হাহাকারের মধ্যে রূপ লাভ করেছে। নববর্ষের ভাষণে তিনি মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্যের কথা বলেছিলেন দার্শনিকের মতে, কিন্তু কবিতায় প্রবল ক্ষোভের আঘাতে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানের সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে লিখেছেন :

এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট

চৌদিকের চিরনবীনতা?

সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান।

নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা!

দু'দিন পরে [১৩ বৈশাখ] লেখা 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতায় [দ্র ২।১৪৩-৪৪] এই সংশয় আরও তীব্র :

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,

আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।

—ব্যক্তিজীবনের পটভূমিকা থেকে সরিয়ে এনে কবিতাটি পড়লে মনে হবে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে একটি দার্শনিক ভাবনা এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু পাণ্ডুলিপি-তে যখন দেখি কবিতাটির নাম 'বিরহ বিলাপ' ও এর বর্জিত প্রথম স্তবকটি হল—

কে এদের নিয়ে যায়, কে এদের কাছাকাছি আনে,

বাঁধা যদি নাহি পড়ে এত দৃঢ় কেন এই স্নেহ!

দূর হতে কেন টানে

ব্যথা কেন বাজে প্রাণে

কাঁদায়ে কি ফল তবে, কাঁদিলে ফেরে না যদি কেহ!

—তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না কাকে হারিয়ে এই বিরহ-বিলাপ, বিধাতার নিষ্ঠুর সৃষ্টির সম্বন্ধে কেন এই আকুল আক্ষেপ!

পরের দিনের [১৪ বৈশাখ] কবিতা 'জীবনমধ্যাহ্ন' [দ্র ২।১৭৫-৭৮]-তে মনে হতে পারে যেন সুরের পরিবর্তন হয়েছে—'তাই আজ বার বার ধাই তব পানে/ ওহে তুমি নিখিলনির্ভর' বা 'প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান/ চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা' প্রভৃতি ছত্র পড়লে মনে হয় আগের দিনের আক্ষেপ ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে শান্তভাব ধারণ করেছে। কিন্তু ঈশ্বর-নির্ভরতা তো আগের কবিতাটিতেও ছিল :

হাসিতেছি কাঁদিতেছি প্রান্তে বসি এ বিশ্বজগতে—

সর্ব্বত্র রয়েছ তুমি পরিপূর্ণ গম্ভীর অপার।

তোমার আপনমতে

লয়ে চলিয়াছ পথে,

ভেদ করি সুখদুঃখ, মিলন বিরহ অন্ধকার।

আমি কাঁদিতেছি বলে পথ হতে ফিরাবেনা মোরে,

আমি মাগিতেছি বলে দিবে না আমার অমঙ্গল

তাইত সাহস ক'রে

কাঁদি ও চরণ ধ'রে,

যাহা মনে আসে তাই বলে যাই হৃদয়দুর্ব্বল।[১]

অপরপক্ষে প্রকৃতির শান্তিকে মায়া ব'লে সন্দেহ করেছেন ১৫ বৈশাখে লেখা 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় [দ্র ২।১৪৪-৪৭]। পাণ্ডুলিপির ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্তবক গ্রন্থে বর্জিত, আবার গ্রন্থের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম পাঁচটি স্তবকের পাঠ পাণ্ডুলিপিতে নেই অর্থাৎ পরে কোনোসময়ে যুক্ত হয়েছে। গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাটি পাঠকেরা সহজেই পড়ে নিতে পারবেন, তাই আমরা বর্জিত ৬ষ্ঠ স্তবকটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—তাতে দেখা যাবে প্রকৃতির বিচিত্র মায়াবিনী রূপের বর্ণনা-মূলক এই কবিতাটির অন্তঃপ্রেরণা সমকালীন মনোভাব থেকেই নিঃসৃত :

অধিবাণী কেন আনে হৃদয়ের মাঝে

এত স্নিগ্ধ সুখ!

ছোট ছোট বাহুগুলি এত দৃঢ় করে

কেন বাঁধি বুক!

জীবনের মাঝে হায়

কেন আঁকা রহে যায়

রক্তরেখা স্মৃতিচ্ছবি

চির মিষ্টমুখ!

—এই চির মিষ্টমুখের রক্তরেখা স্মৃতিছবি দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে বারবার রবীন্দ্রনাথের মনে হানা দিয়েছে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত বৈশাখ মাসে—তখন যে কবিতাগুলি লেখা হয়েছে সেগুলি নিছক স্মৃতিচারণ নয়, সমকালীন অন্য ধরনের মানসিক পরিবেশকে তছনছ করে তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। এই বৎসরের বৈশাখ মাসে লেখা সব ক'টি কবিতাই এর উদাহরণ, মানসী-র পাণ্ডুলিপির বর্জিত পাঠগুলি সযত্নে অনুধাবন করলে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। আমরা আশা করি, ভগ্নহৃদয়-এর 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-আধারিত' সংস্করণের [মাঘ ১৩৮৮] মতো মানসী-র এরূপ কোনো একটি সংস্করণ বা বিস্তৃত 'পাণ্ডুলিপি-পরিচয়' একদিন প্রকাশিত হবে—তখন সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এই পর্যালোচনা সহজ হবে। বর্তমানে স্বল্প মন্তব্য-সহ এই মাসে লেখা বাকি কবিতাগুলির একটি তালিকা আমরা সংকলন করে দিচ্ছি :

১৬ [শুক্র 27 Apr] 'শ্রান্তি' ['কতবার মনে করি পূর্ণিমানিশীথে'] দ্র মানসী ২।১৭৮-৭৯

পাণ্ডুলিপিতে ৫৫ ছত্র ও ৫টি স্তবকে বিভক্ত দীর্ঘ কবিতাটির নাম 'দুর্ব্বল', যার প্রথম তিনটি স্তবকই গ্রন্থে বর্জিত। প্রথম ছত্রটি : 'এ জীবন-দাহ আমি পারিনে সহিতে'।

১৭ [শনি 28 Apr] 'মরণস্বপ্ন' [কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়'] দ্র ঐ ২।১৪৮-৫১

১৯ [সোম 30 Apr] 'বিচ্ছেদ' ['ব্যাকুল নয়ন মোর, অস্তমান রবি'] দ্র ঐ ২।১৭৯-৮০

২০ [মঙ্গল 1 May] 'আকাঙক্ষা' ['আর্দ্র তীব্র পূর্ববায়ু বহিতেছে বেগে'] দ্র ঐ ২।১৪১-৪২

২১ [বুধ 2 May] 'মানসিক অভিসার' ['মনে হয় সেও যেন রয়েছে বসিয়া'] দ্র ঐ ২।১৮০-৮১

২১ [,,] 'একাল ও সেকাল'[১] ['বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী'] দ্র ঐ ২।১৩৯-৪০

২২[বৃহ 3 May] 'কুহুধ্বনি' ['প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে'] দ্র ঐ ২।১৫১-৫৪

২৩ [শুক্র 4 May] 'পত্রের প্রত্যাশা' ['চিঠি কই! দিন গেল, বইগুলো ছুঁড়ে ফেলো'] দ্র ঐ ২।১৮১-৮৩

কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো এই তালিকাটিতে পাণ্ডুলিপির ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, সেইজন্য 'মানসিক অভিসার' কবিতাটি গ্রন্থে পরে থাকলেও 'একাল ও সেকাল' কবিতাটির পূর্বে বসেছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, অগ্র° ১২৯৪-এ লেখা কবিতাগুলির মতো উপরের কবিতাগুলিও এলোমেলো ভাবে সাজানো। কিন্তু কোনো বিশেষ ভাবানুষঙ্গে কবিতাগুলিকে গ্রথিত করার উদ্দেশ্যে কালানুক্রমিকতার এই ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে, কবিতাগুলি বারবার পড়েও একথা আমাদের মনে হয়নি। সোনারতরী ও চিত্রা কাব্য দু'টিতে কয়েকটি স্থলে কালানুক্রমিকতার ব্যতিক্রম দেখা গেলেও তার পরিমাণ এত কম যে তাকে অনবধানতার ত্রুটি বলে গণ্য করা যায় এবং চৈতালি কাব্যে স্পষ্টতই ভাবের ও বিষয়ের ঐক্য বিধানের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে কালানুক্রমিকতা রক্ষা করা হয়নি। লক্ষণীয়, মানসী-র পরবর্তী কবিতাগুলি রচনার তারিখ অনুযায়ী সাজানো। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, আলোচ্য ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ঘটেছে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনের কোনো জটিল গ্রন্থি বর্তমান। বিষয়টির প্রতি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বৈশাখের শেষ কবিতা 'পত্রের প্রত্যাশা'। কলকাতার কোলাহল থেকে দূরে নিভৃত অবকাশের মধ্যে কাব্যসাধনা করবেন, রবীন্দ্রনাথের গাজিপুরে বাসা নেবার এটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তারই মধ্যে কলকাতার প্রিয়জনদের জন্যে যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছে তার একটি আভাস আছে 'মরণস্বপ্ন' কবিতায় :

স্বদেশ পূরব হতে বায়ু বহে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।

—'পত্রের প্রত্যাশা' [পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম 'চিঠির প্রতীক্ষা'] কবিতায় এই ব্যাকুলতা অস্থিরতায় পরিণত হয়েছে :

চিঠি কই! দিন গেল,   বই গুলো ছুঁড়ে ফেলো,
আর তো লাগে না ভালো ছাইপাঁশ পড়া।…
চিঠি কই! হেথা এসে   একা বসে দূর দেশে
কী পড়িব দিনশেষে সন্ধ্যার আলোকে! …
তার সেই স্নেহস্বর   ভেদি দূর-দূরান্তর
কেন এ কোলের 'পর আসে না নীরবে!

—আমাদের বিশ্বাস, যাঁর চিঠির প্রত্যাশায় রবীন্দ্রনাথের এই কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে, তিনি হচ্ছেন ইন্দিরা দেবী। এই ভ্রাতুস্পুত্রীটিকে তিনি যে কত ভালোবাসতেন, তার নানা নিদর্শন বিভিন্ন সূত্রে আমরা আগেই পেয়েছি। বর্তমান সময় থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের মনের আরও কাছাকাছি চলে এসেছেন। অনেক দিন আগে কৃষ্ণ কৃপালনী একটি সাহসী উচ্চারণ করেছিলেন : 'who [his niece Indira] seems to have partially replaced his deceased sister-in-law as his chief confidantes'[১]

—আমরা বর্তমান সময়ের ক্ষেত্রে 'partially' শব্দের পরিবর্তে 'fully' বসাতে চাই। কবিতা বা গানের মধ্য দিয়ে মনের গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করেও যেটুকু না-বলা থেকে যায়, সে-টুকু বলার জন্য সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের এমন একজনকে প্রয়োজন হয়েছে। এক সময়ে কাদম্বরী দেবী ছিলেন সেই অবলম্বন, পরবর্তী কালে রানী [নির্মলকুমারী] মহলানবিশকে আমরা সেই ভূমিকা নিতে দেখি—বর্তমান সময়ে ইন্দিরা দেবী উক্ত প্রয়োজন সাধন করেছেন। ছিন্নপত্রাবলী-র অসাধারণ পত্রগুচ্ছ এঁকেই লেখা হয়েছিল, এ-প্রসঙ্গে সে-কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে এঁদের কিছু পার্থক্য আছে। কাদম্বরী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী, এই অন্তরঙ্গ নারীকে ঘিরেই তাঁর মনের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের প্রেমভাবনা গুঞ্জরিত হয়েছে—অথচ সম্পর্কের জটিলতায় মন বারবার হয়েছে বাধাগ্রস্ত :

বৃহৎ বিষাদ ছায়া, বিরহ গভীর
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন—
নির্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন।[২]

কিন্তু অন্য দুই স্নেহাস্পদা নারীর ক্ষেত্রে সম্পর্কের এই জটিলতা ছিল না, ফলে মন সহজেই বাধামুক্ত আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। এদের মধ্যে ইন্দিরা দেবীর ভূমিকা ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ, ফলে সেই বয়সের সূক্ষ্ম মানসিক সংকট উত্তরণে তাঁর সহায়তা বারবার কার্যকরী হয়েছে। কোনো প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দ্বারা নয়, নিছক তাঁর সান্নিধ্যই স্নেহ-মমতার

উৎসটিকে উন্মুক্ত করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের জমানো অন্ধকারকে মুছে দিয়েছে। কাব্যে ব্যবহৃত প্রতীক বা রূপককে কবির জীবনের তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কোনো কোনো সময়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে জেনেও আমাদের মনে হয়, সন্ধ্যাসংগীত-এ 'হৃদয় অরণ্যে'র যে গোলকধাঁধায় তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, 'আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে/ আনিল এ অরণ্য-বাহিরে/ আনন্দের সমুদ্রের তীরে'[৩]—সেই 'পাখি' ইন্দিরা দেবী। প্রভাত-সংগীত কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন, তথ্যটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করলাম এই কারণে যে, আমাদের ধারণা, আলোচ্য পর্বেও ইন্দিরা দেবী একই ভূমিকা পালন করেছেন। আগের আলোচনায় দেখা গেছে, ১১ বৈশাখ থেকে যে কাব্যধারার সূত্রপাত হয়েছে কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি তার প্রধান আলম্বন—স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে সংসার-সুখের যে কামনা করছেন রবীন্দ্রনাথ, স্মরণের দীর্ঘনিশ্বাস বার বার তাকে ম্লান করেছে। এই সংকট থেকে মুক্তির জন্যই 'পত্রের প্রতীক্ষা', যে পত্রে—

'তুমি ভালো আছ কি না' 'আমি ভালো আছি'।
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে,
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।—
দরশ পরশ যত সকল বন্ধন গত,
মাঝে ব্যবধান কত নদীগিরিপারে—
স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে দুঁহু করস্পর্শ লয়ে
অক্ষরের মালা হয়ে বাঁধে দুজনারে।

—এই কবিতা লেখার কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতা যাত্রা করেন এবং জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় ইন্দিরা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ও সম্ভবত সরলা দেবীকে নিয়ে গাজিপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর ১১ জ্যৈষ্ঠ থেকে আবার যে কবিতাগুচ্ছ লিখিত হয়েছে তার সুর একেবারেই আলাদা।

আমরা বলেছি, গত বৎসর [১২৯৪] সরলা দেবীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন প্রথম পালিত হয়। এই বৎসর ২৫ বৈশাখ [রবি 6 May]-এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু তাঁর জন্মোৎসব যে পালিত হয়েছিল তার নিদর্শন মেলে সত্যপ্রসাদের হিসাব-খাতায় :'রবিমামার জন্মদিন উপলক্ষে ঘড়ি দেওয়া যায় তাহার মূল্য—৪\'—ঘড়িটির দাম ৪ টাকাই ছিল না, অনেকে মিলে চাঁদা করে রবীন্দ্রনাথকে ঘড়িটি দিয়েছিলেন—হিসাবটি দেখে অবশ্য সে-কথা বোঝা যায় না।

গাজিপুর-ভ্রমণ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী স্মৃতিচারণ করলেও [দ্র রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫১-৫২] তাতে রবীন্দ্রনাথের কথা নেই। তাঁকে পাওয়া যায় ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর বর্ণনায় :'ছেলেবেলা থেকেই গান গাই বটে, গান কুড়িয়ে নিই যেখান থেকে পাই—কিন্তু গানের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে প্রথম দেখতে শিখি রবিমামার সংসর্গে যখন গাজিপুরে তাঁর কাছে থাকি। সত্যি সত্যি গান জিনিষটা যে একটা যান্ত্রিক কিছু নয়—সঙ্গীতের বুকের ভিতর যে একটি দিব্যপ্রাণী বিরাজ করেন, সেই অনুভূতির একটা আবছায়া আবছায়া স্পর্শ পেতে থাকি গাজিপুরে—রবিমামার মুখে চোখে সেই সঙ্গীত দেবতার প্রতিচ্ছায়া দেখে, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় যখনি গানের

চর্চ্চায় তিনি নিযুক্ত হতেন আমাদের সঙ্গে নিয়ে—সে কোন ওস্তাদকে বসিয়ে তবলা পাখোয়াজের চাঁটিতে ধূম্‌ধূমাকারের চর্চ্চা নয়, কিম্বা নিজেরই তৈরি গান আমাদের শেখানোর চর্চ্চা নয়—সেটি সঙ্গীতের রূপ ও রসের পিছনে পিছনে নিজে ঘোরা ও আমাদের ঘোরানোর চর্চ্চা।…

'মনে পড়ে, সে দিনগুলোর কোন কোন দিন কৃষ্ণধন বাড়ুয্যের স্বরলিপির বই[১] ধরে ধরে একটি একটি গান বের করা আর ভোগ করা—যেমন, 'তুঁ কেঁউ রোদিয়া',,…আবার বেহাগে—'সাঁই তুঁহি-আঁধিরাত বারবার'—এতে কথা ও সুর দুইয়ে মিলিয়ে বেহাগের কত টানটুন, কত ঘোরফের।

'হেমচন্দ্রের "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে"তে কৃষ্ণধন বাঁড়ুয্যের বসানো সুরে গানের রূপ কতটা ফুটল না ফুটল সেটা বাজিয়ে-বাজিয়ে গেয়ে-গেয়ে ঝালানো কোন কোন দিন।

'আবার একদিন—"হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে" আমার গাওয়া এই বাউলের গানকে কোরাস্‌ গাইবার উপযোগী করার জন্যে তাকে নতুন করে গড়ে তোলা—দু-দল গলায় একই সঙ্গে গাওয়ার জন্যে তাকে দু-সুরী করা। এই দু-সুরে সাজানোর প্রচেষ্টা আরো দুই একটি গানে—যাতে যাতে খাপ খায়, তা এইখানেই আরম্ভ হয়, যেমন "এস এস বসন্ত"।

'গানের সুর চিনতে শিখেছিলাম আগে, কিন্তু সুরের রূপ চিনতে শিখলুম গাজিপুরে।'[২]

গাজিপুরের 'কবিকুঞ্জ'তে সংগীতেরও একটি বিশেষ স্থান থাকবে, রবীন্দ্রনাথ তার পরিকল্পনা পূর্ব্বেই করেছিলেন। সেই হিশেবে সত্যপ্রসাদের কাছ থেকে ধার করে একটি হারমোনিয়ম কিনেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র-বিক্রেতা হ্যারল্‌ড্‌ অ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে। কিন্তু এই সময়ে ভাইঝি-ভাগিনেয়ীদের নিয়ে সংগীতচর্চা করলেও নূতন কোনো গান রচনার কথা জানা যায় না।

গাজিপুর বাস-কালে রবীন্দ্রনাথ ১১ জ্যৈষ্ঠ থেকে দ্বিতীয় যে কবিতাগুচ্ছ রচনা করলেন তাদের মোট সংখ্যা ১৫টি :

১১ [বুধ 23 May] 'বধূ' ['বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্‌!'] দ্র মানসী ২।১৮৩-৮৬

পাঁচ মাস পরে শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে ৭ কার্ত্তিক [সোম 22 Oct] কবিতাটির ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্ধন হয়। গ্রন্থের ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ স্তবক শান্তিনিকেতনে লেখা এবং ৭ম স্তবকটি পাণ্ডুলিপিতে নেই।

১২ [বৃহ 24 May] 'ব্যক্ত প্রেম' ['কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ?'] দ্র ঐ ২।১৮৬-৮৮

৭ কার্ত্তিক কবিতাটিতে ১০ম থেকে ১৪শ স্তবকগুলি সংযোজিত হয়। দু'টি স্তবক গ্রন্থে গৃহীত হয়নি।

১৩ [শুক্র 25 May] 'গুপ্ত প্রেম' [তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে'] দ্র ঐ।১৮৯-৯১

কবিতাটিতে ৮ম ও ১৩শ স্তবক দু'টি পরে সংযোজিত। দু'টি স্তবক গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে।

১৪ [শনি 26 May] 'অপেক্ষা' ['সকল বেলা কাটিয়া গেল'] দ্র ঐ। ১৯২-৯৭

পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নাম 'অন্ধকারে'। দীর্ঘ এই কবিতাটির অনেকগুলি স্তবক গ্রন্থে বর্জিত।

জ্যৈষ্ঠের কবিতাগুচ্ছের কয়েকটি স্তর আছে, প্রথম স্তরের উপরোক্ত চারটি কবিতার আশ্রয় প্রেম। লক্ষণীয়, এদের প্রথম তিনটি অবহেলিতা নারীর উক্তি। গ্রাম্যপ্রকৃতির শান্ত পরিবেশে বড়ো-হয়ে-ওঠা একটি বালিকা বধূর বঞ্চনা-পীড়িত হৃদয়ার্তি 'বধূ' কবিতার আলম্বন। এর বাস্তব-ঘেঁষা রূপটি ধরা পড়েছিল ৯ম স্তবকের গ্রন্থে বর্জিত কয়েকটি ছত্রে :

…ডাকিয়া এনে তবু/কেন এ হেলা
স্বামী ত তিনি প্রভু/করেন কৃপা কভু
ঘুমোন পাশে শুয়ে/রাতের বেলা।…

'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' যুগ্ম-কবিতাও প্রেম-বঞ্চিত নারীর অনুযোগে মুখর। মনে হয়, বৈশাখের কবিতাগুচ্ছে অচরিতার্থ প্রেমের যে স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করেছিল, এখন তা কেটে গিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত মানসিক পরিবেশে অতীতের স্মৃতিলোক থেকে দৃষ্টি ফিরেছে অব্যবহিত বর্তমানে গার্হস্থ্য প্রেমের জগতে। কিশোরী বধূ মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথের কবিমনের অংশীদার ছিলেন না—সম্ভবত সেই মানসিকতা ও যোগ্যতাও ছিল না তাঁর; ফলে অগ্র° ১২৯৪-তে লেখা কবিতাগুলিতে প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান না পেয়ে অভিমানী কবিমন 'সংশয়ের আবেগ'-এ পীড়িত হয়ে 'পুরুষের উক্তি'-তে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিজাল রচনা করেছে। অপরদিকে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫-এর প্রথম চারটি কবিতার দৃষ্টিকোণ আলাদা—সহানুভূতির আলোকে—প্রেয়সী নয়—গৃহলক্ষ্মী নারীর হৃদয়টি উন্মোচিত হয়েছে। 'অপেক্ষা' কবিতাটি তো 'নিবিড়তম দাম্পত্যমিলনের আলেখ্য'[১]।

কয়েক দিন বাদে ১৮ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 30 May] থেকে যে কবিতা লেখা শুরু হল তার সুর একেবারে আলাদা—৩২ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 13 May] পর্যন্ত যে এগারোটি কবিতা রচিত হয়, তার একটি বাদে ['সুরদাসের প্রার্থনা'] বাকিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যবীণা 'কড়ি' সুরে ঝঙ্কৃত হয়েছে। মনে হয়, মায়ার খেলা-র গানগুলি লিখতে গিয়ে যে প্রেমের মায়াজাল তিনি রচনা করছিলেন, শেষ পর্যন্ত নিজেই বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন তাতে—তারপর ব্যক্তিগত প্রেম-অভিমান-অনুযোগ-স্মৃতি ইত্যাদি বিচিত্র জটিল দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের উচ্চাবচ অতিক্রম করে যখন দাম্পত্যপ্রেমের স্নিগ্ধ সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন তাঁর দৃষ্টি আত্মকেন্দ্রিকতা কাটিয়ে বহির্মুখী হয়েছে। কয়েক বছর আগে যখন সপরিবারে সোলাপুরে গিয়েছিলেন, নবীন প্রেমের মাধুর্যরসে অভিষিক্ত কবিমন তখন 'বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল' দেখতে পেয়ে 'আহ্বানগীত' রচনা করেছিল—আর এখন প্রায় একই ধরনের মানসিক আবহে 'দেশের উন্নতি'র বাস্তব চিত্রটিকে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কশাঘাতে জর্জরিত করলেন। কয়েক বছর পরে একটি চিঠিতে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন : 'এখন একএকবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌চে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্তপ্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করচে—সেই জন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস।'[২] 'আহ্বানগীত'-এ ছিল দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর 'দুরন্ত আশা' 'দেশের উন্নতি' 'বঙ্গবীর' 'ধর্মপ্রচার' প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস—অবশ্য দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকেই নকল দেশসেবার ভণ্ডামির প্রতি উপহাসের উদ্ভব।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫-এর অবশিষ্ট কবিতাগুলির তালিকা দেওয়া হল :

১৮ [বুধ 30 May] 'দুরন্ত আশা' ['মর্মে যবে মত্ত আশা'] দ্র মানসী ২।১৯৭-২০১

১৯ [বৃহ 31 May] 'দেশের উন্নতি' ['বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ'] দ্র ঐ ২।২০১-০৭

২১ [শনি 2 Jun] ‘বঙ্গবীর’ [‘ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে’] দ্র ঐ ২।২০৮-১২

২২/২৩ [রবি-সোম 3-4 Jun] ‘সুরদাসের প্রার্থনা [‘ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন’] দ্র ঐ ২।২১২-১৯

২৪ [মঙ্গল 5 Jun] ‘নিন্দুকের প্রতি নিবেদন’ [‘হউক ধন্য তোমার যশ’] দ্র ঐ ২।২১৯-২২

২৫ [বুধ 6 Jun] ‘কবির প্রতি নিবেদন’ [‘হেথা কেন দাঁড়ায়েছ, কবি’,] দ্র ঐ ২।২২৩-২৬

২৬ [বৃহ 7 Jun] ‘গুরু গোবিন্দ’ [‘বন্ধু, তোমরা ফিরিয়া যাও ঘরে’] দ্র কথা ৭।৬৩-৬৮

২৭ [শুক্র ৪ Jun] ‘নিষ্ফল উপহার’ [‘নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল’] দ্র মানসী, র° র°১ [প·ব·]

৭।৩৮৭-৮৮ ২৮

[শনি 9 Jun] ‘পরিত্যক্ত’ [‘বন্ধু, মনে আছে সেই প্রথম বয়স’] দ্র মানসী ২।২২৬-৩০

২৯ [রবি 10 Jun] ‘ভৈরবী গান’ [‘ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমূরতি’] দ্র ঐ ২।২৩১-৩৫

৩২ [বুধ 13 Jun] ‘ধর্মপ্রচার’ [‘ওই শোনো ভাই বিশু’] দ্র ঐ ২।২৩৬-৪২

সমকালীন পত্র-পত্রিকার সমালোচনা সম্ভবত কবিতাগুলির মূল প্রেরণা। রাজনৈতিক-সামাজিক মতামতের আলোচনা ছাড়া সাহিত্যিক বিষয়বস্তু নিয়ে কী ধরনের সমালোচনা তখনকার দিনের সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও করা হত, তার কিছু নমুনা আমরা সঞ্জীবনী পত্রিকার উদ্ধৃতিতে [দ্র রবিজীবনী ২।২২৬-২৭, ২২৯] দেখেছি। তবু তো সঞ্জীবনী-র লেখকগোষ্ঠীর অনেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু বঙ্গবাসী-র মতো বিরোধী পত্রিকাতে তাঁর রচনা সম্পর্কে কী সমালোচনা কোন্ ভাষায় করা হত, তা আজ জানার উপায় নেই—তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া দেখে কিছুটা অনুমান করা যায়। ‘দুরন্ত আশা’ কবিতাটি লেখার পিছনে সম্ভবত অনুরূপ কোনো প্ররোচনা আছে।[১]

‘দেশের উন্নতি’ [পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম ‘একক’] কবিতাটির সঙ্গে এক বছর আগে লেখা ‘আপনি বড়’ প্রবন্ধটির বক্তব্যের সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করেছি। ‘সঞ্জীবনী’-র উপরোক্ত সমালোচনার বা অনুরূপ মন্তব্যের প্রত্যুত্তর হিশেবেও এটিকে দেখা চলে :

‘ওজস্বিতা ‘উদ্দীপনা’
ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা,
আমরা করি সমালোচনা
জাগায়ে তুলি দেশ!
বীর্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বলো টিকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তার
দুর্দশার শেষ।[২]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালির গতানুগতিক উত্তেজনার স্রোতে গা ভাসাতে পারেননি বলেই তাঁর প্রতি এত সমালোচনার কশাঘাত। তাই কখনো কখনো লোভ হয়েছে এই সব দলের সামিল হতে :

কেন এ দুখ, কেন এ আশা,/ কেন এ ডাকাডাকি!
মরমজ্বালা হৃদয়মাঝে/ পুষিয়া কেন রাখি!
মাদুর পেতে ঘরের ছাতে/ ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে
আমিও কেন সবার সাথে/ মিশিয়া নাহি থাকি![৩]

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন :

ধিক্‌রে সাধ! ছি ছি কি লাজ!/ হস্‌ নে প্রাণ হতাশ আজ!
সাধিব নিজে নিজের কাজ/ রাখিব না ক' বাকি![১]

—নিজে যা সত্য বলে জেনেছেন, সারাজীবন কোনো প্রলোভনেই তিনি তা অনুক্ত রাখতে পারেননি,—তারই ফলে দেশে এবং বিদেশেও প্রশংসা ও নিন্দা, সমাদর ও অবহেলা কোনো সময়েই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেনি।

'সুরদাসের প্রার্থনা' [পাণ্ডুলিপিতে নাম 'অন্ধ'][২] স্বতন্ত্র ধরনের কবিতা—এক মাস আগে যে ভাবাবহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেন সেখানেই তিনি ফিরে গেছেন। তবে কবি সুরদাসের কাহিনীর আবরণ থাকায় ব্যক্তিগত আবেগ অনেক পরিমাণে সংযত।

কড়ি ও কোমল-এর প্যারডি 'মিঠেকড়া' 'রাহু' ছদ্মনামে রচনা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ–বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী পুস্তিকাটির প্রকাশ-তারিখ 17 Apr 1888 [মঙ্গল ৬ বৈশাখ]।[২] 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' এই 'রাহু'র উদ্দেশ্যে নিবেদিত। 'রাহু' তাঁর 'ভূমিকা'য় লিখেছিলেন : 'হোমার, বাল্মীকি, বর্জিল, ব্যাস, সেক্সপীয়র, কালিদাস, গেতে, দান্তে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বাইরন, শেলি, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহা মহা কবিগণ রচনা দূরের কথা–কল্পনাতেও যাহা আনিতে পারেন নাই, এই গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত ছিল।'–রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিবেদন-এ লিখলেন :

হউক ধন্য তোমার যশ,
লেখনী ধন্য হোক,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে
জাগাক সপ্তলোক।
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই—
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ
বিদ্রুপ কেন ভাই?

আগের কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গবীর'দের তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আঘাতে জর্জরিত করেছেন—কিন্তু যখন নিজেই ব্যঙ্গের লক্ষ্য হলেন, তখন তাঁর 'নিবেদন' মর্মযন্ত্রণার আকারে ফুটে উঠেছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ভঙ্গিতে উপদেশের ছলে প্রত্যাঘাত অবশ্য এই কবিতাটিতেও আছে, যার অমোঘ শক্তিটি অনুভব করি শেষ ছত্রগুলিতে :

হয়তো এ ফুল সুন্দর নয়,

ধরেছি সবার আগে—

চলিতে চলিতে আঁখির পলকে

ভুলে কারো ভালো লাগে।

যদি ভুল হয় ক'দিনের ভুল!

দু দিনে ভাঙিবে তবে।

তোমার এমন শাণিত বচন

সেই কি অমর হবে?

পরের দিনে লেখা 'কবির প্রতি নিবেদন'[৩] এই কবিতাটিরই পরিপূরক—সেখানে আক্ষেপ করে বলেছেন :

হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে

ধূলি আর কলরোল-মাঝে?

এর পর ২৬ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ শিখ ইতিহাস অবলম্বনে দু'টি কবিতা লিখিত হ'ল—'গুরু গোবিন্দ'ও 'নিষ্ফল উপহার'–পরবর্তীকালে এদের প্রথমটি 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের 'কথা' অংশে [শেষ স্তবকটি বাদ দিয়ে] এবং দ্বিতীয়টি ভাষা ও ছন্দ পরিবর্তনান্তে 'কাহিনী' অংশে [দ্র ৭।১০৭-০৯] গৃহীত হয়। শিখ ইতিহাস তিনি মন দিয়ে চর্চা করেছিলেন তার প্রমাণ 'বালক'-এ প্রকাশিত কাজের লোক কে?', 'বীর গুরু', 'শিখ স্বাধীনতা' প্রভৃতি প্রবন্ধ। 'গুরু গোবিন্দ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ উক্ত 'বীর গুরু' প্রবন্ধের পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি অংশকে কাব্যরূপে দিলেন। প্রবন্ধটিতে বর্ণিত আর একটি কাহিনী অবলম্বনে 'নিষ্ফল উপহার' রচিত। আমাদের মনে হয়, নিছক কাহিনীর আকর্ষণেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা-দু'টি রচনা করেননি—যে ভাবনার জগতে তিনি এই সময়ে বাস করছিলেন, তাকেই রূপ দিতে গিয়ে এই দু'টি কাহিনীকে আশ্রয় করেছিলেন। 'কবির প্রতি নিবেদন'-এ তিনি লিখেছিলেন :

দেখো হোথা নূতন জগৎ—

ওই কারা আত্মহারাবৎ

যশ-অপযশ-বাণী কোনো কিছু নাহি মানি

রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।

—এই 'সুদূর ভবিষ্যৎ' রচনার কর্মপন্থাই বাণীরূপ নিয়েছে গুরু গোবিন্দের জবানীতে :

এখনো কেবল নীরব ভাবনা,

কর্মবিহীন বিজন সাধনা,

দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা

আপন মর্মবাণী।...

চারি দিক হতে অমর জীবন

বিন্দু বিন্দু করি আহরণ,

আপনার মাঝে আপনারে আমি

পূর্ণ দেখিব কবে।

মর্যাদা, কর্তৃত্ব, ধন-সম্পদের প্রতি লোভ ত্যাগ না করতে পারলে এই ব্রত উদ্‌যাপন করা যাবে না—'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটির মধ্য দিয়ে যেন এই কথাটাই বলা হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্যও প্রতিদানহীন নিন্দা-ঘৃণা-অত্যাচার-কণ্টকিত ব্রতসাধনের সংকল্প নির্বাচন করে নিয়েছেন, কিন্তু যাঁদের প্রেরণায় এই কঠোর ব্রতধারণ তাঁরা আজ ভিন্নপথগামী—'পরিত্যক্ত' ও 'ভৈরবী গান' কবিতা দু'টিতে এই বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এক বৎসর আগে 'আলস্য ও সাহিত্য' [ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪] প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : 'বঙ্গদর্শন' যখন ভগীরথের ন্যায় পাশ্চাত্যশিখর হইতে স্বাধীন ভাবস্রোত বাঙ্গালার হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিলেন তখন বাঙ্গালা একবার নিদ্রোত্থিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত বিহঙ্গের ন্যায় নূতন ভাবালোকে বিহার করিবার জন্য উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সে এক সুন্দর ও মহৎ জীবনের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সহসা নবযৌবনের পুলক অনুভব করিতেছিল। পৃথিবীর কাজ করিবার জন্য একদিন বাঙালীর প্রাণ যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সময়ে বঙ্গসাহিত্য মুকুলিত হইতেছিল।'[১] এই কথাগুলিই যেন 'পরিত্যক্ত' কবিতার প্রথম দুটি স্তবকে ছন্দের আশ্রয়ে প্রকাশিত। কিন্তু "এমন সময়ে কোথা হইতে বার্ধক্যের শীতবায়ু বহিল। প্রবীণ লোকেরা কহিতে লাগিল, 'একি মত্ততা! ছেলেরা সৌন্দর্য দেখিয়াই ভুলিল, এ দিকে তত্ত্বজ্ঞান যে ধূলিধূসর হইতেছে!'"[২] 'পরিত্যক্ত' কবিতায় এর কাব্যরূপ :

> কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,/ কোথা গেল সেই আশা!
> আজিকে বন্ধু, তোমাদের মুখে/এ কেমনতর ভাষা!
> আজি বলিতেছ, "বসে থাকো, বাপু,/ছিল যাহা তাই ভালো।
> যা হবার তাহা আপনি হইবে,/কাজ কী এতই আলো!
> কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ,/বন্ধ করেছ গান,
> সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ/নিতান্ত সাবধান।

বঙ্কিমচন্দ্র সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু লিখেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, কারণ এরূপ কোনো লেখা তাঁর রচনাবলীতে সংকলিত হয়নি—কিন্তু তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ও অনুসারী চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি লেখকগণ নানাভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলতাকে সমর্থন করছিলেন। অথচ এঁরাই বঙ্গদর্শন-এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নবযুগ এনেছিলেন—বাঙালির অন্তরে নতুন আশা ও উদ্দীপনা জাগিয়েছিলেন! তাই সক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

> তোমার আবার প্রানের প্রবাহ/ ভেঙ্গেছে মাটির আল,
> তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে/ উজান স্রোতের কাল।···

কিন্তু তিনি নিজে তাঁর সংকল্পে অটল, মহৎ জীবনের আস্বাদ পেয়ে যখন একবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন আর ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।—

সে নবীন আশা নাইকো যদিও/ তবু যাব এই পথে,

পাব না শুনিতে আশিস্-বচন/ তোমাদের মুখ হতে।···

শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি/ টানিয়া লবে না মোরে,

আপনার বলে চলিতে হইবে/ আপনার পথ ক'রে।

—কিন্তু তবু মনে যে সংশয় আসে, 'ভৈরবী গান' কবিতায় সেই সংশয় নৈরাশ্য-ক্ষোভ গীতিকবিতার আবরণে পরিবেশিত :

এই সংশয়মাঝে কোন্ পথে যাই,/ কার তরে মরি খাটিয়া?

আমি কার মিছে দুখে মরিতেছি বুক/ ফাটিয়া? ···

যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,/ একা কি পারিব করিতে!

কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা/ হরিতে!

কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব/ একেলা জীর্ণ তরীতে!

কিন্তু এই সংশয় ও হতাশার মেঘ মনকে আচ্ছন্ন করলেও, তা ক্ষণিকের জন্য—

থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর/ নবীন জীবন ভরিয়া—

যাব যাঁর বল পেয়ে সংসারপথ/ তরিয়া,

যত মানবের গুরু মহজনের/ চরণচিহ্ন ধরিয়া।

এর পাশাপাশি 'পরিত্যক্ত' কবিতায় যাঁদের উদ্দেশে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন, তাঁদের করুণ চিত্রটি সাজিয়ে দিয়েছেন :

···তারা পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু/ পথপাশে রহে লুটিতে!

তারা অলস বেদন করিবে যাপন/ অলস রাগিনী গাহিয়া, ···

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া/ আপনারে তারা ভুলাবে,

স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর/ বুলাবে।

এই নিষ্প্রাণ, আত্মদরসর্বস্ব জীবনকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ 'দুরন্ত আশা' কবিতায় 'আরব বেদুয়িন'-এর দুর্দম জীবনকে আহ্বান করেছিলেন, এখানেও সেই কামনা জানিয়েই কবিতাটি শেষ করেছেন :

ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,/ নিঠুর আঘাত চরণে।

যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন/ মরণে।

যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ/ সুখ আছে সেই মরণে।

কবিতাটিতে নৈরাশ্য আছে ঠিকই, কিন্তু যাঁরা জীবনস্রোতের উজানে যাবার অপপ্রয়াসে লিপ্ত তাঁদের আচরণের জন্যই রবীন্দ্রনাথের মনে মাঝে মাঝে নিরাশার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও জীবননিষ্ঠ আশাবাদই 'ভৈরবী গান'-এর মূল সুর।।

জ্যৈষ্ঠের শেষ কবিতা 'ধর্মপ্রচার' সম্পূর্ণভাবেই সাময়িক কবিতা। পাণ্ডুলিপিতেই মন্তব্য আছে : '২৮ জ্যৈষ্ঠ [শনি ও Jun] সঞ্জীবনীতে "এই কি পুরুষার্থ" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া'—মুদ্রিত গ্রন্থেও টিপ্পনী দেখা যায় :

'এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।' যীশুর প্রেমধর্ম-প্রচারকারী মুক্তিফৌজের [Salvation Army][১] এক গেরুয়াধারী শ্বেতাঙ্গ প্রচারকের উপর 'হিন্দুধর্মধ্বজা'ধারী কয়েকজুন যুবকের অত্যাচার নাটকীয় সংলাপের আকারে কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কতখানি মর্মঘাতী হতে পারে এটি তার অন্যতর নিদর্শন। কবিতাটি সুপরিচিত—ব্যঙ্গের লক্ষ্যও সুস্পষ্ট—সুতরাং কোনো উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতেই বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত একটি উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

হিন্দু বিবাহ গাঢ় মিলন
ত্বকে ত্বকে হাড়ে মাস
একথা বুঝাতে ত্বকে হাড়ে মাসে
লাগাইতে হয় বাঁশ!

—চন্দ্রনাথ বসু-প্রচারিত আধ্যাত্মিক হিন্দু বিবাহের প্রতি নগ্ন কটাক্ষ বলেই সম্ভবত অংশটি বর্জিত হয়েছে!

২৩ আষাঢ় [শুক্র 6 Jul] গাজিপুর-প্রবাসের শেষ কবিতাটি রচিত হয় 'নববঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ' [দ্র মানসী ২। ২৪২-৪৫]। কবিতাটি পড়লে বোঝা যায়, সামাজিক অনাচারের প্রতি যে বিদ্রূপাত্মক মনোভাবে তিনি আগের মাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এখনও সেই মনোভাব তাঁকে ত্যাগ করেনি। 'পরিত্যক্ত' কবিতায় লিখেছিলেন—

সানাই বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসি/ আট বরষের বধূ,
শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির/ করি যৌবনমধু!

—এই কবিতাটিতে নাটকীয় সংলাপের আকারে সেই দাম্পত্যের হাস্যকরতা উদঘাটিত হয়েছে।

কবিতাটির পাণ্ডুলিপির উপরে লেখা আছে : 'কাল সুরি/ বাবিদের নিয়ে/ দিনকতকের জন্যে/ কলকাতায় যাব।' সুতরাং মনে করা যেতে পারে, পরদিন অর্থাৎ ২৪ আষাঢ় [শনি 7 Jul] তিনি সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা ও সরলাকে নিয়ে কলকাতায় যান ও কয়েকদিন পরেই ফিরে আসেন।

এই পর্বের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমনের যে ছবিটিই পাওয়া যাক্ না কেন, সহৃদয় সামাজিকতায় ও আত্মীয়-বন্ধুদের সাহচর্যে তাঁর ব্যক্তিজীবন সহজ ছন্দে প্রবাহিত হচ্ছিল। গাজিপুরে ছিলেন তাঁর 'দূরসম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়—যাঁর সাহায্যে তাঁর গাজিপুরে থাকার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী এঁকে 'গাজিপুরের গাজি মহাশয়' নামে অভিহিত করে লিখেছেন :'…আমরা তাঁহাকে গাজি বলি—তাহার কারণ গাজিপুরের নবাগতদিগের ইনি অন্ধের লড়ি। ইনি তাহাদিগের আতিথ্যদাতা—পরামর্শদাতা —আর একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরস আলাপের যোগানদাতা। ইহা ছাড়া ঠাট্টার বুলি—আর গল্পের টীকা তাঁহার ত মুখে লাগিয়াই আছে। যেদিন কোন কথা কহিবার পর তাঁহার মুখ হইতে একটি গল্প শুনিতে না পাই—সেদিন কথাটাই বৃথা মনে হয়।'[২] এর পর তিনি চা-বাবুর সর্দি, মৈত্রী মহাশয়ের ডাকগাড়ি, সেলামবাবু, হান্টিং ঘোষাল, রাজা বৈদ্যনাথের লগি ঠেলা ইত্যাদি এমন কয়েকটি গাজি মহাশয়-কথিত অদ্ভুত ও হাস্যরসাত্মক গল্প পরিবেশন করেছেন যে, বোঝা যায় এই সদালাপী সুরসিক মানুষটির সঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কাছেও আকাঙ্ক্ষিত ছিল।[৩] দীর্ঘকাল তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ও পত্রালাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্বশুর

শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও গাজিপুর-প্রবাসী ছিলেন, বহু বৎসর ধরে প্রতি মাসে তাঁকে কুড়ি টাকা করে মাসোহারা পাঠানোর হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ইনিও সুরসিক ছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর উল্লেখ করেছেন। আর ইন্দিরা দেবীর কাছে আকর্ষণীয় লেগেছে তাঁর রন্ধন-নৈপুণ্য : 'মনে আছে তিনি বেগুন মুলো ও বড়ি দিয়ে গুড়-অম্বল বেঁধে রান্নাঘরের তাকে তুলে রেখে কাশী বেড়াতে যেতেন এবং ফিরে এসে খেতেন। সত্যি কথা বলতে কি, সে রকম সুস্বাদু গুড়-অম্বল তার পরে আর খাইনি'।[১]

গাজিপুরের ইংরেজ বাসিন্দাদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র খসড়ার পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটি আর একবার উদ্ধার করি : 'আমি যখন গাজিপুরে থাকতুম ইংরেজরা মনে করত, আমোদ প্রমোদ খেলা ও সঙ্গ অভাবে আমি বুঝি ভারী ম্রিয়মাণ হয়ে আছি। তাই আমাকে ক্রমাগত নিমন্ত্রণ করত এবং ক্লাবের মেম্বার হবার জন্য অনুরোধ করত।'[২] প্রিয়নাথ সেনকে ২ বৈশাখের চিঠিতে লিখেছিলেন, 'পাশে Civil Surgeon-এর বাড়ি'—এই ইংরেজ সিভিল সার্জনের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মে। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, 'কবি আমাদের বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার কবিতা তর্জমা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন।'[৩] এইরূপ একটি অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায় মানসী-র পাণ্ডুলিপিতে—'Desire for a Human Soul ['All fruitless is the cry']'[৪] শিরোনামে 'নিস্ফল কামনা' কবিতাটির '...প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি/ অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে' পর্যন্ত প্রথম ২৩টি ছত্রের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। যদিও পাণ্ডুলিপির শেষাংশে অনুবাদটি পাওয়া যায়, তবু মনে করা যেতে পারে যে, অনুবাদটি আলোচ্য সময়েই করা হয়েছিল। যতদূর জানা যায়, এইটিই রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদের প্রথম প্রয়াস। তিনি অনুবাদটির কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তাই পরবর্তীকালে আর একটি সংক্ষিপ্ততর অনুবাদ করেন ও সেটি *Lover's Gift and Crossing* [1918] গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। দু'টি পাঠের তুলনা করে কৃষ্ণ কৃপালনী দ্বিতীয়টির সম্পর্কে বলেছেন, 'The reader may well ask, as indeed does the poet in the earlier version : Where is the immortal flame hidden in the depth of thee!'[৫]

ইংরেজদের ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন কিনা, তা তিনি আমাদের জানাননি—কিন্তু অন্য ধরনের একটি গোষ্ঠী রচনার চেষ্টা যে করছিলেন, সে-খবর জানা যায় 27 Jul [শুক্র ১৩ শ্রাবণ] গাজিপুর থেকে সুকুমার হালদারকে [ভাগিনেয়ী সুপ্রভা দেবীর স্বামী] লেখা একটি পত্রে : 'আমরা এখান থেকে। Prof. Loisette-এর Memory lesson পাবার জন্য একটা class form করবার চেষ্টা করচি। দশজন হলেই বিলেতে টাকা পাঠিয়ে তার পর থেকে বিস্মৃতির হাত একেবারে এড়ান যাবে—কিন্তু দেনা পাওনা সম্বন্ধে স্মরণশক্তি সমান পরিষ্কার হওয়া কিছু নয়। কলকাতায় কেউ কি memory class join কর্ত্তে চায়? তাহলে তাকে আমার ঠিকানায় ২০ টাকা পাঠাতে বোলো।'[৬] সুকুমার হালদার এই পত্রের টীকা হিশেবে জানিয়েছেন, 'Statesman সংবাদপত্রে স্মৃতিশক্তি বাড়াবার কোন এক বিজ্ঞাপন দেখে। আমি তাঁর উপদেশ মত, নিজের চাঁদার সঙ্গে তারও চাঁদা পাঠিয়েছিলুম।'[৬] এই ক্লাসের ছাত্রেরা কি বিস্মৃতির হাত এড়াতে পেরেছিলেন?

শিল্পী অসিতকুমার হালদারের পিতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুকুমার হালদারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। বর্তমান সময়ে তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনে টাকাও ধার করেছেন। উক্ত পত্রের

প্রথমাংশে ঋণ পরিশোধের কথা আছে—২০ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথের বৈশাখ মাসের মাসোহারা ২০০ টাকা থেকে ৪৫ টাকা 'বাবু শুকুমার হালদার'কে দেওয়ার হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়।

এই চিঠি লেখার কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ আবার কলকাতা যান। ২০ শ্রাবণ [শুক্র 3 Aug] তিনি নিজের হাতে বৈশাখ-আষাঢ় তিন মাসের মাসোহারা ৬০০ টাকা, শ্রাবণ মাসের মাসোহারা ৩০০ টাকা [মাসোহারার পরিমাণ বৃদ্ধিটি লক্ষণীয়] এবং 'ছোটবধুঠাকুরাণী' অর্থাৎ মৃণালিনী দেবীর প্রাপ্য বৈশাখ-শ্রাবণ চার মাসের জন্য ১২০ টাকা গ্রহণ করেছেন—ক্যাশবহির হিসাবে এই তথ্য মেলে। আবার ৩০ শ্রাবণ [সোম 13 Aug] 'আগামী ভাদ্র মাসের মাসোহারা অগ্রীম ৩০০৲ গুঃ খোদ' হিসাব থেকে বোঝা যায়, তিনি এই দিন পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। এই দিনই বা এর পরের দিন তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীকে নিয়ে গাজিপুর রওনা হন।

'দারজিলিং পত্র'-এর মতো স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাজিপুর পত্র' [ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৬] রবীন্দ্রনাথের কথায় পূর্ণ। তিনি যাত্রার বিবরণে লিখেছেন : 'তিনজনে ত আমরা হাবড়ার মেলট্রেনে উঠিলাম; একজন কাশীধামে শ্বশুরালয়ে যাইবেন [? সত্যপ্রসাদ], আর আমরা দুই ভাইবোনে গাজীপুরের যাত্রী। রাত্রিটা ত ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিলাম;···[পরদিন] যতই বেলা বাড়িতে লাগিল—শ্রাবণের কাটফাটা রৌদ্রে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত···ফাটিয়া উঠিতে লাগিল···/ এই রৌদ্রে বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমাদের দিলদারনগরে নামিতে হইল, এখানে ট্রেণ বদলাইয়া তাড়িঘাটের ট্রেণে উঠিতে হয়। খর রোদে ভাজা ভাজা হইয়া, তপ্ত বালি পায়ে ভাঙ্গিয়া আমরা দিলদারনগরের অন্য পাশের গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। উঠিয়া শুনিলাম এ ট্রেণ আপাতত ছাড়িতেছে না—আধ ঘণ্টা বাদে ছাড়িবে।···যখন দেখিলাম চারিদিকের এই সকল মহামারী ব্যাপারের মধ্যেও আমার ভায়াটা কাপুরুষের মত অবিচলিতভাবে বসিয়া আছেন, তখন সমস্ত রাগ তাঁহার উপর গিয়া পড়িল। তাঁহা হইতে কখনো যে ভারত উদ্ধার হইতে পারিবে না ইহা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে লাগিলাম।···কিন্তু ভ্রাতার এমনি মনুষ্য চরিত্র জ্ঞান—তিনি বুঝিলেন আর এক রকম। তিনি ভাবিলেন পথশ্রমে আমি বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কথাবার্তায় আমাকে তিনি উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না, তিনি কথা আরম্ভ করিতেই আমাদের তর্ক উঠিল, আমরা দুজনে একত্র হইলে এরূপ না হইয়া বড় যায় না। তিনি আরম্ভ করিলেন "যদি চাও সুখ, আগে লও দুখ। সবুরে মেওয়া ফলে, তাহা ভুলিলে দিদিমণি?"/ আমি বলিলাম "যে সুখ চায় সে দুঃখ ভোগ করুক, আমি নিব্বাণ মুক্তির ভিখারী।" ক্রমে ঠাট্টা হইতে গম্ভীর তর্ক উঠিল। সুখ দুঃখ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কিনা, মঙ্গল অমঙ্গল অনন্যসাপেক্ষ (absolute) কিনা, হিন্দুর মোক্ষ বৌদ্ধের নির্ব্বাণ এক কিনা, এই সকল বিচারে আধ ঘণ্টা ছাড়া দেড় ঘণ্টা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল, আমরা জানিতেও পারিলাম না। ট্রেণ যখন একেবারে তাড়িঘাটে আসিয়া থামিল, তখন আমাদের জ্ঞানোদয় হইল, কিন্তু আমাদের বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে তখনো আমরা সমান অজ্ঞান রহিলাম।···ষ্টেসন হইতে ষ্টীমার নিতান্ত মন্দ পথ নহে।···তীরের সুদৃশ্য শোভা উপভোগ করিতে করিতে আমরা গাজিপুরের ঘাটে আসিয়া পৌছিলাম। এই ঘাট গাজিপুর সহরের ধারে।···ঘাটে নামিয়া ধূলিময় একটি ক্ষুদ্র গলি হাঁটিয়া আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ী আমাদের লইয়া সহরের গলি ঘুঁজি ছাড়াইয়া ঘণ্টা খানিকের মধ্যে ইংরাজ-পাড়ায় পড়িল। ভাইটি তখন আশ্বাস দিলেন অল্পক্ষণের মধ্যেই এবার আমরা বাড়ী পৌঁছিব।···অবশেষে গাড়ী যখন একটি বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া এক বড় বাঙ্গলার কাছে লাগিল,

বেলু-রাণীর টুকটুকে মুখখানি ফুলের মত আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠিল, তাহার হাত ধরিয়া আমার ভ্রাতৃজায়া যখন বারান্দায় অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন…পথশ্রান্তিও ভুলিয়া গেলাম।'[১]—উদ্ধৃতিটি সুদীর্ঘ, কিন্তু বর্ণনার সজীবতা ও সরসতায় আশা করি পাঠকও শ্রান্তি বোধ করেননি! চিরকালই মেয়েদের লেখা স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের ছবিটি জীবন্ত হয়ে ফুটেছে, স্বর্ণকুমারী সেই মেয়েদের মধ্যে প্রথমতম একথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতে পারি।

রোজ বিকেলে কখনও পায়ে হেঁটে কখনও গাড়িতে তাঁরা বেড়াতে বেরোতেন। বাড়ির কাছেই অবস্থিত লর্ড কর্নওয়ালিসের [1738-1805] সমাধি-উদ্যান তাঁদের প্রাত্যহিক দ্রষ্টব্যস্থল ছিল। স্বর্ণকুমারীর মতে, তিনি গাজিপুরে যা-কিছু দেখেছেন, তার মধ্যে এইটিই সর্বোৎকৃষ্ট। 'কিন্তু আমাদের বন্ধুপ্রবর গাজিপুরের গাজি মহাশয়ের নিকট একদিন এই কথা বলিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। অনধিকার চর্চ্চার যে কত মহৎ দোষ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াসে এ সম্বন্ধে সংলগ্ন অসংলগ্ন যত গল্প তাঁহার জানা আছে—একে একে সমস্তগুলি তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং এতদ্দ্বারা আমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ অবসন্ন সন্তপ্ত অনুতপ্ত করিয়া তুলিয়া তাঁহার হৃষ্ট মুখে ও পুষ্ট শরীরে তুষ্ট ভাব প্রকাশপূর্ব্বক গাজিপুরের যেখানে যত উৎকৃষ্টতর স্থান আছে, তাহার তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন।'[২]

গাজিপুরের গঙ্গায় একদিন তাঁরা নৌকাবিহারে বেরিয়েছিলেন, তার বিবরণ দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী : 'আমরা একদিন বিকালে নৌকায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, পশ্চিমে স্তরবিন্যস্ত নানাবর্ণ উজ্জ্বল মেঘের মধ্যে সূর্য অস্ত যাইতেছিলেন, …/ ভ্রাতা গাহিতে লাগিলেন—

আজি কি হরষ-সমীর বহে প্রাণে—

(এ কি) প্রেম কুসুম ফুটে হৃদি কাননে। …[১]

…নৌকা যখন আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি স্বল্প জলের মধ্যে আসিয়া পড়িল, দাঁড়িরা দাঁড় ফেলিয়া লগীঠেলিতে লাগিল—আমাদের স্বপ্নের ভাবও ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা কঠোর সভ্য জগতে ফিরিয়া আসিলাম।'[২]

নৌকাভ্রমণের আনন্দে তাঁরা সেইদিন রাত্রেই স্থির করলেন যে, বোটে করে কাশী ঘুরে আসবেন। কিন্তু পরদিন সকালেই এই যাত্রার এমন-সব অসুবিধার কথা উল্লিখিত হতে লাগল যে, জলপথের পরিবর্তে স্থলপথেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একদিন কাশী দেখিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত গাজিপুরের ভূগোল ও ইতিহাসের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী, তা তাঁর উদ্ভট কল্পনাশক্তির অনন্য নিদর্শন। অথ ভূগোল বৃত্তান্ত :'মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ঠিক নীচেই গাজিপুর অবস্থিত—যদি প্রমাণ চাও—দ্বিপ্রহরে গাজিপুরের মাঠে আসিয়া দাঁড়াইও, ছায়া পায়ে পড়িবে। কিন্তু অধিকক্ষণ দাঁড়াইও না, তাহার কারণ আছে।'[৩]—কারণটি অবশ্য তিনি প্রকাশ করেননি। এর পর "শালিবাহনের সময় হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গাজিপুরের সমস্ত ঘটনাই অবলীলাক্রমে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের এমন 'Instructive' এবং 'interesting' ইতিহাস কোন ইংরাজেও যে এ পর্য্যন্ত লিখিতে পারে নাই ইহা আমি খুব সাহস করিয়া বলিতে পারি। (ইংরাজি কথা দুইটা তাঁহার ইতিহাস হইতেই আমি উদ্ধৃত করিলাম; এই দুটার ভাল বাঙ্গলা করিতে পারিলে তিনি পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—চেষ্টা করিতে ছাড়িও না।)"[৩] —মন্তব্য-সহ স্বর্ণকুমারী

দেবী রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ইতিহাসটি উদ্ধৃত করেছেন : ‘হয় সাদত আলি, নয় মুরাদ খাঁ, নয় বলবন্ত রাও, নয় বিশ্বামিত্র মুনির বাবা গাধিরাজ প্রথম গাজিপুর স্থাপন করেন। তারপরে তিন চারি শত বৎসর কি হোল তা কেউ বলতে পারে না। সফদৎজঙ্গ হুজুরীমলের পেটে তিনটে চারটে ছুরীর খোঁচা মেরে যখন গাজিপুরের তক্ত দখল করে বসেন, তখন শালিবাহনের বা বিক্রমাদিত্যের বা খৃষ্টমৃত্যুর বা মহম্মদ জন্মের কোন শক বা শাল বা অব্দ তা এখনো স্থির হয়নি। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্ছে না। কিন্তু এটা স্থির হয়ে গেছে যে ফজল আলি অত্যন্ত মোটা লোক ছিল। সে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আপনার পা দেখতে পেত না—দৃষ্টি পেটের উপর বেধে যেত, শ্রীচরণ পর্য্যন্ত পৌঁছত না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার চরণ দৃষ্টিগোচর হবার প্রধান কারণ এই যে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র খান খানান একটা বড় গোছের ভুজালি নিয়ে বাপের জঠরভার লাঘব করেছিল। এর থেকে কোন তত্ত্ব বা নীতি বেরোতে পারে কি না জানিনে কিন্তু বহুৎ পরিমাণে অন্ত্র তন্ত্র যকৃৎ ও প্লীহা বেরিয়েছিল। তার পরে মামুদ খাঁর সঙ্গে আমুদ খাঁর ভয়ানক যুদ্ধ হয়—কিন্তু মাঝে থেকে মন্ত্রী হামুদ খাঁ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দুই দলকে ফাঁকি দিয়ে প্রভু এবং প্রভুর তিন পুত্র, তের জামাই ও আঠারটা ভাগনেকে সাফ করে ফেলে পৌনে দুশ বেগম ও গাজিপুর দখল করে বসে। তারপর থেকে অনেকগুলো খাঁ, আলি, বক্স, উল্লা, নেড়ে, দেড়ে, বিষ, ছুরী, মড়ক উত্তরোত্তর গাজিপুর ভোগদখল করে। তারপরে অনেকদিন আর বড় একটা শিক্ষা বা আমোদজনক ঘটনা কিছু ঘটেনি। কেবল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যে গাজিপুরের ইতিহাসে চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকবে।’[৪]—রবীন্দ্রনাথের গাজিপুরে আগমনই যে সেই বিশেষ ঘটনা, এ-কথা বলাই বাহুল্য! ‘ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ’ করার যে আকাঙক্ষা নিয়ে তিনি গাজিপুরে এসেছিলেন, তার অপূর্ণতাই এই ইতিহাস-জল্পনার মাধ্যমে চরিতার্থ হয়েছে বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ এখানে কবিবন্ধু দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর পরিচয় করিয়ে দেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘এক দিন রবিবাবু আমাকে বলিলেন, “ভারতীর সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এখানে আছেন। আপনার কতকগুলি কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইবার জন্য দিন।” অনুরোধ শুনিয়া আমিও কৃতার্থ হইলাম। কারণ ইতিপূর্ব্বে আমার কোন কবিতা অথবা কোন প্রবন্ধ কোন প্রখ্যাত পত্রিকায় বাহির হয় নাই।’[১] এই সাক্ষাতের পর দেবেন্দ্রনাথের ‘অদ্ভুত রোদন ও অদ্ভুত সুখ’ কবিতা ভারতী ও বালক-এর আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় [পৃ ৪১১-১২] প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ভারতী-র নিয়মিত লেখক-রূপে গণ্য হয়েছেন।

সম্ভবত ভাদ্র মাসের শেষে কিংবা আশ্বিনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবী-সহ সপরিবারে গাজিপুরের পালা শেষ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। ৭ আশ্বিন [শনি 22 Sep] ১০ নং উড স্ট্রীটে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নূতন বাসস্থান থেকে তিনি ডোয়ার্কিন অ্যান্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঘোষকে লেখেন : ‘আপনাদের ডোয়ার্কিন ফ্লুট পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি।…দেশীয় সঙ্গীতের পক্ষে আপনাদের এই যন্ত্র যে বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই যন্ত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি আমাকে ইহার মূল্য লিখিয়া পাঠাইবেন।’[২] সুতরাং এর আগেই তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গাজিপুরের সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছেন : ‘…পশ্চিম অঞ্চলের কোনও স্থানে নিজের আদর্শের অনুরূপ একটি কবিকুঞ্জ নির্মাণ করিয়া তিনি ‘মানসী’র

অধিকাংশ কবিতা ও 'গোলাপছড়ি' গল্প গাজিপুরে লিখিত হয়। গাজিপুর হইতে কবি ফিরিয়া আসিলেন, কবিকুঞ্জ আর হইল না। সে বাড়িখানি তাঁহার ভাগিনেয় অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়কে বসবাসের জন্য দান করেন।'[৩] গোলাপছড়ি' নামে রবীন্দ্রনাথের লেখা কোনো গল্পের কথা আমরা জানি না—কিন্তু গাজিপুরে জমি ও বাড়ি কেনা এবং সুকুমারী দেবীর পুত্র অশোকনাথকে দান করা সংক্রান্ত একটি হিসাব পাওয়া যায় ৩১ শ্রাবণ ১৩০৭ [15 Aug 1900]-এর সরকারী ক্যাশবহিতে : 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামীয় দরুণ অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাজীপুরের জমি ও বাটী ক্রয়ের দলীল পারস্য ভাসা হইতে বাঙ্গালা ভাসায় তর্জমা করার ব্যায়…২২' টাকা।

গাজিপুর থেকে চলে এলেও সেখানকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। পরেও তিনি আর একবার সপরিবারে গাজিপুর গিয়েছিলেন, সে সংবাদ পাওয়া যায় ১৯ আশ্বিন ১৩০০ [30ct 1893]-তে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লিখিত একটি পত্রে : 'পরিবারবর্গকে গাজিপুর রওনা করে দিয়ে আমি কাল রাত্রে রাজধানীতে এসে হাজির হয়েছি।… আমি আবার আগামী পরশু সিমলা পর্ব্বতে রওনা হচ্চি। পথে একবার গাজিপুরে উঁকি মেরে যাব—…।'[৪] পিতার জন্য প্রায়ই গাজিপুর থেকে গোলাপজল, 'চামেলী ফুলেল তৈল', আতর ইত্যাদি আনিয়ে দিয়েছেন, ক্যাশবহিতে সেই সংক্রান্ত বহু হিসাব দেখা যায়।

গাজিপুর থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে বরীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন যেতে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, শান্তিনিকেতনে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য মহর্ষি ২৬ ফাল্গুন ১২৯৪ একটি ট্রাস্টডীড সম্পাদন করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য করা হয় কোজাগরী পূর্ণিমার দিন ৪ কার্ত্তিক [শুক্র 19 Oct]। এই উপলক্ষে একটি বিরাট দল কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে যান। ক্যাশবহির একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে : 'শান্তিনিকেতনে গত ১৯ আশ্বিন বাবু মহাশয়রা এখান হইতে যাইয়া ১৬ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত থাকিবার ব্যয়—শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবু ও বড়বাবু ও রমণীবাবু, মোহিনীবাবু, রবীবাবু, অরুবাবু, নীতুবাবু, গগনবাবু, নীরদবাবু, যোগিনীবাবু, রজনীবাবু, সুরেনবাবু, বিপীন ডাক্তার ও অক্ষয়বাবু ও উঁহার স্ত্রী ও দিনুবাবু প্রভৃতি যাতায়াতের রেল ভাড়া গাড়িভাড়া ও লগেজ ভাড়া প্রভৃতি—২৬৩।ল ৯/উহাদিগের আহারাদির ব্যয় ও বাজে খরচ ৪৬১। ৬'। এই তালিকা থেকে জানা যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নীরদনাথ মুখোপাধ্যায় [গগনেন্দ্রনাথের পিসতুতো ভাই, রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী], ডাঃ বিপিনচন্দ্র কোঙার [ঠাকুরবাড়ির গৃহচিকিৎসক], গায়ক ও অভিনেতা অক্ষয়কুমার মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী[১], এবং মোহিনীমোহন রমণীমোহন যোগিনীমোহন ও রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়েরা চার ভাই—এই ষোলো জন শান্তিনিকেতনের যাত্রীদলে ছিলেন। এছাড়া ভৃত্য ও পাচক কয়েকজন নিশ্চয়ই ছিল। তাঁরা কলকাতা থেকে ১৯ আশ্বিন [বৃহ 4 Oct] মহালয়ার আগের দিন রওনা হন ও ১৬ কার্ত্তিক [বুধ 31 Oct] পর্যন্ত পুরো চার সপ্তাহ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। 'শান্তিনিকেতন কুটীর দ্রব্যাদি ক্রয় জন্য বিপুল ব্যয়ের হিসাবও ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। অনুমান করতে পারি, পূজাবকাশটি তাঁদের ভালোই কেটেছিল!

আশ্রম প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিয়ে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লেখেন : '…এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এক সভা আহূত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, যিনি ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য

ইংলন্ড, ফ্রান্স্, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ইঁহারা দুইজনে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মোহিনীবাবুর বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান পাঠ ও রবীন্দ্রবাবুর প্রাণস্পর্শী সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ও ২/৪টি সঙ্গীত করিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে মোহিনীবাবু শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত বন্ধুগণকে এই স্থানে আসিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিলেন। বোলপুর রাইপুর সুরুল প্রভৃতি ভদ্রপল্লি হইতে সকল শ্রেণীর প্রায় ২০০ শত ভদ্রলোক আগ্রহের সহিত এই কার্য্যে যোগ দিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।...সভাভঙ্গের পর সমাগত বন্ধুগণকে সরবত ও তাম্বুল দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।' পরিশেষে তিনি লেখেন : 'শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু দ্বিপেন্দ্রবাবু মোহিনীবাবু রমণীবাবু যাঁহারা এই আশ্রমের উন্নতির জন্য এখানে আগমন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমার হৃদয়ের সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।'[২]

অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবার পরের দিন থেকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-চর্চায় ব্রতী হন; কিন্তু কোনো নূতন রচনার আবেগ না থাকায় কয়েকটি পূর্ব-রচিত কবিতার সংস্কার-সাধন করেন। ৫ কার্ত্তিক [শনি 20 Oct] প্রথম যে-কবিতাটি সংশোধন ও পরিবর্ধিত করেন সেটি হল 'কুহুধ্বনি', মূল রচনার তারিখ ২২ বৈশাখ গাজিপুর। প্রথম স্তবকের 'ছায়ায় কুটিরখানা... পশিতেছে মানবের ঘরে' ও তৃতীয় স্তবকের 'সুখে দুঃখে উৎসবে—করেছিল সুমধুরতর' অংশ-দুটি এই দিন সংযোজিত হয়েছিল। আরও কিছু সংযোজন গ্রন্থে গৃহীত হয়নি।

৭ কার্ত্তিক [সোম 22 Oct] 'বধূ' [মূল রচনা : ১১ জ্যৈষ্ঠ] ও 'ব্যক্ত প্রেম' [মূল রচনা : ১২ জ্যৈষ্ঠ] কবিতা-দুটির সংশোধন-পরিবর্ধন হয়। বধূ কবিতায় ব্যাপক সংশোধন ছাড়াও তৃতীয় স্তবকের 'শরতে ধরাতল...আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি' অংশটি সংযোজিত হয়। 'ব্যক্ত প্রেম' দশম থেকে চতুর্দশ পাঁচটি স্তবক এই দিন লেখা হয়।

৮ কার্ত্তিক [মঙ্গল 23 Oct] 'কবির প্রতি নিবেদন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ স্তবকের পরে দুটি স্তবক যোগ করেন, কিন্তু গ্রন্থে মুদ্রণের সময়ে সেগুলি বাদ দেন।

উপরে যে সংশোধন-পরিবর্ধনের কথা বলা হল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই পাণ্ডুলিপিতে সেগুলির স্থান-কাল নির্দেশ করেছেন। কিন্তু গাজিপুরে লেখা আরও অনেকগুলি কবিতায় অনুরূপ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে,—আমাদের অনুমান, তাদের অধিকাংশই করা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে।

১৯ কার্ত্তিক [শনি 3 Nov] কালীপূজার দিন রবীন্দ্রনাথ ও অন্যেরা শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। তার দু'দিন পরেই ২১ কার্ত্তিক [সোম 5 Nov] ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'Philology'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'[৩] -এর সূচনা করেন সত্যেন্দ্রনাথের বির্জিতলার[১] বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনে এই পারিবারিক খাতাটির বিশেষ মূল্য আছে। এই সময় থেকে পরবর্তী তিন বছরে তাঁর অনেক বিচ্ছিন্ন ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে এই খাতায়—যার অনেকগুলিকে তাঁর স্থায়ী সাহিত্যের বীজ রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

খাতার উদ্বোধনের দিন রবীন্দ্রনাথ এতে কিছু লেখেননি। এই দিন শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই চারটি রচনা পাওয়া যায়। হিতেন্দ্রনাথ 'রবিকাকার সন্তান' নামে একটি টিপ্পনীতে লেখেন : 'রবিকাকার একটী মান্যবান ও

সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে, কন্যা হইবে না। সে রবিকাকার মত তেমন হাস্যরসপ্রিয় হইবে না রবিকাকার অপেক্ষা গম্ভীর হইবে। সে সমাজের কার্য্যে ঘুরিবার অপেক্ষা দূরে দূরে একাকী অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবে।' মাসখানেক পরে হিতেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম অংশটি সফল হয়েছিল।

২২ কার্ত্তিক [মঙ্গল 6 Nov] রবীন্দ্রনাথ 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র' নামে দুটি রচনা লেখেন; এদের মধ্যে প্রথমটি ভারতী, বৈশাখ ১৩১২।৯০ ও দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রবীক্ষা ১ [১৩৮৩]।২২-এ মুদ্রিত দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব [১৩৯১]।৩১১-১৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'Philology' বা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে রচনা দিয়ে পারিবারিক খাতার উদ্বোধন করেছিলেন, 'অক্ষর তত্ত্ব'-ও প্রথম দিনেই লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সূত্র ধরেই বাংলা ভাষার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বাঙালি চরিত্রের আলস্য ও জড়তার সঙ্গে উক্ত ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। গাজিপুরে লেখা শেষ পর্বের কবিতায় বাঙালি সম্পর্কে যে-মনোভাব তিনি পোষণ করেছিলেন, এই রচনা-দু'টিতেও একই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, ১৩১১ সালে লেখা 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে এই রচনায় ব্যবহৃত কয়েকটি উদাহরণ ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৩০ কার্ত্তিক [বুধ 14 Nov] রবীন্দ্রনাথ বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসবে যোগ দেন। ক্যাশবহির হিসাব থেকে তথ্যটি জানতে পারি, অনুষ্ঠানটির কোনো বিবরণ আমরা পাইনি। তবে সাধারণত এই ধরনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংগীত পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ থাকত।

16 Nov [শুক্র ২ অগ্র°] পারিবারিক খাতায় ১৯ সংখ্যক প্রস্তাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'citizen' ও 'নাগর' সম্বন্ধে একটি টীকা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ পরদিন এ-সম্পর্কে মন্তব্য লেখেন, 'রসিক কথাটার বাঙ্গলা মানে ভাবুক অথবা বিশুদ্ধ humorous নহে। রসিক কথাটার মধ্যে নাগর শব্দের মত একটা মলিন ভাব আছে।'

২২-সংখ্যক প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের 'Stray Thoughts about Philology' সম্ভবত 17 Nov [শনি ৩ অগ্র°] লেখা হয়। '(খানি, খানা) (টি, টা)। কোথায় কোন্‌টা ব্যবহার্য' এই প্রশ্ন দিয়ে তিনি প্রস্তাবটি আরম্ভ করেছেন। পূর্ব দিন রাত্রে 'খানার টেবিলে বসে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবের শেষে বর্ণানুক্রমিক ভাবে 'ক' থেকে 'ঝ' পর্যন্ত অনেকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ সংকলিত হয়েছে। অনেক পরে 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে [দ্র শব্দতত্ত্ব ১২।৩৭৪-৮২; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭, ৭ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা] বিষয়টি নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন।

17 Nov শনি [৩ অগ্র°] রবীন্দ্রনাথ একটি বিতর্কমূলক প্রসঙ্গের অবতারণা করেন 'হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা'-শীর্ষক ২৩-সংখ্যক প্রস্তাবে। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূর্ব-কৃত একটি আলোচনার সূত্র অবলম্বন করে তিনি বাঁধা নিয়মের প্রতি হিন্দুদের আনুগত্যের প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক স্বাধীনতার্জন-বিষয়ক আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন : স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় স্বভাব [নহে]। আমরা চিরদিন শাস্ত্রের অধীন, রাজার অধীন, গুরুর অধীন, গুরুজনের অধীন—সেটা একটা দৈব ঘটনামাত্র। […] মূল কারণ আমাদের মর্মের মধ্যে নিহিত।' সুতরাং রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়ের চিন্তাপ্রসূত,বৃহত্তর অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত নয় এই মত ব্যক্ত করে তিনি লিখলেন : 'আমার বিবেচনায় ইংলন্ডের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের সহিত আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের অনেক প্রভেদ আছে। তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির মূল কারণ তাহাদের সমাজ তাহাদের অবস্থার মধ্যেই

নিহিত। সুতরাং তাহাদের শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে জাতিগত ভেদ নাই, শিক্ষার ন্যূনাধিক্যের ভেদমাত্র। ...আমাদের দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে সম্পূর্ণ আলো অন্ধকারের ভেদ। একের কথা আরেকের পক্ষে বিদেশীয়। উভয়ের মধ্যে মানসিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একজন ইংরাজের সহিত বাঙ্গালী অশিক্ষিতের যে প্রভেদ, ইংরাজিওয়ালা বাঙ্গালীর সহিত সাধারণের তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম **প্রভেদমাত্র**। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ, পরবর্তীকালে সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনায় তিনি এই ধারণা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 17 ও 19 Nov-এ লিখিত দু'টি প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রথমাংশ সম্পর্কে তাঁর ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করেছেন। [দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৫২। ১২-১৩]। রবীন্দ্রনাথ 20 Nov [মঙ্গল ৬ অগ্র°] এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন 'আমাদের সভ্যতার বাহ্যিক ও মানসিক অসামঞ্জস্য'-শীর্ষক ২৮-সংখ্যক প্রস্তাবে [দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৫২। ১৩]।

এর আগের দিন 19 Nov [সোম ৫ অগ্র°] তিনি 'স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব' শিরোনামে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করেন। 'মায়ার খেলা' রচনার শুরু [আশ্বিন ১২৯৪] থেকে 'মানসী'র অনেকগুলি কবিতার মধ্য দিয়ে 'রাজা ও রানী' নাট্যকাব্য পর্যন্ত [চৈত্র ১২৯৫] প্রায় দেড় বৎসর রবীন্দ্রনাথের মন নারী ও পুরুষের প্রেমের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ছিল। বর্তমান প্রস্তাব ও পরবর্তী 'কবিতার উপাদান রহস্য (mystery)' [20 Nov], 'সৌন্দর্য্য ও বল' [21 Nov], 'আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব' [21 Nov], 'সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব' [24 Nov], 'আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব' [26 Nov] ও 'Chivalry'-শীর্ষক প্রস্তাবগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিরই বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন [দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৫৩। ১১-১৬]। এদের মধ্যে 'স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব'-শীর্ষক ২৬-সংখ্যক প্রস্তাবটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক খাতায় এই প্রস্তাবটি নিয়েই সর্বাধিক বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল। 'লাহোরিনী' শরৎকুমারী চৌধুরানী [26 Nov], জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [26 Nov, ৪৪-সংখ্যক], যোগেশচন্দ্র চৌধুরী [৪৫-সংখ্যক], সুরেন্দ্রনাথ [৪৬-সংখ্যক], অক্ষয় চৌধুরী [৪৭-সংখ্যক] ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় (9 Dec, ৫০-সংখ্যক] এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন [দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৫৩। ১৬-১৮]। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবে লেখেন : 'আমার মনে হয় স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের ভালবাসার মধ্যে মাত্রাভেদ নহে জাতিভেদ বর্তমান। পুরুষের ভালবাসা সৌন্দর্যপ্রিয়তার সহিত সংযুক্ত, আর স্ত্রীলোকের ভালবাসা নির্ভরপরতা সুতরাং ক্ষমতার প্রতি আসক্তি হইতে উৎপন্ন। পুরুষের যথার্থ ভালবাসা Ideal-এর প্রতি এবং স্ত্রীলোকের যথার্থ ভালবাসা Real-এর প্রতি।...পুরুষ যখন রমণীকে ভালবাসে তখন সেই ভালবাসার মধ্যে সে সম্পূর্ণ বিরাম পায় না; যদিও তাহার ভালবাসার মধ্যে একটি অনির্বচনীয় সুখ থাকে, তথাপি কি একটা আকাঙক্ষাপূর্ণ সুগভীর বিষাদ ছায়ার ন্যায় তাহার অনুবর্তী হইয়া থাকে। কারণ সমুদয় যথার্থ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটি চিরনিলীন আকাঙ্ক্ষা সর্বদা বিরাজ করিতে থাকে। ...প্রেম রমণীর পক্ষে বাস্তবিক আশ্রয়স্থল—এইজন্য সে তাহার হৃদয়কে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করে না। সে যাহা পাইয়াছে তাহার মধ্যেই তাহার আকাঙক্ষার অবসান। রমণী এই কারণে বিশেষ Practical.' রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণের আলোকে মানসীর অনেকগুলি কবিতার প্রেমভাবনার স্বরূপ অনুধাবন করা সহজ বলে মনে করি।

22 Nov [বৃহ ৮ অগ্র°] রবীন্দ্রনাথ ৩৫-সংখ্যক প্রস্তাবে লেখেন 'ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution)' [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ২৩]। ধর্ম সম্পর্কে এই ভাবনা অবশ্য আকস্মিক নয়। পূর্বোক্ত ২৬-সংখ্যক প্রস্তাবের 'গ' অনুচ্ছেদ 'ধর্ম্মে ভয়, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম'-এ এবং ২৯-সংখ্যক 'কবিতার উপাদান রহস্য' প্রস্তাবে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বর ও ধর্মের কথা উত্থাপিত হয়েছিল।

১৩ অগ্র°[মঙ্গল 27 Nov] বিকেল ৪-০২ মিনিটে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয়, তখন জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতার বয়স দু' বৎসর এক মাস। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বলেন্দ্রনাথের ডায়ারিতে প্রাপ্ত রথীন্দ্রনাথের রাশিচক্রটি এইরূপ :
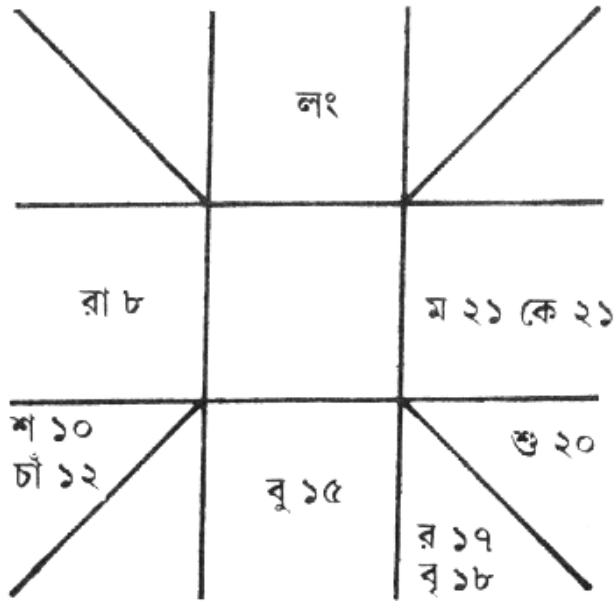
পুত্রের জন্মের পর কিছুদিন পর্যন্ত পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা নেই। ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী ২৩ অগ্র°[শুক্র 7 Dec] তিনি ও দ্বিপেন্দ্রনাথ পার্ক স্ট্রীটে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করেন। এর পর ৩০ অগ্র°শুক্রবার[১] [14 Dec] তিনি লেখেন 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ রচনা, রচনার শেষে তারিখের সঙ্গে 'যোড়াসাঁকো' লেখা—এ থেকে মনে হয়, মূল রচনাটি তিনি জোড়াসাঁকোতেই লিখেছিলেন, বিকেলে বির্জিতলার বাড়িতে গিয়ে পারিবারিক খাতায় কপি করেন। রচনাটির অধিকাংশ খাতাতে নেই ও একটি পাতাও স্খলিত। এটি সম্পাদিত হয়ে সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯ [পৃ ২১০-১৪] সংখ্যায় মুদ্রিত হয় দ্র ছন্দ ২১। ৩৮১-৮৩

পৌষ মাসে পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি–19 Dec [৫ পৌষ বুধ] 'সৌন্দর্য্য নামক একটি রচনায় লেখেন : '৫৩ সংখ্যক প্রস্তাবে ['১ পৌষ ১৮৮৮ যোড়াসাঁকো'] বড়দাদা সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার রীতিমত উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য।···/ "নিজে না মাতিলে অন্যকে মাতান যায় না" একথাটা অতি অল্প জায়গায় খাটে। অধিকাংশ স্থলেই যে মাতাইবে তাহাকে মাতিলে চলিবে না।···/ আমার ত মনে হয় সৌন্দর্য স্বভাবতই অপ্রমত্ত কারণ পৃথিবীতে সৌন্দর্যই পরিপূর্ণতার আদর্শ। পরিপূর্ণতার সহিত

মত্ততা শোভা পায় না। সৌন্দর্যের আপনার মধ্যে আপনার একটি সামঞ্জস্য আছে—সে নিজের মধ্যে নিজেই সম্পূর্ণ—সে আর সকল হইতে আপনাকে সংহত করিয়া রাখে। এই জন্যই আর সকলে এমন প্রবলবেগে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সৌন্দর্যের মধ্যে দৈন্য নাই, এই জন্যই, আমাদের ভিক্ষুক হৃদয় তাহার দ্বারে অতিথি হইয়া উপস্থিত হয়।…'[২]

৫৬-সংখ্যক প্রস্তাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, 'Bravo! ঠিক্! exactly so! কিন্তু আরো একটু details খুঁটিনাটি আবশ্যক।' এর পর তিনি নৈয়ায়িকের মতো কয়েকটি তর্ক উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটি তিনি শেষ করেছেন এইভাবে : 'The next question is what it is in the masculine সৌন্দর্য; যাহা স্ত্রীলোককে মাতায়, and what it is in the feminine সৌন্দর্য যাহা পুরুষকে মাতায়? Let us hear from রবি।'[৩] রবীন্দ্রনাথ তখনই এই প্রশ্নের উত্তর দেননি।

এর পর দীর্ঘকাল পারিবারিক খাতার রচনাপ্রবাহে ছেদ পড়েছে।

গত বৎসর দার্জিলিঙে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা'র গানগুলি লিখতে শুরু করেছিলেন, বৎসরাধিককাল পরে অভিনয়ের প্রাক্কালে অভিনয়পত্রী হিসেবে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল; বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকা অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 22 Dec 1888 [শনি ৮ পৌষ], পৃষ্ঠা সংখ্যা : [২], 'বিজ্ঞাপন' ও 'সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা' |ল০, ৬৪।[৪]

মায়ার খেলা/ গীতিনাট্য।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য আট আনা। আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত/ ও প্রকাশিত। ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড। / অগ্রহায়ণ ১৮১০ শক।

[আখ্যাপত্রের পিছনে] এই গ্রন্থের স্বত্ব সখিসমিতিকে দান করা হইল।/ গ্রন্থকার।

'বিজ্ঞাপন'-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'সখিসমিতির মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প।

'মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহার স্বরূপে সমর্পণ করিলাম।/…

'পাঠক ও দর্শকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্যান্য পাত্রগণের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর নহে।/…'

১৫ পৌষ [শনি 29 Dec] সখি সমিতির উদ্যোগে বেথুন স্কুলের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মহিলাশিল্পমেলার[১] প্রথম দিনে মায়ার খেলা অভিনীত হয়। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : '…আমাদের বাড়ির মেয়েরাই অভিনয় করেন। সখাদের বেশ ছিল খুব টকটকে রঙের সাটিনের পাঞ্জাবি ও ধুতি তার সঙ্গে ঈষৎ গোঁফের রেখা।[২] সরলা দেবী লেখেন : '…সেবার দাদা ও সুরেন স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন। মায়াকুমারীদের মাথায় অলক্ষ্য তারে বিজলীর আলো জ্বালানো তাঁদের একটি বিশেষ কারিগরি ছিল। আর সবাই অতি ভয়ে ভয়ে ছিল—পাছে বিজলীর তার জ্বলে উঠে মায়াকুমারীদের shock লাগে! …মেলা সুন্দর করে সাজান, স্টেজ বাঁধা, স্টল ঘেরা প্রভৃতি সব কাজেই দাদাদের ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল ক'দিন ধরে।'[৩] রবীন্দ্রনাথও এদের সঙ্গী হয়েছেন। এইরূপ একটি হিসাব পাওয়া যায় ক্যাশবহিতে : 'জ্যোৎস্না ও রবীবাবু বেথুন স্কুলে যাবার জন্য ১৪ পৌষ ৬'।

এইটুকু ছাড়া মেলা ও অভিনয় ছিল সম্পূর্ণরূপে পুরুষ-বিবর্জিত। মেয়েদের পক্ষে অভিজ্ঞতাটি সম্পূর্ণ অভিনব। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী [দত্ত] লিখেছেন : 'বেথুন কলেজে প্রথম উদঘাটিত শিল্পমেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্তৃক 'মায়ার খেলা' অভিনয় হয়, এবং মেয়েরা পুরুষদের মতো সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করে, সে কি এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন।'[৪] সরোজকুমারী দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, সরলা দেবী শান্তা ও অভিজ্ঞা দেবী প্রমদার ভূমিকায় অভিনয় করেন, অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি।[৫]

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হয় এলাহাবাদে [26-28 Dec 1888] বেঙ্গল চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি জর্জ ইয়ুল [George Yule, 1829-92]-এর সভাপতিত্বে। ব্যারিস্টার নর্টন [Eardley Norton] কংগ্রেসের প্রতি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং 1887-এর মাদ্রাজ অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধিদের একটি ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও জানকীনাথ ঘোষাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাই এলাহাবাদ অধিবেশনের পর এরা যখন কলকাতায় এলেন, ঠাকুরপরিবার তাঁদের সম্মানে একটি ইভনিং পার্টির আয়োজন করেন ২৮ পৌষ [শুক্র 11 Jan 1889] তারিখে। রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে প্রিয়নাথ সেনকে খবরটি জানিয়েছেন : 'আগামী শুক্রবার রাত্রে George Yule ও Norton-এর honour-এ আমাদের এখানে একটা Party হবে তারই বন্দোবস্ত কর্ত্তে এ কদিন ব্যস্ত ছিলুম এবং আছি।'[৬] সংবাদপত্রে খবরটি খুব সংক্ষেপে পরিবেশিত হয় : '...Yesterday there was an evening party at the house of Babu Debendra Nath Tagore, in honour of Mr. Yule and Mr. Norton.'[৭] কিন্তু অনুষ্ঠানটিতে যে জাঁকজমকের কোনো অভাব ছিল না, সেটি স্পষ্ট করে ক্যাশবহির একটি হিসাব : 'দং ইভিনিং পার্টি উপলক্ষে জর্জ ইউল সাহেব প্রভৃতি আগমন করার ব্যয় ২৮৫্ ব্যান্ডবাদক ৫৬ ···খানা তৈয়ারী পেলিটী কোং ১ বিল ১৮০্ গোফুর বাবুরচি ৩৭লo/২১৭লo'। হিসাবটি 'কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিজ স্বতন্ত্র কেশবহি'র, সুতরাং অনুষ্ঠানটির প্রতি মহর্ষির অনুমোদন ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। বস্তুত কংগ্রেস-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতি ছিল, ১ কার্ত্তিক ১২৯৭ [17 Oct 1890] তিনি ২০০০ টাকা কংগ্রেসে দান করেন—অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে প্রথমাবধি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত জামাতা জানকীনাথ ঘোষালের উপরোধ সম্ভবত এ-বিষয়ে অনেকটা কার্যকরী ছিল।

চিত্রশিল্পী আর্চার গত বৎসর রবীন্দ্রনাথ ও মাধুরীলতার একটি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি মহর্ষির একটি তৈলচিত্র আঁকা শুরু করেন। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে এই যোগাযোগ ঘটেছিল। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, পূজ্যপাদ মহাশয়ের ছবি তোলাইবার জন্য পার্ক স্ট্রীট ও গির্জাতলা [অন্যত্র 'যোড়াগির্জা'] যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া হিশেবে ২৭ ও ২৯ পৌষ এবং ১ থেকে ৭ মাঘ ও ১৭ মাঘ মোট দশ দিনে তাঁকে ১৫ ০ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে মনে হয়, ছবি আঁকার প্রতিটি সিটিং-এ তিনি উপস্থিত থাকতেন। ৪ চৈত্রে ক্যাশবহির একটি হিসাব : 'ব°জে, আরচার সাহেব দ° শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের ছবি তৈয়ারীর জন্য উক্ত সাহেবকে দেওয়া যায় ১৫০০্'।

১১ মাঘ [বুধ23 Jan] মহর্ষিভবনে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঊনষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে সমারোহের কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষে কোনো গান রচনা করতে দেখা

যায় না,[১] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত মাঘোৎসবের বিবরণে [ফাল্গুন ১৮১০ শক। ২০১-১১] ও কোনো গান ছাপা হয়নি। সম্ভবত পুরোনো গানই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়েছিল। মায়ার খেলার অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ততা রবীন্দ্রনাথের গান না লেখার কারণ হতে পারে।

এত বিচিত্র কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও রবীন্দ্রনাথের মানসিক অস্থিরতা কাটছিল না। 'ইহার চেয়ে হতে যদি আরব বেদুয়িন'—এই বাসনা কেবল কাব্যকথা নয়, অনুরূপ একটি অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা তিনি বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি লিখেছেন : 'আমার যৌবনারম্ভে এক সময়ে আমার খেয়াল গিয়াছিল, আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিল। কিন্তু আমার পিতাকে যখনই বলিলাম, তিনি বলিলেন, "এ তো খুব ভালো কথা; রেলগাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে।" এই বলিয়া তিনি কিরূপে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার গল্প করিলেন।'[২] তাঁর বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখায় পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি ও পরিণতির কথা জানা যায় : 'Only once Bohemia tugged at him fiercely. Rabindranath conceived an idea of walking all the way from Calcutta to Peshwar by the Grand Trunk Road. He was quite excited and earnest about it. He said two or three friends would join him, they would travel very light, carry very little money with them and would march all day and take their chance for a resting place at night. The idea never actually materialised and gradually fizzled out, and the proposed great hike remained an unwritten epic.'[৩] বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত সম্পর্কে তাঁর যে রোম্যান্টিক কল্পনা ছিল, গাজিপুরে তা যথার্থ অবলম্বন পায়নি, তাই হয়তো এই মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিমণ্ডিত রাজপথ দিয়ে ভ্রমণ করে 'ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীতযুগের স্পর্শলাভ' করার আকাঙ্ক্ষার জন্মদান করেছিল!

কিন্তু অজ্ঞাত অনিশ্চিতের পথে যাত্রার বাসনা যখন বাস্তবে রূপ পেল না, তখন তিনি অত্যন্ত পরিচিত পথই বেছে নিলেন। কন্যা মাধুরীলতা ও একটি আয়াকে [?ভজিয়া দাসী] সঙ্গে নিয়ে তিনি মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে সোলাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। রবীন্দ্রনাথের যাত্রার সঠিক তারিখটি নির্ণয় করা একটু শক্ত। আমরা আগেই দেখেছি, মহর্ষির তৈলচিত্রের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ১৭ মাঘ [মঙ্গল 29 Jan] পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে যান। ওই তারিখেই তাঁকে কাশিয়াবাগানে স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ি যেতে হয় : '১৭ মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের আদেশ মতে রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের কাছিয়া বাগান যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া'; 'ব° শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দং উঁহাকে সাহায্য বিঃ ৮৩৫ নং এক চেক গুঃ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০'—হয়তো এই চেক দিতে যাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কাশিয়াবাগান যেতে হয়—না-কি এই যাত্রাতেও স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সঙ্গিনী হয়েছিলেন? ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, তিনি ১৮ বুধ 30 Jan] ও ২২ মাঘ [রবি 3 Feb] পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিলেন। এর পর ২৫ মাঘ [বুধ 6 Feb]-এর হিসাব : 'ব° বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উক্ত বাবু মহাশয়ের বম্বে গমনের পাথেয় জন্য দেওয়া যায় বিঃ এক বৌচর গুঃ খোদ কৈ° হা° আদায় ২০০ '—হিসাবের শেষ অংশটির তাৎপর্য এই যে, ১৮ মাঘ উক্ত উদ্দেশ্যে অগ্রিম হিসেবে তাঁকে যে ২০০ টাকা দেওয়া

হয়েছিল, এই দিন সেটি তাঁর নামে খরচ হিসেবে লেখা হল। অনুমান করা যায়, এর দু' এক দিনের মধ্যে তিনি সোলাপুর যাত্রা করেন।

এই বারে রবীন্দ্রনাথ প্রায় চার মাস বিদেশে ছিলেন, এর মধ্যে দু' মাসের কিছু বেশি তিনি সোলাপুরে কাটান, বাকি সময়টা ছিলেন পুনা ও খিরকি [Kirkee]-তে।

ফাল্গুন, চৈত্র ১২৯৫ ও বৈশাখ ১২৯৬-এর প্রথম দিকটা রবীন্দ্রনাথ সোলাপুরে ছিলেন। প্রিয়নাথ সেনকে একটি পত্রে লিখেছেন : 'এ জায়গাটা যে খুব মনোরম তা নয়—জমিতে ঘাস নেই—গাছে পাতা নেই—জলাশয়ে জল নেই—লোকালয়েও অধিক লোক নেই—চারিদিক মরভূমির মত ধূ ধূ করচে। আমার এই লেখবার ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কেবল প্রখর রৌদ্র ও তপ্ত বাতাস আসে, কোন সুন্দর বা বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায় না। দেখতে দেখতে দোয়াতের কালী শুকিয়ে জমে আসে—শরীরের ঘর্ম্ম সজলাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই শুকিয়ে যায়—রচনা করবার সময় আমার কাব্যরস শুকিয়ে আসে কিনা জানিনে কিন্তু আমার কালী শুকিয়ে বাস্তবিক লেখবার বড়ই ব্যাঘাত করে।'[২] অসুবিধাটা সত্যই গুরুতর ছিল, কারণ এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর প্রথম বড়ো নাটক 'রাজা ও রানী' লেখেন। ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়, নাটকটি 'এক মাসের অনধিক কালে রচিত' হয়েছিল।[৩] প্রিয়নাথ সেনকে উক্ত পত্রে খবরটি জানিয়ে লেখেন : 'ইতিমধ্যে আমার একখানা নাটক শেষ হয়ে গেছে। এখনো নামকরণ করে উঠতে পারিনি। আমার নিজের ভাল লাগ্‌চে—মনে হচ্ছে একটা কাজ করেছি—কিন্তু জানই ত/ আপরিতোষাদ্বিদূষাং ইত্যাদি/ তোমাদের কাছ থেকে বাহবা পেলে তবে বোঝা যাবে। এ নাটকের গল্পটা তোমাদের কাছে কখনো করেছি কি না মনে নেই—যা তোক গোপনে রাম নইলে কৌতূহল অনেকটা চলে যাবার সম্ভাবনা।'[৪] অর্থাৎ নাটকের প্লটটি কলকাতায় থাকার সময়েই তাঁর মাথায় এসেছিল।

বস্তুত ১২৯৪-এর শরৎকালে 'মায়ার খেলা' লেখার সময় থেকেই প্রেমের স্বরূপ নিয়ে ভাবনা তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম,/ প্রেম মেলে না,/ শুধু সুখ চলে যায়'–'মায়ার খেলা'র শেষ গানটির কয়েকটি ছত্র রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী-সংস্করণ রাজা ও রানী-র সূচনায় ব্যবহার করেছিলেন, তথ্যটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর পর তিনি অগ্র° ১২৯৪-এ 'নিস্ফল কামনা', 'বিচ্ছেদের শান্তি', 'সংশয়ের আবেগ', 'নিস্ফল প্রয়াস', 'হৃদয়ের ধন' প্রভৃতি কবিতায় প্রেম সম্পর্কে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন—আমাদের ধারণা—রাজা ও রানী নাটকে সেইটিই কাহিনীর আশ্রয়ে নাট্যদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 26 Nov [১২ অগ্র°] পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্রনাথ 'Chivalry'-শীর্ষক প্রস্তাবে লিখেছিলেন : 'Browning-এর In a Balcony নামক নাট্যকাব্যে রাজ্ঞী দুঃখ করিতেছেন যে, কেবলমাত্র রাণী হইয়া স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণতা নাই সুখ নাই; যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্মান উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ভালবাসে তাহা হইলেও যেন তাঁহার স্ত্রী-প্রকৃতি কতকটা চরিতার্থ হয়।' রানী সুমিত্রা যেন এই আদর্শের বিপরীতে রচিত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

বৎসরটি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পক্ষে ঘটনাবহুল নয়। যেক'টি ঘটনার কথা আমরা জানতে পেরেছি, নিম্নে উল্লিখিত হল।

প্রতিভা দেবী ও আশুতোষ চৌধুরীর প্রথম পুত্র আর্যকুমারের অন্নপ্রাশন হয় ৫ বৈশাখ [সোম 16 Apr] ও ভাদ্র মাসের শেষে গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নামকরণ করা হয় 'গেহেন্দ্রনাথ'।

১৩ অগ্র° [মঙ্গল 27 Nov] রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এইদিনই গুণেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিশিবালা দেবীর এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুহাসিনী দেবীর বিবাহ হয়।

১৯ মাঘ [31 Jan 1889] অরুণেন্দ্রনাথের স্ত্রী চারুশীলা দেবী একটি মৃত কন্যা প্রসব করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাত্র এক বৎসর আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

জোড়াসাঁকো বাড়ির পুকুরটিকে বুজিয়ে ফেলার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১০ চৈত্র [22 Mar]-এর হিসাবে দেখা যায় : 'বাটীর দক্ষিণে যে স্থানে পুষ্করিণী ছিল তাহার উপর জমি সমান করিয়া ঘাস বসাইয়া খেলার জায়গা হওয়ার ব্যয় ৩৭৪ ৷৷ল০'—অনেকের স্মৃতিকথায় এই খেলার মাঠের উল্লেখ আছে।

1888-এ সংস্কৃত কলেজ থেকে ক্ষিতীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিভাগে এবং বেথুন স্কুল থেকে সরলা দেবী ও মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে সুধীন্দ্রনাথ তৃতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইন্দিরা দেবী লরেটো হাউস থেকে ও সুরেন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে উভয়েই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। Calcutta University Calendar-এ তখন এন্ট্রান্স-পরীক্ষার্থিনী মেয়েদের বয়স উল্লেখ করা হত না, সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে লেখা আছে ১৫ বৎসর ৭ মাস।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও ১২৯৫ বঙ্গাব্দের অধিকাংশ সময়ই কলকাতার বাইরে ছিলেন, ফলে ব্রাহ্মসমাজের কাজে তাঁর মনোযোগের অভাব লক্ষিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় গত বছর চৈত্র মাসে সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন, তিনিই মোটামুটি কার্য-পরিচালনা করছিলেন।

পূর্ব বৎসর [১২৯৪] ২৬ চৈত্র [শনি 7 Apr 1888] প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় 'ব্রাহ্মসমাজ সম্মিলনী' নামে একটি সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। উল্লেখ্য, বৎসরের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ প্রস্তাব করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্রের প্রস্তাবানুসারে বর্তমান বৎসরের শুরুতেই ৩ বৈশাখ [শনি 14 Apr] ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথের পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে 'ব্রাহ্মসম্মিলন সভা' হয়—তত্ত্ব-কৌমুদী-তে [১১৪, ১৬ জ্যৈষ্ঠ। ৪৮] লিখিত হয় : 'তাহাতে তিন শত ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। তিন সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপাসনার কার্য করেন।' এর পর 2 May [বুধ ২১ বৈশাখ] Concord club-এ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ সম্মিলনীর আর একটি সভায় আশুতোষ চৌধুরী 'Charity and Charitable Institutions' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১] রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে গাজিপুরে

ছিলেন বলে তিনটি সভার কোনোটিতেই উপস্থিত থাকতে পারেননি। কয়েক মাস পরে মাঘ মাসে তিনি একটি সভায় যোগ দেন, কিন্তু ১৮ মাঘ [বুধ 30 Jan 1889] 'প্রতাপবাবুর সম্মিলনী সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের যাতায়াতের গাড়িভাড়া' ক্যাশবহির এই হিসাবটি ছাড়া উক্ত সভা সম্বন্ধে আমরা আর কিছু জানতে পারিনি। আর একটি হিসাবে দেখা যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক অক্ষয়কুমার মজুমদার ও অজপ্রকাশ ভদ্র উক্ত অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন—সুতরাং সভায় সংগীত-পরিবেশনের ব্যবস্থাও ছিল।

১১ মাঘ [বুধ 23 Jan 1889] আদি ব্রাহ্মসমাজের উনষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'প্রাতঃকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত বহিঃ প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপের নিম্নে ব্রহ্মোপাসনা হয়। দেশ বিদেশ লইয়া লোকসংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল।'[১] উপাসনার পর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ উপদেশ পাঠ করেন।

সায়ংকালীন উপাসনায় 'শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহ পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত ও আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। লোকের সমাগম এত হয় যে ঐরূপ প্রকাণ্ড গৃহে তিলার্দ্ধেরও স্থান ছিল না। সুবিখ্যাত বক্তা বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথম একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।'[২] এরপর শম্ভুনাথ গড়গড়ি উদ্বোধন করেন ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বেদী থেকে উপদেশ দেন। আগেই বলা হয়েছে, এই বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উৎসবে গীত কোনো গানই মুদ্রিত হয়নি।

মাঘোৎসব উপলক্ষে জোড়াসাঁকো বাড়ির অন্তঃপুরে 'মহিলা সমাজ' হয়; এই অনুষ্ঠানে যে উপদেশ পঠিত হয়, সেটি 'শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরে মহিলা-সমাজ/ স্ত্রীলোকের পঠিত উপদেশ' নামে তত্ত্ববোধিনী-র ফাল্গুন সংখ্যায় [পৃ ২১১-১৩] মুদ্রিত হয়।

৪ কার্ত্তিক [শুক্র 9 Oct] আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু পূর্বে নির্মিত 'শান্তিনিকেতন' গৃহ অবহেলায় ও সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। ২৬ ফাল্গুন ১২৯৪ আশ্রমের ট্রাস্ট ডীড রেজেস্ট্রি হওয়ার পর ট্রাস্টীরা এই গৃহের সংস্কার-কার্যের দিকে মন দেন। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : শান্তিনিকেতনের মেরামত সমাধা হইলে প্রয়োজনীয় বিবিধ গৃহসজ্জায় প্রাসাদ সুসজ্জিত হইল এবং আশ্বিন মাসের শেষে [১৯ আশ্বিন] দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে মহর্ষিদেবের পুত্র প্রভৃতি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।···৩রা কার্ত্তিক···দেখিলাম বিবিধ বহুমূল্য গৃহোপকরণে আশ্রম পরিপূর্ণ হইয়াছে, মহর্ষিদেব তাঁহার ব্যবহৃত সংস্কৃত, ইংরাজি, বাঙ্গলা বহুসংখ্যক পুস্তক ও পুস্তকাধার আশ্রমে দান করিয়াছেন। কন্যাকে প্রথমবার স্বামীগৃহে পাঠাইবার সময় যেমন পিতামাতা নিজের অবস্থানুরূপ গৃহস্থের প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য যৌতুকরূপে প্রদান করেন মহর্ষিদেবও সেইরূপ খাট পালঙ্কাদি শয্যাদ্রব্য, টেবিল, চেয়ার, কৌচ, কার্পেট, পাকশালায় আবশ্যক বিবিধ তৈজসপত্রাদি, এমন কি সূচ সুতাটি পর্য্যন্ত, দিয়া আশ্রম সাজাইয়া দিয়াছেন।[৩] একটি হিসাবে এই বিবরণের সমর্থন মেলে : 'দং শান্তিনিকেতনের বাটীর জন্য জিনিস আদি ক্রয়—কৌচ, টেবিল, পাখা, ম্যাটীং প্রভৃতি ও রশুইয়ের ও খাবার বাসনাদি ফিল্টার ঘড়ি দিগর ক্রয়ের এক হিসাব ২০০৭।০

৯ কার্ত্তিক [বুধ 24 Oct] সন্ধ্যার পূর্বে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনার সূচনা হয়। শান্তিনিকেতনে বুধবারের উপাসনার এইটিই সূত্রপাত।[৪] অঘোরনাথ লিখেছেন : 'শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে আমি আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করি, বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় সঙ্গীত করেন।'[৫]

শান্তিনিকেতনের জন্য নিযুক্ত প্রথম আশ্রমধারী দেবপ্রতিপালক বাবাজি দায়িত্বভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই আশ্রম ত্যাগ করেন। অঘোরনাথের উৎসাহ ও নিষ্ঠা দেখে মহর্ষির নির্দেশে ট্রাস্টীরা এবার তাঁকেই আশ্রমধারী রূপে নিযুক্ত করেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, ৭ অগ্র° [বুধ 21 Nov] স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ পুত্র মুণীন্দ্র, দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও এক বৎসরের একটি কন্যা নিয়ে তিনি আশ্রমবাসী হন। এর পর আট বছরেরও বেশি তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য :৩

'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামাঙ্কিত খাতাটি রবীন্দ্রভবনের ২৭২ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি—মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬২, তার মধ্যে ১৫৭টি পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, বাকি ৫টি পৃষ্ঠা সাদা। কয়েকটি পাতা হারিয়ে গিয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

খাতাটি ইন্দিরা দেবীর সংগ্রহে ছিল। তিনি লিখেছেন : 'আমাদের একটি পারিবারিক খাতা ছিল যেটি···ভবানীপুরের বাড়িতে সিঁড়ির উপরে একটি উঁচু ডেস্কের উপর শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। যার যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে রাখত।···এরকম দুখানি খাতা পর পর ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রথমটি রথীর পঞ্চাশতম জন্মদিনে তাকে উপহার দিই, এখন এটি সযত্নে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।'[১]

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই ভঙ্গুর পাণ্ডুলিপিটির কীটদষ্ট বা জরাজীর্ণ পাতাগুলি বিচ্ছিন্ন করে, দুপিঠ আস্বচ্ছ কাপড়ে মুড়ে, বোর্ড কাপড় ও চামড়া দিয়ে গ্রন্থাকারে বাঁধাই করা হয়েছে। বর্তমানে পাতাগুলির মাপ মোটামুটি 32.5×20 সেন্টিমিটার। প্রতি পৃষ্ঠায় নীলাভ সূক্ষ্ম রুল ৩৪টি।[২]

প্রথম দিকে মূল অংশের পৃষ্ঠাঙ্ক হিসেবে বাংলা সংখ্যার [১, ২, ৩,] ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন জনের লেখা প্রস্তাবগুলিও এইরূপ সংখ্যা-চিহ্নিত। পাণ্ডুলিপিটি পর্যালোচনা করতে গেলে দুটি সংখ্যাই মূল্যবান, কেননা বহু ক্ষেত্রেই পরবর্তী প্রস্তাব-লেখক আগের পৃষ্ঠা বা প্রস্তাবের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে অ-চিহ্নিত পৃষ্ঠাগুলি সংখ্যা-চিহ্নিত করতে গিয়ে ইন্দো-আরবীয় হরফ [1, 2, 3, ···] ব্যবহার করা হয়, ফলে দু-প্রস্থ পৃষ্ঠাসংখ্যার উদ্ভব হয়েছে—যেমন, পূর্ববতী ১ চিহ্নিত পৃষ্ঠাটি এখন '7'-সংখ্যার দ্বারা নির্দেশিত।

পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠাটি [p. 1] ইন্দিরা দেবীর উপহার : 'শ্রীমান রথীন্দ্রের/ শুভ পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে/ বিবি দিদি/ ২৭। ১১। ৩৮ [রবি ১১ অগ্র° ১৩৪৫]। p.4 রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে : 'নিষেধ // ১। পেন্সিলে লেখা।/ ২। আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া।/ ৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে ততদিন এ খাতার প্রবন্ধ কা[গজে] অথবা পুস্তকে ছাপান।' p.5 জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা নামপত্র : 'পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তক/ ইহাতে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত/ সকলেই/ (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন)/ আপন আপন মনের ভাব চিন্তা স্মর্ত্তব্য বিষয়/ ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। ইতি। P. 2, 3, 6-এ কিছু লেখা হয়নি।

২১ কার্ত্তিক [সোম 5 Nov] ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'Philology' শীর্ষক প্রস্তাব লিখে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এর সূচনা করেন [p.7]। দিনটি বলেন্দ্রনাথের ঊনবিংশতম জন্মদিন, কিন্তু যোগাযোগটি নিতান্ত কাকতালীয় বলে মনে হয়—কারণ এইদিন বলেন্দ্রনাথের লেখা একটি প্রস্তাব ['অক্ষর তত্ত্ব'] থাকলেও, জন্মদিনের প্রসঙ্গ তাঁর বা অন্য কারো রচনায় দেখা দেয়নি। এই খাতার সর্বশেষ প্রস্তাবের [১১৯-সংখ্যক] লেখক রবীন্দ্রনাথ [ধ্বন্যাত্মক শব্দ-সংকলন,? ১৩০৬-০৭], কিন্তু এর রচনাকাল দেওয়া নেই। এর আগের ১১৮ সংখ্যক প্রস্তাবে বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে ৯ অগ্র° ১৩০২ [রবি 24 Nov 1895] লেখা পত্রটি কপি করে রাখা হয়েছে। সুতরাং এই খাতার কালসীমা ১২৯৫-১৩০২ এই সাত বৎসর ধরা যেতে পারে—কিন্তু পারিবারিক খাতার প্রধান যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ একই বিষয়কে বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখে একটা বিতর্কের আবহাওয়া সৃষ্টির প্রবণতা সেটি এক বৎসরের মধ্যেই মন্দীভূত হয়েছে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এর একটি পরিশিষ্ট আছে। তার শুরুতে [p.141] ইন্দিরা দেবী লিখে রেখেছেন : 'মূল খাতার অনুক্রম নহে। বহু পরে সংযোজিত'—এর মধ্যে ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ [9 Jun 1923]-এ লেখা 'শিলঙের চিঠি' [দ্র পূরবী ১৪।১৬-১৯] কবিতাপত্রের অনুলিপিও রয়েছে।

এই পুস্তকের বিভিন্ন প্রস্তাব সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়েছে। পুলিনবিহারী সেন ১৩৫২-৫৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া দেশ-এ অনেকগুলি রচনা সংকলন করেন। ড পশুপতি শাশমল বিশ্বভারতী পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, দিগন্ত ও দক্ষনাবিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান লেখকদের রচনা টীকা-সহ সংকলন করেছেন। বিশেষত শেষোক্ত পত্রিকায় 'পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায় তিনি বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনী-সহ সমস্ত রবীন্দ্ররচনার যে সংকলন করেছেন, সেটি একটি স্বল্প-পরিচিত পত্রিকার পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ না থেকে অবিলম্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' একটি খসড়া-খাতা হলেও বিশেষত রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ক্ষিপ্রগতি ও বহুমুখিনতার দৃষ্টান্ত হিশেবে সযত্নে অনুশীলনযোগ্য।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

আগেই বলা হয়েছে[১], বাংলা দেশে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির যে মহিলা শাখা গড়ে ওঠে [1882] স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথমাবধিই তার সভানেত্রী [1882-86] ছিলেন। এই সূত্রে যে-সমস্ত মহিলার স্বামী বা বাড়ির পুরুষেরা থিয়সফিস্ট ছিলেন, তাঁরা স্বর্ণকুমারীর কাশিয়াবাগানের বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং তাঁরা সখিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। তাঁদের মধ্যে নানা আলোচনার সূত্রে 'একটি প্রস্তাব' উত্থাপিত হয় ও ভারতী-র বৈশাখ ১২৯২ [পৃ ১৪-২৪]সংখ্যায় সেটি মুদ্রিত হয়।[২] 'অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত শিক্ষিত মহিলাদের সম্মিলন' ছিল এই প্রস্তাবের লক্ষ্য। পরের বছর আর 'একটি প্রস্তাব' [দ্র ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৩২০-২১]-এ লেখা হয় : 'গত বৈশাখ মাসে ভারতীতে একটি প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধে লেখিকা দেশের স্ত্রীলোকদের সুশিক্ষার উপর দেশের উন্নতি কতদূর নির্ভর করে তাহা দেখাইয়া সাধারণ স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি ও উপায় স্বরূপ আমাদের দেশের শিক্ষিতা ও অন্তঃপুর বদ্ধা মহিলাদিগের পরস্পর মেলামেশা সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব

করেন। কয়েকটি কৃতবিদ্য মহিলা সেই প্রস্তাবটি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সেই উদ্দেশে এই বৈশাখ হইতে সখিসমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিতেছেন।' সরলা দেবী এ-সম্বন্ধে লিখেছেন : 'মাদাম ব্লাভাটস্কির প্রতি শ্রদ্ধায় যখন মান্দ্য পড়ল, থিয়সফির দল ভঙ্গ হল, তখন থিয়সফির সূত্রেই যাঁদের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হয়েছিল, সেই সব মহিলাদের নিয়ে 'সখি-সমিতি' নাম দিয়ে মা একটি সমিতি স্থাপন করলেন। 'সখি-সমিতি' নামটি রবিমামার দেওয়া। কুমারী ও বিপন্না বিধবাদের বৃত্তি দিয়ে পড়ান, পড়া সাঙ্গ হলে তাদের শিক্ষয়িত্রীরূপে বেতন দিয়ে অন্তঃপুর-মহিলাদের শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত করা, মফঃস্বলে ধর্ষিতা নারীদের জন্যে প্রয়োজন হলে উকিল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করে মোকদ্দমা চালান, বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহ করে মেলা করা, তাতে মেয়েদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতি নানা আয়োজনে 'সখি-সমিতি' বিখ্যাত হয়ে উঠল।'[৩] মোকদ্দমা করার কোনো বিবরণ অবশ্য সখিসমিতি-র বার্ষিক প্রতিবেদনগুলিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সরলা দেবী কথিত অন্যান্য কাজগুলি সমিতি তার সীমিত সামর্থ্যে করে গেছে। বর্তমান বৎসরের বৈশাখ মাসে ভারতী ও বালক-এ 'মহিলা-শিল্পমেলা' শীর্ষক একটি প্রস্তাবে [পৃ ৪৯-৫১] লেখা হয় : '…সখীগণ আপনাদের মধ্যে অতিরিক্ত চাঁদা তুলিয়া সেই অর্থ হইতে বৎসর বৎসর একটি মহিলা শিল্পমেলা খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। দেশীয় মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি ও মহিলাগণ বিরচিত নানাবিধ শিল্পাদি এই মেলায় প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইবে।…সমিতি আগামী মাঘ মাসে এই মেলা খুলিবার ইচ্ছা করেন। আয়োজনটি অবশ্য আগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং ১৫ পৌষ [শনি 29 Dec] বেথুন কলেজের প্রাঙ্গণে মহিলা-শিল্পমেলার উদ্বোধন হয়। বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর সার স্টুয়ার্ট কলভিন বেলী-র স্ত্রী লেডি বেলী দুপুর বারোটায় মেলার উদ্বোধন করেন, অল্পক্ষণ পরেই ভারতের নবনিযুক্ত গবর্নর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউনের পত্নী মেলাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। খবরটি দিয়ে ভারতী ও বালক-এ লিখিত হয় : '…কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন। মেলা তিন দিন খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৩টা অবধি মেলার দোকান খোলা থাকিত। বিক্রেতা ক্রেতা ও দর্শক সকলেই এ মেলায় মহিলা। মেলা উপলক্ষে বেথুন স্কুলের বাড়ীটি লতাপাতা ফুল প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। বাটীর মধ্যস্থলের খোলা উঠান চাঁদোয়া দ্বারা ঢাকিয়া উঠানের মধ্যভাগে একটী লতা পাতা রচিত কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুটীরের মধ্যে ফুলের দোকান। উঠানের চারি পার্শ্বে বারান্দায় ও ঘরে মহিলাদের ক্রয়োপযোগী নানারূপ দ্রব্যাদি সজ্জিত হইয়াছিল।'[১] 'দানের দ্রব্যাদি, মেলায় ক্রীত দ্রব্যাদি ও টিকিট বিক্রয়ের মূল্য এবং কমিশন প্রভৃতি সমস্ত লইয়া' এ-বৎসরের মেলার আয় ১৪৭৪ ১৫ এবং ব্যয় ১০৪০ বাদ দিয়ে ৪৩৪ ১৫ লাভ সখিসমিতির অধ্যক্ষাদের খুশি করেছিল, সন্দেহ নেই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫

কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন এই বৎসর অনুষ্ঠিত হয় এলাহাবাদে 26 Dec 1888 থেকে 28 Dec [বুধ-শুক্র ১২-১৪ পৌষ] পর্যন্ত। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ জর্জ ইউল [Mr. George Yule, 1829-92][২] এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। প্রথম

তিনটি কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রসমূহ এর বিরোধিতা করলেও ইংরেজ রাজপুরুষদের মধ্যে সহৃদয়তার অভাব দেখা যায়নি। কিন্তু এলাহাবাদ কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদী শাসন তার নখর-দংষ্ট্রা প্রদর্শন করল। ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মিঃ হিউমকে উৎসাহিত করেছিলেন। পরে সরকারী কর্মচারীদের সরাসরি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে নিষেধ করলেও সহানুভূতি প্রকাশে বিরত ছিলেন না। প্রথম কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে সেখানে গৃহীত প্রস্তাবকে সম্মান জানিয়ে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করেন। ভাইসরয়ের পদ পরিত্যাগের কিছু আগে সেক্রেটারি অব্ স্টেটের কাছে প্রেরিত এক গোপন ডেসপ্যাচে ব্যবস্থাপক সভাসমূহের পুনর্গঠন বিষয়ে কংগ্রেসের প্রস্তাব সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁর বিদায়সভার ভাষণে কংগ্রেস-আন্দোলনকে তীব্র আক্রমণ করে এর নেতাদের 'microscopic minority''বলে অভিহিত করেন। উত্তর প্রদেশের গভর্নর স্যার কলভিন অকল্যান্ড এই মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ নিলেন। তিনি এক সাকুলারে সরকারী কর্মচারীদের অধিবেশনে উপস্থিত হবার উপর নিষেধ জারি করেন। অধিবেশনের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারেও প্রচুর অসুবিধা সৃষ্টি করেন। শাসক-সম্প্রদায়ের বন্ধু কাশীর রাজা শিবপ্রসাদ প্রতিনিধি-রূপে সভায় উপস্থিত হয়ে গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস পান। 1887-এ বীর রাঘব চেরিয়ার-রচিত কংগ্রেস বিষয়ে প্রশ্নোত্তর-মূলক 'Tamil Catechism' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তামিল ভাষায় লেখা পুস্তিকাটির ত্রিশ হাজার ও উর্দুতে অনূদিত পঁচিশ হাজার কপি বিনামূল্যে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে বিতরিত হয়। ড বিমানবিহারী ও ভকতপ্রসাদ মজুমদার অনুমান করেছেন, এই পুস্তিকাটি ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের অসন্তোষ-উৎপাদনের অন্যতম কারণ।[৩]

এবার ১২৪৮ জন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ২২১ জন মুসলমান।

আমরা আগেই বলেছি, কংগ্রেস অধিবেশনের পর মিঃ ইউল ও মিঃ নর্টন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁদের সম্মানে 11 Jan 1889 [শুক্র ২৮ পৌষ] ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে একটি ভোজসভার আয়োজন করা হয়।

কংগ্রেসের অধিবেশনের দু'মাস পূর্বে কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন [Bengal Provincial Conference] অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ছিল সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় গুরুত্ব আছে এমন প্রস্তাব নিয়েই সেখানে আলোচনা হত। সেইজন্য প্রাদেশিক বিভিন্ন সমস্যার আলোচনার উদ্দেশ্যে এই প্রাদেশিক সম্মেলনের পরিকল্পনা। 25-28 Oct [বৃহ-শনি ১০-১২ কার্ত্তিক] ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন হলে প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হল। অন্যান্য প্রদেশও ক্রমে ক্রমে এই ধরনের সম্মেলনের আয়োজনে উদ্যোগী হয়।

প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না, তিনি তখন শান্তিনিকেতনে কাব্যচর্চায় ব্যাপৃত। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি একাধিকবার বিভিন্ন জেলা-শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত হন ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। 1908-এ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬

রবীন্দ্রনাথের ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্য অবলম্বনে ব্যঙ্গকাব্য ‘মিঠেকড়া’ [‘ইহা কড়িও নহে, কোমলও নহে, পূরো সুরে মিঠেকড়া’] লেখেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ‘রাহু’ ছদ্মনামে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ : 17 Apr 1.888 [মঙ্গল ৬ বৈশাখ]। রবীন্দ্র-বিদূষণকে প্রথম ধারাবাহিকতা দান করেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পরে সেই পথে চলার লোকের অভাব হয়নি—কালীপ্রসন্ন তাঁদেরই একজন। তবে অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি হিতৈষীর ছদ্মবেশ ধারণ না করে সোজাসুজিই তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এবং রুচি-বৈগুণ্যে কোনোদিনই তাঁর পাঠকের অভাব হয়নি—রবীন্দ্র-কাব্যের বিশ্বখ্যাতি লাভের বহু পরে ১৩২৮ বঙ্গাব্দেও [1921] গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াই তার প্রমাণ।

গ্রন্থের ‘ভূমিকা’র কিছু অংশ আমরা আগে উদ্ধৃত করেছি, এখানে শেষাংশ উদ্ধার করা যাক : ‘মোট কথা —যদিও ইহাতে ‘কড়ি ও কোমলে’র ন্যায় “স্তন” নং ১, “স্তন” নং ২, “চুম্বন”, “বিবসনা” প্রভৃতি সুরুচি-সঙ্গত কবিতা লিখি নাই, তথাপি তদ্রুপ ঈশ্বর-প্রেমাত্মক এক-আধটি কবিতার অভাব হইবে না। মন্দ লোকের মন্দ ভাব—আমার মনে পাপের লেশমাত্র নাই।

‘সুজন পাঠক,—তুমি যতই দুর্জন হও না কেন, যখন আমার কাব্যপাঠ করিতেছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি সুজন—অতএব গ্রন্থকারদিগের কৌলিক প্রথানুসারে পুনশ্চ বলিতেছি—হে সুজন পাঠক, তুমি তোমার পত্নীর সমক্ষে অবলীলাক্রমে এই “মিঠে কড়া” নামক মহাকাব্য পাঠ করিতে লজ্জা বোধ করিবে না। এবং হংহো পাঠিকে, তুমিও তোমার স্বামীর নিকট আদি ব্রাহ্মমতে এই পুস্তক পড়িতে পারিবে। পড়িলেই বুঝিবে রবি আমার কবলে কিনা।—রাহু’

‘গ্রন্থ-সূচনা’য় তিনি লিখেছেন :

…ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ/ বঙ্গের আদর্শ কবি।
শিখেছি তাঁহারি দেখে;/ তোরা কেউ কবি হবি? …
সে যে রবি—আমি রাহু,/ তুল্য মূল্য সবাকার।
ধনী সে—দরিদ্র আমি,/ সে আলো—এ অন্ধকার।’

এর পর কড়ি ও কোমল-এর প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা উল্লেখ করে করে অনেকগুলি কবিতার প্যারডি রচনা করেন কালীপ্রসন্ন। তার অনেকগুলি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত হওয়ায় পাঠকের কাছে সুপরিচিত। আমরা এখানে ‘কাব্যবিশারদ’-এর মুন্সিয়ানার পরিচিতি হিশেবে একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রচারিত অংশ উদ্ধৃত করছি, এর শিরোনাম ‘ঈশ্বরের প্রেম’ :

ইহা রথযাত্রা কি জলযাত্রা হইতে ফিরিয়া লেখা হয় নাই

মুদির দোকানের এক সের, আধ সের, এক পোয়া
আধ পোয়া, প্রভৃতি যথাক্রমে উপরি উপরি
সাজান দেখিয়া লিখিত হইল।
এক সের হতে ছটাকের সিকি
সারি সারি রাখা তবকে তবকে
যেন যুবতীর কুচ একতর

প্রলয় ঘটায় পলকে পলকে।

—হিতবাদী-র সম্পাদক-রূপে 1896 [১৩০৩]-এ 'রুচি-বিকার' নামে একটি 'প্রাপ্ত' কবিতা মুদ্রিত করার ফলে মানহানির অভিযোগে তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল, প্রসঙ্গটি এই সূত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি!

গ্রন্থশেষে 'স্বপ্ন দর্শন'-এ লেখক প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন :

শুন ওরে মূর্খ কবি/ বগলে পুরেছ রবি
মিঠেকড়া নব ছবি/ গিয়াছ রে আঁকিয়া।
নাশিতে তোমার জাড্য/ রচনার পারিপাট্য
নূতন হেঁয়ালি নাট্য/ রহিয়াছে হইয়া
সেই সে মুষল যবে/ বালকে বাহির হবে
কি করিবে তুমি তবে/ মোটা বুদ্ধি লইয়া?
ঠাট্টা হবে গাড়ী গাড়ী/ হাসিবে ঠাকুর বাড়ী
ক্ষিতিতলে গড়াগড়ি/ যারে তারা হাসিয়া।[১]

—হেঁয়ালি নাট্যের আকারে বালক পত্রিকায় মুষল-বর্ষণ রবীন্দ্রনাথ বহুবার করেছেন, কিন্তু বর্তমান 'রুচিবিকার'-এ স্তম্ভিত হয়ে তিনি লিখলেন 'নিন্দুকের প্রতি *নিবেদন*'—তাঁর বেদনা সম্ভবত আরও তীব্র হয়েছিল কালীপ্রসন্ন ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে লেখা পত্র-কবিতাগুলিকে ব্যঙ্গের অন্যতম লক্ষ্য করেছিলেন বলে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-ভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেন 'মিঠেকড়া পাঠ করে শ্রীকাকাতুয়া দেবশর্মা ছদ্মনামে 'রবিরাহু' নামে টীকা-সহ একটি শ্লেষাত্মক কবি লেখেন আষাঢ় ১২৯৮ [পৃ]-সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায়; টীকাটি হল : 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কড়ি ও কোমল" কাব্য পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রবিরাহু শর্ম্মা "মিঠে কড়া" লিখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রবিরাহুর করকমলে উপহারস্বরূপ অর্পিত হইল।' একই সংখ্যায় স্বনামে দেবেন্দ্রনাথ 'মালা/ রবীন্দ্রবাবুর সনেট' কবিতা লিখে কড়ি ও কোমল-এর সনেটগুলির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, 'রবিরাহু' কালীপ্রসন্নের শেষ পরিচয় হয়ে থাকেনি। 'বিদ্যাপতি/ সমগ্র বঙ্গীয় পদাবলী' [১৩০১] ও হিতবাদী-র সম্পাদক, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ—এই পরিচয়েই তিনি বাঙালির স্মৃতিমন্দিরে স্থান পেয়েছেন এবং সেই-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল।

---

১ 'নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা। (উদ্বোধন)', তত্ত্ব°, জ্যৈষ্ঠ। ২৬-২৭; উপাসনাটি সম্ভবত গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজে হয়। অগ্র° ১২৯০-এ মুসৌরী-দেরাদুন ত্যাগ করে জলপথে প্রত্যাবর্তনের সময়ে মহর্ষি এই ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন দ্র তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৬ পৌষ ১৮০৫ শক। ২১৪

১ চিঠিপত্র ৮। ৪৭, পত্র ৬৩

২ 'শূন্য গৃহে' কবিতার বর্জিত প্রথম দু'টি স্তবক।

৩ মানসী ২। ১৭৫

১ পাণ্ডুলিপিতে 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতাটির শেষ দুটি স্তবক।

১ প্রমথনাথ বিশী কবিতাটির ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্তবকে কালিদাসের পথিকবধূ ও যক্ষনারীর উপস্থাপনায় 'রসবোধের অখণ্ডতা খণ্ডিত' হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দ্র রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ১ [১৩৬৩]। ৫৯—পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, কবিতাটির প্রাথমিক রূপ বৃন্দাবনের রাধাকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল, উক্ত দুটি স্তবক পরবর্তী সংযোজন।

১ *Rabindranath Tagore: A Biography* [1980], pp.131-32

২ 'আকাঙক্ষা', মানসী ২। ১৪২

৩ 'পুনর্মিলন', প্রভাতসংগীত ১। ৭৪

১ গীতসূত্রসার [১ম : 1885, ২য় : 1886]—এই বইটি রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো করে পড়া ছিল। বৎসর-খানেক পরে লিখিত 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' প্রবন্ধে বইটির কোনো কোনো বক্তব্যকে অবলম্বন ক'রে তিনি আলোচনার বিস্তার ঘটিয়েছেন।

২ 'গানের ভিতর দেবদর্শন', গীতবিতান বার্ষিকী [১৩৫০]। ১১৪-১৫

১ জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী ১ [১৩৭৭]। ২৩৯

২ চিঠিপত্র ৫। ১৫০, পত্র ৬ [১৭ মাঘ ১২৯৭]

১ কবিতাটির ষষ্ঠ স্তবকের শেষ দুটি ছত্রের পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ : 'দূর কর এ কাগজখানা/করগো কর দূর'।

২ মানসী ২। ২০৫

৩ 'দেশের উন্নতি' কবিতার শেষ স্তবকের পাণ্ডুলিপি-ধৃত পূর্বপাঠ।

১ কাব্যগ্রন্থাবলী-তে শিরোনাম 'আঁখির অপরাধ'।

২ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬

৩ ৮ কার্ত্তিক [23 Oct] শান্তিনিকেতনে অবস্থান-কালে কবিতাটিতে আরও দু'টি স্তবক সংযোজিত করেছিলেন, কিন্তু গ্রন্থে গৃহীত হয়নি।

১ 'আলস্য ও সাহিত্য', সাহিত্য [১৩৬১]। ১৮৯

২ ঐ। ১৮৯

১ 1882-তে Salvation Army-র সদস্যেরা প্রথম ভারতে আসেন; তত্ত্ব-কৌমুদী [৫। ১৩, ১ কার্ত্তিক ১৮০৪ শক (১২৮৯)। ১৫৩]-তে লিখিত হয় : 'বিলাতের "মুক্তির ফৌজ" ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বোম্বাই নগর আক্রমণ করেন কিন্তু শান্তিরক্ষকগণ কর্ত্তৃক বন্দী হন।'

২ 'গাজিপুর পত্র', ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬। ১০২

৩ ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় এর সম্পর্কে বলেছেন : 'গগনবাবুর সঙ্গেই আমাদের বেশি ভাব ছিল, কারণ তিনি মজা করে মুসলমানী বাউলের গান গেয়ে আমাদের হাসাতেন।' এখানে তিনি 'একজন সরকারী ঠাকুরদাদা ও তাঁর সুন্দর মেয়ের সঙ্গে পরিচয়'-এর কথা বলেছেন; রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে গাজিপুরের পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে—তাঁর রচিত 'পশ্চিম-মুল্লুকের চক্রবর্তী-খুড়ো' এই 'সরকারী ঠাকুরদাদা', গগনচন্দ্র রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শ্বশুর শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় [এঁর রাঁধা অম্বলের সুখ্যাতি ইন্দিরা দেবী করেছেন রবীন্দ্রস্মৃতি-তে, রবীন্দ্রনাথ হুবহু সেই খ্যাতি দান করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রটিকে] প্রভৃতির মিশ্রণে গঠিত।

১ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫২

২ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ২৩৮

৩ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ২৪২

৪ দ্র *Poems* [1970], pp. 15-16, No. 3; Fruitless Cry' নামে লোকেন্দ্রনাথ পালিত-কৃত কবিতাটির একটি অনুবাদ *The Modern Review*-এর May 1911 [pp. 463-64]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

৫ *Rabindranath Jagore: A Biography*, p. 135

৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র ও টীকা

১ ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬। ৯৭-৯৯

২ ঐ। ১০১

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মসংগীত, ১২৮৭ সালের মাঘোৎসবে গীত, মিশ্র পরজ-কাওয়ালি।

২ 'গাজিপুর পত্র', ভারতী ও বালক, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৬। ২৭৯-৮০

৩ ঐ, ঐ, শ্রাবণ ১২৯৬। ১৯৯

৪ ঐ, ঐ, শ্রাবণ ১২৯৬ ২০০

১ 'স্মৃতি', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। ১৬৩

২ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, 'ডোয়ার্কিনের কথা', দেশ বিনোদন ১৩৮৭। ১৪৭

৩ রবীন্দ্র-কথা [১৩৪৯]। ২০৫

৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১ ইন্দিরা দেবী এঁর সম্পর্কে তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় বলেছেন : 'তাঁর স্ত্রী বোধহয় অন্দরমহলে তাসের মজ্‌লিসই বেশি জমাতেন, নামটা মনে পড়ছে না; —তবে এক মেয়ের নাম যেন ছিল বিদ্যুৎনী আর এখন মনে হচ্ছে তাঁর পাতানো নাম ছিল মকরন্দ।'

২ তত্ত্ব°,অগ্র° ১৮১০ শক। ১৬৪; লেখক একটি পত্রের আকারে প্রতিবেদনটি তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করেন। সম্পূর্ণ পত্রটির জন্য দ্র প্রণতি মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম [১৩৭৯]। ৫৯-৬২

৩ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

১ 'কলকাতার সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালের লাগাও জমিতে তখন একটি বিরাট পুকুর ছিল। তাকে লোকে বলত বির্জিতলাও। তারই সামনে বর্তমান প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের জমিতে বিজনিরাজার একটি পুরনো বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়ে বহুদিন ছিলুম।'—রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩২

১ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন '৩১ অগ্রহায়ণ শুক্রবার', কিন্তু পঞ্জিকা-অনুসারে ৩০ অগ্র° অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি ও শুক্রবার।

২ পুলিনবিহারী সেন-সংকলিত 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি' : দেশ, শারদীয়া ১৩৫২। ১৫

৩ ঐ। ১৬

৪ দ্র পুলিনবিহারী সেন, রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ২৪৪

১ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

২ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩৩

৩ জীবনের ঝরাপাতা। ৫৯

৪ 'মিলন কথা', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। ২৪৪

৫ দ্র 'পুরাতন কথা', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। ২১২-১৮

৬ চিঠিপত্র ৮। ৪৯, পত্র ৬৫

৭ *The Bengalee,* Vol. XXX, No. 2, Jan 12, p. 19.

১ ২ শ্রাবণ ১২৯৬-এর হিসাব : 'গত ১২৯৫ সালের ১১ মাঘের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ব্যয় শোধ ১৫৫২লত'

২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩২১-২২

৩ 'Some Celebrities', *The Modern Review*, May 1927, p. 543.

১ স্বর্ণকুমারী দেবী 'শ্রাবণ ১৮৯২' তারিখ দিয়ে একটি পত্রে লিখেছেন, 'দুই বৎসর আগে যখন আমরা সোলাপুরে আসি…' [ভারতী ও বালক, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১২৯৮। ৩৬৯]-এর থেকে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, তিনি 1890-তে সোলাপুর। গিয়েছিলেন [দ্র পশুপতি, শাশমল, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। ১১৫]। ২৩ শ্রাবণ ১২৯৭ [7 Aug 1890] রবীন্দ্রনাথ সোলাপুরে যান, তখন স্বর্ণকুমারীও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন ধরে নিলে উক্ত অনুমানটির সংগতি পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে লন্ডন যাওয়ার নির্ধারিত উদ্দেশ্য নিয়েই সোলাপুর যাত্রা করেছিলেন ও তাঁরা 22 Aug 'শ্যাম' জাহাজে বোম্বাই ত্যাগ করেন। এই অবস্থায় স্বর্ণকুমারীর উক্ত সময়ে সোলাপুর ভ্রমণ সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। অপরপক্ষে পুনায় রমাবাইয়ের বক্তৃতা সম্পর্কে তিনি যেভাবে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন [পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য], তাতে উক্ত বক্তৃতাসভায়। তাঁর উপস্থিতি সপ্রমাণিত হয়।

২ চিঠিপত্র ৮। ৫১, পত্র ৬৬

৩ দ্র ৯ অগ্র° ১৩০২-এ লেখা পত্র : দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৭৩, পত্র ১

৪ চিঠিপত্র ৮। ৫০, পত্র ৬৬

১ দ্র *The Indian Messenger,* May 13 [Vol. V, No-36], p. 284

১ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২০১

২ ঐ। ২১১

৩ শান্তিনিকেতন আশ্রম। ৫৪-৫৬

৪ 20 Aug 1828 [৬ ভাদ্র ১২৩৫] রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই দিনটি বুধবার ছিল বলেই সম্ভবত বুধবার সাপ্তাহিক উপাসনার দিন ধার্য হয় দ্র আত্মজীবনী [১৩৬৮]। ৩০৪

৫ শান্তিনিকেতন আশ্রম। ৬১

১ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩৯

২ দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১ [১৩৮৩]। ১৩

১ দ্র রবিজীবনী 2 [১৩৯১] ২২৪

২ ড পশুপতি শাশমল বলেছেন, রচনাটি স্বর্ণকুমারীর লেখা দ্র স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। ৪৬১

৩ জীবনের ঝরাপাতা। ৫৯

১ 'মহিলা শিল্প-মেলা', ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৫। ৫৩২

২ সুরেন্দ্রনাথ এঁর সম্পর্কে লিখেছেন : 'He was the first non-Indian President. He was a Calcutta merchant, the head of the great firm of Andrew Yule & Co. I had hardly come across a Calcutta merchant with broader and more liberal views or with more genuine sympathy for Indian aspirations. He was a hard-headed Scotchman who saw straight into the heart of things, and never hesitated to express himself with the bluntness in which a Scotchman never fails, if he wants to show it.' —*A Nation in Making [1963]*, p. 101

৩ দ্র *Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era*, pp. 11-15

১ দ্র রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ১৮৫

১ উদ্ধৃতিগুলি বিশু মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' [১৩৬৯] থেকে গৃহীত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

১২৯৬ [1889-90] ১৮১১ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ঊনত্রিংশ বৎসর

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা যে-চিঠিটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সেই মূল পত্রটিতে কেউ বেগুনি কালিতে লিখে রেখেছিলেন Post 18 AP 89/Cal 19 AP 89; কিন্তু 18 Apr [বৃহ ৬ বৈশাখ] যে চিঠি সোলাপুরে ডাকে দেওয়া হয়েছে, তা কিছুতেই পরের দিন কলকাতায় পৌঁছতে পারে না, সুতরাং লিখিত তারিখে নিশ্চয়ই কিছু ভুল আছে। যাই হোক, একাধিক কারণে পত্রটি মূল্যবান—এইবার সোলাপুর থেকে লেখা এইটিই একমাত্র চিঠি, যা এ পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে পৌচেছে। এতে রাজা ও রানী নাটক লেখার কথা তিনি বন্ধুকে জানিয়েছেন, সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আর একটি সংবাদ : 'সম্প্রতি একদা সন্ধেবেলায় এখানকার ইংরেজমণ্ডলীর সঙ্গে খেলবার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে বসে আছি। আজকালের মধ্যে শীঘ্রই পুনশ্চ উত্থান করবার সঙ্কল্প করচি'[১]—ইংরেজদের নানা দোষত্রুটির সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করলেও এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তরুণ বয়স থেকেই ছিল, তাঁদের সঙ্গে খেলাধূলা আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেও আপত্তি ছিল না—গাজিপুরে বাসকালেও অনুরূপ যোগাযোগের দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি—মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে থাকলে এই ধরনের মেলামেশার পরিমাণ স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যেত। অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজে তিনি পড়েননি—1878-80তে বিলাতপ্রবাসের মধ্যে মাত্র তিন মাস হেনরি মর্‌লির সাহচর্যে ইংরেজি সাহিত্যের উচ্চতম পঠনপাঠনের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন, তবু যে পরবর্তীকালে তাঁর ইংরেজি উচ্চারণের অজস্র প্রশংসা শোনা যায় তার কারণ এইরকম উচ্চশিক্ষিত ইংরেজমীর সান্নিধ্য।

এই চিঠিতে আছে, 'দিনকতক কলকাতায় এক বেলুনবাহনের পুজো চলছিল'[১]—রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি য়ুরোপীয় বেলুন-আরোহীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে 27 Apr [শনি ১৫ বৈশাখ] বেলুনে আকাশে উঠবেন বলে বিজ্ঞাপন দিলে কলকাতায় খুবই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, আত্মীয়বন্ধুদের চিঠিতে খবরটি রবীন্দ্রনাথের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। সত্যপ্রসাদের হিসাব খাতায় ১ বৈশাখ 'বেলুন দেখিবার টিকিট ২॥০'—এরূপ হিসাব দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া' [পৃ ৮৯-৯২]-তে এই প্রসঙ্গে অনেক মজার কথা উল্লেখ করেছেন। উক্তদিন অনিবার্য কারণে ওড়া সম্ভব হয়নি; তাঁর 'The City of Calcutta বেলুন-সহ তিনি আকাশে ওঠেন 4 May [শনি ২২ বৈশাখ] তারিখে। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পরে 'চিরকুমার সভা' [১৩০৭] লেখার সময়ে এই বেলুন ওড়ার কথা স্মরণ করেছেন।

চিঠিটিতে আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, 'ন[গেন্দ্র বোসে]র সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় কি.? আমি তাঁর দুখানা চিঠি পেয়েছি—এবং তার উত্তরও দিয়েছি'[১]—এই নগেন্দ্র বোস হচ্ছেন বিশ্বকোষ-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু [1866-1938]—বর্তমান সময়ে সাহিত্যযশঃপ্রার্থী তরুণ যুবক। কল্পনা পত্রিকার আষাঢ় ১২৯৪ সংখ্যায় [পৃ ১০২-০৬] তিনি কড়ি ও কোমল-এর একটি দীর্ঘ উচ্ছ্বাসপূর্ণ সমালোচনা লেখেন, সম্ভবত সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সোলাপুরে থাকার সময়ে রাজা ও রানী নাটক ছাড়া রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র কবিতা লেখেন 'প্রকাশ বেদনা [দ্র মানসী ২। ২৪৫-৪৬]; ৬ বৈশাখ [বৃহ 18 Apr] কবিতাটি লিখিত হয়। এর পর পুনার নিকট খিরকি-তে বাস করার সময়ে তিনটি কবিতা লেখেন—'মায়া' [১ জ্যৈষ্ঠ], 'বর্ষার দিনে' [৩ জ্যৈষ্ঠ] ও 'মেঘের খেলা' [৭ জ্যৈষ্ঠ]। চারটি কবিতা মিলিয়ে পড়লে মনে হয়, বৈশাখ মাসের সঙ্গে জড়িত বেদনাদায়ক স্মৃতি এই কবিতাগুলিরও ভাবাবহে বর্তমান।

বৈশাখ ১২৯৬-এ সত্যেন্দ্রনাথের 'বোম্বাই চিত্র' প্রকাশিত হয় [বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী তারিখ 22 May 1889:৯ জ্যৈষ্ঠ]; গ্রন্থটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন : 'উৎসর্গপত্র / স্নেহাস্পদ/ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ভাই রবি,/ তুমি এই গ্রন্থ-প্রকাশ বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিয়াছ—/ তোমার প্ররোচনায়/ ইহার জন্মলাভ, ইহার স্থানে স্থানে/ তোমার হস্তচিহ্ন বিদ্যমান। এই গ্রন্থখানি তোমার হস্তে সাদরে/ সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমার এই স্নেহের উপহার গ্রহণ কর।'—রবীন্দ্রনাথের হস্তচিহ্ন অবশ্য কেবলমাত্র 'তুকারাম' প্রবন্ধেই আছে—ভারতীর বৈশাখ-আষাঢ় ১২৮৫ সংখ্যাগুলিতে মুদ্রিত প্রবন্ধটির জন্য তিনি তুকারামের অনেকগুলি 'অভঙ্গ' অনুবাদ করেছিলেন। বইটির মুদ্রণ—ব্যাপারেও তিনি কিছু সাহায্য করে থাকতে পারেন।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ সোলাপুর ছেড়ে পুনার নিকটবর্তী খিরকিতে বাস করতে যান। খিরকি একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান, এখানকার যুদ্ধে পেশোয়া বাজিরাওকে পরাজিত করে পুনা ও দাক্ষিণাত্যের উপরে ইংরেজরা তাদের অধিকার বিস্তৃত করে ও এখানে একটি সেনানিবাস গড়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথের এখানে আসার প্রধান সূত্র সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পুনার দক্ষিণ কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক গোবিন্দ বিঠ্ঠল কড়কড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁরই খিরকি-স্থ রোজব্যাঙ্ক ['Rosebank'] নামক বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' [1915] গ্রন্থে এই বন্ধুটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন [পৃ ১৮৮-৯২]। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন : '…গোবিন্দ কড়কড়ের অনেকগুলি ভাবসাব হাস্যরসাত্মক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে খৃষ্টান, ব্যবসায়ে অধ্যাপক, এবং স্বভাবে কিঞ্চিৎ পাগল। …পোষাক ও আচার অভ্যাসে সাহেব হলেও তিনি মনে মনে অনেক বিষয়ে স্বদেশী এবং পুনার হিন্দু সমাজের অনেকেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু—বিশেষতঃ স্বদেশী সঙ্গীতের তিনি যথার্থ অনুরাগী ভক্ত। তাঁর উদ্যোগে আমরা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক ভাল গাইয়ের গান শুনেছি। আমাদের একেলে বাঙ্গলা গান বা গলা তাঁর পছন্দ হত না এবং আমাদের মধ্যে যাদের ভাল গাইয়ে মনে করি তাদেরও গান শুনে তিনি ব্যঙ্গসহকারে নকল করতেন ও বলতেন, "সপ্ত সুরের" তোমরা কিছুই জান না।' আমাদের মধ্যে ভাল গাইয়ে' বলতে সত্যেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকেই বুঝিয়েছেন। এ-সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় বলেছেন : [গোবিন্দ কড়কড়ে] রবিকার অল্পবয়সে তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর নান শুনেছেন, সে সম্বন্ধে বলতেন, "Ravi, what does Ravi know about সপ্তসুর?" সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, কতবার আমরা তাঁর আতিথ্যস্বীকার করে তাঁর সঙ্গ উপভোগে

আমোদে দিন কাটিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ প্রায় এক মাস তাঁর কাছে ছিলেন, তাঁর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল একটু বিমিশ্র ধরনের। প্রত্যাবর্তনের পথে বাড়িটি দেখে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'খিড়কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস-ক্ষেত্র, কাঁচের-জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম; দেখে মনটা হঠাৎ কেমন হু হু করে উঠল। এই এক আশ্চর্য! যখন এখানে বাস করতুম তখন এ বাড়ির উপরে যে সবিশেষ স্নেহ ছিল তা নয়—যখন এ বাড়ি ছেড়ে তোদের সঙ্গে সোলাপুরে গিয়েছিলুম তখনও যে বিশেষ কাতর হয়েছিলুম তাও বলতে পারিনে—অথচ দ্রুতগতি ট্রেনের বাতায়নে বসে যখন কেবল নিমেষের মতো দেখলুম সেই একলা বাড়ি তার খেলার জায়গা এবং ফাঁকা ঘরগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন সমস্ত হৃদয়টা বিদ্যুৎবেগে সেই বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মনে হতে লাগল তেমনি করে সকলে মিলে ঐ বাড়িটাতে গিয়ে জটলা করে বসলেই যেন আপাতত সংসারের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়।'[১]—মনের ভিতরের যে অস্থিরতা রবীন্দ্রনাথকে কিছুদিন থেকে যে-কোনো পরিবেশ সম্পর্কেই অসহিষ্ণু করে রাখছিল, এই বিচিত্র মনোর্ভাব হয়তো তারই ফল।

খিরকি যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে একটি ফরমায়েশি গান রচনা করতে হ'ল—'সুখে থাকো আর সুখী করো সবে' [ইমন্ ভূপালি-কাওয়ালি দ্র গীতবিতান ২। ৬০৮, স্বর ৮]। বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা স্নেহলতার [1874-1967] সঙ্গে কুমুদনাথ সেনের [1866-1907] বিবাহ হয় 2 May 1889 [বৃহ ২০ বৈশাখ]। বিহারীলাল সত্যেন্দ্রনাথের পরে দ্বিতীয় দলের আই. সি. এস.—ঠাকুরবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বহু পূর্ব থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল [দ্র রবিজীবনী ২। ১১৪, ১২১]। তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী গুপ্ত সখিসমিতির অন্যতমা সখী ছিলেন। সম্ভবত এদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে আশীবাণী-স্বরূপ গানটি লিখে পাঠিয়ে দেন। পুলিনবিহারী সেন লিখেছেন, 'স্নেহলতার আত্মীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ সরলা দেবীকে গানটির সুর দিতে বলেছিলেন, তিনিই (সরলা দেবী) বিবাহসভায় গানটি করেন।'[১]

খিরকি-র রোজব্যাঙ্কে বাস করার সময়ে অল্প দিনের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ তিনটি কবিতা রচনা করেন

14 May [মঙ্গল ১ জ্যৈষ্ঠ] 'মায়া' ['বৃথা এ বিড়ম্বনা'] দ্র মানসী ২। ২৪৭-৪৮

16 May [বৃহ ৩ জ্যৈষ্ঠ] 'বর্ষার দিনে' ['এমন দিনে তারে বলা যায়'] দ্র ঐ ২। ২৪৮-৫০

পাণ্ডুলিপিতে ৭ম স্তবকের আগে আর একটি স্তবক আছে, গ্রন্থে সেটি বর্জিত। কবিতাটির ১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৭ম স্তবকগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর একটি গীতরূপ রচনা করেন দ্র গীতবিতান ২। ৩৭০-৭১স্বর১১।

20 May সোম [৭ জ্যৈষ্ঠ] 'মেঘের খেলা' ['স্বপ্ন যদি হত জাগরণ'] দ্র ঐ ২। ২৫০-৫১

এখানে থাকার সময়ে তিনি একদিন রমাবাইয়ের বক্তৃতা শুনতে যান। সেই খবর জানিয়ে একটি পত্র-প্রবন্ধে[২] লিখলেন : 'কাল বিকেলে বিখ্যাত বিদুষী রমাবাইয়ের বক্তৃতার কথা ছিল, তাই শুনতে গিয়েছিলেম। অনেকগুলি মহারাষ্ট্রী ললনার মধ্যে গৌরী নিরাভরণা শ্বেতাম্বরী ক্ষীণতনুষ্টি উজ্জ্বলমূর্তি রমাবাইয়ের প্রতি দৃষ্টি আপনি আকৃষ্ট হল। তিনি বললেন, মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ কেবল মদ্যপানে নয়। রমাবাইয়ের এই বক্তব্যের সূত্র ধরে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের সমানাধিকার, পুরুষের অধীনতাগ্রহণের বিরুদ্ধে নারীদের আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের একটিই কেন্দ্র : 'যতদিন মানবজাতি থাকবে কিংবা তার থাকবার সম্ভাবনা থাকবে, ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ কাজটা এমন কাজ যে, এতে অনেকদিন ও অনেকক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে

হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে' এবং 'এক সন্তানধারণ থেকেই স্ত্রী-পুরুষের প্রধান প্রভেদ হয়েছে; তার থেকেই উত্তরোত্তর বলের অভাব, বলিষ্ঠ বুদ্ধির অভাব এবং হৃদয়ের প্রাবল্য জন্মেছে। এই কথাগুলিকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেওয়ার জন্যেই তাঁর বক্তব্যে চরম প্রগতি-পরিপন্থী মত ব্যক্ত হওয়ার মতো অঘটন ঘটে গেছে : 'সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোনো স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে-ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর অধোগতি হয় না, বরং মহত্ত্বই বাড়ে।' নব্যহিন্দুরা এইভাবেই সাধ্বী স্ত্রীর মহিমা কীর্তন করে পুরুষের যথেচ্ছাচার সমর্থন করেছেন!

রমাবাই তাঁর ভাষণ শেষ করতে পারেননি—রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'রমাবাইয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত, কিন্তু এখানকার বর্গির উৎপাতে তা আর হয়ে উঠল না।--স্ত্রীলোকের পরাক্রম সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা করতে শুনে বীর পুরুষেরা আর থাকতে পারলেন না, তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন; তর্জনগর্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে জয়গর্বে বাড়ি ফিরে গেলেন।'[৩]

পরের মাসের ভারতী ও বালক-এ 'রমাবাই' প্রবন্ধে [দ্র শ্রাবণ। ২৪৩-৪৬] সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান : রমাবাই পুরুষআশ্রয়ের বিপক্ষ মতাবলম্বী নহেন, পতিভক্তি অকর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না—তবে আশ্রয়ের নামে যে সকল পুরুষ-অত্যাচার সমাজে অহরহঃ সংঘটিত হয় তাহা রমাবাই মঙ্গলজনক জ্ঞান করেন না। সুতরাং তাহার প্রতিকার তাঁহার বিবেচনায় অত্যাবশ্যক।···স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সমকক্ষ—এ কথা তিনি যে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা প্রসঙ্গে। ···স্ত্রীলোকের এক রকম গ্রহণশক্তি ও ধারণশক্তি আছে, কিন্তু সৃজন শক্তি নাই, একথা লেখক কিরূপে স্থির করিলেন তাহা ত বুঝিতে পারি না।···বিশেষ স্ত্রীলোকে যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রামে সমর্থ, রমাবাইয়ের নিজের জীবনই যখন তাহার একটি দৃষ্টান্ত।' কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার প্রকৃতি, কাজের ক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত পরবর্তীকালে সংশোধন করলেও নারী-পুরুষের প্রতিভার পার্থক্য বিষয়ে একই ধারণা পোষণ করেছেন।[১]

খিরকি-তে থাকার সময় সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ সপরিবারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন—ইন্দিরা দেবী তো ছিলেন-ই। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি সকলের সঙ্গে আবার সোলাপুরে যান এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিকে বেলা ও আয়াটিকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করেন। ফিরে এসে যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়ে তিনি ইন্দিরা দেবীকে যে পত্রটি[২] লেখেন, সেটি বিজাপুরে পৌঁছনোর তারিখ 12 Jun [বুধ ৩০ জ্যৈষ্ঠ]—সুতরাং অনুমান করা চলে যে, পত্রটি দিন-চারেক আগে লেখা [? ২৭ জ্যৈষ্ঠ রবি 9 Jun], রবীন্দ্রনাথ তার পূর্বেই কলকাতায় পৌঁছে গেছেন।

যাত্রাপথের খুঁটিনাটি যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ পত্রটিতে দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি খুব উল্লেখযোগ্য। কল্যাণ স্টেশনে গাড়ি বদল করার সময়ে একটি খালি গাড়ির অধিকার নিয়ে এক ইংরেজ মহিলার কটু আচরণ বর্ণনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই-সব নাক-তোলা রূপসী ইংরেজ মেয়েগুলো যদি ভারতবর্ষে না আসত তা হলে ইংরেজরা আমাদের উপরে ঢের ভালো ব্যবহার করতে পারত; এরাই Anglo-Indian ভাবের মূল ভিত্তি।' ইংরেজ ও Anglo-Indian এই দুটি শ্রেণীবিভাগ রুরীন্দ্রনাথ সারাজীবনই

ব্রিটিশজাতি সম্বন্ধে করে গেছেন—যাদের তিনি পরবর্তীকালে ‘বড়ো ইংরেজ’ ও ‘ছোটো ইংরেজ’ নামে চিহ্নিত করেছেন।

এই চিঠির শেষে কলকাতায় তাঁদের সংবর্ধনার বিবরণ রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে দিয়েছেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকার : ‘খোকাকে দেখে ভারী নতুন রকম বোধ হল। মস্ত গোল মাথা, নিতান্ত হাঁদা, বেশ একটু কালো, মাথা নেড়া, ফুলো গাল, পরম নিরবুদ্ধির মতো চোখ মুখের ভাব সর্বদা টম, হাতগুলো ফুলো-ফুলো মোটামোটা মুঠো-করা—কোনো প্রকার অঙ্গভঙ্গী বা শব্দ প্রয়োগের দ্বারা তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে হাসে, চট্‌কে কিম্বা নেড়ে দিলে হো হোঃ শব্দে পরিতোষ প্রকাশ করে। এই তার general characteristics—কিন্তু এ সকল বিষয়ে তার সমবয়স্ক মানবসন্তানের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো প্রভেদ দেখি নে।'—রবীন্দ্র-রচনায় রথীন্দ্রনাথের এইটিই প্রথম পরিচয়, ক্যাশবহি তাঁর সম্পর্কে প্রথম খবরটি দেয় ২৯ চৈত্র ১২৯৫-তে : ‘ব° গোপালচন্দ্র ঘটক দ° শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের পুত্রের ও শীতলাকান্তবাবুর কন্যার টিকে দিবার ব্যয় শোধ ২রা ও ২৪ ফাল্গুনের ২ বৌচর শোধ ৮০৷৷০’।

সোলাপুর থেকে ফিরে আসার পরেই রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি গুরুভার দায়িত্বে আবদ্ধ হতে হ’ল। তাঁর বিবাহের দু'দিন আগে ২২ অগ্র° ১২৯০ তারিখে একটি পত্রে মহর্ষি পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : ‘এইক্ষণে তুমি জমীদারির কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিল বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ।’ এই নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে কতটুকু পালন করেছিলেন, তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না। এর দু’দিন পরে সারদাপ্রসাদের মৃত্যু, কয়েকমাস পরে কাদম্বরী দেবী ও হেমেন্দ্রনাথের দেহত্যাগ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজী ব্যবসা ইত্যাদি বিশৃঙ্খলায় জমিদারি ও আর্থিক বিলিব্যবস্থার ভার কার উপরে দেবেন সেটি নির্ধারণ করা বোধ হয় মহর্ষির পক্ষেও সম্ভব হচ্ছিল না। আগে এর সবটাই দেখাশোনা করতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ২৪ আষাঢ় ১২৯১ থেকে জোড়াসাঁকোর হিসাবপত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ দেখতে শুরু করেন, কিন্তু তিনি অঙ্কশাস্ত্রে যতই পারঙ্গম হোন না কেন, জমিদারি হিসাবের গোলকধাঁধা তাঁর স্বভারের পক্ষে অনুকূল ছিল না, তাই ৮ ভাদ্র থেকে এই দায়িত্ব নেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ। মহর্ষি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকত্ব দেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে পরমোৎসাহে এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিক থেকে তাঁর উপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাচ্ছিল না দেখে রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে সহযোগী সম্পাদক হিশেবে নিয়োগ করা হয়—এমন-কি শান্তিনিকেতনের ট্রাস্টী হিশেবেও রবীন্দ্রনাথের নাম বিবেচিত হয়নি। অন্যদিকে আর্থিক বিলিব্যবস্থার ব্যাপারেও যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ছিল। বিলাসী-স্বভাব দ্বিপেন্দ্রনাথ জমিদারি-পরিদর্শনের কঠোর দায়িত্ব কখনোই নেননি; জোড়াসাঁকো-সেরেস্তার হিসাবপত্র দেখার চেয়ে পিতামহের সান্নিধ্যে দিনযাপন তাঁর কাছে অনেক বেশি প্রার্থিত ছিল। পরিবারের সদস্যদের জন্য যে মাসোহারা নির্দিষ্ট ছিলকয়েক বছরের ক্যাশবহি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার বন্টনে নানাধরনের গোলমাল ঘটেছে। এর অন্য বহুরকম কারণ থাকতে পারে, কিন্তু ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠাই স্বাভাবিক। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে-ধরনের বেপরোয়া যাযাবর জীবন যাপন করছিলেন, এই প্রতিভাবান পুত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বৎসল পিতার পক্ষে তাঁর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই আর বেশিদিন তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে সোলাপুর থেকে ফিরে

আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপরে জোড়াসাঁকোর হিসাবপত্র পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব পড়ল। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, ১ আষাঢ় ১২৯৬ পর্যন্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ স্বাক্ষরাদি করেছেন—পরের দিন ২ আষাঢ় [শনি 15 Jun] থেকে রবীন্দ্রনাথ হিসাবপত্রে R.T. স্বাক্ষর দেওয়া শুরু করেন।

এর কিছুদিন পরেই আর একটি দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হ'ল। ১৬ শ্রাবণ [বুধ 31 Jul] শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর দায়িত্বভার ত্যাগ করেন ও ট্রাস্টডীডের শর্তানুযায়ী অপর দু'জন ট্রাস্টী দ্বিপেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ৩১ শ্রাবণ [বৃহ 15 Aug] রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন [দ্র.Tagore. Family Paper, Doc. No. 77]। বোঝাই যায় যে, এই সমস্ত পরিবর্তন মহর্ষির পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়েছিল। ১৭ শ্রাবণ নরেন্দ্রনাথ সেন উকীলের বাটী হইতে ট্রষ্টীডীড আনিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের যাতায়াতের গাড়িভাড়া ইত্যাদি হিসাব থেকে এইসব পরিবর্তনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাটি অনুমান করা যায়। এরপর অগ্র° ১২৯৬ [Nov 1889 } থেকে তাঁর উপরে জমিদারি পরিদর্শনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সাংসারিক ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ করতে গত বৎসরের ক্যাশবহিতে একটি হিসাব লক্ষ্য করা যায় : 'দালানের ছাদের উপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের রশুই ঘর তৈয়ারী ব্যয় বিঃ ১৬ কার্ত্তিক ও ৫ অগ্রহায়ণের ২ বৌচর ১৩ ৩'—আয়োজনটি সামান্য, কিন্তু বাঙালি পরিবারের ছবিটি রান্নাঘর ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মৃণালিনী দেবীর ..রন্ধননৈপুণ্যের খ্যাতি অনেকের স্মৃতিকথাতেই ঘোষিত হয়েছে —'ব্যঞ্জনাদির স্বাদ ও মিষ্টান্নাদির পাক তাঁর হাতে উৎরাত উৎকৃষ্ট হয়ে। কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে নানানতরো মিষ্টান্ন তৈরী করতেন নিজের হাতে।'[১] সুতরাং যে কবি লিখেছেন, 'জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায় কিংবা 'কাব্য পড়ে যেমন ভাব/ কবি তেমন নয় গো···সামনে যখন অন্ন থাকে। থাকে না সে অন্যমনে'—তাঁর হৃদয়-জয়ের সহজতম উপায় উদরপথেই। রশুইঘর'টি যখন তৈরি হয়েছিল, তখন তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সন্তানসম্ভবা মৃণালিনী দেবীর পক্ষে সম্ভব হয়নি—সেই সুযোগ এল এখন। 'বাহির তেতালায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের রশুই ঘরের খোলা পাল্টান ঘরামীর মজুরী শোধ' বা 'বাহিরের তেতালায় রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের রশুই ঘরের চালে জাপরি দেওয়া ও ঝাপ বান্ধান ও দরজা মেরামত ব্যয়'—আষাঢ় মাসের এইসব হিসাব উক্ত 'রশুই ঘর' সংক্রান্ত। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিপত্রে তাঁকে প্রায়ই মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন—সেগুলি সম্ভবত এই সময় থেকেই পাঠানো শুরু হয়েছে। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বা তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাসকেও উক্ত রশুইঘর থেকে পরিতৃপ্ত করা হয়েছে —সে অবশ্য আরো পরের কথা।

৯ আষাঢ় [শনি 22 Jun] ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যোগ দেন —'ভবানীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে রবীন্দ্রবাবু ও সত্যবাবু ও ক্ষিতেন্দ্রবাবু ও কৃতেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যাতায়াতের সেকেন ক্লাশের গাড়িভাড়া শোধ বিঃ ৯ আষাঢ়ের ১ বৌচর ৪।০'। এই দিনের আর একটি হিসাব : 'ব° নিউম্যান কোম্পানি/ দং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের ছবি তৈয়ারী হয় তাহার এক বিল শোধ গুঃ শ্রীধরচন্দ্র সরকার-৪৩ ০'—এটি কোন ছবি?

বিদেশভ্রমণেও যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তি ছিল না, তেমনি কলকাতায় থাকার সময়েও পার্ক স্ট্রীট ও অন্যান্য জায়গায় প্রায় প্রত্যহই তিনি যাতায়াত করেছেন। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, আষাঢ় মাসের ৫, ১৯, ২২, ২৪, ২৫ ['পার্ক স্ট্রীট হইতে আশুবাবুর বাটী'], ২৬, ২৭, ৩০, ৩১ ও ৩২ তারিখ এবং শ্রাবণ মাসের ২, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ তিনি জোড়াসাঁকো থেকে পার্ক স্ট্রীট যাতায়াত করেছেন। মহর্ষির কাছে যাতায়াতের খরচ সরকারী ক্যাশ থেকে দেওয়া হত, সেই কারণেই এই-সব হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। বন্ধুবান্ধবদের কাছে বা অন্য প্রয়োজনে যাতায়াত নিজের খরচেই করতে হত, তবু বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী বা বির্জিতলায় যাওয়ার কিছু হিসাব ক্যাশবহিতে রয়েছে।

মহর্ষি এই সময়ে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িটি বদল করার কথা ভেবেছিলেন, নূতন বাড়ি খোঁজার দায়িত্ব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই উপর—১৫ শ্রাবণ, ৫ ও ৯ ভাদ্র 'শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ মহাশয়ের জন্য বাড়ি দেখিতে শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের যাতায়াতের' হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু উপযুক্ত বাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়নি—মহর্ষি ২৬ কার্ত্তিক ১৩০৫-এ জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসার আগে পর্যন্ত একই বাড়িতে বাস করেছেন।

সোলাপুর থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রানী নাটকটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী নাটকটির প্রকাশের তারিখ 9 Aug 1889 [শুক্র ২৫ শ্রাবণ], পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬+১৪৯, মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

রাজা ও রাণী।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রণীত।/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা/ মুদ্রিত ও প্রকাশিত ॥/ ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। / ২৫ শ্রাবণ ১২৯৬ সাল।/ মূল্য ১ টাকা।

গ্রন্থটি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত : পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বড়দাদা মহাশয়ের/ শ্রীচরণকমলে/ এই গ্রন্থ/ উৎসৃষ্ট/ হইল।

বইটি পাঠ করে দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'রবি,/ আজ আমি "রাজা রাণী" খানা শেষ কলুম—Most pathetic-consentrated essence of Poetry —আমি এরূপ কবিতা ইংরাজিতেও দেখি নাই—যদি কোথাও দেখিয়া থাকি এখন তা দূরীভূত—বইখানি is really worthy of Immortality./ রাজাটা is of a peculiar character—onesided—out of joint—unreasonable—inconsiderate—স্ত্রীলোকের এইরূপ স্বভাব naturally suit করে কিন্তু পুরুষেরতা শুধু নয়। রাজার—এরূপ character something very awkward—Lyrical versus Dramatic এই যা একটু খোঁচ'[১]—নইলে বইখানি Firstclass Poetry.'

রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি নিম্নলিখিত মন্তব্য-সহ পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ নকল করে রাখেন 2Oct [বুধ ১৭ আশ্বিন] তারিখে : 'রাজা ও রাণী সম্বন্ধে বড়দাদা আমাকে একখানি ছোট চিঠি লিখিয়াছেন। সে চিঠি আমি এইখানে কাপি করিয়া রাখিলাম। আমার নানা রচনা সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিয়াছে কিন্তু কোন সমালোচনায় আমি এত গর্ব অনুভব করি নাই। বড়দাদার কাছ হইতে আসিতেছে বলিয়াই আমার এত বিশেষ গর্ব্ব ও বিশেষ আনন্দ।'

পুলিনবিহারী সেন 'রাজা ও রানী' সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংকলন করেছেন রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী [পৃ ২৫৮-৮৬]-তে, কৌতূহলী পাঠককে আলোচনাটি দেখে নিতে অনুরোধ করি।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তৎকালীন লাইব্রেরিয়ান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদনে 'রাজা ও রানী' সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধারযোগ্য : '*Raja o Rani* has more flesh and blood, more circumstance and detail, than the previous works of Babu Ravindra Nath and the interest is sustained throughout. With the increase of age and experience, Ravindra Babu's works are becoming replete with human interest. His dramas when performed before a select audience by the members of his own family produce a powerful effect, but they are generally meant for the cultured few. They are never enacted in public theatres, and are not likely to be appreciated by their audience.' হরপ্রসাদের অন্তিম মন্তব্য অবশ্য 'রাজা ও রানী'র ক্ষেত্রে সত্য হয়নি, নাটকটি ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চে বহুবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর আর একটি মন্তব্য থেকে মনে হয়, বির্জিতলার বাড়িতে যে অভিনয় হয় সেখানে তিনি দর্শক-রূপে উপস্থিত ছিলেন।

খিরকিতে লিখিত কবিতাগুলির পর রবীন্দ্রনাথ আবার কবিতা লিখলেন 10 Aug [শনি ২৬ শ্রাবণ] তারিখে—অল্পদিনের ব্যবধানে মোট ছ'টি কবিতা লেখা হ'ল—সব-ক'টিই জোড়াসাঁকোয় লিখিত :

10 Aug [২৬ শ্রাবণ] 'ধ্যান' ['নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া'] দ্র মানসী ২২৫১-৫২

২ ভাদ্র [শনি] 17 Aug 'পূর্বকালে' ['প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে'] দ্র ঐ ২।২৫২-৫৩

৪ঠা পৌষ [১২৯৭ : 18 Dec] 1890 তারিখে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কবিতাটির একটি পরিবর্তন করেন : 'এ জগতে কত লোক ভাল বাসিয়াছে' দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১।৩-৪। এই পরিবর্তন যখন করা হয়, তখন মানসী কাব্য প্রায় প্রকাশের মুখে [প্রথম প্রকাশ : ১০ পৌষ 24 Dec], সুতরাং নিতান্ত কাব্যক্রীড়াচ্ছলে এটি করা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

17 Aug [শনি ২ ভাদ্র] 'অনন্ত প্রেম' ['তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি'] দ্র মানসী ২।২৫৩-৫৪

৯ ভাদ্র [শনি 24 Aug] 'ক্ষণিক মিলন' ['একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া'] দ্র ঐ ২|১২৬

কবিতাটির তৃতীয় স্তবক ভারতী ও বালক,জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪-সংখ্যায় [পৃ ৮৩-৮৬] 'বিফল মিলন' কবিতার' দ্বিতীয় স্তবক রূপে মুদ্রিত হয়েছিল।

১১ ভাদ্র [সোম 26 Aug] 'আত্মসমর্পণ' ['আমি এ কেবল মিছে বলি'] দ্র ঐ ২।১৩০-৩২

১৪ ভাদ্র [বৃহ 29 Aug] 'আশঙ্কা' ['কে জানে এ কি ভালো?'] দ্র ঐ ২/২৫৫-৫৬

এই কবিতাগুলি সম্পূর্ণ আলাদা সুরে বাঁধা—পূর্ববর্তী কবিতাগুলির অতৃপ্তি, বেদনা, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কুহেলিকা কেটে গিয়ে জন্মজন্মান্তরের প্রেম যেন: 'চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে' কবির মনকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। শেষের দু'টি কবিতায় প্রেমিকার কাছে নিঃশর্ত 'আত্মসমর্পণ' যদিও কিছুটা 'আশঙ্কা'য় পীড়িত, তবুও পূর্ববর্তী কবিতাগুলির নৈরাশ্যদীর্ণ আক্ষেপের সঙ্গে তুলনায় একে নিতান্তই মৃদু বলতে হবে। আসলে নিরুদ্যম নিছক মনোচর্চা কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শুভ হয়নি, কর্মের তরঙ্গে ভাসমান অবস্থায় অনুকূল অবসরে যখন তিনি মনোলোকে ডুব দিয়েছেন, কেবল তখনই কবিতার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য তাঁর অন্তরকে অভিষিক্ত করেছে—তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বক্তব্যের প্রমাণ আছে। আমরা আগেই বলেছি, এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাংসারিক দায়িত্ব তিনি লাভ করেছেন—ছোটোবেলা থেকেই তথাকথিত জাগতিক

অসাফল্য তাঁর মনে একধরনের হীনমন্যতার জন্ম দিয়েছিল, ফলে যখনই কোনো দায়িত্বভার ও বিশ্বাস তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে তখনই তিনি উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন। এই মানসিক পরিবেশের সঙ্গে কবিতাগুলিকে মিলিয়ে পড়লে এদের বিশেষ তাৎপর্যটি উদঘাটিত হতে পারে বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের এই কর্মোৎসাহের পরিচয় আছে সমকালীন একটি গদ্যরচনায়—'নব্যবঙ্গের আন্দোলন নামে এটি বিনা-স্বাক্ষরে [বার্ষিক সূচীপত্রে নাম আছে] ভারতী ও বালক-এর ভাদ্র-আশ্বিন [পৃ ৩৪৫-৫১]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছেন : 'আজ কাল গবর্ণমেন্টের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহা দেখিয়া আশা ও আনন্দ জন্মে। কিন্তু যেখানে ভালবাসা বেশি সেখানে আশঙ্কাও বেশি। স্বজাতির উন্নতি যদি বাস্তবিক প্রিয় এবং ঈপ্সিত হয় তবে ভাবনার কারণ সম্বন্ধে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধভাবে কেবল আনন্দ করিয়া বেড়ান স্বাভাবিক নহে।' ধনী ব্যক্তিরা যে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অর্থ সাহায্য করেন না, তার কারণ নির্দেশ করে তিনি লিখলেন : 'আমরা সত্যপরায়ণ নহি সুতরাং কোন কাজেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বিশ্বাস ব্যতীত কোন কাজই হয় না, আবার বিশ্বাসযোগ্য না হইলে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব গোড়ায় দরকার চরিত্র গঠন। জাতির মধ্যে উদ্যম, সত্যপরতা, আত্মনির্ভর, সৎসাহস না থাকিলে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া রেপ্রেজেন্টেটিব গবর্ণমেন্ট ভিক্ষা চাহিতে বসা বিড়ম্বনা।...আমরা যে সকল অধিকার অনায়াসে অযাচিত ভাবে পাইয়াছি, তাহার জন্য গবর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ দিয়া প্রাণপণে যেন তাহার যোগ্য হইবার চেষ্টা করি—কারণ পড়িয়া পাওয়াকে পাওয়া বলে না, কেন না তাহার স্থায়িত্ব নাই, তাহাতে কেবল নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্টভাবে সুখে থাকা যায় মাত্র কিন্তু তাহাতে জাতীয় চরিত্রের বিশেষ উন্নতি হয় না।'—পরাধীন দেশের একজন লেখক এরূপ লিখেছিলেন, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একশ বছর পরে স্বাধীন ভারতেও কথাগুলির তাৎপর্য হারিয়ে যায়নি!

সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী অবশ্য ভ্রাতার নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করতে পারেননি, তিনি পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন :লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দলনের মধ্যেই—কাজ করিবার একটি ইচ্ছা জাতীয় মহত্ত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে, তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা কি করিয়া পাইবেন?

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিতে কেবল নব্যবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে নয়, নব্যহিন্দুদের সামাজিক আন্দোলন প্রসঙ্গেও তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন—এবং স্বভাবতই তির্যক ভঙ্গিতে : 'আবার এই সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা আমাদের সাহিত্যের নেতা তাঁহারা সম্প্রতি এক বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন আমাদের মত এমন সমাজ আর পৃথিবীতে কোথাও নাই। হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক, এবং বাল্যবিবাহ ব্যতীত তাহার সেই পরম আধ্যাত্মিকতা রক্ষা হয় না, আবার একান্নবর্তী প্রথা না থাকিলে উক্ত বিবাহ টেঁকে না,—এবং যেহেতুক হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক বিধবা বিবাহ অসম্ভব, এদিকে জাতিভেদ প্রথা এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক সমাজের শৃঙ্খলা শ্রমবিভাগ ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কারণ। অতএব আমাদের সমাজ একেবারে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন। য়ুরোপীয় সমাজ ইন্দ্রিয়সুখের উপরেই গঠিত, এইজন্য তাহার মধ্যে আদ্যোপান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা। আবার বলেন আমাদের দেশের প্রচলিত উপধর্ম্ম মানবজাতির একমাত্র অবলম্বনীয়, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মানব বুদ্ধির

অতীত।' বিনা মন্তব্যে চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রচারিত মতের এই সারসংক্ষেপ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের চেয়েও মর্মঘাতী!

আমরা আগেই বলেছি, ৩১ শ্রাবণ [15 Aug] রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টী নিযুক্ত করা হয়। নূতন বন্দোবস্ত অনুযায়ী ব্যবস্থাদিরও বিবরণ পাওয়া যায় :'৭ ভাদ্র [শনি 22 Aug] শান্তিনিকেতনের বাঙ্গাল বেঙ্কে নূতন একাউন্ট খুলিবার জন্য দ্বিপুবাবুর শাস্ত্রীমশায়ের ও রবীবাবুর পার্ক স্ট্রীট হইতে বাঙ্গাল বেঙ্কে যাতায়াত' এবং ২৭ ভাদ্র [বুধ 11 Sep] 'ব° শান্তিনিকেতনের ট্রষ্টী/ বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দিগর—দ° শান্তিনিকেতনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দেওয়া যায় বিঃ ১ বৌচর গুঃ পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ১০০০্'। এরপর রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিনের জন্য শান্তিনিকেতন যান : 'শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের শান্তিনিকেতন বাগানে গমনাগমনের ব্যয়…১২ ০ '—হিসাবটি ৩০ আশ্বিনের, কিন্তু অনুমান করা যায় ২৭-২৯ আশ্বিন [12-14 Oct] এই তিন দিনের জন্য তিনি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন; কেন-না ভাদ্র মাসের ১, ৫-৯, ১২, ১৩, ১৬-২৭ ও ৩০ তারিখে এবং আশ্বিন মাসের ১-৬, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭-১৯, ২১-২৬ তারিখে তাঁর পার্ক স্ট্রীট ও বির্জিতলায় যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। গত বৎসর ৪ কার্ত্তিক শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান বৎসরে প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন-জাতীয় কোনো অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়নি।

৩১ ভাদ্র [রবি 15 Sep] রথীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন হয়। তারিখটি আমরা পেয়েছি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা প্রিয়ম্বদা দেবীর একটি স্কেচ থেকে, ছবির তলায় তিনি লিখে রেখেছেন : 'যোড়াসাঁকো তেতালা ৩১ ভাদ্র রথীন্দ্রের অন্নপ্রাশনের দিন 15th September Sunday'। এই উপলক্ষে প্রথম হিসাবটি পাই ১ ভাদ্র [শনি 31 Aug] তারিখে : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে চেলীর যোড় ৩।৷০ ঢাকায়ের যোড় ৬ পীড়ে একটা ১।৷ল০; শেষ হিসাবটি ২৫ পৌষের [8 Jan 1890]. মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩২৯।ল০-মাধুরীলতার অন্নপ্রাশনে এর চেয়ে বেশি খরচ হয়েছিল।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ রবীন্দ্রনাথ শেষ মন্তব্য লিখেছিলেন 19 Dec 1888 [৫ পৌষ ১২৯৫] তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্য্য' রচনা অবলম্বন করে। এর পর তাঁর রচনা পাওয়া যায় 'সপ্তমীপূজা। ১৮৮৯' [১৬ আশ্বিন ১২৯৬ মঙ্গল 1 Oct] তারিখে 'শরৎকাল' শিরোনামে।[১] এই প্রস্তাবে তিনি লেখেন : 'আবার শরৎকাল আসিয়াছে। এই শরৎকালের মধ্যে আমি একটি নিবিড় গভীরতা, একটি নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করি।…শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি একত্রে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া 'রক্ত আকারে আমার হৃদয়ের শিরার মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে।'

প্রস্তাবের মূল ভাবনাটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি রচনা করেন [দ্র ৪। ৫৯৫-৯৬]। মূল রচনাটি সংকলিত হয় 'মানসী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩২০ [পৃ ৬৯৭-৯৮]-সংখ্যায়। কয়েকদিন পরে 10 Oct [বৃহ ২৫ আশ্বিন] এই প্রস্তাবেরই অনুষঙ্গ হিশেবে ছেলেবেলাকার শরৎকাল' [দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৫৪।১০]-শীর্ষক একটি প্রস্তাব রচনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য ইতিপূর্বে 7-8 Oct 'ছেলেবেলার কথা' নামের দুটি প্রস্তাবে শৈশবস্মৃতির রোমন্থনের সূচনা করে দিয়েছিলেন।

উক্ত সপ্তমীপূজার দিনই [1 Oct] পারিবারিক খাতায় ‘Dialogue/ Literature’[১] নামে প্রমথ চৌধুরী, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাহিত্য-বিষয়ক একটি আলোচনার অনুলেখন করা হয়, অনুলেখক প্রথমাংশে লোকেন পালিত ও শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেন : ‘সাহিত্য জিনিষটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না বলবার ভঙ্গীর উপর।’ মাঝে মাঝে তিনি মন্তব্য করলেও প্রমথ চৌধুরী ও লোকেন পালিতই ছিলেন প্রধান আলোচক। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য লেখেন স্বতন্ত্র প্রস্তাবাকারে পরের দিন 2 Oct [বুধ ১৭ আশ্বিন] ‘সাহিত্য’ শিরোনামে [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ২৬-২৭]। এখানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন : ‘আমি নিজে বারবার দেখিয়াছি,যখন সাহিত্যরচনার মধ্যে মগ্ন থাকা যায় তখন যেন একপ্রকার অতিচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। যেন আর একজন অন্তঃপুরুষ আমার অধিকাংশ চেতনা অপহরণ করিয়া আমার অর্ধেক অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া যায়। সে যেন আমার সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অভিজ্ঞতাকে আমার Real এবং Idealকে প্রতিদিনের আমাকে এবং আমার সম্ভাবিত আমাকে গলাইয়া লেখার মধ্যে তাহারি এক বিন্দু ঢালিয়া দেয়’—‘জীবনদেবতা’ ‘অন্তর্যামী’ প্রভৃতি কবিতার প্রাথমিক ভাবনা হিশেবে অংশটিকে গণ্য করা যায়।

এইদিনই ‘৬৫ সাহিত্য ।/ (৬৩-সংখ্যক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)’—রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লিখিত এই শিরোনামে প্রমথ চৌধুরী লোকেন পালিতের সঙ্গে তাঁর আলোচনার পরিশিষ্টটি রচনা করেন। এর পর রবীন্দ্রনাথ ‘রাজা ও রানী’-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা চিঠিটি কপি করেন, সেটি ও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে।

৬৭-সংখ্যক প্রস্তাব লোকেন পালিতের ইংরেজি রচনা ‘Agnosticism’ 6 Oct [রবি ২১ আশ্বিন] লিখিত হয়। সম্ভবত এইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ এইদিন লেখেন ‘বাঙ্গলায় লেখা’ [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১।২৯] ‘বাঙ্গলা ভাষায় লিখিবার এক বিশেষ সুবিধা এই যে বাঙ্গলায় নূতন কথা বলা যায়।বাঙ্গলায় কোন চিন্তা ব্যক্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তটাই একান্ত একাগ্রতার সহিত ভাবিয়া লইতে হয়, তাহার আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হয়। অক্ষমতাবশতঃ অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন হইতে পারে কিন্তু অলক্ষিতভাবে অন্যের নির্মিত পথে পড়িবার সম্ভাবনা বিরল। ইংরাজিতে প্রায় সকল ভাবেরই বহুকালসঞ্চিত ভাষা আছে—ভাবের উদয় হইবামাত্রই তাহারা দলে দলে আসিয়া আপনাদের মধ্যে ভুলাইয়া লইয়া যায়। এইরূপ অনায়াসলব্ধ ভাষার স্বতঃপ্রবাহিত গতির মধ্যে পড়িয়া চিন্তাশক্তি কথঞ্চিৎ নিরুদ্যম হইয়া পড়ে।’ প্রস্তাবটি কি বন্ধুর লেখার পরোক্ষ সমালোচনা?

একই দিনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ‘অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সঙ্গীত’ [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ৩০-৩১]। পূর্ববর্তী প্রস্তাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে তাঁর মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, হয়তো তারই সূত্রে বর্তমান প্রস্তাবের অবতারণা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী তিন দিন পার্ক স্ট্রীট ও বির্জিতলা যাতায়াত করলেও পারিবারিক খাতায় কিছু লেখেননি। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ দুটি প্রস্তাবে (7 ও 8 Oct] তাঁর ছেলেবেলার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। রচনা দু'টির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথও 10 Oct ‘ছেলেবেলাকার শরৎকাল’ [দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৫৪। ১০] নামে স্মৃতিচারণ করেছেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আবার এরই মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ‘কাজ ও খেলা’ [8 Oct] ও ‘খেলার কি কোন কার্যকারিতা নাই’ [9 Oct] নামে একটি নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য লেখেন 17 Oct [বৃহ ২ কার্ত্তিক] তারিখে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতে, ‘খেলা ও

কাজে প্রভেদ কি? খেলা হচ্ছে কাজের ভান—···খেলাতে কাজেতে প্রভেদ এই—খেলার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমোদ—কাজের লক্ষ্য হচ্ছে আমোদ-নিরপেক্ষ হইয়া কোন, দূরবর্তী উদ্দেশ্য সাধন—জীবিকা কিম্বা জীবনযাত্রা নির্বাহের সহিত তাহার অব্যবহিত যোগ। যখন আমাদের মনে প্রবৃত্তি-সমূহের প্রথম উন্মেষ হইয়াছে, অথচ সেই সকল প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ করিবার মত শারীরিক সামর্থ্য হয় নাই, তখন আমরা স্বল্প পরিসরের মধ্যে সেই সকল প্রবৃত্তি চালনা করিয়া সুখী হই—ইহাই খেলা।'[১] প্রসঙ্গক্রমে তিনি মায়ার খেলা'র 'এ তো খেলা নয়,/ এযে হৃদয়-দহন জ্বালা' ছত্র-দু'টি উদ্ধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই বক্তব্যকেই সম্প্রসারিত করেছেন : 'আমাদের মানবকার্য সাধনের জন্য বহুকাল হইতে কতকগুলি প্রবৃত্তি ও শক্তির চচা হইয়া আসিয়াছে। বংশানুক্রমে তাহারা আমাদের [ভিতর] সংক্রামিত, সঞ্চিত ও অনুশীলিত. হইয়া আসিতেছে।···যখন তাহাদিগকে সত্যকার কাজে খাটাইবার অবসর পাই না, তখন সঙ্গীদের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া একটা কাজের ভান গড়িয়া তুলি ও এই উপায়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত সঞ্চিত উদ্যমকে ছাড়া দিয়া আনন্দ অনুভব করি।সভ্যতা বৃদ্ধি-সহকারে আমাদিগকে অনেক প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিতে হয়, সুতরাং খেলাচ্ছলে তাহাদের নিবৃত্তি সাধন করিতে হয় কাব্য লিখিয়া, কাব্য পড়িয়া, অভিনয় দেখিয়া ও করিয়া নানা প্রবৃত্তির অলক্ষিত চরিতার্থতা সাধন হয় ইত্যাদি। এই ধরনের লেখালেখিও এক রকমের 'খেলা', যাকে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন 'মানসিক পায়চারি'[২]—কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল তো ভালো, নইলে একধরনের মানসিক ব্যায়ামের মাধ্যমে মনকে সচল রাখার চেষ্টাই এই সব লেখার উদ্দেশ্য। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবের শেষে একটি গুরুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন : 'আজকাল আমাদের মধ্যে যে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে উহা খেলা না কাজ? অনেকের পক্ষে উহা খেলা—কেননা বক্তৃতা করিবার আমোদ-বক্তৃতা শুনিবার আমোদ—বাহবা পাইবার আমোদ—বাহবা দিবার আমোদ উহা হইতে চলিয়া গেলে বোধ হয় অনেকেই উহা হইতে সরিয়া পড়িবেন—কিন্তু Hume সাহেবের মত দুই চারিজন তোক যে ইহাকে খেলা বলিয়া মনে করেন না তাহার প্রমাণ এই যে এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন—গভর্নমেন্ট ইহাকে খেলা বলিয়া মনে করেন কিন্তু ভাবেন ইহা দীপশিখার সহিত খেলা।'[৩] কয়েকদিন আগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' প্রবন্ধের উপরে লিখিত সম্পাদকীয় টীকার প্রতিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহানুভূতি—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব-প্রচারিত মতেই অবিচল থেকেছেন, .Political Agitation-এর সঙ্গে খেলার তুলনা খাটে কিনা ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমরা কি আপনাকে ও পরকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি না?'[৪]

এর মধ্যে বির্জিতলার বাড়িতে 'রাজা ও রানী' অভিনীত হল। তারিখটি নির্ধারণ করা যায়নি, তবে আশ্বিনের শেষ দিকে অভিনয়টি হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। ঠাকুরবাড়িতে যে-কোনো উপলক্ষে বা কোনো উপলক্ষ ছাড়াই অভিনয়ের আয়োজন হত যখন-তখন, তার ফলে প্রত্যেকটি অভিনয়ের তারিখ ও বিবরণ সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক। পরবর্তীকালে ইন্দিরা দেবী বা অবনীন্দ্রনাথ এই-সব বিষয়ে কিছু কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন—কিন্তু তাঁরা কোনো তারিখ উল্লেখ করেননি এবং তাঁদের প্রদত্ত বিবরণে কখনও কখনও একাধিক অভিনয়ের স্মৃতি মিলে-মিশে গিয়ে পরস্পরের বর্ণনায় অসংগতি সৃষ্টি করেছে। বর্তমান অভিনয়ের প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'তারপর মেজোজ্যাঠামশায়ের পার্টি, আমরা 'রাজা ও রানী' অভিনয়

করেছিলুম। আর কী খাওয়ার ধূম এক মাস ধরে। পার্ট সব তৈরি হয়ে গেছে, তবু আমরা রিহার্সেল বন্ধ করছি না খাওয়ার লোভে।…বিকেলের চা থেকে খাওয়া শুরু হত, রাত্রের ডিনার পর্যন্ত খাওয়া চলত আমাদের, আর সঙ্গে সঙ্গে রিহার্সেলও চলত। দেবদত্ত সেজেছিলেন মেজোজ্যাঠামশায়, সুমিত্রা মেজোজ্যাঠাইমা, রাজা রবিকাকা, ত্রিবেদী অক্ষয় মজুমদার, কুমার প্রমথ চৌধুরী, ইলা প্রিয়ম্বদা [ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিতে প্রতিভা দেবী], সেনাপতি নিতুদা—যেমনি লম্বা চওড়া ছিলেন স্টেজে ঢুকলে মনে হত যেন মাথায় ঠেকে যাবে [ইন্দিরা দেবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত তথ্য—'নারায়ণী কাকিমা : মৃণালিনী দেবী']। আর, আমরা অনেকেই ছোটোখাটো পার্ট নিয়েছিলুম জনতা, সৈন্য, নাগরিক, এই-সবের। আমার ছয়-ছয়টা পার্ট ছিল তাতে।'[৫] ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'একতলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে প্রথম রাজা ও রানীর অভিনয় হয়।মা খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন শুনতে পাই। পরদিন বঙ্গবাসী কাগজে 'ঠাকুরবাড়ির নতুন ঠাট' বলে একটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ বেরল। তাতে উক্ত পাত্রপাত্রীর তালিকা এবং পরস্পরের সম্পর্ক পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া ছিল।'[৬]

অবনীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী বোধ হয় আর অভিনয় হয়নি' বললেও ইন্দিরা দেবী সত্যেন্দ্রনাথের পরিচালনায় আরও একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'রাজা ও রানী' অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।[১] অক্ষয় মজুমদারের ত্রিবেদী-চরিত্রে অভিনয়ের প্রসঙ্গ দুজনেই উত্থাপন করেছেন, কিন্তু একাধিক অভিনয়ের স্মৃতি একসঙ্গে মিশে গিয়ে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। বর্ণনাটি বর্তমান অভিনয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে মনে হয় —অক্ষয় মজুমদারের অভিনয় নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করার জরিমানা হিশেবে সত্যেন্দ্রনাথকে নগদ পঞ্চাশ টাকা ও একটি শাল ঘুষ দিতে হয়েছিল, এর ফলে ত্রিবেদী চরিত্রটি যে তাঁর মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল তার প্রমাণ পারিবারিক খাতায় 'ছেলেবেলার কথা' লিখতে গিয়ে ত্রিবেদীকে মনে পড়েছে—'…নবীনবাবু বাবামশার মজলিসে বিদূষক—আর বাণেশ্বর পণ্ডিত আমার ত্রিবেদী ঠাকুর।

ত্রিবেদী সরল! নির্ব্বুদ্ধিই বুদ্ধি তার
সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড।'

-উদ্ধৃতিটিতে 'আমার' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়!

অভিনয়টি ২৫ আশ্বিনের [বৃহ 10 oct] পূর্বেই হয়েছিল [আমাদের অনুমান, ২০ আশ্বিন শনি 5 oct বিজয়ার পরের দিন] বলে মনে হয়। কারণ, উক্ত তারিখের পর রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিনের জন্য শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অভিনয়ের উত্তেজনা কেটে যাবার পর ভারমুক্ত হয়ে শান্তিনিকেতনে যাওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

৩০ আশ্বিন [মঙ্গল 15 oct] তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। পরদিন 'পার্ক স্ত্রটি আসিবার ৩১ আশ্বিনের ১ বৌচর'[২] হিসাব ক্যাশবহিতে পাওযা যায়—এই দিন তিনি পার্ক স্ট্রীটের বা বির্জিতলার বাড়িতেই ছিলেন বলে মনে হয়, কারণ ১ কার্ত্তিকের খরচ—/দ০ আশ্বিন মাসের মাস্কাবারী হিসাব সই করাইতে রবীবাবু মহাশয়ের নিকট বিজাতলায় ও পার্ক স্ট্রীটে যদুর যাতায়াতের ট্রামভাড়া লেগেছিল।

15 oct [মঙ্গল ৩০ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক খাতায় লেখেন সৌন্দর্য সম্বন্ধে notes' এবং 'পুনশ্চ নিবেদন'। সৌন্দর্য্য শিরোনামে ও প্রসঙ্গে তিনি আগে কয়েকটি প্রস্তাব লিখেছিলেন, এবারে note-এর ভঙ্গিতে লিখলেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ভাবনা—'সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব' নামে প্রথমোক্ত প্রস্তাবের প্রথমাংশ

ভারতী ও বালক-এর শ্রাবণ ১২৯৯-সংখ্যায় [পৃ ২৩৫-৩৭] মুদ্রিত হয়। এর শেষে তিনি লেখেন : 'প্রেম ও স্বাধীনতা আমি এক কথার স্বরূপে ব্যবহার করিতেছি কারণ আমি তাহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাই না। প্রেম ও স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্যভাবে একাত্ম। স্বাধীনতা অর্থেই ভালবাসার স্বাধীনতা যাহা ভাল বাসিতেছি না তাহাতে বদ্ধ থাকাই.অধীনতা। ইচ্ছা ব্যতীত স্বাধীনতার অর্থ নাই—প্রেম এবং ইচ্ছা একই কথা। অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে তিনি এটি লিখেছিলেন, তাই হয়তো বক্তব্য স্পষ্ট হয়নি ভেবে এর পরে দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে যোগ করেছেন : 'শেষটা বড় metaphysical হইয়া পড়িল—এই জন্য ভাবনা হইতেছে এর মধ্যে একটা গলদ থাকিয়া যাইতে পারে। বিশেষত আমার ভাল করিয়া ভাবিবার সময় নাই। এখনি বাহিরে যাইতে হইবে। চলিলাম। তারিখটি সম্পর্কেও সংশয় ছিল—'১৪ই কি ১৫ই ঠিক জানি না। ১৫ই বোধ হয়/ oct 1889'।

যে কাজে গিয়েছিলেন, হয়তো সেখান থেকে ফিরে এসে 'পুনশ্চ নিবেদন'-এ লিখলেন : Metaphysics আমার পক্ষে চোরা বালি। যত প্রতিষ্ঠাস্থল পাইবার জন্য চেষ্টা করি ততই অধিক চাপা পড়ি। অতএব বড়দাদার উপরে আমার উদ্ধারের ভার সমর্পণ করিলাম। ইচ্ছা প্রেম স্বাধীনতা এ সকল আমার জুরিস্‌ডিক্‌ষনের বহির্ভূত। বোধহয় আমার মনের ভাবটা এই যে, ইচ্ছাতেই স্বাধীনতার বীজ। ইচ্ছাই প্রকৃত স্বাধীন। আর সকলই নিয়মজালে বদ্ধ। ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা, অর্থাৎ action অসংখ্য নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।—বড়দাদা Free will সম্বন্ধে লিখিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আমি সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া দিলাম।' 'বড়দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি।

16 Oct [বুধ ১ কার্ত্তিক] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ইন্দুর-রহস্য'; 'দিন কতক দেখা গেল সুরির [সুরেন্দ্রনাথ] দুটো একটা বাজনার বই খোওয়া যাইতেছে। সন্ধান করিয়া জানা গেল একটা ইন্দুর রাতারাতি উক্ত বইয়ের কাগজ কাটিয়া ছিন্ন খণ্ডগুলি পিয়ানোর তারের মধ্যে খুঁজিয়া দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছাড়া ইহার ত কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।' প্রস্তাবটির বাকি অংশ 'বৈজ্ঞানিক কৌতুহল' [দ্র পঞ্চভূত ২৬৪০-৪৪; সাধনা, ভাদ্র কার্ত্তিক ১৩০২৪৬০-৬৭] প্রবন্ধের শেষাংশে সমীরের উক্তি হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এইদিন [16 Oct] 'চুম্বন' শীর্ষক প্রস্তাবে সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন; 'চুম্বন রহস্য কে বলিবে? অধরে অধর মিশাইয়া একটি নিঃশব্দ শব্দ উচ্চারণ—ইহার অর্থ কি? একটি জাতি আছে যাহারা চুম্বনের মর্যাদা অবগত নহে। জাপানী জাতি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। এইরূপ শুনিয়াছি জাপানী জননী শিশুকে বুকে লইয়া আদরে চুম্বন করে না। মাতার এরূপ উদাসীন ভাব আমাদের সহজে বোধগম্য হয় না।···কি এক শান্তশীল শীতলতা বংশপরম্পরা প্রবাহিতা হইয়া তাদের এমনি ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে যে জননীরও এই স্বাভাবিক উচ্ছাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্বতন্ত্র প্রস্তাবাকারে নয়, মন্তব্যের আকারে রবীন্দ্রনাথ এই দিনই লিখলেন : 'চুম্বন প্রথা কি কেবল আর্যজাতীয়ের মধ্যেই বদ্ধ নহে? সেমেটিক্, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে কি চুম্বন প্রচলিত আছে? আমরা মনেই করিতে পারি না হৃদয়ের মধ্যে স্নেহ-প্রেমের উদ্রেক হইলে অধরের প্রতি অধরের আকর্ষণ না হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু উহা কি কতকটা স্বাভাবিক এবং কতকটা প্রথাগত নহে? জন্তুদের মধ্যেও ত চুম্বন নাই—আঘ্রাণ, লেহন, গাত্রঘর্ষণ আছে। বানরী কি করিয়া আপন শাবকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে কেহ বলিতে পারেন?'[১] রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হয়েছে মার্জিনে, 'তার উকুন বাছিবার ভান করিয়া—S.T.'—পুলিনবিহারী সেন অনুমান করেছেন, এটি সত্যেন্দ্রনাথের লেখা

—কিন্তু আমরা মনে করি, টীকাটি সত্যেন্দ্র-পুত্র সুরেন্দ্রনাথের রচিত, হস্তাক্ষর তাঁরই মতো, 'S.T.'-স্বাক্ষর তাঁর অনেকগুলি লেখায় দেখা গেছে।

আমরা আগেই বলেছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কাজ ও খেলা' [5 oct] প্রস্তাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য লেখেন 17 oct [বৃহ ২ কার্ত্তিক] তারিখে। এই 'কাজ ও খেলা' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবটি আপাতত পারিবারিক খাতার শেষ রচনা—এরপর বলেন্দ্রনাথ আবার এই খাতায় লিখেছেন ৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 18 Feb 1890] তারিখে। মনে হয়, পূজার ছুটি শেষ হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ সোলাপুরে ফিরে গেলে বির্জিতলায় আত্মীয়বন্ধুদের আসরটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়—পারিবারিক খাতায় লেখা বন্ধ হওয়ার এটি একটি অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রনাথেরও কার্ত্তিক মাসে পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াতের পরিমাণ লক্ষণীয় ভাবে কম—ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী তিনি মাত্র ৩, ৬, ৮ ও ৯ কার্ত্তিক পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি সম্ভবত আর একবার শান্তিনিকেতনে যান—ক্যাশবহিতে ২১ কার্ত্তিক [বুধ 6 Nov] একটি হিসাব দেখা যায় : 'জায়/ রবীবাবু মহাশয় ° যোগেন্দ্র পাল বীরভূম ২০০্', হিসাবটি সম্পূর্ণ হয় ২৭ কার্ত্তিক [মঙ্গল 12 Nov] : 'ব° যোগেন্দ্রচন্দ্র পাল/ মোং বাঁধ নবগ্রাম দ° উহাকে দান করা যায় ২০০্'—এই হিসাবের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর সেরেস্তার হিসাবপত্র দেখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন ২ আষাঢ়—অগ্রহায়ণ মাসে [Nov 1889] তিনি পেলেন জমিদারী পরিদর্শনের অধিকার। একটি হিসাবে দেখা যায় : 'দ্বিপেন্দ্রবাবুর ও রবীন্দ্রবাবুর ১০ অগ্রহায়ণ বির্জাতলার বাটীতে হইতে পার্ক স্ট্রীটের বাটীতে যাতায়াতের গাড়িভাড়া'—অবসর-মতো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এতদিন জমিদারি পরিদর্শন করছিলেন, মহর্ষি এই সময়ে সেই ভার অর্পণ করলেন রবীন্দ্রনাথকে।

১১ অগ্র° [সোম 25 Nov] রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবী, তাঁর একজন সহচরী, বেলা ও রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে শিলাইদহ যাত্রা করেন। বলেন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী হন—'শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রবাবু মহাশয়ের বিরাহিমপুর শুভাগমনের ব্যয় বিঃ ১১ অগ্রহায়ণের এক বৌচর…১৯।লও'; বলেন্দ্রনাথ নিজেও পারিবারিক খাতায় লেখা তাঁর 'Adventure'-শীর্ষক প্রস্তাবে লেখেন, 'আমাদের সিলাইদহে যাওয়া হয় ১১ই'।

শিলাইদহে গিয়ে তাঁরা একটি বোটে আশ্রয় নেন। ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জায়গাটির বর্ণনা দিয়ে লেখেন : 'শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর—ধূ ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাতে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।'[১] বাংলা দেশের নদী-তীরবর্তী প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মকালে পেনেটির বাগানবাড়িতে ও পরে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে তিনি শিলাইদহে এসেছেন, কিন্তু এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত বর্তমান সময়েই। এই চিঠিতেই সেই প্রকৃতিরসসম্ভোগের

নান্দীপাঠ করা হয়েছে—এরপর ছিন্নপত্রাবলী-র অনেকগুলি পত্র ও সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালী কাব্যত্রয়ে রচিত হয় পদ্মাকেন্দ্রিক প্রকৃতির সঙ্গে আদানপ্রদানের ইতিবৃত্ত।

কিন্তু শুরুতেই একটি অঘটন—বলেন্দ্রনাথ যাকে 'adventure' বলেছেন—ঘটে যায়। তিনি লিখেছেন : 'একদিন-সেদিন ১৩ই অগ্রহায়ণ [বুধ 27 Nov] ···চরের একদিককার একেবারে শেষে গিয়ে পৌঁছই। তখন বেশ সন্ধ্যে হয়েছে—চারিদিক ধোঁয়া ধোঁয়া। সেখানে দেখলুম, একদল বালহাঁস আমাকে দেখে ক্যাঁ কো ক্যাঁ কো করতে করতে উড়ে গেল।···তাপরে কাকীমাকে সেইদিন খাবার আগে চওড়া পদ্মার কথা বল্লুম—বালহাঁস টালহাঁস কোনও কথাই নুকোইনি। কাকীমা আর তাঁর সহচরীতে মিলে ঠাহরালেন, পরদিন আমার সঙ্গে চরের সেই শেষে গিয়ে পদ্মার বাহারটা একবার দেখে আসবেন।···পরদিন [১৪ অগ্র° বৃহ 28 Nov] বিকেল বেলায় স-সহচরী কাকীমা ত পদ্মার সেই বালহাঁসের আড্ডা দেখতে চল্লেন। দিব্যি যাওয়া গেল। ···কিন্তু ফিরতে ফিরতে কোথায় গিয়ে পড়ি।···পথ নিয়ে আবার উভয় পক্ষের মতভেদ উপস্থিত হ'ল। ···সন্ধ্যে ছেড়ে বেশ একটু অন্ধকার হয়েছে—আমরা তখন অগাধ বালি-সমুদ্রের মাঝখানে।কাকীমাকে বোঝালুম যে, একটু উঁচু জমিতে উঠলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কাকীমা মন্দ হাঁটতে পারেন না—তিনি প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু তাঁর সহচরী বড় গোলযোগ করে তুল্লেন। শুনলুম, তাঁর নাকি গা হিম হয়ে আস্‌ছে, চল্‌বার সামর্থ্য নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়াও তাঁর এক কাল্পনিক ভয় উপস্থিত হল, মাটী-বালি ফুঁড়ে পাছে একদল ঠেঙ্গাড়ে বের হয়।···শেষে উঁচু জমিতে উঠতে একদল লোকের বিড়বিড় শোনা যেতে লাগল। ডেকে হেঁকে অনেক করে শেষটা সেই মেছোদের কল্যাণে পথ পাওয়া গেল। এ তো বলেন্দ্রনাথের 'adventure'-এর বর্ণনা—রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ-আশঙ্কার বিবরণ আছে ছিন্নপত্রাবলী-র উল্লিখিত ৩ সংখ্যক পত্রটিতে। অবশ্য চিঠিটি লেখবার সময় ঘটনার বিভীষিকার সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রচিত হয়েছে—তাই সকৌতুকে কিছুদিন আগে অভিনীত 'রাজা ও রানী' নাটকের সংলাপ আওড়াতে পেরেছেন—'আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ'। চিঠিটি শেষও করেছেন বিক্রমের উক্তির প্যারডি দিয়ে। তিনি যে কেবল বেড়াবার উদ্দেশ্যে সপরিবারে শিলাইদহে যান নি, তার প্রমাণ চিঠির এই অংশটিতে আছে। 'ঐ রে! মৌলবী সাহেব এক দঙ্গল প্রজা নিয়ে এসে সেলাম করছে'—এই বর্ণনা থেকেই মনে হয় প্রজাদের অভাব-অভিযোগ প্রার্থনা ইত্যাদি শোনা ও তার প্রতিকার করার চেষ্টা ইত্যাদি জমিদারি কর্ম তাঁকে প্রায়ই করতে হ'ত।

চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন সম্ভবত ১৪, ১৫, ১৬ অগ্র° [28-30 Nov]—এই তিনদিন ধরে। ইন্দিরা দেবী পত্র-শেষে প্রাপ্তির তারিখ লিখে রেখেছেন : 'কলকাতা/ ২ ডিসেম্বর?/ ১৮৮৮'—1888 অবশ্যই ভুল, সালটি হবে 1889 এবং 30 Novপোস্ট করা চিঠিটি পরদিন রবিবার ডাক বিলি হয়নি বলে 2 Dec কলকাতায় পৌঁছয় এইরূপ হিসাব করলে পত্র-প্রাপ্তির তারিখটি ঠিকই আছে ধরে নেওয়া যায়।

ছিন্নপত্র বা ছিন্নপত্রাবলী-র তারিখের ভুলটি প্রথম লক্ষ্য করেন রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১।২৫৮, পাদটীকা ২]। কিন্তু তিনিই আবার ভুল করে লিখেছেন 30 Nov. 1889 [শনি ১৬ অগ্র°] এমারেল্ড্ থিয়েটারে 'রাজা ও রানী'র প্রথম ব্যবসায়িক অভিনয় হয় ও 'রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।' এই তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন সেকথা জানাননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সেই সময়ে শিলাইদহে ছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই—সুতরাং তাঁর

পক্ষে অভিনয় দেখতে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। বস্তুত উক্ত অভিনয়ের সূচনা হয় 7 Jun 1890 [শনি ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭] তারিখে যথাস্থানে আমরা সে-প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারি কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলেও তাঁর পরিবারের সদস্যেরা কি করে সময় কাটাতেন, তার কিছু নমুনা আছে পারিবারিক খাতায় অনুলিখিত বলেন্দ্রনাথের 'সিলাইদহ/ সুনা-উল্লার গান' শীর্ষক প্রস্তাবে : 'আমরা যখন সিলাইদহে ছিলুম তখন রোজ রোজ আমাদের বোটে সেখানকার গ্রাম্য গাইয়েদের আমদানি হত। তার মধ্যে দু'জন আমাদের মাকামারা হয়ে পড়েছিল। একজন বষ্ণম—সে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকীরের[১] গান গাইত, আর একজন নেড়ে এবং বাচ্ছা—তার গান নানারকম। তার নাম হচ্ছে সুনা-উল্লা।···এক-একদিনের পালায় তারল০ আনা ক'রে পয়সা বরাদ্দ ছিল ···নিয়মিত বরাদ্দ ছাড়াও কাকীমার দানশীলতায় তার একখান সাড়ী এবং তাঁর সহচরীর ফস্‌ফরিক সালসার একটা খালি বোতল লাভ হয়েছিল।···[২] —এইরূপ ভূমিকা করে বলেন্দ্রনাথ সুনা-উল্লার মুখ থেকে শোনা বারোটি গান খাতায় নকল করে রেখেছেন। ৪ ও ৭ সংখ্যক গানের পাশে মার্জিনে লেখা যথাক্রমে ২৩শে ও ২৫শে অগ্রহায়ণ '৯৬—অনুমান করা যায় অন্তত এই দুটি গান উক্ত তারিখগুলিতে শুনেছিলেন। এর মধ্যে ২ সংখ্যক গানের রচয়িতা গগন মণ্ডল, বলেন্দ্রনাথ ভনিতার নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'সিলাইদহের ডাক-হরকরা লিখে রেখেছেন। এই গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, এর সুর অবলম্বনে তাঁর বিখ্যাত স্বদেশী সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' রচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরপরিবারের অনেকে এইভাবে বাউল ও অন্যান্য লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ ১২৯০ সংখ্যা ভারতী-তে 'সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সংগৃহীত তিনটি লোকসংগীত প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালেও অনুরূপ উদাহরণ অনেক আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় কতদিন শিলাইদহে ছিলেন নিশ্চিত করে বলা শক্ত। ১৮ ও ২৭ অগ্র° এবং ১ পৌষ 'রবীবাবুর নিকট পত্র' পাঠানোর হিসাব পাওয়া যায়। এর পর ৯ পৌষ [সোম 23 Dec]-এর হিসাবে দেখি : 'রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের বির্জাতালা হইয়া পার্ক স্ট্রীটের বাটী যাতায়াতের গাড়ীভাড়া'—সুতরাং এর আগেই তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। এর পর ১২, ১৩, ১৪, ২০, ২২, ২৫, ২৬ ও ২৭ পৌষ তাঁর পার্ক স্ট্রীট বা বির্জিতলা যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়—তিনি যে পৌষ মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন, এই হিসাব তার প্রমাণ।

এর পরেই ১ মাঘ [সোম 13 Jan 1890] তাঁকে আবার আমরা জমিদারিতে দেখি। উক্ত দিন 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের নিকট পত্র লেখার টিকেট' বাবদ দু পয়সা খরচ করা হয়। ১২, ১৭, ১৯, ২৩ মাঘ ও ৩ ফাল্গুন তাঁকে পত্র পাঠানো হয়। এরপর ৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 18 feb] 'রবীবাবু মহাশয়ের বিজার্তালা হইয়া পার্ক স্ট্রীটের বাটী যাতায়াতের' হিসাব থেকে মনে হয় পৌষ মাসের শেষ থেকে ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি জমিদারিতে ছিলেন।

আগের বারে তিনি গিয়েছিলেন শিলাইদহে, বিরাহিমপুর পরগণার জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এবারে তিনি এলেন শাহজাদপুরের [সাজাদপুর] কুঠীতে—পাবনা জেলার অন্তর্গত

ইসবশাহী বা ইউসুফশাহী পরগণার জমিদারি পর্যবেক্ষণ করতে।

এখানে এসে কয়েক দিন পরে পত্নী মৃণালিনী দেবীকে যে চিঠিটি লিখলেন [স্ত্রীকে লেখা এতাবৎ প্রাপ্ত প্রথম চিঠি], তার মধ্যে গৃহস্থ রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় : 'ভাই ছোটবউ। যেমনি গাল দিয়েছি অমনি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত। ভালমানুষির কাল নয়। কাকুতি মিনতি করলেই অমনি নিজমূর্তি ধারণ করেন আর দুটো গালমন্দ দিলেই একেবারে জল। একেই ত বলে বাঙ্গাল। ছি, ছি, ছেলেটাকে পর্য্যন্ত বাঙ্গাল করে তুল্লে গা!'[৩] চিঠির শেষে পুত্র-কন্যা সম্পর্কে লিখেছেন : 'বেলি খোকার জন্যে এক একবার মনটা, ভারি অস্থির বোধ হয়। বেলিকে আমার নাম করে দুটো "অড" খেতে দিয়ো। আমি না থাকলে সে বেচারা ত নানা রকম জিনিষ খেতে পায় না। খোকাকেও কোন রকম করে মনে করিয়ে দিয়ো। আমার পশমের ছবি[১] দেখে সে আমাকে চিনতে পারে এ শুনে আমি বড় খুসি হলুম না।'[২] চিঠিতে অন্য খবরও আছে : 'একদল উকীল আর স্কুলের মাষ্টার এসেছিল। আমার বই স্কুলে চালাবার জন্য কথাবার্তা বয়ে রেখেছি কেবল বই আর পাচ্চিনে।--রাজর্ষি যে-খানা আমার কাছে ছিল সেইটেই ইনস্পেক্টরের হাতে দিয়েছি।' 'রাজর্ষি স্কুলে চালানো গিয়েছিল—সত্যপ্রসাদ রাজর্ষির প্রকাশক ছিলেন, তাঁর হিসাব-খাতায় দেখা যায় : 'সাহাজাদপুরে ২৫ খানা রাজর্ষি বিক্রয়ের জন্য দেওয়া যায় তাহার মূল্যের মধ্যে···১০'।

চিঠিটিতে যে 'উকীল আর স্কুলের মাষ্টার'দের কথা আছে, তাঁরা এসেছিলেন শাহজাদপুর হাই স্কুলের ছাত্রদের সুনীতিসঞ্চারিণী সভায়[৩] সভাপতিত্ব করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে। ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে [১০ মাঘ বুধ 22 Jan] রবীন্দ্রনাথ এর একটি কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন।[৪]

৮ মাঘ সোম 20 Jan ছিল এই সভার অধিবেশন। তার পূর্বে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে রবীন্দ্রনাথ 20-1-90 তারিখ দিয়ে Inspection Book-এ লেখেন : visited the school for the first time, went round all the classes. I did not try to frighten the boys out of their wits by cursory examination, which I find they have often enough. I have every reason to believe that the Head Master is doing his duty conscientiously and I dare say the school is as good as any other of its kind.'[৫]

—এ-ধরনের কাজ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এইটিই প্রথম, তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষাদর্শের পরিচয় এখানে দুর্লক্ষ্য নয়।

জমিদারবাবুর সম্মানে স্কুল ছুটি হয়ে গেলে সেখানেই সুনীতিসঞ্চারিণী সভার অধিবেশন বসে। ইন্দিরা। দেবীকে লেখা চিঠিটিতে রবীন্দ্রনাথ এই সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ১৬-১৯]।

স্ত্রীকে লেখা ইতিপূর্বে উল্লিখিত চিঠিটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'আমাদের সাহেব আবেন পর্শুদিন। সেদিন আমার কি শুভদিন! আমার কি আনন্দ! আমার সাহেব আসবে আবার আমার মেমও আসবে! হয়ত আমার ঘরে এসে খানা খেয়ে যাবে—নয়ত বলবে—বাবু, আমার সময় নেই! আমার কত বাদ্ধি পার্থনা করি, যেন তার সময় না থাকে।' এই সাহেব সম্ভবত তরুণ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এফ. ও. বেল। সাহেবের এই সপ্তাহে আসা হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ পরের সপ্তাহে [? ১৩ মাঘ শনি 25 Jan] নিজেই গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'কাজেই দুফুর বেলা পাগড়ি পরে কার্ডে নাম লিখে পাল্কি চড়ে জমিদারবাবু চললেন। সাহেব তাঁবুর বারান্দায় বসে বিচার করছেন, ···একেবারে তার নাকের সামনে পাল্কি

নাবালে, সাহেব খাতির করে চৌকিতে বসালে।'[৬] সাহেবকে তিনি অনুরোধ করলেন, পরদিন রবিবার রাত্রে তাঁর সঙ্গে খেতে। সাহেব জানালেন, তিনি সেইদিনই অন্য এক জায়গায় যাবেন pig sticking-এর যোগাড় করতে; তখন তাঁকে সোমবার খাবার নিমন্ত্রণ করে তিনি ফিরে এলেন। বিকেলে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি—'বই ছুঁতে ইচ্ছে করছে না, কিছু লেখা অসম্ভব, মনের মধ্যে ভারী একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত, যাকে কবিত্বের ভাষায় বলে—কী যেন নেই, কে যেন থাকলে বেশ হ'ত, কিন্তু তাকে যেন কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি।' বিপন্ন ম্যাজিস্ট্রেটকে আশ্রয় নেবার আহ্বান জানিয়ে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করার একটি কৌতুকপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন ইন্দিরা দেবীকে লেখা ছিন্নপত্রাবলীর ৬-সংখ্যক পত্রে [পৃ ২১-২৩]।

রবীন্দ্রনাথ এই বৎসর মাঘোৎসবে উপস্থিত ছিলেন না, এই উপলক্ষে কোনো গানও রচনা করেননি। অবশ্য লেখার কাজ বন্ধ থাকেনি—এক বৎসর আগে সোলাপুরে থাকার সময়ে লিখেছিলেন 'রাজা ও রানী'—শেক্‌সপীয়রীয় আদর্শে রচিত তাঁর প্রথম বড়ো নাটক, এবারে সাজাদপুরে থাকার সময়ে লিখলেন আর একটি বড় নাটক 'বিসর্জন'—'রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত।

অবনীন্দ্রনাথ নাটকটি রচনার একটি ইতিহাস দিয়েছেন : 'তখন বর্ষাকাল, রবিকাকা আছেন পরগনায়। দাদা, অরুদা আমরা কয়জনে, একটা কী নাটক হয়ে গেছে, আর একটা নাটক করব তার আয়োজন করছি। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এর বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে কেবল কথাটুকু নিয়ে খাড়া করে তুলেছি নাটক করব। ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়ছে, আমরা সব তাকিয়া বুকে নিয়ে এই-সব ঠিক করছি—এমন সময় রবিকাকা কী একটা কাজে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, দেখি কী হচ্ছে! খাতাটা নিয়ে নিলেন, দেখে বললেন, না, এ চলবে না—আমি নিয়ে যাচ্ছি খাতাটা, শিলাইদহে বসে লিখে আনব, তোমরা এখন আর কিছু কোরো না।···এর কিছুদিন বাদেই রবিকাকা শিলাইদহে গেলেন, আট-দশ দিন বাদে ফিরে এলেন, 'বিসর্জন' নাটক তৈরি।'[১] অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে কিছু ত্রুটি আছে। সময়টি অবশ্যই বর্ষাকাল নয়, পৌষ মাসের বর্ষণসিক্ত কোনো দিন হতে পারে; তাছাড়া নাটকটি লেখা হয়েছিল সাজাদপুরে, শিলাইদহে নয়।

নাটকটি লেখার ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথেরও কিছু ভূমিকা ছিল! রবীন্দ্রনাথ এটি তাঁকে উৎসর্গ করে লিখেছেন :

তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

—কিন্তু এই বর্ণনা কিছুটা অস্পষ্ট, সুরেন্দ্রনাথের জন্মদিন ১২ শ্রাবণ [26 Jul], পৌষ-মাঘ মাসে লেখা নাটক জন্মদিনে সুরেন্দ্রনাথকে উপহার দিতে গেলে বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করা দরকার—তার আগেই রবীন্দ্রনাথ

‘দেশে’ ফিরে এসেছেন, বইটি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭-এ।

দীর্ঘ উৎসর্গ-কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি রচনার পটভূমিকা ও পরিবেশের খুঁটিনাটি-সহ বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। এটি সম্ভবত সাজাদপুরে নাটকসমাপ্তির অব্যবহিত পরে লেখা। এতদিন তিনি নাচরিত্রগুলির সুখদুঃখের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন, ‘তাহাদের তুলনায় আর সবে ছায়াপ্রায়/ আসে যায় নয়নের ’পরে’। কিন্তু রচনা-শেষে—

তাই এতদিন পরে আজি নিজমূর্তি ধরে
প্রবাসের বিরহবেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে ‘কী এনেছ’ বলি সবে
যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,
খাতাখানি বের করে বলিব ‘এ পাতা ভরে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ।’

এরপর নাটকটি পাঠ করে শোনানোর পালা। রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই প্রথাটি পালন করেছেন—নতুন কোনো রচনা আগে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে পাঠ করে তাঁদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার পর প্রকাশের কথা ভেবেছেন। এখানে নাটক-পাঠের আসরটি কল্পনা করেছেন বির্জিতলার বাড়ির পরিবেশটি স্মরণ করে—

সেই ছবি মনে আসে— টেবিলের চারি পাশে
গুটিকত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই-তিন ঊর্ধ্বে জ্বলে কেরোসিন,
কেদারায় বসি ঠাকুরানী।···
খাতা হাতে সুর ক’রে অবাধে যেতেছি প’ড়ে
কেহ নাই করিবারে টীকা।

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব’য়ের পাত,
বাহিরে নিস্তব্ধ চারি ধার—
তোদের নয়ন জল করে আসে ছলছল্
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন-রচনায়—
মনে মনে প্রাণ ভরি অমরতা লাভ করি

নীরব সে সমালোচনায়।

গ্রন্থ-মুদ্রণের পরবর্তী পর্যায়ের কথাও কল্পনা করেছেন :

রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।'

—শেষ ছত্রটি লেখবার সময় সম্ভবত রাজা ও রানী-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনা—'Lyrical versus Dramatic এই যা একটু খোঁচ'—তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল!

অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনানুযায়ী বউঠাকুরানীর হাট-এর নাট্যরূপ সংবলিত খাতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ পূর্বেই 'রাজা বসন্ত রায়' নামে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল, তাই নতুন পারিবারিক অভিনয়ের প্রয়োজনে এইটিকেই আবার নাট্যায়িত করতে নিশ্চয়ই তাঁর মন সায় দেয় নি। এবার রাজর্ষি উপন্যাসটি তাঁর সঙ্গে ছিল—স্ত্রীকে লিখেছেন যে, স্কুলে চালাবার জন্যে 'রাজর্ষি যে-খানা আমার কাছে ছিল সেইটেই ইন্‌স্পেক্টরের হাতে দিয়েছি'। আরও ২৫ খানা রাজর্ষি যে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই-সব কারণেই সম্ভবত রাজর্ষি-কে নাট্যরূপ দেওয়ার ভাবনা তাঁর মনে এসে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-রচনাবলী-সংস্করণ রাজর্ষি-র সূচনা'য় লিখেছেন, 'আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ।--বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।' পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের ঘটনা পর্যন্ত কাহিনী অবলম্বনেই বিসর্জন রচিত, অবশ্য নাটকীয় প্রয়োজনে ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ চত্বারিংশ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে বর্ণিত কিছু-কিছু ঘটনা বিসর্জন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রানী গুণবতী, অপর্ণা, চাঁদপাল, নয়নরায় প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নূতন সৃষ্টি।

বিসর্জন প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে [? ২ জ্যৈষ্ঠ]। প্রথম সংস্করণের পাঁচটি অঙ্ক ও ঊনত্রিশটি দৃশ্য ছিল। ১৩০৩ আশ্বিনের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'-সংস্করণে নাটকটি বহুল সংস্কার হয় ও দৃশ্যসংখ্যা হয় একুশটি; হাসি, কেদারেশ্বর, অপর্ণার অন্ধ পিতা প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র বর্জিত হয়। প্রধানত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'-সংস্করণকে ভিত্তি করে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হল ১ আষাঢ় ১৩০৬ সালে। এতে কাব্যগ্রন্থাবলীর পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য মিলিয়ে প্রথম দৃশ্য এবং প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্য মিলিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য গঠিত হয়, শেষ দৃশ্যের সমাপ্তি অংশটি নূতন রচনা। কাব্যগ্রন্থাবলী ও 'দ্বিতীয় সংস্করণ' মিলিয়ে আর একটি সংস্করণ প্রস্তুত হয় কাব্যগ্রন্থ নবম ভাগের [১৩১০] অন্তর্ভুক্ত 'বিসর্জন'-এ! ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত 'তৃতীয় সংস্করণ'-এ প্রথম সংস্করণের অনেক অংশ নানা পরিবর্তন-সহ গৃহীত হয়, 'হাসি' চরিত্রটির পুনঃ-- প্রবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে ১৩৩৮ সালে ১৩১০-এর কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণটি আবার ফিরে এল—মোটের উপর এই পাঠটিই বর্তমানে প্রচলিত।

বর্তমানে যে সংস্করণ প্রচলিত, তার সঙ্গে প্রথম সংস্করণের পার্থক্য সুদুস্তর। বর্তমানের প্রতীক-প্রতিম অপণা চরিত্রটি প্রথম সংস্করণে অনেক বেশি মানবিকতা-গুণসম্পন্ন—জয়সিংহের সঙ্গে তার জটিল

প্রেমসম্পর্কটি পরে অনেকটাই সরলীকৃত হয়েছে। গুণবতীর রানীত্বের গর্ব, স্বামীর প্রতি অভিমান ও ধ্রুবের প্রতি ঈর্ষাদীর্ণ মনোভাব তাঁকে চক্রান্তকারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছে, কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে তাঁর ভূমিকা সংক্ষিপ্ত ও একমুখী। চাঁদপাল প্রথম সংস্করণে একটি সম্পূর্ণ চরিত্ররূপে পরিকল্পিত হয়েছিল, গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে চক্রান্তের শ্বাসরোধী পরিবেশ রচনায় সে রঘুপতি, গুণবতী ও নক্ষত্ররায়ের সুচতুর সহযোগী, কিন্তু বর্তমান সংস্করণে তার চরিত্র প্রায় নামমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত চরিত্রগুলির পূর্বমহিমার ভগ্নাবশেষ প্রচলিত সংস্করণে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি, ফলে প্রথম সংস্করণের পাঠের সঙ্গে অপরিচিত ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিসর্জন-এর ঘটনাবিন্যাস 'খানিকটা অসম ও এলোমেলো' বলে মনে করেছেন।[১] কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, অনেক অবান্তর ঘটনা-বাহুল্য বর্জিত হওয়ায় পরবর্তী সংস্করণে নাটকের গতি ও সংঘর্ষের তীব্রতা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে উন্নতি লক্ষিত হয় সংলাপের ভাষায়। প্রথম সংস্করণের গদ্যাত্মক কাব্যভাষা বহুল পরিমাণে সংশোধিত হয়েছে পরবর্তী সংস্করণে। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা গুণবতীর এই সংলাপটি তুলনা করতে পারি :

প্রথম সংস্করণ, পৃ ৭-৮

মা'র কাছে কি করেছি দোষ? ভিখারী যে
উদরের দায়ে সন্তান বিক্রয় করে
তারে দাও শিশু—⋯
⋯এই বক্ষ, এই বাহু,এই
কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, রচিতে নিবিড়
করে একটি জীবন্ত নীড়, একটুকু
প্রাণকণিকার তরে! একটি নূতন
আঁখি প্রথম আলোকে হেরিবে আমার
মুখ,—ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন
কচি রাঙা ঠোঁটে, অকারণ আনন্দের
প্রথম হাসিটি! ⋯

রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণ [দ্র ২। ২৮৯]

মার কাছে কী করেছি দোষ! ভিখারি যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু—⋯
⋯এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু

প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!

—লক্ষণীয়, দ্বিতীয় উদাহরণটির বক্তব্য একই, শব্দের পরিবর্তনও সামান্য—কিন্তু অন্বয় এবং ছন্দোযতির একটু হেরফেরে ছন্দঃস্পন্দটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে ৮+৬ মাত্রার পর্ববিভাগ অক্ষুণ্ণ রেখে যে সাবলীল প্রবহমানতা সৃষ্টি হয়েছে, প্রথম উদাহরণে তা অনুপস্থিত। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়, প্রথম সংস্করণে ছন্দের এই ত্রুটি এতই সুপ্রচুর যে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ একটি ছত্রে ১৪ মাত্রা বজায় রাখার দিকেই এটা মনোনিবেশ করেছিলেন যে, আমাদের উচ্চারণপ্রবণতার পক্ষে স্বাভাবিক পর্ববিভাগে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন!

আমরা আগেই বলেছি, ৩ ফাল্গুন [শুক্র 14 Feb] 'রবীবাবুর নিকট ১ পুত্র' এবং ৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 18 Feb] রবীবাবু মহাশয়ের বিজাতালা হইয়া পার্কষ্ট্রীটের বাটী যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া'র হিসাব পাওয়া যায়—সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এরই অন্তর্বর্তী কোনো দিনে তিনি সাজাদপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। ৭ ফাল্গুন বলেন্দ্রনাথও বির্জিতলার বাড়িতে গিয়েছিলেন,শিলাইদহে লিখে নেওয়া 'সুনা-উল্লার গান' তিনি এইদিন পারিবারিক খাতায় লেখেন। পরদিন [৮ ফাল্গুন] তিনি লেখেন শিলাইদহের 'Adventure'কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ এই দিনও বির্জিতলার বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ১০, ১৫, ১৬, ২১, ২৫ ও ২৭ ফাল্গুন তাঁর বির্জিতলা বা পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। এই সময়ে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এর প্রধান লেখক বলেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ বির্জিতলায় গেলেও এই খাতায় কিছু লেখেননি।

চৈত্র মাসে তাঁর পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায় ৬, ১০ ও ১২ তারিখে। [১২ চৈত্র সোম] 24 Mar তারিখে তিনি পারিবারিক খাতায় লেখেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ নিবন্ধ। রচনাটির প্রথমাংশ একই শিরোনামে সাধনা পত্রিকার বৈশাখ ১২৯৯ [পৃ ৪৭১-৭৩] সংখ্যায় প্রকাশিত হয় [দ্র সাহিত্য ৮। ৪৬১-৬৩]; এই রচনার সাধনা-য় বর্জিত শেষাংশ রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ৩১-৩২-এ মুদ্রিত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে পারিবারিক খাতায় 6 Oct 1889 তারিখে লিখিত 'বাঙ্গলায় লেখা' প্রস্তাবে তিনি প্রায় অনুরূপ বক্তব্যই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবটির উপলক্ষ সম্ভবত কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার [হয়তো-বা 'রাজা ও রানী'র] সমালোচনা। সমালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় আমরা আগেও দেখেছি, এখানেও অনুরূপ সহনশীলতার অভাব লক্ষ্য করা যায় : 'বঙ্গদেশে প্রকৃত সাহিত্যের সমালোচনা করিতে পারেন এমন কয়জন লোক আছেন। কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় "জ্যেঠামি" নামক একটি শব্দ আছে সেটি শ্রুতিমধুর নহে; কিন্তু আমাদের সমালোচনাকে আর কোন নাম দেওয়া যায় না।'[১] কয়েক বৎসর পরে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'চৈতালি' কাব্যের সমালোচনায় বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'জ্যাঠা' বলে অভিহিত করেছিলেন!

বর্তমান প্রস্তাবের শেষে রবীন্দ্রনাথ খাতায় লিখে রেখেছেন : '(আজ সু [রেনরা] সোলাপুর যাচ্চে)।—'; তাঁরা হয়তো এক মাসের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন—কারণ '১৪ই বৈশাখ ১২৯৭' তারিখ দিয়ে ঋতেন্দ্রনাথ

পারিবারিক খাতার অব্যবহিত পরের প্রস্তাবটিতে লিখেছেন : "আজকের congress meeting-এ দেবতার ধিক!"

ঋতেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের যে-সভা প্রসঙ্গে এই ধিক্কার জানিয়েছেন তার কথা আমরা পরে আলোচনা করব—কিন্তু কংগ্রেস সম্পর্কে ঠাকুরপরিবার ও রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়। কয়েকমাস পূর্বে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে দ্বিপেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীও এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন, অবশ্য দর্শক হিশেবে। এই অধিবেশনে স্থির হয়, কংগ্রেসের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও সংবাদপত্রাদিকে অবহিত করবার জন্য এগারো জন সদস্যের যে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হবে—তাতে থাকবেন মিঃ জর্জ ইয়ুল, মিঃ এ. ও. হিউম, মিঃ অ্যাডাম, মিঃ ইয়ার্ডলি নর্টন, মিঃ জে. ই. হাওয়ার্ড, মিঃ ফেরোজশা মেটা, মিঃ সরফ-উদ-দিন, মিঃ এন. মুধলকর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ ও ডব্লু. সি. বোনার্জি। সুরেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে বোম্বাই যাত্রা করেন 18 Mar 1890 [মঙ্গল ৬ চৈত্র]। তার পূর্বদিন ৫ চৈত্র [সোম 17 Mar] কলকাতার বেলভিউ হোটেলে [Bellevue Hotel] তাঁকে একটি সান্ধ্য ভোজসভায় বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। ডব্লু. সি. বোনার্জির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ভোজসভায় অন্যান্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। মনোমাহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি ৪৬ জনের উপস্থিতি-তালিকায় ঠাকুর-পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ, মোহিনীমোহন ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নাম দেখা যায়।[২] ক্যাশবহির একটি হিসাবেও দেখি : 'শ্রীযুত সুরেন্দ্রবাবুর বিলাত গমন উপলক্ষে খাওয়ানর হিসাবে ব্যয়/ শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয় ৯/ শ্রীযুত অরুবাবু মহাশয় ৯'। ১৪ বৈশাখ ১২৯৭ [শনি 26 Apr] এমারেল্ড্ থিয়েটারে পঠিত 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব সমর্থন করেন। আবেদন-নিবেদন-মূলক রাজনীতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে ও পরেও রবীন্দ্রনাথ বারবার সোচ্চার হলেও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গটি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচ্য।

সম্ভবত চৈত্রমাসের কোনো এক দিনে রবীন্দ্রনাথ একটি সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে যোগদান করেন। এই সাহিত্য-সমিতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া দুষ্কর। তবে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অনাথনাথ বসু প্রভৃতি যুক্ত ছিলেন—একথা প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র থেকে জানা যায়। হয়তো সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার সহযোগী হিশেবে এই সমিতি ['সুহৃৎ সমিতি'] গড়ে উঠেছিল। উল্লিখিতপত্রে[১] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সাহিত্যসমিতিতে যে অধিবেশনে রৈবতক সমালোচনা হয় সেবারে তুমি ছিলে না—সেজন্যে তোমার আপ্‌শোষ করবার কারণ কিছুই নেই। যে রকম মনে করেছিলুম সে রকম লোক তোমাদের সমিতিতে নেই—অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের দম্ভটুকু আছে। হীরেন্দ্র দত্ত তত্ত্বজ্ঞ হতে পারেন কিন্তু রসজ্ঞ কিছুমাত্র নন। অন্য যাঁরা বসে শুনছিলেন তাঁরাও কেউ বুদ্ধিলক্ষণযুক্ত দুটো কথা যুটিয়ে বলতে পারলেন না। জ্ঞানেন্দ্র গুপ্তর মস্তিষ্কগহ্বর কুহেলিকাচ্ছন্ন—অন্যান্য সভ্যদের এখনো ভালরূপ পরিচয় পাইনি কিন্তু অনাথনাথবাবুর বেশ একটি ভদ্র শোভনভাব আছে এবং তিনি মনে করেন না যে তিনি পৃথিবীতে এসে একটি প্রতিভার অগ্নিকাণ্ড করবেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের রৈবতক

কাব্য।/ সমালোচনা' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার বৈশাখ ১২৯৭ [পৃ ৩৩-৪০]-সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হতে শুরু করে [জ্যৈষ্ঠ। ৪১-৫৫, শ্রাবণ। ১২৩-৩৭, ভাদ্র-আশ্বিন। ২১৯-৩৫] প্রমথনাথ সাহিত্যসমিতির পরবর্তী একটি অধিবেশনে 'জয়দেব' প্রবন্ধ পাঠ করেন, প্রবন্ধটি ভারতী ও বালক-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় [পৃ ৯৭-১১২]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কি নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে চৈত্র মাসের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন? তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৮১২ শক-সংখ্যার ২১-২২ পৃষ্ঠায় 'শান্তিনিকেতন/ ১লা বৈশাখ রবিবার ৬১ ব্রাহ্ম সংবৎ'-নির্দেশিত একটি উপাসনা-ভাষণের শেষে [পৃ ২২] রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত দু'টি 'ব্রহ্মসঙ্গীত মুদ্রিত হয় :

[১] রাগিণী টৌড়ি—তাল কাওয়ালি/ নব আনন্দে জাগো আজি
দ্র গীতবিতান ১। ১৩৭; স্বর ২৪; মূলগান; অধর ধরে বন বাঁশরী বজাবে কান্‌হ্
দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৭২-৭৩।

[২] রাগিনী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি/ ওই পোহাইল তিমির রাতি দ্র গীতবিতান ১। ১২৯; স্বর ২৪; মূল গান : তোম্ তানা নানা নানা দু ত্রিবেণীসংগম। ২৩।

প্রাসঙ্গিক তথ্য :১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উল্লেখ করবার মতো ঘটনা খুবই কম।

৩১ ভাদ্র [রবি 15 sep] রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন হয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

২১ ফাল্গুন [মঙ্গল 4 Mar 1890] পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথ, শরকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র যশঃপ্রকাশ এবং বর্ণকুমারী দেবীর দুই পুত্র সরোজনাথ ও প্রমোদনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়।

মহর্ষি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ [8 Jun 1869] তারিখে একটি উইল করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ১।১২৯]। বর্তমান বৎসরে 28 Jun [শুক্র ১৫ আষাঢ়] সেই উইলটি 'cancelled and Revoked মন্তব্য-সহ স্বাক্ষর করে তিনি বাতিল করেন। সম্ভবত এই সময়ে ডাঃ নীলমাধব হালদার ও ডাঃ বিপিনচন্দ্র কোঙার উপস্থিত ছিলেন, ক্যাশবহিতে এই কারণে তাঁদের যথাক্রমে ৫০ ও ১০০ টাকা দেবার উল্লেখ আছে। বাতিল করা উইলের বদলে নূতন উইল তখনই করা হয়নি, সেটি করা হয় পরের বৎসর [১২৯৭] আশ্বিন মাসে।

1889-এ প্রমথ চৌধুরী দর্শনে [Mental and Moral Science] প্রথম শ্রেণীর অনার্স-সহ বি.এ.ডিগ্রি লাভ করেন। তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য :২

১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ [শনি 13 Apr] মহাসমারোহে জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে নববর্ষ-উৎসব পালিত হয়। মহর্ষিভবনের নববর্ষ উৎসবের একটি সুন্দর ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন সরলা দেবী : 'আমাদেরও

একটি পারিবারিক উৎসবের দিন ছিল যেদিন পরস্পরকে আলিঙ্গন প্রণামাদি করা হত। সে নববর্ষে, ১লা বৈশাখে। নতুন কাপড় পরার কতকটা রেওয়াজও সেইদিনটিতে ছিল। এক হিসেবে এইটিই আমাদের যথার্থ পারিবারিক মিলনের দিন। সেদিন অতি ভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে উঠত। ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠে, বাড়িসুদ্ধ পুরুষেরা সকলে প্রস্তুত হয়ে নবশুভ্রবস্ত্র পরিধান করে, উঠানে উপাসনা-সভায় সমবেত হতেন, আর মেয়েরা খড়খড়িতে। উপাসনাদি হয়ে গেলে বয়সের তারতম্য অনুসারে প্রণাম আলিঙ্গনাদি শেষ করে-মেয়েমহলেও—সরবৎ পান করান হত বাইরে—তার [পর]

বাড়ির লোকদের সেদিন সকলের একত্র ভোজন হত মধ্যাহ্নে'।[১] অনুষ্ঠানটির আর এক ধরনের চিত্র পাওয়া যায় বর্তমান বৎসরের হিসাবে : '১২৯৬ সালের ১ বৈশাখ ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ব্যয় শোধ—বাটী সাজান, ৫০৷৷/৩ ফল খাওয়ান ৫৭ল৯ কাঙ্গালীদিগের কাপড় ও উহাদিগকে চাউল দান ২৯৷৷৯ কলসী উৎসর্গ ১৪৷৷/৬ মধ্যাহ্নে ভোজনের ব্যয় ১৩৩ ০/২৮৫৷৷লত'—ব্যয়ের পরিমাণটি একটি পারিবারিক উৎসবের পক্ষে যথেষ্ট বেশি, এর মধ্যে 'কলসী উৎসর্গ'-এর হিসাবটি আমাদের চমৎকৃত ও কৌতুকান্বিত করে।

এইদিন 'শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরে মহিলা-সমাজ।/নববর্ষ'—শীর্ষক উপাসনাটি তত্ত্ববোধিনীর জ্যৈষ্ঠ [পৃ ১৭-১৯] সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠিত হয় ১১ মাঘ [বৃহ 23 Jan 1890]। 'প্রাতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে ব্রহ্মোপাসনা হয়। ঐ সুসজ্জিত স্থান যথা সময়ে লোকে পরিপূর্ণ' হয়ে উঠলে রামকুমার বিদ্যারত্ন ও আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ উপদেশ দেন। রাত্রে 'শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহ পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত ও আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এবার বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান এমন লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রশস্ত গৃহ লোকে লোকারণ্য'। আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন। 'নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত' আখ্যায় একটি মাত্র গান তত্ত্ববোধিনী [ফাল্গুন। ২১১]-তে মুদ্রিত হয় :

মহীসুরী ভজন—তাল ফের্‌তা।/ হায় একি হেরি শোভা অতুলন!

—এছাড়া অনেকগুলি পুরোনো গান গাওয়া হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

১ ভাদ্র ১২৯৭-এর হিসাব: 'গত ১২৯৬ সালের ১১ মাঘের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ব্যয় শোধ ১৯৯৪ ৷৷/৩'।

এই অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরে ২৫ মাঘ প্রধান আচার্য হিশেবে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে উপাচার্য পদে নিয়োগ করেন। [দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১২.]। দ্বিজেন্দ্রনাথ বহু পূর্ব থেকেই আচার্য-রূপে অভিহিত হতেন—আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এই প্রথম দেওয়া হল। মহর্ষির শেষ জীবনের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ইতিপূর্বেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টী নিযুক্ত হয়েছিলেন, বর্তমানে উপাচার্যরূপে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজেও বিশিষ্ট ভূমিকা লাভ করলেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি, শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৬ শ্রাবণ পদত্যাগ করলে ট্রাস্টডীড অনুসারে অপর দু'জন ট্রাস্টী দ্বিপেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ৩১ শ্রাবণ [15 Aug] রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন [রমণীমোহন অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সম্পাদক পদে

অধিষ্ঠিত ছিলেন]। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে তাঁদের নামে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা, 'শান্তিনিকেতনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ১০০০ টাকা দান, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন যাওয়া ইত্যাদি বৃত্তান্ত আমরা আগেই দিয়েছি। মহর্ষি ট্রাস্ট ডীডে শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্যনির্ব্বাহও ব্যয় সঙ্কুলান জন্য কয়েকটি সম্পত্তি দান করেন; কিন্তু বহু বৎসর এই সম্পত্তি ট্রাস্টীদের কাছে হস্তান্তরিত করা হয় নি [এটি করা হয় 14 Sep 1903 তারিখে সম্পাদিত আর একটি দলিলের দ্বারা] —ইতিমধ্যে বিভিন্ন খরচ মেটানোর জন্য মহর্ষি তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

৪ কার্তিক ১২৯৫ আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বর্তমান বৎসরে প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হয়েছিল বলে জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এর সপ্তাহখানেক পূর্বে একবার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। অবশ্য ৮ পৌষ [রবি 22 Dec] আশ্রমে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। এখানে যে 'উপদেশ' দেওয়া হয়, সেটি তত্ত্ববোধিনী [মাঘ ১৬৯-৭৩]-তে মুদ্রিত হয়। অনুষ্ঠানটির আর কোনো বিবরণ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়নি। অন্য দুই ব্রাহ্মসমাজের তুলনায় আদি সমাজ অনেকটাই প্রচারবিমুখ ছিল, ফলে এই সমাজের ইতিহাস রচনা বিঘ্নসংকুল। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেওয়ার দিনটি [৭ পৌষ] এই বিশেষ উপাসনার লক্ষ্য ছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা শক্ত, কিন্তু সেক্ষেত্রে পূর্বদিন শনিবার থাকায় সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠান হওয়ায় কোনো বাধা ছিল না। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২২ অগ্রহায়ণ [রবি 7 Dec 1890] শান্তিনিকেতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হলেও মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা বা উদ্বোধন হয় ৭ পৌষ ১২৯৮ এবং তারপর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সাংবৎসরিক উৎসব ৭ পৌষকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বর্তমান বৎসরের উক্ত বিশেষ উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন না।

শ্রাবণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মচারী তালিকায় অধ্যক্ষ পদে কতকগুলি সংযোজন পরিলক্ষিত হয়; পুরোনোদের সঙ্গে নূতন নাম—গগনেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়নাথ মুখখাপাধ্যায় ও আশুতোষ চৌধুরী। এঁদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি একটু বিস্ময়কর। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেননি—তাঁদের পরিবারে দোল-দুর্গোৎসব ও অন্যান্য হিন্দু আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হত। গগনেন্দ্রনাথের প্রথম পুত্রের জন্মের পর থেকেই মহর্ষির পরিবারের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা বেড়ে গিয়েছিল। সেই সম্পর্কের স্বীকৃতি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব হয়তো এই নিবার্চনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

কংগ্রেসের তৃতীয় মাদ্রাজ অধিবেশন [1887] থেকে একই মণ্ডপে একটি সামাজিক-সম্মেলনের [social Conference] আয়োজন করা হচ্ছিল। তার আগের বছর কলকাতা অধিবেশনের সময়ে [Dec 1886] সমাগত ব্রাহ্ম প্রতিনিধিদের সিটি কলেজ হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় সংবর্ধিত করা হয়েছিল, আমরা যথাস্থানে তার বিবরণ দিয়েছি। বর্তমান বৎসর বোম্বাইতে পঞ্চম অধিবেশনের সময় [1889 অনুষ্ঠানটিকে সংগঠিত করে Theistic Conference নামে অভিহিত করা হ'ল; বোম্বাইতে ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ সংগঠন প্রার্থনা সমাজের উদ্যোগে প্রার্থনা সমাজ মন্দিরে 27, 29 ও 30 Dec এই অধিবেশন হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ।[১] ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বিশ্বাসী ভারতের একেশ্বরবাদী সংগঠনগুলির মধ্যে ভাববিনিময় Theistic Conference-এর উদ্দেশ্য ছিল।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টির চেষ্টা চলছিল, তার কিছু কিছু বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। বর্তমান বৎসরে ১৬ মাঘ [মঙ্গল 28 Jan 1890] মহর্ষির পার্ক স্ট্রীট-স্থ বাসভবনে তিন সমাজের সমবেত উপাসনা হয়। মাঘোৎসবের অঙ্গ হিশেবে এই ধরনের সম্মেলনও কয়েক বৎসর ধরে একটি প্রথায় পরিণত হয়। এর পর ১ ফাল্গুন [বুধ 12 Feb] প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি 'শান্তি কুটীর'-এ ব্রাহ্ম মিশন কমিটির একটি সভায় স্থির হয়, সব-ক'টি শাখার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ধর্মীয় বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতা করবেন—28 Feb [১৭ ফাল্গুন] তার প্রথমটি দেবেন প্রতাপচন্দ্র স্বয়ং।

প্রাসঙ্গিক তথ্য :৩

সাজাদপুর অবস্থান-কালে রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য কীর্তির অজ্ঞাত কাহিনী পরিবেশন করেছেন ড মযহারুল ইসলাম তাঁর 'শাহজাদপুরে জমিদার রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাফল্য' প্রবন্ধে [দ্র দেশ, ২৫ চৈত্র ১৩৮৯। ১৯-২৫]। ড ইসলামের পিতামহ নবীপুরের আকুল সরকার ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু বাউল ভদ্রের কন্যা মৃণাল-মৃদুল লতা [ডাক নাম লতা] পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গোপনে বিবাহ করেন। বাউল ভদ্র ছিলেন মুড়াপাড়ার ব্যানার্জি জমিদারের প্রজা। তিনি জমিদারের কাছে অভিযোগ করেন যে আকুল সরকার জোর করে তাঁর কন্যাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেছে। জমিদার ও তাঁর ম্যানেজার রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় আকুল সরকারকে শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হন এবং আকুল সরকারও তাঁদের বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে এসেই এই ঘটনার কথা শোনেন এবং আকুল সরকার ও তার সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ড ইসলামের অনুমান, সিরাজগঞ্জ থেকে তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট এফ ও বেল সাজাদপুরে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন ও উভয়ের চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। এই প্রসঙ্গে আকুল সরকারকে 27 Jan [সোম ১৫ মাঘ] তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র ড ইসলাম উদ্ধৃত করেছে : 'প্রিয় আকুল সরকার,/ তোমার ব্যাকুলতা আমি উপলব্ধি করেছি। সিরাজগঞ্জ থেকে সাহেব এসেছিলেন, আমি তাঁকে তোমাদের বিষয়টি বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। তুমি নিজের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করোনি, এইটে আমার ভাল লেগেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে আমি ঘৃণা করি। মানুষের নিকট মানুষের মর্যাদার বাড়া আর কিছু নেই। নারী পুরুষের প্রেমও এই শাসনই মেনে চলে—সে হৃদয়ের বশ, ধর্মের বা বর্ণের অনুশাসন তার বড়ো নয়। সমাজ প্রাচীর গড়ে কিন্তু হৃদয় অনায়াসেই সে প্রাচীর অতিক্রম করতে পারে। তোমাদের সাথে আলাপ করে আমি তেমনি দুটো হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছি। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শাসনকে নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করবে না। আশা করি তোমাদের উপরে যে অত্যাচারের আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা দূরীভূত হয়েছে। তোমরা আমার সাহায্য ও সহানুভূতি সর্বদাই লাভ করবে। সুখী হও।/ ইতি—/শুভার্থী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' মূল পত্রটি 1928-এ একটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। কিন্তু আকুল সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা খোদেজা খাতুন '১০ই মাঘ ১৩১৪ শুক্রবার (২৪শে জানুয়ারী, ১৯০৮ খৃঃ)' পত্রটির যে অনুলিপি প্রস্তুত করেন, সেটি রক্ষিত হয়েছে ও তার একটি লিপিচিত্র ড ইসলাম তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত করেছেন। এই প্রতিলিপিটি গুরুতর সংশয়ের সৃষ্টি

করে। অনুলিপির তারিখ দেখে জানা যায়, এটি মূল পত্রটি বিনষ্ট হবার আগেই প্রস্তুত হয়েছিল, অর্থাৎ দেখে দেখে লেখা—অন্তত মিলিয়ে নেবার সুযোগ তখন বর্তমান ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন স্বাক্ষরে সর্বদাই 'শ্রী' ব্যবহার করতেন, অনুলিপিটি শ্রী-হীন। কলকাতার অধিবাসী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'সঙ্গে' অর্থে 'সাথে' শব্দটির প্রয়োগ স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া 'মর্যাদা', 'ধর্ম', 'সর্বদা' ইত্যাদি দ্বিত্ব-বর্জিত বানান রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে লিখতেন না—নকল করার সময়ে অভ্যাসবশত ভুল করা 1908-এ অসম্ভব ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দেশিত বানান-বিধি প্রচারিত হয়েছিল 1936-এ, তারপরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও এই বিধিতে অভ্যস্ত হতে সময় নিতে হয়েছিল!

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বোম্বাইতে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্নের [sir william Wedderburn, 1836-1918] সভাপতিত্বে 1889-এর 26 Dec থেকে 28 Dec [বৃহ-শনি ১১-১৩ পৌষ]। মিঃ ফেরোজশা মেটা ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। মোট ১৮৮৯ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন, তার মধ্যে বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-সহ বাংলা দেশের প্রতিনিধি ছিলেন ১৬৫ জন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে দ্বিপেন্দ্রনাথ প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত হন। স্বর্ণকুমারী দেবী দর্শক হিশেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলার মহিলা-প্রতিনিধি ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলি [বসু] প্রথম মহিলা বক্তা রূপে সভাপতিকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এবারে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা ২৫৮ জন। কংগ্রেসের এই অধিবেশন Bradlaugh Session নামে পরিচিত। ভারতপ্রেমিক পার্লামেন্ট-সদস্য মিঃ চার্লস ব্যাড্‌ল [Mr. Charles Bradlaugh] ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারের উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে একটি বিল আনয়ন করার কথা ভাবছিলেন। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার সংকল্প নিয়ে ভারতে আসেন এবং এই অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁর উপস্থিতি সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এবারের অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ই ছিল ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ ও সংস্কার। মিঃ ব্র্যাড্‌ল'র সুবিধার জন্য প্রায় একটি খসড়া বিলই সভায় প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির একটি জটিল সমস্যাও এই সভায় অনাবৃত হয়ে পড়ে। অযোধ্যার মুসলমান প্রতিনিধি মুন্সী হিদায়েৎ রসুল একটি সংশোধনী এনে বলেন, ব্যবস্থাপক সভায় সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হোক। লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার হামিদালি খান, সৈয়দ মীর-উদ্দিন আহমেদ প্রভৃতি এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং অন্যান্য মুসলমান সদস্যেরাও এর বিরুদ্ধে ভোট দেন।

ভারতীয় সমস্যার স্বরূপ পার্লামেন্টের সদস্যদের বুঝিয়ে বলার জন্য ও ইংলণ্ডে জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে এগারো জনের একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের ধনভাণ্ডার গঠনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ আবেদন জানালে এক ঘণ্টার মধ্যে ৬৪,০০০ টাকা দান স্বাক্ষরিত হয় ও ২০,০০০ টাকা সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'Mr. Bradlaugh was a witness to the scene, and the impression that he then formed must have been no small

incentive to his disinterested labours for the political advancement of a people so full of real patriotism.'[১]

দ্বিতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে 17 Oct 1889 [বৃহ ২ কার্ত্তিক] আরম্ভ হয়। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় প্রস্তাবের সমর্থনে বাংলায় বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা পত্র-পত্রিকায়। উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। এই ধরনের সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা এই প্রথম দেওয়া হল, সেই দিক থেকে ঘটনাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫

বিখ্যাত সাধক লালন ফকির শিলাইদহের নিকটে কুষ্টিয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল পূর্বে সেঁউড়িয়া [সেওরিয়া] নামক স্থানে বসবাস করতেন। 'পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য; শুনিতে পাই ইহার শিষ্য দশ হাজারের উপর।'[২] ইনি বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে বেড়াতেন, কুমারখালিতে কাঙাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মকালে এইরূপ একটি সংগীত পরিবেশনের উল্লেখ জলধর সেন করেছেন।[৩] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে 'শিলাইদহ বোটের উপর' ২৩ বৈশাখ ১২৯৬ [রবি] 5 May 1889 তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল, তার প্রমাণ আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের খাতায়, সেখানে তিনি 'লালন ফকীর'-এর একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেন।[৪] প্রত্যক্ষদর্শীর আঁকা এইটিই লালনের একমাত্র চিত্র। পরবর্তী কালে নন্দলাল বসু এই স্কেচটি অবলম্বনে লালনের একটি চিত্র অঙ্কন করেন, 'আপন মনের মাধুরী' মেশালেও লালনের উন্নত ললাট ও তীক্ষ্ণ নাসার বৈশিষ্ট্য নন্দলাল রক্ষা করেছেন—চিত্রটি বিভিন্ন গ্রন্থে বারংবার মুদ্রিত হওয়ায় বহুল পরিচিত।

এই চিত্রটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। একথা ঠিকই যে, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র-ই প্রথম তাঁর 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য' [১৩৮৬] গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে ও ভিতরে আর্টপ্লেটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অঙ্কিত লালনের রেখাচিত্রটি মুদ্রণ করে অনেকের পক্ষে ছবিটি দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন; কিন্তু তিনি যখন লেখেন : 'কেউ-ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা স্কেচটি দেখেননি একমাত্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ছাড়া। এবং তারপর এই দীর্ঘ ছিয়াশী বছর পরে আমি আবার তাকে প্রকাশ্যে লোক-চক্ষুর সামনে হাজির করলাম।'—[৫] তখন দাবিটি একটু অতিরিক্ত মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত [মৃত্যু : 4 Mar 1925] পরিচিত-অপরিচিত অজস্র ব্যক্তির ছবি এঁকেছেন এবং কেউ তাঁর ছবির খাতা দেখতে চাইলে সাগ্রহে তাঁকে দেখতে দিয়েছেন, অনেকের স্মৃতিকথায় এইরূপ উল্লেখ আছে। তাছাড়া অধ্যাপক মিত্র রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহশালায় লালনের যে ছবি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবির তালিকা দেখেছেন, সেই ছবিগুলি শিল্পী মুকুলচন্দ্র দের সংগ্রহে ছিল এবং শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায়[১] 1944-এ তালিকাটি প্রস্তুত হয়। সুতরাং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পর অন্তত এরা দু'জন যে লালনের ছবিটি দেখেছিলেন, এ সম্পর্কে সন্দেহ

করা চলে না। তাছাড়া অধ্যাপক মিত্র যে লিখেছেন, 'আরও মনে হচ্ছে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা এই স্কেচটি রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় দেখেননি'[২]—একই কারণে মেনে নেওয়া শক্ত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও লালন ফকিরের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল কিনা, এই প্রশ্নটিও বিচার্য। অল্প বয়সে মহর্ষি বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার শিলাইদহে গেলেও, পরিণত বয়সে জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে তিনি সেখানে গেলেন বলেন্দ্রনাথ-সহ সপরিবারে বর্তমান বৎসরে ১১ অগ্র° তারিখে; এ-যাত্রায় তিনি শিলাইদহে ছিলেন এক মাসের কিছু কম। এরপর পৌষ মাসের শেষে আবার তিনি জমিদারি পরিদর্শনে গেছেন—কিন্তু সেবার যান সাজাদপুরে। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি আর-একবার দিন-কুড়ির জন্য শিলাইদহে যান। এরপর মাঘ ১২৯৭-এ তিনি আবার যখন কালীগ্রাম-সাজাদপুর-শিলাইদহ পরিভ্রমণ করেন, তখন লালন ফকিরের মৃত্যু ঘটেছে—তাঁর মৃত্যুর তারিখ 17 Oct 1890 [শুক্র ১ কার্ত্তিক]। সুতরাং লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদি সাক্ষাৎ হয়ে থাকে, তাহলে তা অগ্র°-পৌষ ১২৯৬ বা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১২৯৭-এ শিলাইদহে অবস্থানকালেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সময়ে ইন্দিরা দেবী বা প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্রগুলিতে নানাবিধ ঘটনার কথা উল্লেখ করলেও লালন-সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত। অথচ জলধর সেন তাঁর 'কাঙ্গাল হরিনাথ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে [1913] লিখেছেন : 'শুনিয়াছি কবির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুঠিতে লালন একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত গান চলিয়াছিল, ইহার মধ্যে কেহই স্থান ত্যাগ করিতে পারে নাই।'[৩] ঘটনাটি সত্য হলে নিঃসন্দেহে লিখে জানানোর মততা, কিন্তু সমসাময়িক পত্রাবলীতে এর কোনো উল্লেখ নেই এবং ১১৫ বছরের বৃদ্ধের পক্ষে একটানা ৮/৯ ঘন্টা গান গেয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা, তাও ভেবে দেখা দরকার। সম্ভবত জলধর সেনের বর্ণিত এই লোক-শ্রুতি অবলম্বনে শিলাইদহের অধিবাসী ও ঠাকুর এস্টেটের বহুদিনের কর্মচারী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী লালন ফকিরের সঙ্গে মোলাকাৎ'-এর 'উপন্যাসের গল্পের মত' 'প্রথম মিলনের কাহিনী' ফেঁদেছেন—তাঁর বর্ণিত ঘটনা-কাল আরও পরবর্তী, যখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ কুঠী বাড়িতে বাস করতে গিয়েছেন, সেই সময়কার।[৪] কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতার খাতিরে ছেঁউড়িয়া অধিবাসী 'হয়ধর মিঞা' বরকন্দাজকেও উপস্থিত করা হয়েছে! অবশ্য গ্রন্থটির 'প্রকাশক' পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন : 'এই কাহিনীটির নায়ক রবীন্দ্রনাথ না হতেও পারেন। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেই হয়ত সাঁইজির এভাবে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল।'[৫] এই টীকা মুদ্রিত হওয়ার সময়ে গ্রন্থকার কিন্তু জীবিত! বস্তুত এই ধরনের গালগল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্ত কন্টকাকীর্ণ, আর অনেক সময়ে খুব কাছের মানুষেরা এগুলি লিখেছেন বলেই কিছুটা বিপজ্জনকও।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য লালনের ব্যক্তিজীবন, তাঁর ধর্মমত ও তাঁর রচিত পদসমূহের কথা জানতেন। ৫ ভাদ্র ১৩১৬ [শনি 21 Aug 1909] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত একটি ছাত্রসভায় ছাত্রদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিতে গিয়ে বলেন : 'আর একটি বিষয়—যেটা আমার বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়। সেটা ছোট ছোট নূতন ধর্ম্মপ্রচারকদের জীবনী ও বক্তব্য বিষয় সংগ্রহ করা। মফস্বলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাই যে হয় ত পল্লীর নিভৃত ছায়ায় কোনো ব্যক্তি এক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠন করিতেছেন।…আমি এইরূপ একজন ধর্ম্মপ্রচারকের বিষয় কিছু জানি—তাঁহার নাম লালন ফকির। লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দুপরিবারে

জন্মগ্রহণ করেন—এরূপ শুনা যায় যে তাঁহার বাপ মা তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে তাঁহার বসন্ত রোগ হওয়াতে তাঁহাকে রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই সময়ে একজন মুসলমান ফকির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত হন। এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান হিন্দু জৈন মতসকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিষ তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে।'[১]

কয়েক বছর পরে ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে [আশ্বিন, অগ্র°-মাঘ সংখ্যায়] 'সংগ্রহকর্ত্তা-শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্দেশ-সহ ২০টি 'লালন ফকিরের গান' সংকলিত হয়। রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে নকল-করা ২৯৮টি [কয়েকটি গান দু'বার লিখিত হওয়ায় মোট ২৮৫টি] 'লালন ফকিরের গান/ বাউল সংগ্রহ' দুটি খাতায় [Mss. 138A(I) ও 138A(II)] রক্ষিত আছে। যথাস্থানে আমরা এই প্রসঙ্গগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬

এইখানে একটি বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সমীরচন্দ্র মজুমদারের সংগ্রহে রবীন্দ্ররচনা-সংবলিত একটি পাণ্ডুলিপি আছে, 'ছয় ইঞ্চি লম্বা, তিন ইঞ্চি চওড়া পুরু কালো মলাটের এই খাতার উপরে ইংরেজিতে লেখা।'[২] : 'R. N. TAGORE/POCKET BOOK/1889'। 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' প্রবন্ধে কানাই সামন্ত পাণ্ডুলিপিটির নামকরণ করেছেন—'মজুমদার-পুঁথি'[৩]; আমরাও পাণ্ডুলিপিটিকে এই নামে অভিহিত করব। পাণ্ডুলিপিটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকায় আমরা সেটি ব্যবহারের সুযোগ পাইনি; কিন্তু রবীন্দ্রভবনে তার মলাট-সহ প্রতিটি লিখিত পৃষ্ঠার মাইক্রো-ফিল্ম ও ফটোকপি আছে। ফটোকপিগুলি দু'টি খণ্ডে বাঁধানো, তাদের নির্দেশক-সংখ্যা : 426 (i) ও 426 (ii)। মলাটের ছবিটিকে '1' ধরে বাকি পৃষ্ঠাগুলি ক্রমানুসারে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা প্রয়োজন-মতো এই সংখ্যাগুলি ব্যবহার করব।

সুবোধচন্দ্র মজুমদারের কাছে খাতাটি যাওয়ার ইতিহাস-সম্পর্কে 'সুবোধবাবুর এক পুত্র সুনীল মজুমদারের বক্তব্য' উদ্ধৃত করেছেন অমিতাভ চৌধুরী : 'রবীন্দ্রনাথের লেখাটেখা বাবা গুছিয়ে রাখতেন শিলাইদহে। এই পকেটবুক কবির সর্বক্ষণের বন্ধু। ওটার ভিতরে গোঁজা থাকত একটা পেনসিল। খুব 'পারসোনাল' ছিল বলে জমিদারির হিসেব থেকে শব্দতত্ত্ব—যা প্রয়োজন সবই ওটায় লিখে রাখতেন। জমিদারির হিসেব পেনসিলে চলবে না বলে লিখতেন খাগের কলমে আর সেরেস্তা কালিতে। অন্য রচনা লিখেছেন প্রথমে ওই পেনসিলে। তারপর 'ফেয়ার' করে নিতেন। সব যখন ভাল করে কপি করা হয়ে যায়, তখন ওটা বাবাকে দিয়েছিলেন।'[৪]

এই বক্তব্যের মধ্যে একটি ত্রুটি আছে। 'জমিদারির সদর খাজনার হিসাব' [পৃ 13-20], '১২৯৫ সালের জমিদারির মুনফার হিসাব' [পৃ 24], 'পরগনা হায়ের প্রধান প্রধান কর্মচারির নাম ও বেতন' [পৃ 27-31], 'ট্রষ্টীদপ্তরে সদরের আমলাদিগের বেতন [পৃ 33]—এই যে হিসাব ও তালিকাগুলি এই খাতায় আছে, সেগুলি স্পষ্টতই সেরেস্তার কোনো কর্মচারীর হস্ত-লিখিত, বিচিত্র বানান-ভুলেও তাঁকে চিনে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে কিছু নাম ও বেতনক্রম লিখেছেন, এরূপ নিদর্শনও কোনো কোনো পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ২ আষাঢ় ১২৯৬ [15 Jun 1889] তারিখে জোড়াসাঁকোর সেরেস্তার হিসাবপত্র দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের অনুমান, এই দায়িত্বপালনের অঙ্গ হিশেবে 'POCKET BOOK'টি প্রস্তুত করা হয়; অতঃপর রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে খাজনা ও মুনাফার হিসাব ও কর্মচারীদের নাম ও বেতনের তালিকা কোনো কর্মচারী লিখে দেন—যাতে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এটিকে সহজেই ব্যবহার করা যায়। এর পর কিছুদিন এটি জমিদারির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। দুটি পৃষ্ঠায় দেখা যায়, যজ্ঞেশ্বর, শুকচাঁদ, হরিবালা, মধুসা, বসন্ত বিশ্বাস প্রভৃতি প্রজাদের মধ্যে টাকা-পয়সা নিয়ে বিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছু নোট নিয়েছেন—কিন্তু পরে সমস্ত লেখাটিই এমনভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে যে, ইতস্তত দু'চারটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই পড়া যায় না। খাতাটি উল্‌টে নিয়ে আবার একটি পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : 'Memo/শ্রাবণ মাসের আরম্ভ হইতে ডাক্তার মৈত্রকে বার্ষিক ৭৫ টাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। ৪ মাস অন্তর পঁচিশ করিয়া দেওয়া যাইবে॥' এই পৃষ্ঠাতেই 'Saturday August 4th/1889/ বাবু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রভৃতি শব্দ গোটা গোটা করে লেখা—কিন্তু একথাও পাঠককে জানানো দরকার যে, 4 Aug 1889 শনিবার ছিল না, ছিল রবিবার।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে খাতাটি তার স্থূল ব্যবহারিক উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, হয়ে উঠেছে যথার্থই একটি 'পকেট বুক'। দীর্ঘকাল এটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছে, উড়িষ্যা ভ্রমণের সময়ে [Feb 1893] এতে বিভিন্ন হিসাব ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা হয়েছে, কলকাতায় থাকার সময়ে গায়কদের মুখ থেকে শুনে হিন্দি গান লিখে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি ভেঙে রচিত হয়েছে অনেকগুলি স্মরণীয় ব্রহ্মসংগীত। তাছাড়া এতে আছে 'সোনার তরী', 'শৈশবসন্ধ্যা', 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'যেতে নাহি দিব', 'পুরস্কার' প্রভৃতি সোনার তরী-র অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতার প্রাথমিক খসড়া ও বিভিন্ন সময়ে লেখা অজস্র গান। কিন্তু তাতেও খাতাটির সমস্ত পৃষ্ঠা ভরে যায়নি। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'স্মরণ'-এর ১৯টি কবিতা, হাজারিবাগ-আলমোড়ায় লেখা 'উৎসর্গ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি কবিতা এই খাতাতেই লেখা হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপির সর্বশেষ রচনাটি হ'ল শুক্রবার ২৩শে আষাঢ় ১৩১১ [7 Jul 1904] মজঃফরপুরে রচিত একটি গান : 'তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি' [দ্র গীতবিতান ১১২৫-২৬]। এই খাতায় পাওয়া প্রথম তারিখটি ও বারে মিল নেই, আমরা আগেই দেখেছি—শেষ তারিখ ও বারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, ২৩ আষাঢ় ১৩১১ বৃহস্পতিবার ছিল! কিন্তু তারিখে-বারে যতই গোলমাল থাকুক, রচনামূল্যে ও ঐতিহাসিকতায় এই পাণ্ডুলিপিটির সঙ্গে তুলনা চলে কেবলমাত্র মালতীপুঁথি-র। রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের বারবার মজুমদার-পুঁথির কথা উল্লেখ করতে হবে।

---

১ চিঠিপত্র ৮। ৫১, পত্র ৬৬

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১১-১২, পত্র ৪

১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭২। ৩২

২ 'রমা বাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে/পত্র' : ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬। ১৬৪-৬৮; দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২। ৪৫০-৫৫

৩ *The Indian Messenger* পত্রিকায় [Vol-VI, No. 40, June 9, p. 313) 'Ramabai in the midst of her enemies শীর্ষক সংবাদে লেখা হয় : '…the Poona patriots, it seems have no sympathy with social reform. There is a party, who are bitterly opposed to all

ideas of Social advancement. It appears, from reports in Bombay papers, that some of these men, by their hisses and obscene remarks compelled Pandita Ramabai, who intended to deliver series of lectures on the condition of child-widows in India, to change the usual place of meeting.'

১ …হাজার হোক এটা মানতেই হবে, পুরুষের ও মেয়েদের 'বিল্ড' সব দিক থেকেই আলাদা। পুরুষের ব্রেন, তার শক্তি ঢের বেশি মজবুত। না কেন, আমি যদি আমার ন'দিদি হতুম তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম। সংসারের বাধাবিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হলেও মেয়েদের ব্রেন এতটা কাজ করতেই পারে না।'—রানী চন্দ : 'আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ [১৩৭৭]। ৪১, 17 Jan 1938-এর আলাপ।

২ দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ১১-১৫, পত্র ৪

১ হেমলতা দেবী, 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ', প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬। ৩০৪

১ দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনার এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের সম্ভবত ভালো লাগেনি, পরবর্তীকালে 'ড্রামাটিক' 'লিরিক প্রভৃতি শব্দগুলি তিনি একাধিকবার তির্যকভাবে ব্যবহার করেছেন :

কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।' —'বিসর্জন'-এর উৎসর্গ-কবিতা।

১ রবীন্দ্রনাথের দু'টি প্রস্তাবের অন্তর্বর্তী রচনার সংখ্যা মাত্র ছ'টি; ৫৬-সংখ্যক প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'সৌন্দর্য্য' প্রবন্ধের উপরে দ্বিজেন্দ্রনাথের সমকালীন মন্তব্য, ৫৭ সংখ্যক অজ্ঞাত রচনাটি [স্খলিত 59-68 পৃষ্ঠায় লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাটি সম্বন্ধে আমাদের অনুমান, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সাজাদপুর কাছারী থেকে 'ভাই-বোন্-সমিতি' প্রসঙ্গে লেখা তাঁর পত্রটি এখানে কপি করে রাখা হয়েছিল—পত্রটি শ্রাবণ ১৩২০ সংখ্যা ভারতী-র ৪৪৯-৫৫ পৃষ্ঠায় 'ভুক্তভোগীর পত্র' নামে মুদ্রিত হয়—৬১ সংখ্যক প্রস্তাবে বলেন্দ্রনাথ উক্তপত্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন] ও ৫৮ সংখ্যক 'সহানুভূতি ও সহমর্মিতা শীর্ষক '৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ শাজাদপুর-চিহ্নিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা সম্ভবত পরবর্তীকালে খাতায় অনুলিখিত হয়, কারণ এই সময়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পুত্রকন্যা নিয়ে সোলাপুরে গিয়েছিলেন। তাঁরা কলকাতায় ফিরে এলে হিতেন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত [4. 8. 89] ও বলেন্দ্রনাথ ৫৯, ৬০ ও ৬১ প্রস্তাব তিনটি পারিবারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করেন—এর পর ৬২ সংখ্যক রচনাটি রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'শরৎকাল'। পূজাবকাশে সত্যেন্দ্রনাথ সোলাপুর থেকে ফিরে এলে বির্জিতলার বাড়ির পরিবেশটি জমজমাট হয়ে ওঠে। 27 sep [শুক্র ১২ আশ্বিন] তিনি সিটি কলেজ হলে 'Raja Ram Mohan Ray'-শীর্ষক একটি ইংরেজিতে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই সময়ে পারিবারিক খাতায় রচনা-বাহুল্যের অন্যতম কারণ সত্যেন্দ্রনাথের উপস্থিতি।

১ দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ২৪-২৬

১ দেশ, শারদীয়া ১৩৫২। ১২

২ ঐ। ১৩

৩ দ্র 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা', পঞ্চভূত ২। ৬২২

৪ দেশ, শারদীয়া ১৩৫২। ১৩

৫ ঘরোয়া। ১১০-১১

৬ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩২-৩৩

১ দ্র ঐ। ২৯

২ এই বৎসরের আশ্বিন-সংক্রান্তির তারিখ বিষয়ে গোলমাল আছে; Ebhimeris ও শতাব্দী-পঞ্জীতে ৩০ আশ্বিন মঙ্গল 15 Oct আশ্বিন-সংক্রান্তি, কিন্তু ক্যাশবহির হিসাবে ৩১ আশ্বিন সংক্রান্তি এবং ১ কার্ত্তিক বৃহ 17 Oct পাওয়া যায়—কিন্তু উভয় বই ১ অগ্র° শুক্র 15 Nov

১ দেশ, শারদীয়া ১৩৫২। ১৬.

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৭, পত্র ৩

২ ড পশুপতি শাশমল, 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক বলেন্দ্রনাথ' : বি. ভা, প., কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৭ [২৭। ২]। ১৫৭-৫৮

৩ রবিজীবনী ১ [১৩৬৭]। ৩১৭

১ হরিনাথ মজুমদার ['কাঙাল হরিনাথ', 1833-96]; কাঙাল ফিকিরচাঁদের দলগড়ে ওঠার কৌতুকজীবন ইতিহাস লিখেছেন জলধর সেন দ্র সা-সা-চ ৩। ৩৫ ৩০-৩৬

২ বি, ভা, প, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৭। ১৫৪

৩ চিঠিপত্র ১। ৯, পত্র ১

১ এই পশমের ছবি'টি কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর তৈরী; তিনি লিখেছেন, '…গড়ার [মোটা কাপড়] উপর সেক্সপীয়রের একখানি ও রবির একখানি ছবি বুনিয়া যথাক্রমে তাঁহাকে [জ্ঞানদানন্দিনী দেবী] ও রবির স্ত্রীকে উপহার দি। পশমে তোলার হিসাবে উক্ত চিত্রিত ব্যক্তিদের সৌসাদৃশ্য নাকি একটু বিশিষ্টভাবেই ধরা দিয়াছিল—'মিলন-কথা', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। ২৫২; এরা সকলেই 'সখি-সমিতি'র সদস্য ছিলেন।

২ চিঠিপত্র ১।১০, পত্র ১

৩ '[১৮০৯ শকে বা১২৯৪ বঙ্গাব্দে] সাজাহাদপুর উচ্চ শ্রেণী স্কুলের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়দের যত্নে তথায় একটি "সুনীতিমঞ্চারিণী" সভা স্থাপিত হইল।' —ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল-সম্পাদিত 'কুমার, পরিব্রাজক' [১৩৪৬]। ৩৮২; কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামীর অনুগামীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ সভা আরও বহুস্থানে স্থাপিত হয়েছিল।

৪ দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ১৬, পত্র ৫

৫ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'শাহজাদপুর রবীন্দ্রনাথ' [১৩৮৭]। ১৪

৬ ছিন্নপত্রাবলী। ২০, পত্র ৬

১ ঘরোয়া। ২২

১ দ্র রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা ১ [১৩৭২]। ১৭২-৭৪

১ রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ৩১

২ দ্র *The Bengalee*, Mar 22, 1890 [Vol. XXXI, No. 12], p. 139

১ চিঠিপত্র ৫। ১৪৭; চিঠিপত্র ৫-এ পত্রটি তারিখবিহীন, কিন্তু সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২৪। ২৩৯-৪৭-এ মুদ্রিত পত্রে তারিখ আছে ২৪ মে ১৮৯০ [১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭]-রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে।

১ জীবনের ঝরাপাতা। ৬৬

১ দ্র *The Indian Messenger*, 12 Jan 1890 [Vol. VII, No. 20]

১ *A Nation in Making* [1963], p. 102

২ দ্র সনকুমার মিত্র, 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য' [১৩৮৬]। ৬৭-তে উদ্ধৃত 31 Oct 1890 [শুক্র ১৫ কার্ত্তিক ১২৯৭]-এর 'হিতকরী' পত্রিকায় মুদ্রিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

৩ দ্র সা-সা-চ ৩। ৩৫। ৩১

৪ দ্র লালন ফকির : কবি ও কাব্য। ৫৮

৫ লাল ফকির : কবি ও কাব্য। ৬২

১ 22.9.85-এ আলোচনা-সূত্রে কথিত।

২ লালন ফকির : কবি ও কাব্য। ৬৩

৩ লালন ফকির : কবি ও কাব্য। ১২-তে উদ্ধৃত।

৪ দ্র শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ [১৩৮০]। ১৬৫-৭১

৫ ঐ। ১৭১

১ মনোমোহন বসু, 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্র বাবুর অভিভাষণ', বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১৬। ৪৩০

২ আমিতাভ চৌধুরি, 'রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক' এবং [১৩৭৮]। ১

৩ কানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' [১৩৬৮]। ২৫৮

৪ রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক এবং। ১-২

ত্রিংশ অধ্যায়

১২৯৭ [1890-91] ১৮১২ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ত্রিংশ বৎসর

বর্তমান বৎসরের নববর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'নব আনন্দে জাগো আজি' ও 'ওই পোহাইল তিমির রাতি' গান দু'টি রচনা করেছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু নববর্ষের দিন [রবি 13 Apr] তিনি কোথায় ছিলেন—জোড়াসাঁকোয় না শান্তিনিকেতনে—নিশ্চিত করে বলা শক্ত। অবশ্য ৪ বৈশাখ [বুধ 16 Apr] তাঁর পার্ক স্ট্রীটে মহর্ষির কাছে যাওয়ার হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়—সুতরাং তিনি শান্তিনিকেতনে নববর্ষ-উৎসবে যোগ দিয়ে থাকলেও এইদিনের মধ্যে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি যথারীতি সদা-ভ্রাম্যমাণ—৫, ১০, ১৬, ২০ ও ২৭ বৈশাখে তিনি 'পার্ক ষ্ট্রীট' যাতায়াত করেছেন, এর মধ্যে ২০ ও ২৭ বৈশাখ 'পার্ক ষ্ট্রীট হইতে আশুতোষবাবুর বাড়ী যাওয়া আসা'ও আছে। ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে 'মক্কেলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণবিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত' করেনি, তিনি স্কট লেনের ছোটো ভাড়া বাড়িতেই থাকতেন—তাঁকে সাহায্য করার জন্য প্রতিভা দেবীর নামে ১০০ টাকা মাসোহারা তখনও অব্যাহত ছিল।

এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ১৪ বৈশাখ [শনি 26 Apr] বিডন স্ট্রীটে অবস্থিত এমারেল্ড্ থিয়েটারে 'মন্ত্রি অভিষেক'-শীর্ষক ভাষণটি পাঠ করলেন। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ [বৃহ 15 May] : 'মন্ত্রি অভিষেক /(এমারেল্ড্ নাট্যশালায় লর্ড্ ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি/ প্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাট সভা আহূত হয় এই প্রবন্ধ/ সেই সভাস্থলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত হয়।)/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা/ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।/ ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সাল।' [দ্র অ-২। ১৬৩-৭৮] পুস্তিকাটি ভারতী ও বালক-এর বৈশাখ [পৃ ১-১৫] সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয় [পত্রিকাটি 'প্রেসম্যান ও কম্পোজিটরদিগের পীড়াবশতঃ' প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে]।

সিপাহি বিদ্রোহের পরে লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালে 1861-এ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা [Indian Legislative Council] গঠিত হয়। আইন প্রণয়নের জন্য গবর্নর জেনারেল এই সভায় অন্যূন ছয় ও অনধিক বারো জন অতিরিক্ত সদস্য মনোনয়ন করতে পারতেন, যার অন্তত অর্ধেক সংখ্যক হতেন বে-সরকারী সদস্য। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক আইন সভা [Provincial Legislative Council]গুলিও সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য দ্বারা গঠিত হয়। কিন্তু সমস্ত সদস্যই ছিলেন মনোনীত, নিবার্চনের দ্বারা প্রতিনিধি নিয়োগের গণতান্ত্রিক অধিকার ভারতীয়দের দেওয়া হয়নি। 1876-এ মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে করদাতাদের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। 1878-এ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠার পর ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বে-সরকারী সদস্যদের ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রথা প্রয়োগের দাবি উঠতে থাকে এবং 1885-এ কংগ্রেসের প্রথম

অধিবেশনেই সদস্যসংখ্যাবৃদ্ধি ও নির্বাচিত প্রতিনিধির দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের পরবর্তী প্রত্যেকটি অধিবেশনে আরও সুনির্দিষ্ট আকারে দাবিটি তোলা হতে থাকে। 1889-এ কমন্স সভার বিরোধী সদস্য ভারতপ্রেমিক মিঃ চার্লস্ ব্যাডল [Charles Bradlaugh] বোম্বাইতে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে যোগ দেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার বিষয়ে একটি বিল বিলেতের হাউস অব কমন্সে উত্থাপন করার জন্য—কয়েকটি নির্দেশক নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী লর্ড সল্সবেরি [Lord Salisbury]র অধীনে ভারতসচিব ছিলেন লর্ড ক্রস [sir Richard Assheton Cross, 1823.1914]। ভারতে নির্বাচিত মন্ত্রিপরিষদের দাবিকে বাধা দেবার জন্য তড়িঘড়ি তিনি হাউস অব লর্ডসে Indian Councils Bill আনয়ন করেন। সদস্যসংখ্যাবৃদ্ধি, বাজেট-পর্যালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের অধিকার সম্পর্কীয় ভারতীয় দাবি মেনে নেওয়া হলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের দাবি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। বিলের আলোচনা-কালে লর্ড সল্সবেরি বলেন, নির্বাচনপ্রথা প্রাচ্য-ঐতিহ্যের অনুকূল নয়। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি তাঁর যুক্তির প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে।

অপরপক্ষে দেশীয় পত্রিকাগুলি লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে জনমত সংগঠিত করতে শুরু করে। *The Bengalee* পত্রিকার 1 Mar 1890 [pp. 99-100] সংখ্যায় 'Lord Cross's Bill on the Reform of the Councils'-শীর্ষক এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিলটির তীব্র সমালোচনা করা হয়। অবশেষে ১৪ বৈশাখ [শনি 26 Apr] দক্ষিণ শহরতলির চেতলা হাটে এবং বিডন স্ট্রীটের দু'টি রঙ্গমঞ্চে তিনটি প্রতিবাদসভা আহূত হয়। *The Bengalee*-র 3 May [Vol. xxxI, No. 18, P. 212] সংখ্যায় লিখিত হয় : '··· The two Theatres at which the Calcutta people had assembled, were filled up to suffocation; ···Babu Dwijendra Nath Tagore presided over the gathering at the Emerald Theatre; while at the other theatre, the chair was taken by Babu Narendra Nath Sen; and at both the places, the proceedingsthroughout were carried on in a very orderly manner and amidst great enthusiasm. Speeches, both in Bengali and English, were made, which were couched in terms remarkably moderate and breathing confidence in the sense of justice alikeof the Government and the great people of England. ···We noticed among other speakers, our distinguished friend and orator Babu Kali Charan Banerjee, the youthful poet Babu Robindra Nath Tagore, ···Kali Nath Mitter, ··· Surendranath Pal Choudhury and Jotendranath Rai Choudhury, ···Sarada Charan Mitter, Mohini Mohun Chatterje, ···Kali Prasanna Vidyaratna [? Kavyabag sh].'

রবীন্দ্রনাথ যে-প্রস্তাবটির সমর্থনে বক্তৃতা করেন, সেটি হ'ল 'That this meeting views with appreherision and alarm the introduction of Lord Cross's India Councils' Bill into the British Parliament and desires to record its firm conviction that if this measure be passed into law in its present shape, it will create deep and widespread discontent and injure the vital interests of the Indian Nation.'[১]

সাময়িক হুজুগ বা কলকাতার কংগ্রেস নেতাদের উপরোধে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, প্রবন্ধটি . অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তিনি ভাষণটি আরম্ভই করেছেন এইভাবে : 'আমি যে বিষয় উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা আপনা হইতেই অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ...আমরা সকলেই একমত। আমার কর্ত্তব্য কেবল উপস্থিত সকলের হইয়া সেই মত ব্যক্ত করা; নতুবা জটিল রাজনৈতিক অরণ্যের মধ্যে সরল পথ কাটিয়া বাহির করা আমার মত নিতান্ত অব্যবসায়ী লোকের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত।'

রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি সম্পর্কে নেপাল মজুমদার লিখেছেন : 'ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন-সংস্কারগুলির উপর সেদিন রবীন্দ্রনাথের কিছুটা যেন মোহ দেখা যায়। এই ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হীন ও জঘন্য অভিসন্ধি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মানস-পট হইতে অপসারিত হইয়াছিল। মহত্তর বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ-চরিত্রই তাঁহার মানসপটে ভাসিতেছিল। ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসন-সংস্কারগুলির পিছনে তিনি সেই বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজকেই দেখিতেছিলেন।'[২] সমকালীন সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমালোচনা করে লেখেন : 'ভারতের উন্নতি ভারত শাসনের উদ্দেশ্য হইলেও তাহা "মুখ্য উদ্দেশ্য" নহে;—গৌণ উদ্দেশ্য। পরন্তু ইংরাজ গবর্ণমেন্ট-অনুষ্ঠিত ভারত-উপকার "নিঃস্বার্থ" বা "নিষ্কাম" নহে,—তাহা স্বার্থমূলক ও সকাম।'[৩]

রবীন্দ্রনাথ যে এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন, তা নয়। 'ভারতের উন্নতিই ভারতশাসনের মুখ্য লক্ষ্য' বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন, 'অবশ্য, ইংরাজের ইহাতে আনুষঙ্গিক লাভ নাই এমন কথাও বলা যায় না।' এর পরেই দুর্বল ভারতবাসীর প্রতি সবল ইংরেজের অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলে তির্যকভাবে মন্তব্য করেছেন : 'ইংরাজের সাংঘাতিক সংঘর্ষে মাঝে মাঝে আমাদের দুর্বল প্লীহা এবং অনাথ মানসম্ভ্রম শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ কথাটা গোপন করিয়া রাখা সহজ হইতে পারে কিন্তু বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় ইংরাজের এই স্বাভাবিক রূঢ়তা আমরা যদি চর্ম্মের উপরে ও মর্ম্মের মধ্যে একান্ত প্রাণান্তিকরূপে অনুভব না করিতাম তবে ইংরাজ গবর্মেন্টের উদারতা ও উপকারিতা-সম্বন্ধে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কত সহজ হইত!' লর্ড ক্রসের বিলের সমর্থক ইংরেজ সম্পাদকদের যুক্তি সম্পর্কে একই ধরনের তির্যকতার সঙ্গে তিনি বলেন : 'আমার বিশ্বাস আছে হাস্যরসকুতূহলী ইংরাজ জাতি হাস্যাস্পদ হইতে একান্ত ডরাইয়া থাকেন। কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে তাহার আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে।'

একথা ঠিকই যে, একশ্রেণীর 'মহত্তর বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ চরিত্রে'র প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তরুণ বয়সে বিলাতপ্রবাসকালে ডাঃ ও মিসেস স্কট, অধ্যাপক হেনরি মরলি-র মতো কিছু মহৎ-হৃদয় ইংরেজের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন—ভারতেও পারিবারিক যোগাযোগের মাধ্যমে অভিজাত-স্বভাব কিছু ইংরেজের সান্নিধ্য তিনি লাভ করেন। ভগ্নীপতি জানকীনাথের সূত্রে প্রথম পর্বের কংগ্রেস-আন্দোলনের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক ছিল। এলাহাবাদ-কংগ্রেসের পর মিঃ ইউল ও মিঃ নর্টনের সম্মানে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়, সে-সম্পর্কে তাঁর ব্যস্ততার কথা রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে চিঠিতে জানিয়েছেন। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি মিঃ হিউম তাঁর রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করেছেন[১]

দেখে মনে হয়, উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল। এইসব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মনে 'দুই ইংরেজ'[২] ধারণার জন্ম দিয়েছিল : 'এক ইংরাজ আমাদের প্রতি কটমট করিয়া তাকায়। আর-এক ইংরাজ উপর হইতে আপন মহত্ত্বের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করে।' বক্তব্যটি আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন : 'এদিকে ইংরাজি সাহিত্যে আমরা ইংরাজি [? ইংরাজ] চরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, অথচ সাক্ষাৎসম্পর্কে ইংরাজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই না—এইরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতার উপর আমাদের অবিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল। ...এমন সময়ে হিউম, ইউল, বেডরবর্ণ কন্‌গ্রেসকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ...আমরা ইতিহাসে ও সাহিত্যে ইংরাজের যে মহৎ আদর্শ লাভ করিয়াছি সেই আদর্শ মূর্ত্তিমান ও জীবন্ত হইয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।'

জীবনের শেষ পর্বে তিনি ভাষণটি সম্পর্কে একটি পত্রে লিখেছিলেন : "যখন 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধটি লিখেছিলুম তার পরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে, তাই এ লেখাটি এখনকার মনের মাপে মিলবে না। দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বলচি দাঁড়ও নয় শিকলও নয় পাখা মেলব অবাধ স্বারাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চিদুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়।"[৩]—গরম ভাষাটি অবশ্য খুবই মোলায়েমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই সব সাময়িক উত্তেজনায় দোলায়িত হওয়ার কথা জানা গেলেও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের এই সময়ের চিত্রটি অস্পষ্ট। সত্যপ্রসাদের ক্যাশবহিতে দেখা যায়, তিনি ৬ বৈশাখ ১০০০ টাকা 'রবিমামাকে হাওলাত' দিয়েছেন, আবার ৩১ বৈশাখ ১০০ টাকা 'রবিমামাকে হাওলাত দিই'—এর মধ্যে প্রথমটি শোধ হয়েছে ১ কার্ত্তিক ১২০ টাকা সুদ-সহ [!], রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাজে। সরকারী তহবিল থেকে প্রাপ্য মাসোহারা পাওয়ার ব্যাপারে অনিয়ম তখনও দূর হয়নি—তবু এত উচ্চহারে সুদ দিয়ে টাকা ধার করার প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছিল বলা শক্ত। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'বিসর্জন নাটক প্রেসে, তাহার খবরদারি করিতে হইতেছে; 'মানসী' নামে কাব্যখণ্ডও প্রস্তুত—সে কাব্যও প্রেসে গিয়াছে মনে হয়; কারণ গ্রন্থের জন্য 'উপহার' কবিতাটি লিখিলেন ৩০ বৈশাখ'[১]—এই-সব উদ্দেশ্যেও টাকার দরকার হতে পারে।

২৪ বৈশাখের [মঙ্গল 6 May] হিসাব : 'বিপীন ডাক্তারের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বালীর বাগানে খাওয়ান প্রভৃতি হওয়ায় শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের নিমন্ত্রণ থাকায় উঁহার হাওড়া যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া'—এই 'বিপীন ডাক্তার' হচ্ছেন ডাঃ বিপিনচন্দ্র কোঙার, যিনি প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ভগবানচন্দ্র রুদ্রের অকালমৃত্যুর [মৃত্যু : ১৪ শ্রাবণ ১২৯৫] পরে ঠাকুরবাড়ির বেতনভোগী গৃহচিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন।

২৫ বৈশাখ [বুধ 7 May] রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন। পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে তাঁর জন্মদিন পালিত হয়েছিল; সেই সংবাদটি পাওয়া যায় সত্যপ্রসাদের ব্যক্তিগত ক্যাশবহিতে : 'রবিমামার জন্মদিনোপলক্ষে খরচ—৩০' টাকা।

১৭ বৈশাখের একটি হিসাব আমাদের একটু কৌতূহলাক্রান্ত করে : 'শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের চিঠির নকল রাখিবার জন্য একখানা বহী ক্রয় গুঃ খোদ ১ ০'—দাম দেখে মনে হয় খাতাটি বেশ পুরু ধরনের ছিল। বৈষয়িক চিঠিপত্রের নকল রাখার জন্যে কেউ কেউ এইরকম খাতা ব্যবহার করেন [আমরা রবীন্দ্রভবনে ক্ষিতীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত এইরূপ একটি খাতা দেখেছি, শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের চিঠির নকল রাখার জন্যে ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল]—কিন্তু বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এমন-কিছু বৈষয়িক গুরুত্ব অর্জন করেনি যে তাদের নকল রাখার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেইজন্য আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই খাতা ছিন্নপত্রাবলী-র পাণ্ডুলিপির খাতাটি নয় তো?

৩০ বৈশাখ [সোম 12 May] রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় লিখলেন মানসী-র 'উপহার' কবিতাটি। রবীন্দ্রজীবনী-কার সংশয়-চিহ্ন-সহযোগে এই 'উপহার' কবিতার উদ্দিষ্টা হিসেবে মৃণালিনী দেবীর নাম উল্লেখ করেছেন।[২] আমাদের ধারণা, কাব্যগ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। স্মৃতি ও বাস্তবের যে দ্বন্দ্ব মানসী-র প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে দেখা গেছে, বর্তমান পর্যায়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত গৃহ-জীবনের আস্বাদে সেই দ্বন্দ্ব অনেকটাই অবসিত—সাজাদপুর থেকে স্ত্রীকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রটিতে এই গৃহী মানুষটিকে চিনে নেওয়া যায়। কবিতাটিতে মানসী-কাব্যের মর্মকথাটি প্রকাশ পেলেও 'উপহার' দান করেছেন এই গৃহস্থ মানুষটি। এই সময়ে মৃণালিনী দেবী আবার সন্তান-সম্ভবা, এ-কথাটিও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে।

২ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 15 May] 'মন্ত্রি অভিষেক' পুস্তিকা ও 'বিসর্জন' নাটক প্রকাশিত হয়।

বিসর্জন-এর আখ্যাপত্রটি খুবই সংক্ষিপ্ত :

বিসর্জন।/ (রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে/ নাট্যাকারে রচিত।)/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ [আখ্যাপত্র]+৬ [উৎসর্গ কবিতা]+২ [নাটকের পাত্রগণ]+১৫৪। মুদ্রণসংখ্যা : ৫০০।[৩]

'বিসর্জন' নাটকের সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কোনো সমকালীন সমালোচনা আমরা দেখিনি। বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদনে নাটকটি সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, সেটি আমরা উদ্ধৃত করছি : '*Bisarjan*, by Babu Rabindra Nath Tagore, is written with consummate art in this work the Babu dramatized the first few, that is, the best chapters of his well-known novel, the Rajarshi; but the plot of the drama is a great improvement upon tha of the novel. ··· The book is designed to prove the truth of Brahmoism as opposed to idolatory, and the writer has attempted to show this with great cleverness.' উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি যথেষ্ট কৌতুকাবহ, এটিকে কি তৎকালীন নব্যহিন্দুদের সমালোচনা হিশেবে গণ্য করা যাবে?

এর কয়েক দিন পরেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে দেখতে পাই। ২ জ্যৈষ্ঠ তিনি পার্কস্ট্রীটে গিয়েছিলেন ও 'ভালো করে বলে যাও' কবিতাটি রচনার স্থান-কাল '৭ই জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯০/ শান্তিনিকেতন। বোলপুর।' সুতরাং এরই মধ্যবর্তী কোনো দিনে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। এখানে তিনি দশ-বারো দিনের বেশি ছিলেন না—কিন্তু তারই মধ্যে লেখেন তিনটি কবিতা ও প্রমথ চৌধুরীকে দু'টি দীর্ঘ পত্র [আরও পত্র লিখে থাকতে পারেন, কিন্তু সেগুলির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি]।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে এবারের প্রথম কবিতা ‘ভালো করে বলে যাও’ [দ্র মানসী ২। ২৫৬-৫৭] ৭ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 20 May] মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় লেখা। এইদিনই লিখতে শুরু করেন ‘মেঘদূত’ [‘কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে’] কবিতা [দ্র মানসী ২। ২৫৮-৬২], পরদিন ৮ জ্যৈষ্ঠ এটি শেষ করে স্থান-কালের বর্ণনায় লেখেন, ‘৭ই/ ৮ই জ্যৈষ্ঠ। বোলপুর।/ অপরাহ্ণে, ঘনবর্ষায়।/ ১৮৯০’। কয়েকদিন পরে [24 May শনি ১১ জ্যৈষ্ঠ] প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্রে [দ্র চিঠিপত্র ৫। ১৩৮-৪৭, পত্র ৪] কবিতা-রচনার পরিবেশটি লিপিবদ্ধ করেছেন : ‘এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এজায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টিরই উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখতে পাওয়া যায়, ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়—বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়।…এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টিদুর্য্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে—কেবল পড়া নয়—সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতাও লিখে ফেলেছি।’[১] এরপর মেঘদূত কাব্যের তিনি যে রসগ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন, তার সঙ্গে ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘মেঘদূত’ [দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫। ৫০৮-১০] প্রবন্ধই কেবল তুলনীয় হতে পারে।

অথচ ‘মেঘদূত’ কবিতাটি যেদিন লেখা শেষ হয়, সেইদিনে [21 May] লেখা পত্রটিতে বর্ষণমুখর শান্তিনিকেতনের চিত্রটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত : ‘চারদিকে মাঠ ধূধূ করচে—মাঝে মাঝে এক-একটা বাঁধ, এবং তার উঁচু পাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধ তালবন—মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে আকাশ একেবারে অনাবৃত ভূমিতলকে স্পর্শ করে রয়েছে—মাঠের পশ্চিম প্রান্তে ঘনবনের রেখা দেখা যায়। মধ্যেকার এই মরুক্ষেত্র অনশনশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ তৃণে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে একএকটা নিতান্ত খর্ব্বাকার খেজুরের ঝোপ—মাঝে মাঝে মাটি দগ্ধ হয়ে কালো হয়ে কঠিন পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বেরিয়ে রয়েছে। উত্তরদিকের মাঠ বর্ষার জলস্রোতে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে লিলিপট্‌দেশীয় ক্ষুদ্রকায় গিরিশ্রেণীর আকার ধারণ করেছে—সেই ছোট ছোট রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকার স্তূপ নানা রকম পাথরের টুক্‌রো ও কাঁকরে আবৃত—তাতে ছোট ছোট বুনো জাম বেঁটে খেজুর এবং অখ্যাতনামা দুই এক রকমের গুল্ম অত্যন্ত বিরলভাবে শোভা পাচ্চে—তারি মধ্যে মধ্যে ঝরণা এবং জলস্রোতের শুষ্ক রেখা দেখা যায়—শরৎকালে সেইগুলো পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ছোট ছোট মাছ তাতে খেলা করে। এই মরুভূমির মাঝখানে আমাদের বাগানটি গাছে ছায়ায় ফলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে, পাখীর গানে মুখরিত হয়ে, তরুপল্লবের অন্তরাল হতে দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসাদের দ্বারা মুকুটিত হয়ে নিভৃতমহিমায় বিরাজ করচে।’[২] শান্তিনিকেতনের ‘প্রাকৃতিক ভূগোলের’ তৎকালীন বিবরণ বলে বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য।

প্রমথ চৌধুরী বির্জিতলার সান্ধ্যআসরের একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন; তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনার কিছু-কিছু বিবরণ পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এর পাতায় ধরা আছে। এই আসর ভেঙে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : ‘তুমি চুয়োডাঙ্গায় যাবার পর থেকেই তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ভারি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।…তোমার চিঠি পেয়ে আবার কলে জল এল।…কিন্তু মুখোমুখি বসে আকার ইঙ্গিত এবং কণ্ঠস্বর যোগে অবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে যে একটি উত্তাপ আছে চিঠিতে সেটি পাওয়া যায় না, সেই উত্তাপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের মধ্যে অনেক ভাবের অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে; অবিশ্যি, সেগুলো সব যে টিকে যায় তা নয় —অধিকাংশ দ্রুত প্রকাশের স্বভাবই হচ্চে দ্রুত বিনাশ। কিন্তু এতে মানসিক জীবনের যে একটা চর্চ্চা হয়

সেটা ভারি আনন্দের এবং কাজেরও।' কথাগুলির মধ্যে পারিবারিক খাতার—ও কিছুটা পঞ্চভূত-এরও—তাৎপর্যটি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রমথনাথ তাঁর পত্রে 'ছবি ও গান'-এর কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দু'টি পত্রেই সে-বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং পরবর্তীকালের ও সমসাময়িক কবিতার সঙ্গে তাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে নিজের কবিপ্রকৃতির স্বরূপটি বোঝার প্রয়াস পেয়েছেন। পত্র দু'টি এই দিক দিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান।

এবারে শান্তিনিকেতন-প্রবাসের শেষ কবিতা 'অহল্যার প্রতি' ১১-১২ জ্যৈষ্ঠ [শনি-রবি 24-25 May] তারিখে লেখা [দ্র মানসী ২। ২৬৩-৬৫]। কবিতাটিতে গ্রীষ্মের দাবদাহে দগ্ধ পৃথিবীর বর্ষণধৌত শ্যামলরূপটি হয়তো অহল্যার শাপমুক্তির পৌরাণিক কাহিনীর রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশলাভ করেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধের যে অনুভূতি কবিতাটির প্রাণ—তার পূর্ণতর বিকাশ লক্ষ্য করা যায় 'সোনার তরী'-র 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায়। কিন্তু ঐতিহ্যাগত কাহিনী আধুনিক কবিদৃষ্টির আলোকে কিভাবে বিশেষ তত্ত্ব ও সৌন্দর্যকল্পনায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে, তার দৃষ্টান্ত হিশেবে 'অহল্যার প্রতি' অসামান্যতা অর্জন করেছে। পূর্ববর্তী 'মেঘদূত' কবিতাটি সম্পর্কে এই কথা বলা যায়। তাছাড়া মানষী-র এই দুই শ্রেষ্ঠ কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ সমিল প্রবহমান পয়ারের যে আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন, বহুদিন পর্যন্ত তা তাঁর কবিতার অন্যতম বাহন হয়ে থেকেছে—প্রসঙ্গক্রমে এই তথ্যটিও আমরা উল্লেখ করতে পারি।

7 Jun [শনি ২৫ জ্যৈষ্ঠ] এমারেল্ড্ থিয়েটারে 'রাজা ও রানী'র বাণিজ্যিক অভিনয় শুরু হয়।[১] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 24 May-র চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন, 'শুনচি "রাজা ও রানী" আগামী শনিবারে [31 May ১৮ জ্যৈষ্ঠ] অভিনয় হবে—যদি সুবিধে হয় ত একবার দেখতে যাব।'[২] হয়তো বাণিজ্যিক অভিনয় আরম্ভ হওয়ার আগে কোনো বিশেষ অভিনয় হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ও আত্মীয়-বন্ধুরা সেইটি দেখতে গিয়েছিলেন। ড সুকুমার সেন লিখেছেন : 'এই অভিনয়ের বিবরণ স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট পাইয়াছিলাম। তিনি প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স বারো। কিন্তু এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও তাঁহার মনে সেদিনের স্মৃতি ম্লান হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ সেই অভিনয়ে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। রাজা সাজিয়াছিল মতিলাল সুর। রেবতীর ভূমিকায় ক্ষেত্রমণি চমৎকার অভিনয় করিয়াছিল। সুমিত্রা সাজিয়াছিল "গুলফম" [? গুলফন] হরি। ইলার পার্ট লইয়াছিল "হাড়কাটা" কুসুম। কুমারের ভূমিকায় নামিয়াছিল মহেন্দ্রলাল বসু। "পণ্ডিত" হরিভূষণ ভট্টাচার্য[৩] চন্দ্রসেন সাজিয়াছিল।'[৪] অবনীন্দ্রনাথ এই অভিনয়-দর্শনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন : 'এমারেল্ড থিয়েটার রাজা ও রানী নিয়েছিল। পাবলিক অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস অভিনয় করে। গিরিশ ঘোষ ছিলেন তখন তাতে, সে আবার এক মজার ঘটনা। এখন, আমাদের যখন রাজা ও রানী অভিনয় হয় সে সময়ে একদিন কী করে পাবলিক অ্যাক্ট্রেসরা ভদ্রলোক সেজে অভিনয় দেখতে ঢুকে পড়ে।...তারা তো সব দেখেশুনে গেল। এখন পাবলিক স্টেজে রাজা ও রানী অভিনয় করবে, আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। আমরা তো গেছি, রানী সুমিত্রা স্টেজে এল, একেবারে মেজোজ্যাঠাইমা। গলার সুর, অভিনয়, সাজসজ্জা, ধরনধারণ, হুবহু মেজোজ্যাঠাইমাকে নকল করেছে। মেয়েদের আরো অনেকের নকল

করেছিল, রবিকাকাদের নকল করতে পারবে কী করে। ছেলেদের পার্ট ততটা নিতে পারে নি। কিন্তু মেজো জ্যাঠাইমার সুমিত্রাকে যেন সশরীরে এনে বসিয়ে দিলে।'[৫]

আষাঢ় মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় [পৃ ১১৯-২০] যতীশচন্দ্র সমাজপতির লেখা '"রাজা ও রাণীর' অভিনয়"—শীর্ষক একটি সমালোচনা মুদ্রিত হয়। তিনি লেখেন : '…মরকতের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকখানি নির্বাচিত করিয়া, যথার্থই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা যে ছাইভস্ম' পরিত্যাগ করিয়া, সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত ও উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই বড় আশাপ্রদ। বইখানির যে দুই একস্থল, পড়িবার সময় অস্ফুট ও অসংলগ্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল, উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়া, তাহা বিশেষ পরিস্ফুট ও নাট্যরসাত্মক বলিয়া বোধ হইল।

'বিক্রমদেবের অভিনয় আশানুরূপ হয় নাই। সুমিত্রার মধুর ও হৃদয়গ্রাহী অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের মুখে অমিত্রাক্ষর ছন্দের এমন সুন্দর আবৃত্তি আমরা প্রায় শুনিতে পাই না। দেবদত্তের অংশ, দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।…শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু কুমার সেনের অংশে অভিনয় করিয়াছিলেন, মহেন্দ্রবাবুর অভিনয় যথার্থই মুগ্ধকর ও অতি সুন্দর। কিন্তু, শঙ্করের অভিনয় আরও ভাল হওয়া আবশ্যক। গানগুলি সুন্দররূপে গীত হইয়াছিল। রাজার অংশ খুব ভাল হওয়া আবশ্যক। রাজার চরিত্র বড় বিচিত্র, সুতরাং তাহার অভিনয় করাও দুরূহ। অতএব এই অংশের অভিনয়ে বিশেষ মনোযোগ না দিলে, অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না।'[১]

সমালোচনাটি লেখক শেষ করেছেন একটি অনুরোধ জানিয়ে : 'আশা করি, মরকত রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষগণ, রবীন্দ্রবাবুর নবপ্রকাশিত "বিসর্জন" নাটকের অভিনয় করিয়া, আপনাদের গুণপনার পরিচয় দিবেন।'—এই অনুরোধ অবশ্য পালিত হয় নি।

১৮ জ্যৈষ্ঠ এমারেল্‌ডে রাজা ও রানী-র অভিনয় দেখার পরের দিন [১৯ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথের পার্ক স্ট্রীটে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। সম্ভবত এই দিন কিংবা তার পরদিন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ-সহ শিলাইদহ যাত্রা করেন। এবারও তাঁরা বোটে আশ্রয় নেন। 3 Jun [মঙ্গল ২১ জ্যৈষ্ঠ] প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন : 'আমি বোধ হচ্চে এখেনে কিছু কাল থেকে যাব। একটা কিছু লিখ্‌তে চেষ্টা করা যাবে। আপাততঃ কাজকর্ম্মের ভিড়ে তেমন অবসর পাচ্চিনে। মাঝে মাঝে একটু আধটু পড়তে চেষ্টা করি—…জর্ম্মান Faust অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করচি। …পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্ম্মান ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।—বোটটা যত গরম হবে মনে করেছিলুম তা হয় নি—দিনে প্রায় মেঘ করে থাকে এবং রাত্রে অতি চমৎকার জ্যোৎস্না হয়।…অরু চলে গেলে খুব একলা হবে—কিন্তু আমার সেটা নেহাৎ অসহ্য বোধ হয় না।'[২] জর্মান ভাষা-চর্চা সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে লিখেছেন : '…I also wanted to learn German and, by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had

almost mastered the language—which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure. Then I tried Goethe. But that was too ambitions With the help of the little German I had learnt, I did go through Faust. I believe I found my entrance to the palace, not like an inmate who has keys for all the doors, but a casual visitor who is tolerated in some general guest room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe,...'[৩] —হাইনের কবিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় সম্ভবত ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে, ২৫ বৈশাখ ১২৯৪ তারিখে সরলা দেবীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মোৎসবে তাঁর দাদা জ্যোৎস্নানাথ Edgar Alfred Bowring-অনূদিত *Poems of Heine* উপহার দিয়েছিলেন; এরপর রবীন্দ্রনাথ মূল জর্মান *Poetisch Werke von H. Heine* [1885] সংগ্রহ করেন। এই আগ্রহের পরিণাম হিশেবে 'হাইনের কবিতা।/ (জর্ম্মান্ হইতে অনুবাদিত)' শিরোনামে হাইনের ৯টি কবিতার পদ্যানুবাদ সাধনা পত্রিকার বৈশাখ ১২৯৯ [পৃ ৫৪৮-৫১] সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গ্যেটের মূল রচনা থেকে উদ্ধৃতি ও তার ইংরেজি অনুবাদ সোনার তরী-র পাণ্ডুলিপির সূচনায় আছে, সেইটিই আবার উদ্ধৃত করেছেন ইন্দিরা দেবীকে লেখা 5 Oct. 1895-এর পত্রে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৪৮৫, পত্র ২৩৬] : 'Entbehren sollst du, sollst entbehren./ Thou must do without, must do without.' গ্যেটের জীবন ও রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের নিদর্শনের অভাব নেই।'[১]

উপরে উল্লিখিত পত্রে 'একটা কিছু লিখতে চেষ্টা করা'র যে কথা লিখেছেন, সেটি হল চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের প্রথম দৃশ্য 'অনঙ্গ-আশ্রম'। কল্পনাটি কিছুদিন থেকেই তাঁর মনকে আশ্রয় করেছিল। রচনাবলী সংস্করণের 'সূচনা'য় তিনি লিখেছেন : 'অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফল সম্ভারে।···হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়।···

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।'[২]

বৎসরাধিক পরে [রচনা-সমাপ্তির তারিখ দেওয়া আছে 'কটক/ ২৮ ভাদ্র ১২৯৮'] নাট্যকাব্যটি লেখা শেষ হলেও এটির সূচনা শিলাইদহে বর্তমান সময়ে। কয়েকদিন পরে 21 Jun [শনি ৮ আষাঢ়] প্রমথ চৌধুরীকে

আর একটি পত্রে তিনি লিখেছেন : 'আমার মস্তিষ্ক যে অবস্থায় আছে সে আর কি বল্‌ব! ···এরই মাঝে মাঝে পাঁচ ছ মিনিট সময় চুরি করে একটা লেখা আরম্ভ করেছিলুম—সেটা ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে একটু স্থির হয়ে বোঝবারও সময় পাচ্চিনে—ক্ষণিক অবসরে একরকম শ্রান্ত মুহ্যমান মস্তিষ্কে বিছানায় পড়ে পড়ে নিতান্ত অলসভাবে লিখে যাই—লিখ্‌তে লিখ্‌তে মাঝে মাঝে নিদ্রাকর্ষণও হয়—···। যেটা লিখ্‌চি আগে থাক্‌তেই তার নাম দিয়ে রেখেচি অনঙ্গ আশ্রম।'[৩] 'অনঙ্গ-আশ্রম' অবশ্য কোনো নাম নয়, চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের স্থান-পরিচয়। হয়তো কেবল এই দৃশ্যটিই শিলাইদহে লেখা হয়েছিল; এরপর বিভিন্ন পারিবারিক দায়িত্ব পালন, বিলাতভ্রমণ, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি লেখা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে নাটকটি লেখার সুযোগ পাওয়া যায়নি—সেই বাঞ্ছিত অবকাশটি মিলেছে উড়িষ্যার জমিদারি পরিদর্শনে গিয়ে পাণ্ডুয়া কুঠির নিভৃত পরিবেশে।

উক্ত চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এখানে নিতান্ত সময়াভাব এবং অতি শীঘ্র দেখা হবে সেই জন্যে বেশি লিখ্‌লুম না।' এর দু'দিন পরেই ১০ আষাঢ় [সোম 23 Jun] রবীন্দ্রনাথকে পার্ক স্ট্রীটে যেতে দেখা যায়। এইরূপ আর একটি তারিখ ১৮ আষাঢ় [মঙ্গল 1 Jul]। আষাঢ় মাসের বাকি ক'দিন এবং শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। এর পর তাঁর পার্ক স্ট্রীট যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায় ৭, ৮, ১৩ ও ২১ শ্রাবণ তারিখে। এর মধ্যে ২১ শ্রাবণের [মঙ্গল 5 Aug] হিসাবটি বিস্তৃততর : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের হাইকোর্ট হইয়া পার্কস্ট্রীট যাওয়া ও তথা হইতে আসিবার গাড়িভাড়া'। আমরা আগেই বলেছি, মহর্ষি তাঁর পূর্বের উইল বাতিল করে এইসময়ে একটি নূতন উইল করতে মনস্থ করেছিলেন—সম্ভবত এই সংক্রান্ত কোনো কাজে তাঁকে হাইকোর্টে যেতে হয়েছিল।

২৩ শ্রাবণ [বৃহ 7 Aug] রবীন্দ্রনাথ বিলাতের পথে সোলাপুর যাত্রা করেন। এ-সম্পর্কে ক্যাশবহি-র ২৮ শ্রাবণের হিসাব : 'বঃ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ দঃ উক্ত বাবু মহাশয় গত ২৩ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার লণ্ডন বেড়াইতে গমন করায় দেওয়া যায়—বিঃ নিজ স্বতন্ত্র ক্যাসের কৈ° হা° শোধ/ ২৩ শ্রাবণের গুঃ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০০০'। এই টাকায় বিলাতভ্রমণের সম্পূর্ণ খরচ মেটানো সম্ভব হয় নি। ২৯ পৌষের হিসাব : 'বঃ টি পালিত দং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের বিলাত গমনের দেনা ৮০০ মধ্যে নিজ রোজ দেওয়া যায়···৫০'—তারকনাথ পালিত পুত্র সত্যেন্দ্রনাথকে [সতু] নিয়ে আগে থেকেই লণ্ডনে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে এই 'ঋণ' করতে হয়েছিল। বাড়ির লোকেদের জন্য উপহার কিনতে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছেও ধার নিতে হয়েছিল, সে-কথা রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়ায় লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এর আগে বিলাত গিয়েছিলেন ছাত্র হিশেবে 1878-এ প্রায় বারো বছর আগে। তার পর থেকে এই এক যুগের মধ্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে অনেক গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশেষত প্রাচ্যজাতীয় ও ভারতীয় হিশেবে নিজেদের প্রকৃত অবস্থানটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় ভারতের, বিশেষ করে বাংলার, বুদ্ধিজীবীরা তখন চিন্তাভাবনা করছেন এবং ধর্ম, সমাজ, পরিবার, নারীপুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের তুলনামূলক বিচার করে হিন্দু বাঙালির পক্ষে অনুসরণযোগ্য পথের দিক্‌-নির্দেশ নিয়ে বাংলা পত্রপত্রিকার আসর তখন যথেষ্ট সরগরম। রবীন্দ্রনাথও তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাস মতে বারবার এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন—কখনো উৎসাহে উদ্দীপ্ত, কখনো অবসাদে ক্লান্ত ও সেই কারণেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মুখর। এই বিতর্কে যাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই য়ুরোপীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় কেবল পুস্তক ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে; এখানে য়ুরোপীয় জীবনযাত্রা বলতে অবশ্য প্রধানত ইংরেজের

জীবনযাত্রাই বুঝতে হবে, কারণ য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডের পরিচয় তখনও বাঙালির কাছে অস্পষ্ট। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই জীবনকে জেনেছিলেন অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠভাবে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন-ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখন তিনি নিতান্তই তরুণ, কয়েকটি ক্ষেত্রে ইংরেজ পরিবারের খুব ভিতরে থেকে তাঁদের জীবনধারা পর্যালোচনার সুযোগ পেলেও, পরিণত বুদ্ধির বিশ্লেষণ সেই সময়ে তাঁর কাছে আশা করা যায় না। তাই তিনি আর একবার সেই জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন, এতগুলো বৎসরের বিতর্কের মূল উপজীব্যগুলিকে মাথায় রেখে একটি নির্ভরযোগ্য অবস্থান অনুসন্ধানের আশায়। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র ভূমিকা-য় এই উদ্দেশ্যটিকে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন : 'অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল য়ুরোপীয় সভ্যতার ঠিক মাঝখানটাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একবার তার আঘাত আবর্ত এবং উন্মাদনা, তার উত্তাল তরঙ্গের নৃত্য এবং কলগীতি, অট্টহাস্য করতালি এবং ফেনোচ্ছ্বাস, তার বিদ্যুৎবেগ, অনিদ্র উদ্যম এবং প্রবল প্রবাহ সমস্ত শিরা স্নায়ু ধমনীর মধ্যে অনুভব করে আসব। বহুকাল তীরে বসে বালির ঘর গড়ছি এবং ভাঙছি, এবং ভাবছি, ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধবেরা একে একে অনেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সমুদ্রমন্থন সমাপন করে এলেন; এমনি উৎসাহ যে শুষ্কতীরে ফিরে এসেও তাঁরা হস্তপদ আস্ফালন কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারছেন না। আমিও তাই দেখে কৌতূহলবশতঃ একদিন অপরাহ্নে ঐ তরঙ্গিত অগাধ রহস্যরাশির মধ্যে আনন্দে অবতরণ করেছিলুম'।[১]

বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত এই সময়ে ত্রিপুরার অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্যে 23 Jul [বুধ ৮ শ্রাবণ] ছয় মাসের ফার্লো ছুটি নেন। সম্ভবত তাঁরই উপরোধে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বিলাত যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথও হয়তো এই সময়ে বিলাত যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। সুতরাং দুই বন্ধু ২৩ শ্রাবণ [বৃহ 7 Aug] তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে সোলাপুর যাত্রা করেন।

সোলাপুরে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ তিনটি কবিতা লেখেন :

16 Aug [শনি ১ ভাদ্র] 'গোধূলি' ['অন্ধকার তরুশাখা দিয়ে'] দ্র মানসী ২। ২৬৬

20 Aug মঙ্গল[২] [বুধ ৫ ভাদ্র] 'উচ্ছৃঙ্খল' ['এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ'] দ্র মানসী ২। ২৬৭-৭০

20 Aug [বুধ ৫ ভাদ্র] 'আগন্তুক' ['ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই'] দ্র মানসী ২। ২৭০-৭১

তিনটি কবিতার মধ্য দিয়েই একটি বেদনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। এই বেদনা কতখানি ব্যক্তিগত, নিশ্চিত করে বলা শক্ত। কয়েক মাস পরে প্রমথ চৌধুরীকে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন : 'ভাল করে ভেবে দেখ্‌তে গেলে মানসীর ভালবাসার অংশটুকুই কাব্যকথা—বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যিকথাটুকু হচ্চে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিছু জানে না—…আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করচি। …মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই—কেউবা বল্‌চে, আছে—বলে বহির্জ্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে—কেউবা জানে, নেই—তাই আকাঙ্ক্ষারাজ্যে বসেই অর্দ্ধ-নিরাশ্বাসভাবে কল্পনাপুত্তলী গড়িয়ে তাকে পূজো করচে। একেই বল ভালবাসা? আমার ভালবাসবার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে —কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেচি সে মানসেই আছে—সে Artist-এর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?'[১] আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি ও অসম্পূর্ণতার বেদনা মানসী-র শেষ দিকে প্রায় সব ক'টি কবিতার মধ্যেই আছে। বিষয়টি ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়েছেন সুন্দরভাবে : 'যে কবি

অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে প্রেয়সীরূপে অন্তরের মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, অমূর্ত কল্পনাকে প্রণয়াবেশের আরতি-দীপে বরণ করিতে অভিলাষী, তাঁহাকে অনিবার্যভাবে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে সংশয়দোলায় দুলিতেই হইবে।...অনন্তের অন্তরলক্ষ্মী যে মানসসুন্দরী কবির কাব্যপ্রেরণা ও জীবনলীলার সহিত রহস্যময় অন্তরঙ্গতায় একাত্ম, তিনি যে কবির অনুভবকে বার বার বঞ্চনা করিবেন, মিলন-বিরহের মধ্যে মুহুর্মুহু আবর্তিত হইয়া তাঁহার চিত্তবিভ্রম জন্মাইবেন, তাহা মনস্তত্ত্বসম্মত জীবন-সত্য।'[২]

1878-এ রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তখন আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, প্রধানত সেগুলি থেকেই আমরা তাঁর যাত্রাপথ ও ইংলণ্ডের জীবনযাত্রার বিবরণ জানতে পারি। এবারের ভ্রমনে তিনি রীতিমতো ডায়ারি রেখেছেন এবং তারই ভিত্তিতে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' রচনা করেন। সুতরাং তাঁর এই স্বল্পকালীন বিলাত ভ্রমণের প্রায় প্রাত্যহিক বিবরণ আমাদের কাছে সুলভ। মূল ডায়ারি ও তার সুসংস্কৃত গ্রন্থ-রূপ দু'টিই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ 'রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা'র 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে মুদ্রিত করেছেন [আশ্বিন ১৩৬৭]। বর্তমান আলোচনায় এই সংস্করণটিই আমরা ব্যবহার করেছি। এক্ষেত্রে আমরা 'দিনলিপি' বলতে ডায়ারির খসড়াকে ও 'ডায়ারি' বলতে মুদ্রিত গ্রন্থকে বুঝিয়েছি।

22 Aug শুক্রবার [৭ ভাদ্র] অপরাহ্নে 'শ্যাম' নামক জাহাজ-যোগে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্রনাথ বোম্বাই বন্দর থেকে য়ুরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। 'তখন সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।' যদিও মাত্র তিন মাসের রিটার্ন্ টিকিট নিয়ে য়ুরোপে চলেছেন, তবু রবীন্দ্রনাথের মনে হচ্ছে এ যাত্রা যেন অনেক দিনের জন্যে—'একটা কাল্পনিক দীর্ঘকালের বিভীষিকা মন থেকে তাড়াতে পারছি নে।'

আগের বারের মতো এবারও সমুদ্রপীড়া তাঁকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছিল, কিন্তু এবারের সূচনাটি নাটকীয়। পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতেই তিনি কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ার আগ্রহে একটি কুঠুরিতে প্রবেশ করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও তিনি একই কেবিনে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণেই বোঝা গেল কেবিনটি একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের। ক্ষমা চেয়ে তাড়াতাড়ি কম্বলটি তুলে নিয়ে বেরোতে গিয়ে আর এক বিপত্তি দরজা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ পরে মুক্তি পেয়ে নিঃসংশয়চিত্তে পরবর্তী কেবিনের দ্বারে উপস্থিত হলেন, কিন্তু আলোকিত কক্ষের মেজের উপর স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখে অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্বেই পলায়ন করলেন। তৃতীয়বার ভুল করার সাহস না থাকায় জাহাজের ছাতে উপস্থিত হয়ে খানিকটা বমি করে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপরে লজ্জিত নতমস্তকটি স্থাপন করে শুয়ে পরতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন কম্বলটি তাঁর নয়। ফেরৎ দিতে গিয়ে আবার ভুল করার সাহস ছিল না, সুতরাং সেই 'তীব্রতাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর রাত্রি যাপন' করতে হল।

পরের দিন [23 Aug শনি ৮ ভাদ্র] ভোরে লোকেন্দ্রনাথ 'সমস্ত রাত্রির সুখনিদ্রাবসানে...অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট সুস্থ মুখে' ডেকে দর্শন দিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর করুণ অবস্থার বিবরণ দিলেন—'শুনে তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপণ করে এমন দুটো-একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর থেকে আর কখনো শোনা হয়নি।' কেবিনের ভৃত্যটিকে ডেকে তাকে অনেক কষ্টে পরিস্থিতিটি বোঝানো হল, 'তখন সে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে একবার মুখ ফেরালে এবং ঈষৎ হাসলে—তার পরে চলে

গেল।' কম্বলের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটলেও সমুদ্রপীড়ার প্রকোপে 'নাড়ীতে ভারতবর্ষের অন্ন আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না।'

29 Aug এডেনে পৌঁছবার আগে মৃণালিনী দেবীকে একটি চিঠিতে তাঁর অসুস্থতার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : 'রবিবার দিন [24 Aug ৯ ভাদ্র] রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড়ো খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলি খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু আধটু আদর করলুম আর বল্লুম ছোট বৌ মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম—বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে কিনা। তার পর বেলি খোকাকে হাম দিয়ে ফিরে চলে এলুম।'[১]—সংসারী রবীন্দ্রনাথের এই অন্তরঙ্গ চিত্রটি আকাশবিহারী কবিকে আমাদের সমভূমিতে স্থাপন করেছে।

মঙ্গলবার [26 Aug ১১ ভাদ্র] পর্যন্ত অসুস্থতার পালা চলেছে। সেদিন প্রাতে লোকেন্দ্রনাথের আশ্বাসে ডেকে গিয়ে 'লম্বা বেতের চৌকিটির উপর পা ছড়িয়ে বসে পুনর্বার এই মর্ত্য পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আস্বাদ লাভ করা গেল।'

দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'মঙ্গলবারে ডেকে উঠে লোকেনের প্রতি অসাধারণ আসক্তি।' এই 'আসক্তি'র বিস্তৃত বর্ণনা আছে য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-র প্রথম ও শতবর্ষপূর্তি সংস্করণে, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুভাগ্য ঈর্ষণীয় ছিল না, কিন্তু প্রথম জীবনের চিত্রটি ভিন্নতর। এইজন্য আলোচ্য অংশে তাঁর এমন একটি পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে, যা অন্যত্র সুলভ নয় : 'বাহ্য আকৃতি থেকে আমাদের দুটিকে দিবসের পেচকের মতো যতটা আধ্যাত্মিক দেখায়, আমাদের আলোচনাতে সকল সময়ে ততটা সাত্ত্বিক সৌরভ থাকে না। সকলের জানা উচিত যদিচ আমরা ভারতসন্তান কিন্তু তবু আমাদের বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয় নি।…এই জন্যে আমরা দুই যুবক গতকল্য রাত্রি দুটো পর্যন্ত কেবল ষড়চক্র-ভেদ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ত্রিগুণাত্মিকা-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা না করে সৌন্দর্য প্রেম এবং নারীজাতির পরম কমনীয়তা সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করছিলুম এবং মনে করছিলুম আমাদের বয়সী যুবকদের পক্ষে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই জ্যাঠামি এবং সেটা কেবল আজকাল বাংলাদেশেই প্রচলিত হয়েছে।'

দিনলিপিতে পরবর্তী দু'দিনের বিবরণ : 'বুধবারে [27 Aug ১২ ভাদ্র] প্রশান্ত সমুদ্র, উজ্জ্বল সূর্যালোক, কবিত্ব চিন্তা ও তজ্জাতীয় কথোপকথন। বৃহস্পতিবারে [28 Aug ১৩ ভাদ্র] চমৎকার দিন—চিঠি লেখা। রাত্রে চন্দ্রালোকে একটা দেড়টা পর্যন্ত আলোচনা। ঘন বৃষ্টি।'

পরের দিন [29 Aug শুক্র ১৪ ভাদ্র] সমস্ত দিন ধরেই বৃষ্টি, সুতরাং জাহাজের কেবিনে বসে সরলা দেবীকে ['সল্লি'] চিঠি লিখলেন, জাহাজ রাত্রে এডেনে পৌঁছলে সেখানে পোস্ট করবেন [চিঠিটি পাওয়া যায় নি, সরলা দেবীকে লেখা দু'টি ছাড়া আর কোনো চিঠিই রক্ষিত হয়নি—সবই 'পঞ্জাবের পোলিটিকাল হোমাগ্নিতে' ভস্মীভূত এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রজীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়েছে]। এই দিন 'ভাই ছোট বৌ' সম্বোধনে মৃণালিনী দেবীকেও একটি চিঠি লিখেছেন, যার কিছু অংশ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। সমুদ্রপীড়ার বর্ণনা দিয়ে চিঠিতে লিখেছেন : 'তোমাদের কাছে ফেরবার জন্যে ভারি মন ছট্‌ফট্‌ করত। আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই—এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর

কোথাও নড়ব না।' এই মনোভাব রবীন্দ্র-চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। দেশ ও পরিবারের গণ্ডীবদ্ধ জীবনযাত্রা বারবার তাঁকে ঘরছাড়া করেছে, কিন্তু কিছুদিন পরেই ঘরের টান চঞ্চল করে তুলেছে অন্তরকে।

চন্দ্রালোকিত রাত্রে জাহাজ এসে এডেন বন্দরে পৌঁছল। হঠাৎ শোনা গেল পরের দিন প্রভাতের পরিবর্তে সেই রাত্রেই জাহাজ বদল করতে হবে। তাড়াতাড়ি বাক্স-পেঁটরা বন্ধ করে নৌকাযোগে অস্ট্রেলিয়াগত বৃহৎ 'ম্যাসীলিয়া' জাহাজে ওঠা হল—'বহু কষ্টে জিনিসপত্র উদ্ধার করে ডেকের উপর যখন উঠলুম মুহূর্তের মধ্যে এক-জাহাজ দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হল। যদি তার কোনো চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমাদের সর্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে যেত।' অনেক রাত্রে জাহাজ ছেড়ে দিল।

30 Aug [শনি ১৫ ভাদ্র] ম্যাসীলিয়া জাহাজ চলেছে লোহিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে। জাহাজের য়ুরোপীয় যাত্রী-যাত্রিনীদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্কে যে ভাবনা তিনি দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করলেন, সেটি সুসংস্কৃত হয়ে য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি-র প্রথম খণ্ডে 'ভূমিকা' অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই দিন সমুদ্রের উপর সন্ধ্যাটি তাঁর চোখের সামনে মনোহর মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়াটি বিচিত্র : 'সমুদ্র এবং আকাশের অসীম স্তব্ধতার মধ্যে এই আশ্চর্য বর্ণের উদ্ভাস দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে এইটেকে ঠিক ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাষা আমার কোথায়! কিন্তু আবার ভাবি, আবশ্যক কী? এ চঞ্চলতা কেন? ···কিন্তু তবু সমুদ্র এবং আকাশের মাঝখানটি থেকে এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকুকে পারিজাত পুষ্পটির মতো তুলে নিয়ে যদি আর এক জনের হাতে না দিতে পারি তা হলে মনে হয় যেন সমস্ত নিষ্ফল হল।' হয়তো এই কারণেই পর দিন [31 Aug] অভিজ্ঞতাটিকে রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন একটি কবিতায় : 'এমন মধুর ক'রে তুমি ভাবিতে পারো না মোরে—···'। দিনলিপিতে কবিতাটির নীচে লেখা 'Cancelled'—পরদিন লিখেছেন, '[কাল] একটা কবিতা লেখবার চেষ্টা করা গেছে, সেটাতে মনের ভাব ভালো ব্যক্ত হয়নি। বদলাতে হবে।' বদল করতে গিয়ে দু'টি কবিতার জন্ম হয়েছে—একটি লণ্ডনের 'Colville Terrace'-এ ['সেপ্টেম্বর। ৯০। রাত্রি'] লেখা 'বিদায়' [দ্র মানসী ২।২৭১-৭২] ও অন্যটি হল প্রত্যাবর্তনের সময়ে 'Suez Canal'-এ 23 Oct লেখা 'সন্ধ্যায়' [দ্র মানসী ২।২৭৩]।[১]

31 Aug [রবি ১৬ ভাদ্র] সকালে 'ভারত-রাজ-মন্ত্রণার একটি প্রধান আসন'-এর অধিকারী Mr. Evans-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে 23 Sep ও বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়, যার বিবরণ দিনলিপি ও ডায়ারিতে আছে। ব্রেক ফাস্টের সময়ে ছুরি দিয়ে রুটি কাটতে গিয়ে বাম হাতের দুটি আঙুলে রক্তপাত ঘটিয়ে 'মনে এই আক্ষেপ হতে লাগল, এতখানি রক্তের অনর্থক অপব্যয় হল অথচ স্বদেশ যেমন ছিল তেমনি রইল, সাধারণ মানবেরও অবস্থার কোনো উন্নতি হল না, মাঝের থেকে এই ঘটনাটা যদি বাড়িতে, ঘটত তা হলে যে পরিমাণ স্নেহ শুশ্রূষা এবং ছিন্ন অঞ্চলখণ্ড আহত অঙ্গুলির চতুর্দিকে আকৃষ্ট হত অদৃষ্টে তাও জুটল না।'

3 Sep [বুধ ১৯ ভাদ্র] সকাল দশটার সময় জাহাজ সুয়েজ খালে প্রবেশ করে ও গভীর রাত্রে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে পৌঁছয়। এই দিনের দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'কাল অনেক রাত জেগেছি—কেবল বাড়ির জন্যে প্রাণ টানে—আমার মতো গৃহপোষ্য জীব পাওয়া যায় না।' দিনলিপিতে অনেক চিঠি লেখার কথা আছে, কিন্তু সেই চিঠিগুলি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি।

6 Sep [শনি ২২ ভাদ্র] ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের মূল ভূখণ্ড ও আয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে মৃণালিনী দেবীকে একটি চিঠিতে সমস্ত বর্ণনা দিয়ে লিখলেন : 'তোমার দেখ্‌তে ইচ্ছে করচেনা ছুট্‌কি? তোমাকেও একদিন এই পথ দিয়ে আস্‌তে হবে তা জান? তা মনে করে তোমার খুসি হয় না? যা কখনো স্বপ্নেও মনে করনি সেই সমস্ত দেখতে পাবে।'[২] হয়তো তাঁকে নিয়ে বিলাতভ্রমণের কোনো সংকল্প রবীন্দ্রনাথের মনে উদিত হয়েছিল, কিন্তু কোনোদিনই তা কার্যে পরিণত হয়নি। 'ভাই ছোট বউ' বা 'ভাই ছুটি'—সাধারণত চিঠিতে স্ত্রীকে এই সম্বোধনেই রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত—কিন্তু এই চিঠিটির সম্বোধন 'ভাই ছোট গিন্নি' ও 'ছুট্‌কি' উপনামটি লক্ষণীয়। মূল পত্রের শেষে অন্যবিধ সম্ভাষণও আছে, কিন্তু অত্যধিক ও অপ্রয়োজনীয় রুচিবাগীশ সম্পাদনায় '…' চিহ্নের মধ্যে তা অবলুপ্ত হয়েছে।

7 Sep [রবি ২৩ ভাদ্র] সকালে ইটালির ব্রিন্দিসি বন্দরে জাহাজ পৌছলে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের মাটিতে পদার্পণ করলেন। সাড়ে এগারোটার সময় ট্রেনে যাত্রা শুরু করে ৪ Sep রাত্রে একটি ট্রেন বদল করে রাত তিনটেয় প্যারিসে পৌঁছলেন। হোটেল ট্যার্মিনূ [Hotel Terminus]-তে রাত্রিবাস করে পরদিন [9 Sep মঙ্গল ২৫ ভাদ্র] সকালে তাঁরা পদব্রজে 'প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়িঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজনগৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে অল্প আহার করে এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল স্তম্ভ' দেখতে গেলেন। দিনলিপিতে লিখেছেন : 'টাউয়ারে চড়ে বাবি সল্লি আর ছোটোবউকে তিনটে পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিলুম'–এর মধ্যে কেবল স্ত্রীকে লেখা পিকচার-পোস্টকার্ডটি রক্ষিত হয়েছে [দ্র চিঠিপত্র ১।১৬, পত্র ৪]। এরপর দিনলিপিতে hippodrome দেখতে যাওয়ার কথা আছে, কিন্তু ডায়েরিতে প্রসঙ্গটি বাদ গেছে। সেখানে রোমান নাট্যশালার মতো গ্যালারিতে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাবেশে সংগীত সহযোগে Jeanne d'arc [Joan of Arc] মূকাভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'বেশ বুঝতে পারছিলুম ফরাসী দর্শকদের মনটা কিরকম হচ্ছিল।' Ms. 246 চিহ্নিত একটি পাণ্ডুলিপিতে নাটকটি সম্পর্কে তাঁর স্বগত চিন্তা উদ্ধারযোগ্য :'এক একজন নরনারী এক একটা দেশে চিরকালের মত জন্মগ্রহণ করে, তারাই জাতীয় জীবনকে অমর করে রেখে দেয়। আমাদের দেশে লোক প্রতিদিন জন্মায় প্রতিদিন মরে, অতীত ভবিষ্যতের মধ্যে কোন বন্ধন রেখে যায় না। তাই আমাদের জাতি অসংলগ্ন বালুকাতীরের মতই, এখানে কোন উন্নত মানবকীর্ত্তি স্থায়ী হয় না, কেবল এক বৈচিত্র্যহীন নিম্ন সমভূমি চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় সমভাব রক্ষা করে ধূধূ করচে। আমরা যে রাজপুতবীর এবং দুর্গাবাই প্রভৃতি বীরাঙ্গনাদের চরিত্র অন্বেষণ করে কাব্যনাটকে চিত্রিত করতে চেষ্টা করি, তাতে আমাদের প্রকৃত উল্লাস হয় না। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রবাহের যোগ নেই, তাদের মহত্ত্বের আবেগ আমাদের জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত হবার সহজ পথ পায় না।'

রবীন্দ্রনাথ উক্ত পাণ্ডুলিপিতে 13 sep-এর বিবরণে লিখেছিলেন : 'আজ আমাদের একটি আত্মীয় বালকের [জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল] ইংলণ্ডে শুভাগমনের কথা আছে। কথা ছিল আমরা তাকে যত্ন করে পথ দেখিয়ে পরামর্শ দিয়ে এই প্রবাসের সঙ্গে পরিচিত করে দেব। সেইজন্যে কন্টিনেন্ট্ ভ্রমণ স্থগিত করে আমরা সত্বর ইংলণ্ডে এসে পৌঁচেছি।' এর থেকে অনুমান করা যায়, য়ুরোপের মূল ভূভাগও তাঁদের ভ্রমণসূচীর অন্তর্গত ছিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে 1920-তে রবীন্দ্রনাথের এই আকঙক্ষা চরিতার্থ হয়।

বুধবার [10 Sep ২৬ ভাদ্র] সন্ধ্যার সময়ে তাঁরা লণ্ডনে Charing Crossস্টেশনে পৌঁছলে তারকনাথ পালিতের স্ত্রী ও কন্যা লিল্ [লিলিয়ান, বাসন্তীললনা] তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। হোটেলে জায়গা না পেয়ে

Mrs. Mull-এর বাড়ি Colville Terrace-এ বাসা নেন। দিনলিপিতে মন্তব্য করেছেন : ‘সুবিধেমত জায়গা নয়। Miss Mullকে দেখা গেল। এই সেই বিখ্যাত Miss Mull!’ লেখার ভাবে মনে হয় লোক প্রমুখাৎ [লোকেন্দ্রনাথ মারফৎ?] এর কথা আগেই অবগত ছিলেন—ইনিও একজন ‘রবি-অনুরাগিণী’তে পরিণত হন, কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক সম্ভবত flirtation-এর ঊর্ধ্বে ওঠেনি।

বৃহস্পতিবার [11 Sep ২৭ ভাদ্র] লণ্ডনের পুরোনো বন্ধুদের সন্ধানে বেরিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ প্রথমে গেলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা সত্যেন্দ্রবালার [সতু] খোঁজে—‘তাদের বাড়ি গিয়ে শুনলুম তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে।’ কেউ তাদের ঠিকানা জানে না। তারপর গেলেন পূর্বপরিচিতা জনৈক বৃদ্ধা Miss Sharpe-এর কাছে [য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র বা জীবনস্মৃতিতে এঁর কথা নেই]—‘জলবায়ু, স্বাস্থ্য, কালের পরিবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে দু-চারটে কথা কয়ে বেরিয়ে পড়া গেল।’ [Ms. 246-এর সংযোজন : ‘আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এখনো আমি কবি আছি কিনা। আমি সলজ্জ মৃদু হাস্যে কুণ্ঠিতভাবে অপরাধ স্বীকার করে নিলুম।’] অতঃপর গেলেন লণ্ডনের সবচেয়ে প্রিয়স্মৃতিমণ্ডিত Dr. Scott-এর বাড়িতে। দাসী এসে জানালে, তাঁরা এখানে থাকেন না, লণ্ডনের বাইরে New Maldin-এ চলে গেছেন। দিনলিপির বিবরণটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ডায়ারিতে নৈরাশ্যবেদনা গোপন রাখেননি : ‘ভারী নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলুম। মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। আমাদের সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাস্য করলুম—আমার সেই অমুক এখানে আছে তো? দ্বারী উত্তর করলে—না, সে অনেক দিন হল চলে গেছে। চলে গেছে? সেও চলে গেছে! আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবীসুদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবে তো সেই সমস্ত জানা লোকেরা আর কেহ কারও ঠিকানা খুঁজে পাবে না! জগতের কোথাও তাদের আর নির্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না।…একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি—আমার সেই গাছগুলো কত বড়ো হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই ঘর এবং সেই আর-একটা ঘর। আর সেই যে ঘরের সম্মুখে বারান্দার উপর ভাঙা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে হয়তো ঠিক তেমনি রয়ে গেছে, তাদের সরিয়ে ফেলতে কারও মনেও পড়েনি!’ মনে রাখতে হবে, কথাগুলি লেখা হয়েছে নিভৃত দিনলিপির পৃষ্ঠায় নয়—কৌতূহলী পাঠককুলের পঠিতব্য গ্রন্থের মধ্যে। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা কবিতায় ছাড়া অন্যত্র প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই কুণ্ঠিত [‘পুষ্পাঞ্জলি-র ব্যতিক্রম ব্যতীত], তাই তরুণ বয়সের প্রেমের এই সোচ্চার স্বীকৃতি একটু বিস্মিত করে। (পরেও একদিন [৪ আশ্বিন শুক্র 19 Sep] তিনি New Maldin-এ স্কট্ পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু লোকেন্দ্রনাথ সহযাত্রী হতে রাজি না হওয়ায় সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়নি।)

অনেক বিভ্রাটের পর সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফেরা হল। ‘ডিনারের পর Miss Mull-এর সহযোগে খানিকটা গানবাজনা হল। Miss Mull মন্দ গায় না।’ এর পরেও অনেকবার তাঁদের গানের আসর বসেছে, রবীন্দ্রনাথের গানের গলার প্রশংসাও শোনা গেছে। বিশেষ করে বাংলা গান ‘অলি বার বার ফিরে যায়’ ‘দে লো সখী দে প্রভৃতি ইংরেজ শ্রোতৃবর্গকে খুব মুগ্ধ করেছিল।

শুক্রবার [12 Sep ২৮ ভাদ্র] বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তাঁরা গেলেন ন্যাশনাল গ্যালারিতে ছবি দেখতে। দিনলিপিতে লিখেছেন : 'অনেক ছবি, অল্প সময় দেখে মনে বসে না। এক-একটা খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু সেগুলো হয়তো কোনো যথার্থ চিত্র-সমজদারের ভালো লাগে না—বোধ হয় অনেক বিখ্যাত ভালো ছবি আমার কিছুই ভালো লাগেনি।'

15 Sep [সোম ৩১ ভাদ্র] অনেকে মিলে Savoy Theatre-এ Gondoliers গীতিনাট্যের অভিনয় দেখতে যান। এ-বিষয়ে ডায়ারিতে লিখেছেন : 'আলোকে, সংগীতে, সৌন্দর্যে, বিবিধ বর্ণবিন্যাসে, দৃশ্যে, নৃত্যে, হাস্যে, কৌতুকে মনে হল একটা কোন্ কল্পরাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্তক-নর্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; সেখানে আমার মনে হল আমার চারি দিকে যেন কিছুক্ষণ ধরে কিন্নরলোক থেকে সৌন্দর্যের অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল।'

দেশ ছেড়ে বেরোবার পর থেকেই দেশের টান রবীন্দ্রনাথকে উন্মনা করছিল। ইংলণ্ডে আসার পর ফিরে যাওয়ার মনোভাব প্রকাশ পেল এই দিনে : 'ভয় হচ্ছে পাছে কাল আমার নামে বাড়ির চিঠি না আসে—তা হলে আমি এ দেশে টিকতে পারব না। পরের দিন [16 Sep মঙ্গল ১ আশ্বিন] মৃণালিনী দেবীর চিঠি পেয়েছেন, কিন্তু মন প্রসন্ন হয়নি : 'আজ সকালে উঠে যখন কেবল একখানি ছোটবউয়ের চিঠি পাওয়া গেল তখন মনটা নিতান্ত দমে গেল। আর একদণ্ড এখানে টিকতে ইচ্ছে করছিল না।' তার পরে যখন breakfast খেতে গেলুম তখন মেজদাদা বাবির [ইন্দিরা দেবীর] একখানি খোলা চিঠি দিলেন। খোলা চিঠির চেয়ে লেফাফাবদ্ধ চিঠি অনেক ভালো লাগে।…আমার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে আছে—কে জানে জীবনটা কেন ভারী শূন্য এবং নিষ্ফল মনে হচ্ছে।' ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মানসিক সম্পর্কের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি, এই সময়ে সেই সম্পর্কের ঐকতানে একটু বেসুর লাগছিল সম্ভবত দূরত্বের কারণে। এক সপ্তাহ পরে সোমবার [৭ আশ্বিন 22 Sep] আবার স্ত্রী, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবীর চিঠি পেয়েছেন, কিন্তু দিনলিপিতে লিখলেন : 'মনটা একান্ত অস্থির হয়ে আছে—বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না।' ফিরে যাওয়ার সংকল্প তখন প্রায় পাকা—পরদিন [৮ আশ্বিন মঙ্গল 23 Sep] স্ত্রী, সরলা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথের জন্য উপহারের জিনিস কিনেছেন, 'কাল বাবির জন্যে একটা কিনলেই আমার মন নিশ্চিন্ত হয়'—অথচ দিনলিপির স্বগত উচ্চারণ হতাশার দীর্ঘনিশ্বাসে ভরা : 'মনটা এমন শূন্য উদাস হয়ে আছে! ইচ্ছে করছে এই ঘুমোতে গিয়ে আর যদি ঘুম না ভাঙে তো বেশ হয়—ঠিক বেশ হয় না, সকলকে একবার দেখতে এবং সকলের কাছে একবার মাপ চাইতে ইচ্ছে করে।'

'বুধবার [৯ আশ্বিন 24 Sep]। সকালে আবার দোকানে বেরোলুম। বাবির জন্যে একটি বেশ ভালো lamp পছন্দ করবামাত্র লোকেন সেটার জন্যে পীড়াপীড়ি করে দাবি করতে লাগল। তাকে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু মনটা ভারী খারাপ হয়ে রইল। তখনি মনে মনে স্থির করলুম, কতকগুলো জিনিসপত্র কিনেই একেবারে পরের স্টীমার নিয়ে লন্ডন থেকে P & 0 জাহাজে চড়ে বসব—কিচ্ছু ভালো লাগছে না।' সত্যেন্দ্রনাথের আপত্তিতে এই সংকল্প অবশ্য সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু পরের মঙ্গলবারই [১৫ আশ্বিন 30 sep] মন আবার চঞ্চল হয়েছে : 'বাবি লিখেছে, আর চিঠি লিখবে না। মেজদাদার কাছে আমার একলার বাড়ি পালাবার প্রস্তাব করা গেল, কিছু ফল হল না। বাবিকে চিঠি লিখতে বসা গেল।' আমাদের ধারণা, এই চিঠিটি ছিন্নপত্রাবলী-র ৭-সংখ্যক পত্র [দ্র পৃ ২৪]। ছিন্নপত্রাবলী-র পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 118, Vol. (i)] ইন্দিরা দেবী কোনো তারিখ

দেন নি, রবীন্দ্রনাথ '২৯শে' লিখে কেটে দিয়ে লিখেছেন : '৩ অক্টোবর/ লন্ডন'। অনুলিপিতে চিঠিটি আরো বড়ো ছিল, নীল পেনসিল ও কালি বুলিয়ে কিয়দংশ অবোধ্য করা হয়েছে। যেটুকু রক্ষিত ও গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে, তার মধ্যেও ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অব্যক্ত থাকেনি। পরের দিন দিনলিপিতে লিখেছেন : 'আজ পয়লা অক্টোবর—এ মাসটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচা যায়'। অর্থাৎ পূর্ব-নির্ধারিত প্রত্যাবর্তনের তারিখটির কাছাকাছি আসার বাসনা! এরপর সোমবার [২১ আশ্বিন 6 Oct] লিখলেন : 'কাল সমস্ত রাত ধরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। ঠিক এই রকমের স্বপ্ন আমি কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই, মনে হয় কোনদিন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে। এই এক রাত্তিরের মধ্যে ঠিক যেন মাসখানেক অসহ্য কষ্ট পেয়েছি এমনি মনে হচ্ছে।' কয়েকদিন পরে [২৭ আশ্বিন রবি 12 Oct] দিনলিপিতে লিখেছেন : 'কাল রাত্তিরে আবার সেই রকমের স্বপ্ন দেখেছিলুম। স্বপ্নে মনে হচ্ছিল মনের কষ্টে আমি যেন উর্ধ্বশ্বাসে চীৎকার করে কোথায় ছুটে চলেছি। ঠিক এই ধরনের স্বপ্ন কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই।' দু'টি স্বপ্নই এক কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না, কিন্তু প্রথমবারের স্বপ্নটি দেখে ও 'আজ চিঠি আসবার দিন। বাবির চিঠি পাওয়া যাবে না' ভেবে সিদ্ধান্ত নেন বাড়ি ফিরে যাবেন এবং পরদিনই [২২ আশ্বিন মঙ্গল 7 oct] P & O জাহাজ কোম্পানীর অফিসে গিয়ে ফেরার বন্দোবস্ত করে আসেন। দু'দিন পরে ২৪ আশ্বিন বৃহ 9 Oct তিনি Thames জাহাজে ভারতবর্ষাভিমুখে রওনা হন।

ইংলন্ডে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি নাট্যাভিনয় ও অপেরা দেখেন। স্যাভয় থিয়েটারে *Gondoliers* দেখতে যাওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। 17 Sep [১ আশ্বিন] '*Niagara Falls*' দেখে দিনলিপিতে লিখেছেন, 'চমৎকার কাণ্ড'। 20 sep [শনি ৫ আশ্বিন] Druary Lane নাট্যশালায় দেখছেন '*Million of Money*, দেখে মনে হয়েছে—'scenery খুব আশ্চর্য্যি। race course, সত্যিকার ঘোড়দৌড়, চৌঘুরি, সমুদ্রের মধ্যে পর্বত'। অন্য একটি খসড়া-পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 246] মন্তব্য 'নাটকের বিষয়টা কিছু বেশি নাটুকে রকমের, এবং অভিনয়টাও তদুপযোগী।' পরের শনিবারে [27 Sep ১২ আশ্বিন] Lyceum Theatreএ স্কটের *Bride of Lammermoor* উপন্যাসের নাট্যরূপাভিনয় দেখতে যান,[১] দিনলিপিতে মন্তব্য করেন : 'চমৎকার লাগল। কী সুন্দর scene! আভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বরাবর ধীর স্বরে বিচিত্র ভাবের concert বাজে, সেটাতে খুব জমিয়ে তোলে। Ellen Terry খুব ভালো অভিনয় করেছিল, Irving-এর অভিনয়ও খুব ভালো—কিন্তু এমন mannerism, এমন অস্পষ্ট উচ্চারণ, এমন অসুন্দর অঙ্গভঙ্গী! কিন্তু তবুও ভালো অভিনয়—সেই আশ্চর্য।' রবীন্দ্রনাথ নিজে ভালো অভিনেতা ও সফল নাট্যপ্রযোজক ছিলেন, সুতরাং তাঁর মতামতের মূল্য আছে। দৃশ্যসজ্জার যে অনুপুঙ্খতা তাঁর মনে মুগ্ধতার সঞ্চার করেছে বহুদিন পর্যন্ত তাঁর নাট্যপ্রযোজনায় তা আদর্শ হয়ে ছিল, যদিও পরবর্তীকালে একে বাহুল্য বলে তিনি বর্জন করেছিলেন।

বর্তমান সফরে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় সংগীতের ব্যাপক চর্চার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারে য়ুরোপীয় সংগীতচর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন। ম্যাকস্‌মূলার সত্যেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে, তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথ ইতালীয় ও ফরাসী সংগীত খুব পছন্দ করতেন ও তাঁর গানের সঙ্গে ম্যাকস্‌মূলার পিয়ানো বাজাতেন। [২] পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির 'ছোটো রাজা' শৌরীন্দ্রমোহন পাশ্চাত্য সংগীতে পারদর্শিতার জন্য বিদেশ থেকে বহু সম্মান লাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রাদি ও সংগীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ ও দক্ষতার কথা সর্বজনবিদিত। প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, মনীষা দেবী প্রভৃতি সযত্নে য়ুরোপীয় সংগীত চর্চা করেছেন। এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথও যে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি আগ্রহ বোধ করবেন, তা খুবই

স্বাভাবিক। প্রথমবার বিলাত প্রবাসের সময়েই তাঁর য়ুরোপীয় সংগীতে দীক্ষা হয়, বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া-র অনেকগুলি গানে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এবারে যে বাড়িতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, তার গৃহস্বামিনীর কন্যা Miss Mull সংগীতে পারদর্শিনী ছিলেন ও রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য তাঁর কাছে আকাঙিক্ষত ছিল। ফলে প্রায় প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা বা রাত্রে তাঁদের গানের আসর বসেছে। Oswald, Brand প্রভৃতি পরিবারে সংগীত-পরিবেশনের ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসালাভের কথা রবীন্দ্রনাথ দিনলিপিতে লিখেছেন। এছাড়া ফেরার সময়ে টেম্‌স্ জাহাজে Gounod-এর Serenade ও *Ave Maria, Swinburne*এর *If, Good Night, Chantez, Then You'll remember me* প্রভৃতি গান গেয়ে স্তুতি ও মুগ্ধতা অর্জন করেছিলেন, পাশ্চাত্য সংগীতে তাঁর দক্ষতার দৃষ্টান্ত হিশেবে এগুলি উল্লেখ করা যায়।

এবারের ইংলণ্ড ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি দ্রষ্টব্যস্থল পরিদর্শন করেছেন, সামাজিকতা রক্ষাতেও ত্রুটি হয়নি। অপেরা, নাট্যাভিনয় ও ন্যাশানাল গ্যালারিতে ছবি দেখতে যাওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। এর মধ্যে মুগ্ধ হয়েছেন 25 Sep [বৃহ ১০ আশ্বিন] 'প্যারিস এক্‌জিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ'-এ কারোলু ড্যুরাঁ-অঙ্কিত বসনহীনা মানবীর ছবি দেখে; ডায়ারিতে লিখেছেন; 'সুন্দর মানবশরীরের মতো সৌন্দর্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্যের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই ছবিখানি দেখলে চেতনা হয় পশু-মানুষ বিধাতার স্বহস্তরচিত একটি মহিমাকে বিলুপ্ত করে রেখেছে, এবং চিত্রকর মনুষ্যরচিত অপবিত্র আবরণ উদ্‌ঘাটন করে সেই দিব্য সৌন্দর্যের আশ্চর্য আভাস দিয়ে দিলে।...একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারীপ্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারই দিব্য লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। দূর থেকে চকিতের মতো মানব-অন্তঃকরণের সেই অনির্বচনীয় চিররহস্যকে দেহের স্ফটিক বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।' দিনলিপিতে আত্মপ্রকাশ আরও অকুণ্ঠ : 'আমি তো সুতীব্র সৌন্দর্য-আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম, আর ইচ্ছে করছিল আমার সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে এই ছবি উপভোগ করি। বেলি যদি বড় হ'ত তাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি এ ছবি দেখতে পারতুম।'

3 Oct [শুক্র ১৮ আশ্বিন] সত্যেন্দ্রনাথের পীড়াপীড়িতে 'দাদার একটি ইংরাজ বাল্যবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে' বার্মিংহাম শহরে যান। যাত্রাপথে রেললাইনের ধারে ধারে ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই কেবল তাঁকে মুগ্ধ করেছে—কলকারখানা, পোস্ট অফিস, আদালতে তাঁর রুচি ছিল না। পরের দিন একটি ছাপাখানায় গিয়ে রঙিন ছবি ছাপা দেখে তাঁর মনে হয়েছে, 'এটা দেখবার জিনিস বটে'।

এর আগে 22 Sep [সোম ৭ আশ্বিন] সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহেই ইয়র্কশায়ার কাউন্টির অন্তর্গত Richmondএ যান সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ভাগিনেয়ী ইন্দুমতীকে দেখতে। আর একবার 18 Sep [৩ আশ্বিন] গিয়েছিলেন সমুদ্রতীরবর্তী Eastbourne-এ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা সত্যেন্দ্রবালা [সতু]র সঙ্গে দেখা করার জন্য। এবারের ইংলন্ড ভ্রমণে এই ক'বারই শুধু তিনি লণ্ডনের বাইরে গিয়েছিলেন।

29 Sep [সোম ১৪ আশ্বিন] সিন্ধি বন্ধু আধবানির আমন্ত্রণে National Liberal Clubএ ডিনার খেতে গিয়ে বিখ্যাত ইউনিটারিয়ান পাদ্রী Charles Voysey [1828-1912]-র সঙ্গে আলাপ হয়। ভয়সি-র সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, মহর্ষি নানা উপলক্ষে বহুবার তাঁকে অর্থসাহায্য পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে

দেখে তিনি বললেন : 'তোমার বোধ হয় কথাটা খুব নতুন বোধ হবে, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র আমার মনে হয়েছিল যিশুখৃস্টকে যেরকম আঁকে তোমাকে ঠিক সেই রকম দেখতে।' রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেন : 'এ কথা আমার পক্ষে নতুন নয়।' 1912-13-এ ইংলণ্ড-আমেরিকায় ও নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর বিভিন্ন ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য বহুবার প্রকাশ করা হয়েছে। 5 Oct [রবি ২০ আশ্বিন] সম্ভবত ভয়সি-র অনুরোধেই তাঁর চার্চে উপাসনায় যোগ দেন : দিনলিপিতে মন্তব্য করেছেন : 'বেশ লাগল। মনটা অনেকটা ভালো বোধ হল।'

6 Oct [সোম ২১ আশ্বিন] রাত্রে যান Carlyle Society-তে—'চুরোটের ধোঁওয়ার মধ্যে John Stirbing-এর life সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। মেজদাদা Newman সম্বন্ধে একটুখানি বললেন, সকলের খুবই ভালো লেগেছে।'

এবারের বিলাতভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের পোশাক ছিল বিচিত্র—ট্রাউজার, গলাবন্ধ কোট ও গোল মুসলমানী টুপি, কখনো-বা পিরালী পাগড়ি—এই ছিল তাঁর পোশাক। 164, Regent Street-এ Walery নামক স্টুডিয়োতে ভোলা অন্তত পাঁচটি ছবি রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে আছে—তার সব-ক'টিতেই রবীন্দ্রনাথকে এই পোশাকে দেখা যায়। কিন্তু আপন রুচি অনুযায়ী পোশাক পরার বিড়ম্বনাও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে : 'এমন অনেক সময়ে হয়, রাজপথে কোনো নীলনয়না পান্থরমণীর যেমন সম্মুখবর্তী হই অম্‌নি সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সম্বরণ করতে পারে না।' কৃষ্ণ কৃপালনী মন্তব্য করেছেন : 'He is modest enough to explain that these smiles were provoked not by his handsome and manly looks but the odd dress he wore.'[১]

রবীন্দ্রনাথের অসময়ে ইংলণ্ড-ত্যাগের ইচ্ছা বারবার সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রতিহত হয়েছে, এ আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু 7 Oct যখন তিনি জাহাজে আসন নির্দিষ্ট করে ফিরে এলেন, তখন স্বভাবতই সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিনলিপিতে লিখেছেন : 'রাত্তির দুটো পর্যন্ত আমার দেশে ফেরা সম্বন্ধে সমালোচনা করা গেছে।' আবার এই সমালোচনায় পীড়িত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষোভ উদ্‌গীরণ করেছেন পরদিন [8 Oct বুধ ২৩ আশ্বিন][১] ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে : 'মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা—তার এত দিকে গতি—এবং এত রকমের অধিকার যে, এ দিকে-ওদিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে।' পত্রটিতে সম্ভবত আরও অনেক ব্যক্তিগত কথা ছিল, ছিন্নপত্রাবলী-র পাণ্ডুলিপিতে ইন্দিরা দেবীর সম্পাদিত অনুলিখনেরও অনেকটা অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

লণ্ডনে থাকার সময়ে 'মালিনী' [১৩০৩] নাটকের বীজ রবীন্দ্রনাথের মনে রোপিত হয়। তিনি রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণের 'সূচনা'য় লিখেছেন : 'মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।…তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। প্রবাসী বাঙালিদের প্রায়ই সেখানে হত জটলা, আর তার সঙ্গে চলত ভোজ। গোলেমালে রাত হয়ে গেল। যাঁদের বাড়িতে ছিলুম অত রাত্রে দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে হঠাৎ চমক লাগিয়ে দিলে গৃহস্থ সেটাকে দুঃসহ বলেই গণ্য করতেন

তাই পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম। বিছানায় যখন শুলুম তখনো চলছে কলরবের অন্তিম পর্ব, আমার ঘুম ছিল আবিল হয়ে।/ এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।/ জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে আমার মনের একভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতামাত্র, অন্যভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলুম না। পালিত সাহেবকে মনের ক্রিয়ার এই বিস্ময়করতা জানিয়েছিলুম। তিনি এটাতে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য বোধ করলেন না। কিন্তু অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।'

ঘটনাটির উল্লেখ দিনলিপি বা ডায়ারিতে নেই। লণ্ডনে থাকার সময়ে প্রত্যেকটি দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিনলিপিতে আছে, সুতরাং তার মধ্যে কোন্ রাত্রিটি রবীন্দ্রনাথ তারকনাথ পালিতের প্রিমরোজ হিলের বাসায় কাটিয়েছিলেন, তা নির্ণয় করা দুষ্কর। সম্ভবত বিলাত-প্রবাসের শেষ পর্বে [? মঙ্গলবার ২২ আশ্বিন 7 Oct] এই ঘটনাটি ঘটেছিল।

9 Oct [বৃহ ২৪ আশ্বিন] সকালে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষাভিমুখী 'টেম্‌স্' জাহাজে উঠলেন। 'আমার নির্দিষ্ট ক্যাবিনে [Cabin No. 20[২]] গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চারজনের থাকবার স্থান এবং আর-একজনের বাক্স তোরঙ্গের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আছে 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস'। বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে ভাবী সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় নিবিড়ানন্দের সঞ্চার হয়নি।…এমন সময়ে এক অল্পবয়স্ক সুশ্রী ইংরাজ যুবক ['Connolly'—দিনলিপি] ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্য মুখে 'শুভ প্রভাত' অভিবাদন করলেন—মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষ যাত্রা করছেন। এঁর শরীরে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।' এই যুবকের সঙ্গে ও বঙ্গভাষী সহযাত্রী না থাকাতে অন্যান্য বিদেশী নরনারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা এই সমুদ্রযাত্রায় অনেক বেশি হয়েছিল।

ভারতবর্ষীয় ইংরেজ বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের রবীন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে গণ্য করতেন এবং কোনোদিনই তাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। সহযাত্রী Connolly সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক মনোভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। আর এক সহযাত্রী প্রথম ভারতবর্ষাভিমুখী তরুণ ইংরেজ Gibbs এর সঙ্গে তাঁর প্রায় বন্ধুত্ব-সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রধানত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের ক্ষেত্রে উভয়ের মতের মিলকে অবলম্বন করে। অন্যান্য যাত্রী বা যাত্রিণীদের কাছেও এই শ্রেণীকে নিন্দা করার কোনো সুযোগের অপব্যয় রবীন্দ্রনাথ করেননি। ক্ষুব্ধ মনে ইংরেজি ভাষা রচনায় তাঁর দুর্বলতার ফলে এমন একটি সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় দিনলিপিতে যে আক্ষেপ তিনি প্রকাশ করেছেন, সেইটি থেকে তাঁর মনস্তত্ত্বের হদিশ পাওয়া যায় : 'আমার ইংরিজি শিক্ষার অভাব আর কখনো এমন অনুভব করিনি। কোনো কিছু শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজেকে এমন stupid বলে মনে হয়! কিন্তু মজা দেখেছি এক-একজন লোকের সঙ্গে এবং এক-একটা বিষয়ে আমি

বেশ বলে যেতে পারি। Evans-এর সঙ্গে যখন আমার আলোচনা চলত আমি নিজে আশ্চর্য হয়ে যেতুম, বেশ গুছিয়ে বলতে পারতুম। কিন্তু যখন excited হয়ে ওঠা যায় এবং যখন ভালো রকম করে বলা বিশেষ আবশ্যক হয় তখন অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে উঠে কণ্ঠরোধ করে দেয়—গুছিয়ে নেবার সময় পাওয়া যায় না।' অথচ আগে এবং এই জাহাজে অনেকেই তাঁর ইংরেজির বিস্তর প্রশংসা করেছেন; তিনি অক্সফোর্ডে—এমন-কি কোনো কলেজে—পড়েননি জেনে এক বৃদ্ধ ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। আসলে ইংরেজি ভাষাতে ছিল তাঁর অশিক্ষিতপটুত্ব—পড়তে পড়তে এবং বিশেষত শুনতে শুনতে তিনি এই ভাষা যেভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তার প্রতি তাঁর বিশ্বাস কোনোদিনই দৃঢ় হতে পারেনি; এমন-কি তাঁর স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরেও এই ভাষা সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধা কাটেনি।

জাহাজ 23 Oct [বৃহ ৭ কার্ত্তিক] পোর্ট সৈয়দ বন্দর অতিক্রম করে সুয়েজ খালে প্রবেশ করলে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির স্পর্শ লাভ করলেন। দিনলিপিতে লিখেছেন : 'চমৎকার লাগছে।…য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী অপরিচিত বিস্মৃত নিভৃত ছায়াস্নিগ্ধ নদীকলধ্বনিসুপ্ত বাংলাদেশ, আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, আমার ভালোবাসা-লালায়িত কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, আমার নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাশীল অতিব্যথিত জীবনের স্মৃতি এই সূর্যকিরণে এই তপ্তবায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার স্বপ্নভারনত দৃষ্টির সামনে জেগে উঠছে। আমি প্রাচ্য, আমি আসিয়াবাসী, আমি বাংলার সন্তান, আমার কাছে য়ুরোপীয় সভ্যতা সমস্ত মিথ্যে—আমাকে একটি নদীতীর, একটি দিগন্তবেষ্টিত কনকসূর্যাস্তরঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, একটুখানি বিজনতা, খ্যাতিপ্রতিপত্তিহীন প্রচণ্ডচেষ্টাবিহীন নিরীহ জীবন এবং যথার্থ নির্জনতাপ্রিয় একাগ্রগভীর ভালোবাসাপূর্ণ একটি হৃদয় দাও—আমি জগদ্‌বিখ্যাত সভ্যতার গৌরব, উদ্দাম জীবনের উন্মাদ আর্বত এবং অপর্যাপ্ত যৌবনের প্রবল উত্তেজনা চাই নে।'—শেষের দিকে আবেগের তীব্রতায় তাঁর বক্তব্যে একটু অতিরেকের সুর লেগেছিল, সেই কারণেই ডায়ারিতে এই অংশটি বাদ দিয়েছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানসিকতাটি এর মধ্যে ঠিক বুঝে নেওয়া যায়।

অনুকূল পরিবেশে তাঁর কাব্যলক্ষ্মী আবার দেখা দিল। অনেকদিন পরে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে একটি পত্রে [৩০ কার্ত্তিক ১৩১৭ 16 Nov 1910] লেখেন : 'আমার মনে আছে যখন ইংলণ্ডে ছিলুম কোট প্যান্টালুন পরে কোনোমতেই কবিতা লিখতে পারতুম না। লণ্ডনের লজিং হাউস-এ আমার সরস্বতীকে এক দিনের জন্যেও আমন্ত্রণ করে আনতে পারিনি—ভারতবর্ষে ফেরবার পথে জাহাজের ক্যাবিনে দরজা বন্ধ করে আঁট কাপড় সমস্ত ছেড়ে ফেলে তবে আবার কবিতা লিখতে পারি।'[১]

23 Oct [বৃহ ৭ কার্ত্তিক] লিখলেন 'সন্ধ্যায়' কবিতাটি [দ্র মানসী ২।২৭৩]। এটি অবশ্য নতুন কবিতা নয়; 'ম্যাসেলীয়া' জাহাজে লোহিতসমুদ্রে যে অপূর্ব সূর্যাস্ত দেখেছিলেন তারই অভিজ্ঞতাকে একটি কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন 31 Aug—সেটি মনোনীত না হওয়ায় তারই ভাব অবলম্বন করে দু'টি কবিতা জন্ম নেয় 'বিদায়' ও 'সন্ধ্যায়'। দ্বিতীয় কবিতাটির দু'টি পাণ্ডুলিপিতেই এই তথ্যের স্বীকৃতি রয়েছে।

25 Oct শনিবার [৯ কার্ত্তিক] লিখলেন 'শেষ উপহার' [দ্র মানসী ২।২৭৪]—এটি মৌলিক কবিতা নয়, লোকেন্দ্রনাথ পালিত-রচিত একটি ইংরেজি কবিতার পদ্যানুবাদ। মানসী-র ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে লিখেছেন : 'শেষ উপহার-নামক কবিতাটি আমার কোনো বন্ধুর রচিত এক ইংরাজি কবিতা অবলম্বন করিয়া

রচনা করিয়াছি। মূল কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আমার বন্ধু সম্প্রতি সুদূর প্রবাসে থাকা-প্রযুক্ত তাহা পারিলাম না।'

'মৌন ভাষা' [দ্র মানসী ২।২৭৫-৭৬] লেখা আরম্ভ হয় রবিবার 26 Oct [১০ কার্ত্তিক]-এ, শেষ করেন পরের দিন সকালে। দিনলিপিতে 27 Oct কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছেন : 'কাল একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। লিখতে লিখতে ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেল, আজ ক্যাবিনে পড়ে পড়ে সেটা শেষ করলুম। একটা সামান্য কবিতা লিখতে মনটাকে কী রকম করে নিংড়ে বের করতে হয় যারা পড়ে তারা বোধ হয় তার কিছুই বুঝতে পারে না, তারা কেবল ভালোমন্দ সমালোচনা করে মাত্র।'

পরের দিন [28 oct মঙ্গল ১২ কার্ত্তিক][১] লেখেন মানসী-র শেষ কবিতা 'আমার সুখ' [দ্র মানসী ২। ২৭৭-৭৮]। দিনলিপিতে লিখেছেন : 'বিকেলটা কাটাবার জন্যে বসে বসে একটা কবিতা লেখা গেল। এক-এক সময়ে কবিতা লিখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এক-এক সময়ে কবিতা রচনা মনের উপরে যেন একটা বেদনার রক্তরেখা রেখে দিয়ে যায়, এবং সেইখানটা বরাবর ব্যথা করতে থাকে।'

'২ মাস এগারো দিন পরে' 2 Nov [রবি ১৭ কার্ত্তিক][২] 'রাত দুপুরের সময়' রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই পৌঁছলেন। 'স্পেশাল ট্রেন ধরতে পারলুম না—তাই ভারতবর্ষে পৌঁছেও মন ভারী বিগড়ে আছে—হঠাৎ গিয়ে পড়ব ব'লে কত কী কল্পনা করেছিলুম, এক দিনের জন্য সমস্ত ফস্কে গেল।'

রাত্রিটি জাহাজে কাটিয়ে সকালে Watson Hotel-এ গিয়ে দেখেন রিটার্ন টিকিট ও টাকা-সুদ্ধ ব্যাগটি জাহাজে ফেলে এসেছেন, অথচ আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় ঠিক এই বিষয়েই মনকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন! দিনলিপিতে এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, 'যখন আমার biography বেরোবে তখন এই-সমস্ত অন্যমনস্কতার দৃষ্টান্তগুলো পাঠকদের কাছে ভারী আমোদজনক এবং কবির উপযুক্ত শোনাবে, কিন্তু আপাততঃ ভারী অসুবিধে।' ব্যাগটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে এবং 3 Nov [সোম ১৮ কার্ত্তিক] 'রাত্রে যখন কলিকাতা-মুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু আমার সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয়নি।' এরপর '২২ কার্ত্তিক [শুক্র 7 Nov] রবীন্দ্রবাবুর কাছিয়াবাগান ও বীর্জাতালা হইয়া পার্কস্ট্রীট যাওয়া আসার গাড়ি ভাড়া'র হিসাব দেখে মনে হয়, এর আগেই তিনি কলকাতা ফিরে এসেছিলেন।

এই ভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে দিনলিপি রক্ষা করেছিলেন, সেটি সুসংস্কৃত হয়ে অগ্র° ১২৯৮ থেকে সাধনা পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রতিটি সংখ্যায় বিভিন্ন শিরোনামে ও '(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি)' উপনামে প্রকাশিত হয়—'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। দ্বিতীয় খণ্ড' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ ৮ আশ্বিন ১৩০০ [23 Sep 1893]।

দিনলিপি রচনার সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন দিক, নর-নারী-সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি, নারীর ভূমিকার পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে প্রধানত সমাজসমস্যার দিক দিয়ে তিনি যে-সমস্ত চিন্তা করছিলেন, প্রাত্যহিক বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলিও লিখে রেখেছিলেন। এইগুলিকে তিনি স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করেন ও চৈতন্য লাইব্রেরির এক অধিবেশনে পাঠ করেন। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। (ভূমিকা) প্রথম খণ্ড' নামে প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়; 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ ১৬ বৈশাখ ১২৯৮ [28 Apr 1891]।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে নেপাল মজুমদার লিখেছেন : 'উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইংলণ্ড ইউরোপ তথা পৃথিবীর চিন্তাজগতে এক দারুণ বিপ্লব আনিয়াছে। তখন ডারউইনের 'Descent of Man' ও ক্রপটকিনের 'Mutual Aid' তত্ত্ব লইয়া উত্তেজনাপূর্ণ সমালোচনা চলিতেছে। ১৮৮৭ সালেই কার্ল মার্কসের 'Das Kapital' ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবৎসরই স্যামুয়েল মুর কর্তৃক 'Communist Manifesto'-র ইংরেজী তর্জমা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ সালে এঙ্গেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয়। অপরদিকে সিডনি্ ওয়েব্ ও বানার্ড শ এই সময় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার করিতেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্নার্ড শ-র 'Fabian Essays' প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুই তাঁহাকে স্পর্শও করিল না। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, এই ইংলণ্ডকে তিনি কেন দেখিতে পাইলেন না। উনিশ শতকের শেষভাগে যে সব মহামনীষী ইংলণ্ডে বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধন-সম্পদে জগতের যে জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার সিংহদরজা রবীন্দ্রনাথের নিকট উন্মুক্ত হইল না।'[১] এই মন্তব্য অত্যন্ত দ্রুতচিন্তা-সঞ্জাত ও একদর্শী বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত পাঠরুচি ও প্রবণতার কথা ছেড়ে দিলেও, পাঠক রবীন্দ্রনাথের চিত্রটিই আমাদের কাছে অস্পষ্ট। তাঁর রচনায় পঠিত গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতির অভাব থাকায় কতখানি পড়ার ফলে কতটুকু সারবস্তু পাওয়া যায় তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত তাঁর ক্ষীণ কলেবর গ্রন্থসংগ্রহ তাঁর পাঠের বিস্তৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা দিতেও সক্ষম নয়। বরং আলোচ্য সময়ে দিনলিপিতে তাঁর গ্রন্থপাঠ সম্পর্কে কয়েকটি খবর পাওয়া যায়—আমরা দেখি, তিনি একদিকে যেমন ম্যাথু আর্নল্ড ও ব্রাউনিংয়ের কবিতা, ইবসেনের নাটক এবং Alphonse Daudet-র গল্প পড়ছেন, অন্যদিকে [Alfred Russel] Walace-এর *Darwinism ও Modern Thoughts; & Modern Science* জাতীয় বইও আগ্রহের সঙ্গে পাঠ ও পর্যালোচনা করেছেন। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার পরিচয়ও আছে দিনলিপির পৃষ্ঠায় : 'এদের কাজকর্ম এদের আমোদপ্রমোদের মধ্যে যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন মানুষের ক্ষমতার অন্ত দেখা যায় না। এরাই রাজা বটে। এরা অল্পে সন্তুষ্ট হবার নয়; এদের সুবিধে করবার এবং এদের আমোদ দেবার জন্যে মানুষের চরম শক্তি অবিশ্রাম খেটে মরছে। ···কিন্তু ভেবে দেখলে এর একটা অন্ধকার দিক আছে—[Thomas Hood-এর কবিতা] Song of Shirt পড়লে তা টের পাওয়া যায়। এই সুখসমৃদ্ধির অন্তরালে কী অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করছে সেটা আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্ছে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই।···যদি সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় তো প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। দুটো শক্তি যত একসঙ্গে সাম্য রক্ষা ক'রে কাজ করে ততই মঙ্গল—···আলোকের মধ্যে ভয় নেই, কেননা তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে আছে—কিন্তু যেখানে অন্ধকার জমা হচ্ছে, বিপদ সেইখানেই গোপনে বল সঞ্চয় করছে, সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি।' রবীন্দ্রনাথ শ্রীমজুমদার উল্লেখিত বইগুলি পড়েছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু তাঁর স্বচ্ছ অনুভবে এই সমস্যা যে ধরা পড়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

কলকাতায় ফিরে আসবার পর প্রায় একমাস রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির কোনো খবর পাওয়া যায় না। এর পরে ২২ অগ্র° [রবি 7 Dec] শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনিও উপস্থিত থাকেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের উপাসনার পর 'অতিশ্রদ্ধেয় সুকবি ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুরাগভরে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।'[২]

রবীন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগের কয়েক সপ্তাহ পরে সত্যেন্দ্রনাথও ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। জাহাজে বড়োলাট-পত্নী লেডি ল্যান্সডাউন তাঁর সহযাত্রিণী ছিলেন। সখিসমিতি উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রভৃতির পরিচয় আগেই হয়েছিল। এই যাত্রায় সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : 'বাবা একবার বিলেত থেকে আসবার সময়ে তাঁর সহযাত্রী তখনকার লাট-পত্নী লেডি ল্যান্সডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।…কলকাতায় আসবার পর লাটপত্নী এই নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিপ্রায় জানালে তাঁর জন্য বাল্মীকিপ্রতিভার একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। লেডি ল্যান্সডাউনের সঙ্গে তখনকার ছোটোলাট-পত্নী লেডি এলিয়ট প্রভৃতি আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের যথাযোগ্য সমাদর দেখাবার জন্য কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।'[৩] 'কর্তৃপক্ষ' বলতে এখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বুঝতে হবে। তাঁর নিজ স্বতন্ত্র ক্যাশবহি'তে 'থিয়টারের হিসাব' খাতে বিভিন্ন দফায় খরচ লেখার পর ২৪ চৈত্র [6 Apr 1891] পর্যন্ত ব্যয় ৪১৪৯৷লং —হিসাবটি তখনও অসম্পূর্ণ, পরবর্তী বৎসরের মহর্ষির হিসাবের খাতাটি না পাওয়ায় মোট ব্যয়ের পরিমাণটি জানা যায় না। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন যে, দ্বিপেন্দ্রনাথ রসিকতা করে বলেছিলেন, 'জোড়াসাঁকোর উঠানের সাজসজ্জা দেখে লাট-পত্নী বাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই লাটসাহেবকে বলবেন—Darling! All velvet and festoons!'—খরচের আংশিক হিসাব থেকেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

অভিনয়টি কোন্ তারিখে হয়েছিল বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে আমরা জানি যে, সত্যেন্দ্রনাথ 27 Dec [শনি ১৩ পৌষ] সোলাপুরে তাঁর কাজে যোগ দিয়েছিলেন—সুতরাং অভিনয়টি তার আগেই হয়েছিল অনুমান করা যায়।

অবনীন্দ্রনাথ এই অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন 'ঘরোয়া'-তে [পৃ ১২৪—৩২], আমরা তার থেকে মঞ্চসজ্জার বিবরণটি উদ্ধৃত করছি : 'নিতুদা [নীতিন্দ্রনাথ] নিলেন স্টেজ সাজাবার ভার। অনেক কারিকুরি করলেন তিনি স্টেজে। মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা অর্ধচন্দ্রাকারে ভরাট করলেন।…বনজঙ্গল' বানালেন সেই মাটিতে। স্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, দোতলার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা চলে গেছে স্টেজের ভিতরে। নানা রকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সিন বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। পদ্মবন, শোলার পদ্মফুল, পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের মতো পাতলা গজের পর্দা পর পর চার-পাঁচটা স্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথমটা বেশ ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাবে, পরে এক-একটা পর্দা উঠে যাবে, ও-পাশ থেকে আস্তে আস্তে আলো ফুটবে আর একটু একটু করে পদ্মবনে সরস্বতী ক্রমশ প্রকাশ পাবে।… …

'তার পরে বৃষ্টি হল স্টেজে, …পিছনে আয়না দিয়ে আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়কড় করে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি,…নিতুদা দোতলায় ছাদ থেকে সেই দম্বেল দুটো গড়গড় করে এ-ধার থেকে ও-ধার গড়াতে লাগলেন।…যতদূর রিয়ালিস্টিক করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল।'[১] রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আগেই লণ্ডনে থিয়েটার দেখতে গিয়ে দৃশ্যপটের বাস্তবানুকরণে আশ্চর্য বোধ করেছিলেন—বাল্মীকিপ্রতিভা'র দৃশ্যসজ্জায় হয়তো তার প্রভাব পড়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথের বিবরণ অনুযায়ী এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি, অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রথম দস্যু, ইন্দিরা দেবী লক্ষ্মী, প্রতিভা দেবী সরস্বতী, অভিজ্ঞা দেবী হাতবাঁধা বালিকা এবং বাড়ির ছেলেরা ডাকাত সেজেছিলেন। একটি ফটো থেকে জানা যায়, ডাকাতদলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, যশঃপ্রকাশ [মুখোপাধ্যায়], হিতেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ডাকাতদের কাবুলীওয়ালাদের মতো সাজের সূত্রপাত এই অভিনয় থেকে। রিহার্সাল হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে বির্জিতলার বাড়িতে।

১০ পৌষ [বুধ 24 Dec] 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ধরে লেখা কবিতা ২২৪ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

'মানসী'-র আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

মানসী।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/ কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও/ প্রকাশিত।/ ১০ পৌষ, ১২৯৭ ।/ ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।/ মূল্য ২ টাকা।

প্রকাশ : [24 Dec 1890]। মুদ্রণসংখ্যা : ২২০। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+৪+২২৪

'উপহার'-সহ মোট কবিতার সংখ্যা ৬৫টি; পরে 'গুরুগোবিন্দ' ও 'নিষ্ফল উপহার' 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্ভুক্ত হয়।

আগেই বলা হয়েছে, ৪ পৌষ [বৃহ 18 Dec] রবীন্দ্রনাথ ২ ভাদ্র ১২৯৬ তারিখে রচিত 'পূর্বকালে' কবিতাটির একটি পরিবর্তিত রূপ রচনা করেন [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১।৩-৪]—'মানসী' কাব্যগ্রন্থের মুদ্রণ তখন প্রায় সমাপ্ত, সুতরাং কাব্যরূপ নিয়ে অলস খেলা হিশেবে এটিকে গণ্য করা যায়।

'মানসী' কাব্যের আমাদের দেখা প্রথম সমালোচনাটি নব্যভারত, চৈত্র ১২৯৭-সংখ্যায় [পৃ ৬৬৫–৬৭] প্রকাশিত হয়—সমালোচক 'সম্পাদক' দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। আর একটি দীর্ঘ রসগ্রাহী সমালোচনা লেখেন বন্ধু প্রিয়নাথ সেন—তিনি মানসী প্রকাশের কিছুদিন পরেই এটি লেখেন, কিন্তু কতিপয় কারণবশতঃ সমালোচনাটি মুদ্রিত হয় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর সাহিত্য, পৌষ ১৩০০ সংখ্যায় [পৃ ৭০৪-২১]। কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু এটি পড়ে তাঁর ডায়ারিতে লেখেন : 'ইহা প্রকৃত সমালোচকের স্বাধীন মতের অভিব্যক্তি নহে, অন্ধ ভক্তের স্তুতিমাত্র। লেখক মহাশয় সমালোচনায় হাত না দিয়া মানসী-মঙ্গল কাব্য লিখিলে তাঁর উদ্দেশ্য বোধহয় অধিকতর সুসিদ্ধ হইত।'[১] 'কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা' [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]-রচিত 'মানসী এবং রাজা ও রাণী' প্রকাশিত হয় সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৮-সংখ্যায় [পৃ ৩-১৫]। 'সম্পাদক' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পাদটীকায় লেখেন : 'কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা, এই সমালোচনাটি পাঠাইয়াছেন। তাঁহার মতের সহিত আমাদের মতের মিল না থাকিলেও, প্রবন্ধটি সাদরে মুদ্রিত হইল। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।'—এই ভিন্ন মত অবশ্য পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়নি।

বিদগ্ধ বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতও কাব্যবিচারে কিরকম মুড়ি-মিছরির দাম-নির্ণয়ে গোলমাল করেন তার একটি কৌতুকপ্রদ উদাহরণ আছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রতিবেদনে : 'Nirmalya, by Miss Kamini Sen and Manasi, by Babu Ravindranath Tagore, are two collections of occasional pieces by two distinguished poets of Bengal. They are on a par as regards melody of versification, sweetness of language, and purity and depth of sentiment.'

26 Dec [শুক্র ১২ পৌষ] রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বালিগঞ্জ-স্থিত ট্রিভোলি গার্ডেন্‌স্‌ [Trivoli Gardens]-এ ফেরোজশা মেটা-র [1845-1915] সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। অধিবেশনকালে গৃহীত একটি আলোকচিত্রে ফেরোজশা মেটা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, হেমচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতির সঙ্গে পাগড়ি ও আচকান পরিহিত রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায়। এই অধিবেশনের ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, এই ছবিই তার প্রমাণ। ভারতী ও বালক-এর পৌষ-মাঘ সংখ্যায় 'মহাযজ্ঞ।/ ষষ্ঠ বর্ষ/ উদ্বোধন'-শীর্ষক প্রতিবেদনে লেখা হয় : 'সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল তদীয় সহযোগীগণের সহিত দিবারজনী অকাতরে ঘোরতর পরিশ্রম সহকারে বিবিধ আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন'—রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই সহযোগীদের অন্যতম ছিলেন। উল্লেখ্য, মহর্ষি এই উপলক্ষে ১ কার্ত্তিক দু' হাজার টাকা দান করেন।

অধিবেশন শেষ হবার পরে 10 Jan 1891 [শনি ২৭ পৌষ] মনোমোহন ঘোষ স্বেচ্ছাসেবকদের একটি উদ্যান-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করেন, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত 'গাও ভারতের জয়' জাতীয় সংগীতটি গেয়ে শোনান। The Bengalee-র 17 Jan সংখ্যায় [vol. XXXII, No. 3, p. 25] লিখিত হয় : 'On Saturday afternoon last, Mr. Manomohun Ghose as Chairman of the Reception Committee to the late Congress, invited the other members and the young students who had volunteered their services, to a garden-party at his residence in the Theatre Road.' পরবর্তী 24 Jan-সংখ্যায় [P. 37] : 'A Correspondent writes;—...To crown the festivity, Babu Jotirindra Nath Tagore played on the harmonium and Babu Robindra Nath Tagore the great poet of Bengal, sang a very noble song beginning with the word, "জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়," ...'

১৪ পৌষ [রবি 28 Dec] মহর্ষির পার্ক স্ট্রীট-স্থ বাসভবনে Theistic conference-এর উদ্বোধন হয়। গত বৎসর থেকে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশাগত ব্রাহ্ম প্রতিনিধিদের এইরূপ সম্মেলন সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রথা চালু হয়। *The Indian Messenger*-এর [vol. VIII, No. 18, Jan 4 1891, pp. 140-41] বিবরণ থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে তিনটি সংগীত পরিবেশন করেন।[২]

12 Jan [সোম ২৯ পৌষ] রবীন্দ্রনাথকে বহুদিন পরে পারিবারিক খাতায় একটি দীর্ঘ রচনা লিখতে দেখা যায়। রচনাটির প্রথম ও শেষাংশ বাদ দিয়ে 'কাব্য' শিরোনামে সাধনা, চৈত্র ১২৯৮-সংখ্যায় [পৃ ৩৮৪-৮৮] প্রকাশিত হয় [দ্র সাহিত্য ৮।৪৫৯-৬১]; বর্জিত অংশ রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ৩২-৩৫-এ সংকলিত হয়েছে। কয়েকদিন আগে প্রকাশিত মানসী কাব্যের কোনো সমালোচনা নিশ্চয়ই এত শীঘ্র কোনো সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় নি, কিন্তু সম্ভাব্য সমালোচনার প্রত্যুত্তর হিশেবে রচনাটিকে গণ্য করা চলে।

তার আগে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিশেবে তাঁকে একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হয়। এই বৎসর 26 Feb 1891 [বৃহ ১৫ ফাল্গুন] ভারতে তৃতীয় জনগণনার তারিখ হিশেবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখাগুলি নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় বলে মনে করলেও আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ব্রাহ্মেরা নিজেদের হিন্দুসমাজের একটি বিশেষ শাখা বলে গণ্য করতেন। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ আদি

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-রূপে বাংলার জনগণনাকার্যের ভারপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট C.J. O'Donnell-কে 9 Jan 1891 [শুক্র ২৬ পৌষ] তারিখে লিখিত একটি পত্রে তাঁদের শাখাকে 'Theistic Hindus' আখ্যায় অভিহিত করার অনুরোধ জানান। আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত পরিবারগুলিকে 'হিন্দু-ব্রাহ্ম'-রূপে নিজেদের শ্রেণীবদ্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয় তত্ত্ববোধিনী-র ফাল্গুন সংখ্যার দ্বিতীয় মলাটে।

গত বৎসর [১২৯৬] অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গে তাঁদের পারিবারিক বিস্তীর্ণ জমিদারির বিরাহিমপুর ও ইসবশাহী পরগণার সদর কাছারি শিলাইদহ ও শাহজাদপুর পরিদর্শন করেছিলেন। এই বৎসর সম্ভবত ১ মাঘ [মঙ্গল 13 Jan] তিনি আর একটি জমিদারি কালীগ্রাম পরগণার সদর কাছারি পতিসর অভিমুখে রওনা হন। রবীন্দ্রনাথ বোটে করে পতিসর গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে পথের বর্ণনা দিয়ে স্ত্রীকে লেখেন : 'আজ আমি কালিগ্রামে এসে পৌঁছলুম। তিনদিন লাগ্‌ল।'[১] এখানে এসেই তিনি কন্যা মাধুরীলতার [বয়স ৪ বছর ৩ মাস] একটি চিঠি পেয়ে লিখছেন : 'আমার মিষ্টি বেলুরাণুর চিঠি পেয়ে তখনি বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। আমার জন্যে তার আবার মন কেমন করে—তার ত ঐ একটুখানি মন, তার আবার কি হবে? ···কাল রাত্তিরে আমি খোকাকে স্বপ্ন দেখেছি—তাকে যেন আমি কোলে নিয়ে চট্‌কাচ্চি, বেশ লাগ্‌চে।' পিতৃস্নেহ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিমূলক রচনায় খুব বেশি প্রকাশ পায়নি, সেই মনটি ধরা পড়েছে এই ধরনের কিছু কিছু পত্রে।

এইবার উত্তরবঙ্গে এসে বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হল। য়ুরোপের বাহ্যসুখপ্রিয় জটিল জীবনাবর্তে ডুব দিয়ে আসার পর এখানকার শান্ত নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি ও সরল দরিদ্র উচ্চাকাঙক্ষাহীন মানবজীবনপ্রবাহ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছে। ইন্দিরা দেবীকে ৫ মাঘ [শনি 17 Jan] একটি চিঠিতে লিখছেন :'বেশ কুঁড়েমি করবার মত বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, তা ছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড় এখনো চতুর্দিকে ছেঁকে ধরেনি। সব-সুদ্ধ খুব ঢিলে ঢিলে একলা-একলা কী এক রকম মনে হচ্ছে। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে একটা কিছুই নেই, এমন-কি, নাইলেও চলে না-নাইলেও চলে, এবং ঠিক-সময়-মত খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহুদিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়। এখানকার চতুর্দিকের ভাবগতিকও সেই রকম। একটা ছোট্ট নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই।···ডাঙার উপরে নানান রকমের নানান লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে, কেন যে যাচ্ছে,···তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।'[২] এই পরিবেশ তাঁকে সন্ধান দিয়েছে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত ঔদাস্য ও বিষাদের। কিছুদিন আগে দেখা য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য স্বভাবতই মনে এসেছে : 'ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পুরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায়নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।'[৩] এগুলি চিঠির আকারে লেখা ডায়ারি, মনের মধ্যে জেগে ওঠা ভাবনা-অনুভূতির প্রতিটি তরঙ্গ এই

পত্রগুলির মধ্যে চিহ্ন রেখে গেছে। য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-তে তিনি লিখেছেন : 'আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত, আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদের সংগীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গিহীন বিশ্বজগতের।'[১] লক্ষণীয়, এই ভাবনা কিন্তু দিনলিপিতে নেই, এই চিঠির সূত্র ধরেই তা ডায়ারি-তে এসেছে। এই সময়ে তিনি খসড়াটিকে সাহিত্যরূপ দিচ্ছিলেন, এই তথ্যটি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সূত্রপাত এই সময়ে। বোটে করে ছোটোবড়ো বিভিন্ন নদীতে পরিভ্রমণকালে আশেপাশের নানা গ্রামদৃশ্য, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সচল ছবি তাঁর চিত্তপটে প্রতিফলিত হয়েছে, আবার কাছারিতে 'রাজকার্য' করতে গিয়ে হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখ-ভরা বিভিন্ন চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলেছে। আপাতত এই মানুষেরা ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রের মধ্যে হাস্যকৌতুকে মণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হলেও ধীরে ধীরে হৃদয়ের রসে জারিত হয়ে সাধনা-পর্বে লিখিত ছোটোগল্পগুলির অসামান্য শিল্পসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। এদের জীবনসমস্যার সঙ্গে বাস্তবপরিচয় পরবর্তীকালে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনারও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বে একটি পরিবর্তনও লক্ষণীয়। ইতিপূর্বে আত্মভাবে নিমজ্জিত থাকার জন্যে তাঁর কবিতায় দুঃখবেদনার প্রাবল্য ও হৃদয়াবেগের অতিশয়তা একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির নিকট সান্নিধ্যে এই ধরনের অতিরেক অনেকটা প্রশমিত, ফলে সোনারতরী-চিত্রা-যুগের সৌন্দর্যরসপ্রাধান্য সম্ভব হয়েছে।

ছিন্নপত্রাবলী-র চিঠিগুলি এই কারণেই জীবনরসে সমুজ্জ্বল। ৭ মাঘ সোমবার [19 Jan] দুপুরে বোট খুলে কাছারির উদ্দেশে যেতে গিয়ে দেখছেন : 'গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চাল-শূন্য মাটির দেয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটাতিনেক ছাগল চরছে, গোটা-কতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে—নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে; কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কন বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি করছে।'[২] এরপর কাছারির অভিজ্ঞতা : 'আমি যখন তোকে চিঠি লিখতে শুরু করেছি তখন এখানকার একজন আমলা তার দারিদ্র্যদুঃখ বেতনবৃদ্ধি এবং দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা নিয়ে ভারী বক্ বক্ করছিল—…কাল যখন কাছারি করছি, গুটি পাঁচ ছেলে হটাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়াল—কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আরম্ভ করে দিলে, 'পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় হুজুরের পুনর্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।' এমনি করে আধ-ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করে গেল; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন করে নিচ্ছিল।…অন্যান্য আমলা এবং প্রজারা এই ছোকরার ভাষার প্রতি এতাদৃশ দখল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল—…আমি শুনতে পেলুম একজন আর-একজনকে ঠেলে

ঈষৎ বিদ্বেষের ভাবে বলছে, একে কে শিখিয়ে দিয়েছে।'[৩] কৌতুক-স্নিগ্ধ এই ধরনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীলতা ও তার সুন্দর, স্বচ্ছন্দরূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের গল্প বলার ভাষাটি নির্মাণ করে তুলেছে।

১১ মাঘ [শুক্র 23 Jan] ভোরে পতিসর ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ নদীপথে সাজাদপুর রওনা হন। পথের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখছেন ইন্দিরা দেবীকে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৩৬-৩৮, পত্র ১৪]। ১৩ মাঘ সাজাদপুরে পৌঁছে পরদিন Dariapur Katchari থেকে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন : 'কালিগ্রামে ছিলুম কিন্তু কখন সেখান থেকে ছাড়তে হবে ঠিক জানতুম না। এখন সাহাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি—এখানে নিদেন দিন দশেক থাকতেই হবে।···তোমরা কি বিরাহিমপুরে আমার সঙ্গ নিতে পারবে? ···একা একা কেবল রাজ্যশাসন করে আর পারা যায় না—জমিজমা এবং বাকিবকেয়া ব্যতীত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আর পাঁচ রকমের সদালাপ করবার ইচ্ছে হচ্চে। সঙ্গে দুটি চারটি বই আছে তাই বেঁচে আছি—তা ছাড়া একটু আধটু লেখাও চলছে—নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়বার বড় একটা সময় নেই। মানসী জন্মাবার পরে আমার ঘরে আর একটি শারীরী জন্মগ্রহণ করেচে সে খবর বোধ হয় এতদিনে পেয়েছ'।[১] পত্রটিতে 'একটু আধটু লেখা'র যে প্রসঙ্গ আছে, সেটি হচ্ছে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম খণ্ডটি। য়ুরোপ-ভ্রমণের সময়ে তিনি যে দিনলিপি রক্ষা করেছিলেন, তারই মধ্যে জায়গায় জায়গায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্লীন পার্থক্য, নর-নারীর সম্পর্ক ও নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে যে-সব ভাবনা মনে এসেছে সেগুলি লিখে রেখেছিলেন। দেশে ফিরে এসে জমিদারি পরিদর্শনের ফাঁকে ফাঁকে সেইগুলিকেই একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের আকার দিয়েছেন, এখানে সেই লেখার কথাই উল্লেখ করেছেন। পরের দিন রচনাটি সমাপ্ত হয়। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কাছ থেকে পাওয়া একটি পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 246] মুদ্রিত ডায়ারি-র প্রথম খণ্ডের 'প্রায় পূর্ণ পরিণত রূপ অবিচ্ছেদে' পাওয়া যায়—রচনাশেষে তারিখ '১৫ই মাঘ। মঙ্গলবার। ১৮৯১' [27 Jan]। পত্রটিতে 'আমার ঘরে আর একটি শারীরী জন্মগ্রহণ' করার কথা আছে—১১ মাঘ [শুক্র 23 Jan] তাঁর তৃতীয় সন্তান মধ্যমা কন্যা রেণুকার জন্ম হয়। বলেন্দ্রনাথ-সংকলিত রাশিচক্রের খাতায় এঁর জন্মের কোনো বিবরণ নেই।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-র প্রথম খণ্ডটি লেখা শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণবিবরণ-সমন্বিত দিনলিপি অবলম্বনে দ্বিতীয় খণ্ডটিকে প্রকাশযোগ্য রূপ দিতে শুরু করেন। ইন্দিরা দেবীকে ২০ মাঘ [রবি 1 Feb] লিখেছেন : 'সকালে উঠে অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে বিস্তর গড়িমসি করতে করতে সেই ডায়ারিটা লিখছিলুম –ঘণ্টা দুয়েক হল দেড়পাতা-খানেক লিখেছিলুম—এমৎকালে বেলা দশটার সময় হঠাৎ রাজকার্য উপস্থিত হল—প্রধানমন্ত্রী[২] এসে মৃদুস্বরে বললেন, একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কী করা যায়—লক্ষীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল।'[৩] রবীন্দ্রনাথ বিষয়কার্য ভালোই বুঝতেন, নিজের ও বৃহৎ পরিবারের অনেকেরই জীবনধারণের প্রধান উপায় বলে জমিদারির কাজে কখনো অবহেলাও করতেন না—কিন্তু প্রজাদের কাছে রাজসম্মান বজায় রাখার জন্য যে-সব আড়ম্বরের আয়োজন ছিল, সেগুলিকে মনে-প্রাণে অপছন্দ করতেন। তিনি এই পত্রেই লিখেছেন : 'প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। ···অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো

বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! …prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোষ পরে থাকতে হয়।'[৪] এই সময়ে প্রথা-বিরুদ্ধ আচরণ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে এই-সব নিয়মের অনেকগুলিই তিনি তুলে দিয়েছিলেন।

[* 4 Feb বুধ ২৩ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে জানাচ্ছেন : 'হঠাৎ আজ প্রাতঃকালে আমার দক্ষিণ কাঁধে বাতের মত হয়েছে—মাথা এবং হাত নাড়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে—এবং পৃষ্ঠদেশ—যাকে সর্ব্বদাই পশ্চাতে ফেলে রেখেছি—…সেই সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী পৃষ্ঠদেশই আপনাকে চেতনারাজ্যের একাধিপতি করে রেখেছে।'[৫] মানসী প্রকাশিত হবার পর প্রমথ চৌধুরী কাব্যটি সম্পর্কে পত্রে আলোচনার সূত্রপাত করেন, ১৭ মাঘ-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন, বর্তমান পত্রেও কিছু আলোচনা আছে—কিন্তু পরের দিন [5 Feb] যন্ত্রনাকাতর মানুষটি লিখলেন: 'আমার মানষী যদি মূর্ত্তিমতী হয়ে, আমার কল্পনা যদি সত্য হয়ে এখনি আমার বামপাশে এসে দাঁড়ায় তা হলে মাথাটা ফিরিয়ে যে তার দিকে চেয়ে দেখ্ব এমন সম্ভাবনা নেই—বোধ হয় তাকে বলি "ভাই, আমার ঘাড়ে একটু Rhus Tox Liniment মালিশ করে দাও না!"'[১]

ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে [? 7 Feb] কিন্তু অসুস্থতার কথা নেই, জানলার সমুখে খালের পারে যে বেদের দল আস্তানা করেছে তাদের জীবনযাত্রা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে লিখছেন : 'এদের ঠিক অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারী জানতে ইচ্ছে করে।'[২] আর একটি পত্রে [? 9 Feb] লিখেছেন : 'এখানকার পোস্টমাস্টার এক-একদিন সন্ধের সময় এসে আমার সঙ্গে এই রকম ডাকের চিঠি যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয়।…পোস্টমাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীর ভাবে বলে যায়।'[৩] এই-সব জীবনযাত্রা, এই-সব চরিত্র অভিজ্ঞতারূপে তাঁর মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়েছে, কিছুদিন পরে হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকার তাগিদে ঝরে পড়েছে গল্পের ধারায়।

এই দিন [২৮ মাঘ সোম 9 Feb] তিনি সাজাদপুর ত্যাগ করে শিলাইদহে আসেন। প্রমথ চৌধুরীকে সেদিনই লেখেন : 'যেদিন সাহাজাদপুর ছাড়বার কথা ছিল তার পরদিন ছাড়া গেল। মনে করেছিলুম আরো কিছুদিন দেরী হয়ে যেতে পারে কিন্তু তা আর হল না। এখন আমি শিলাইদহ বোটে। এখানে এসে আমার শরীরের সমস্ত ব্যাধি একদিনে দূর হয়ে গেছে। …এখানে এসে আমার কাজ বিস্তর বেড়ে গেছে। লেখাটা আর বড় এগোচ্চে না। মৌলবী সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। …সাজাদপুরে বাত যেমন আমার কাঁধে চেপেছিল, এখানে মৌলবী তার চেয়ে কিছু কম নয়।'[৪] আগের মতো এই চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে বোটে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে প্রমথনাথ ইতিমধ্যেই হরিপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে গেছেন—খামের উপরে ঠিকানাটি কেটে '53/54 Dharmatala Street' লিখে দেওয়া হয়েছে, কলকাতা কংগ্রেসের পর আয় বৃদ্ধি হওয়ায় আশুতোষ চৌধুরী স্কট লেনের ছোটো বাড়িটি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এই বাড়িটিতে উঠে এসেছিলেন।[৫]

উপরের চিঠিতে যে মৌলবীর কথা আছে, তাঁর সম্বন্ধে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী লিখেছেন : 'শোনা যায়, তিনি নাকি স্থানীয় মুসলমান নন, তিনি ছিলেন পাঞ্জাবি; আরবি ও পারসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত, বড় বড় পারসিক

কবিদের বাণী ও কবিতা প্রায়ই আওড়াতেন; সাধারণত উর্দু বা হিন্দীতেই কথা কইতেন। তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন, আমির-ওমরাহদের মত দাড়িগোঁফ-সমেত তাঁর সুগৌর দেহকান্তি দেখে সকলেই মুগ্ধ হত। ···মৌলবী সাহেব নিজের দর্শনধারী রূপ, আদব-কায়দা আর আরবি-পারসির পাণ্ডিত্যের জোরেই রবীন্দ্রনাথের খুব পরিচিত হয়ে পড়লেন। প্রায়ই নানা বিষয় নিয়ে রবিবাবুর কাছে আসতেন, খুব মিশতেন,—স্থানীয় উন্নতিকর নানা আলোচনায় যোগ দিতেন এবং সব বিষয়েই বেশ উদারতার পরিচয় দিতেন।'[৬] এই বর্ণনা অনুযায়ী মানুষটির সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগার কথা, কিন্তু তাঁর পত্রে প্রথমাবধি এঁর সম্পর্কে তাঁর বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। যাই হোক্, এই-সব সাময়িক উপদ্রব নির্জনতার আস্বাদটিকেই আরও গভীর করে দেয়। ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রে [? 11 Feb বুধ ৩০ মাঘ] লিখছেন :'মৌলবী এবং আমলাগুলো গিয়ে, কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেকছে তোকে সে আর কী বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখা-সাক্ষাৎ হল।'[৭]

আমরা আগেই বলেছি, ১৫ মাঘ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-র প্রথম খণ্ডটিকে প্রকাশযোগ্য রূপ দেবার পর রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রস্তুত করছিলেন, সেটি শেষ হল ৩ ফাল্গুন [শনি 14 Feb]; Ms. 246-এ রচনাশেষে তিনি তারিখ দিয়েছেন : '১৪ ফেব্রুয়ারি, শিলাইদহ। ১৮৯১। ৩ ফাল্গন'। পরে সাধনা-য় মুদ্রিত হবার সময়ে তিনি এই পাণ্ডুলিপির পাঠেরও ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্জন করেছেন। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ৮ আশ্বিন ১৩০০ [শনি 23 Sep 1893]।

শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ ৬ ফাল্গুন [মঙ্গল 17 Feb] বা তার পূর্বে ফিরে আসেন—এই দিন তিনি পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিলেন, ক্যাশবহিতে তার সাক্ষ্য রয়েছে। পুরো মাসটিতে তাঁর গতিবিধি অস্পষ্ট, কেবল 25 Feb [বুধ ১৪ ফাল্গুন] বির্জিতলায় পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র প্রথম পাণ্ডুলিপি [Ms. 250] থেকে দু'টি অংশ উদ্ধৃত করেন : 131 পৃষ্ঠায় 'মানুষের সবলতা দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে ভাব্‌তে ভাব্‌তে···' [দ্র য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। ১৯৩-৯৫] ও 'Natural Selection এর নিয়ম বরাবর সরল রেখায়···' [দ্র ঐ। ১৯৫-৯৬]। রচনাংশ দু'টি সুসংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে বর্জিত হয়েছিল, হয়তো সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এদের পারিবারিক খাতায় লিখে রেখেছেন। দিনলিপির পাণ্ডুলিপিটি [Ms. 250] ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রভবনে দান করেন। হয়তো পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে উপহার দেন।

২৮ ফাল্গুন [বুধ 11 Mar] হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে অসমীয়া ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার বিবাহ হয়।[১]

প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহের [৩০ শ্রাবণ ১২৯৩] দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পরে মহর্ষি-পরিবারে আর একটি বিবাহ সম্পন্ন হওয়াতে স্বভাবতই আনন্দোল্লাসের পরিমাণ বেশি হয়েছে। লক্ষ্মীনাথও সেই কথা লিখেছেন : 'অনেক দিনের পরে সেই বড় পরিবারে এই ধরনের বিয়ের ঘটনার সাড়া পরিবারের শিক্ষিত মার্জিত যুবকদের মনে অনেক দিন ধরে জেগেছিল। ···পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মায়ার খেলা' নামক নাটক হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার বাড়িতে। কবিবর তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে সেই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদুষী গ্র্যাজুয়েট কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, ভারতীর সম্পাদিকা মহর্ষিকন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্র্যাজুয়েট কন্যা শ্রীমতী সরলা ঘোষাল এবং

ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য মেয়েরাও ছিল। প্রজ্ঞা তখন বিবাহিতা বলে আমার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল।'[২] ইন্দিরা দেবীও এই অভিনয়ের স্মৃতিচারণ করেছেন, তিনি অবশ্য কোনো উপলক্ষের কথা উল্লেখ করেননি : 'মায়ার খেলার একটি অভিনয় এই বির্জিতলার বাড়ির বারান্দাতেই হয়েছিল, তার বিশেষত্ব এই ছিল যে, মায়াকুমারীদের অভাবে রবিকাকা জ্যোতিকাকা বসন্ত ও মদন সেজে তাদের গান গেয়েছিলেন। আমি এইবার শান্তা সেজেছিলুম।'[৩]

অভিনয়টি কবে হয়েছিল, নিশ্চিত করে বলা শক্ত। ৬ চৈত্র [বৃহ 19 Mar] রাত্রে দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুশীলা দেবীর মৃত্যু হয়। এই বধূটিকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী খুব ভালোবাসতেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পরে কিছুদিন পর্যন্ত বির্জিতলার বাড়িতে অভিনয়ের আসর বসা স্বাভাবিক নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের তালিকায় দেখা যায়, 15 Mar [রবি ২ চৈত্র] তিনি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার একটি ছবি এঁকেছেন। অভিনয়টি এইদিনেও হতে পারে।

১ চৈত্র [শনি 14 Mar] রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাবের অষ্টাদশ অধিবেশন উপলক্ষে জেনারেল অ্যাসেম্বলি'জ ইনস্টিটিউশনে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র 'ভূমিকা' অংশ পাঠ করেন। *The Indian Mirror* পত্রিকার 11 March সংখ্যায় এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় : 'The eighteenth ordinary meeting of the Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club will be held on Saturday, the 14th March, at 6-30 P.M. at the General Assembly's Institution, when Babu Robindra Nath Tagore will read a paper on "Reflections of an Indian Tourist in Europe" in Bengal[i]. The Hon'ble Justice Guru Dass Bannerji will take the chair. All are cordially invited.'

গৌরহরি সেন 5 Feb 1889 [মঙ্গল ২৪ মাঘ ১২৯৫] ৮৩ নং বিডন স্ট্রীটে 'চৈতন্য লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন, পরে ৪/১ বিডন স্ট্রীটে লাইব্রেরিটি স্থানান্তরিত হয়। ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে এর যোগাযোগ প্রথমাবধিই ঘনিষ্ঠ ছিল। 16 Aug 1890 [শনি ১ ভাদ্র ১২৯৭] চৈতন্য লাইব্রেরির একটি অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'আর্যামি ও সাহেবিআনা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এর ১১০ সংখ্যক প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ 12 Jan 1891 [সোম ২৯ পৌষ ১২৯৭] লিখেছেন : 'একদিন চৈতন্য লাইব্রেরিতে একজন কাব্যরসসন্দিগ্ধ ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "আচ্ছা মহাশয়, বসন্তকালে, বা জ্যোৎস্নারাত্রে লোকের মনে বিরহের ভাব কেন উদয় হইবে আমি ত কিছু বুঝিতে পারি না।···'[১] ইত্যাদি—এর থেকে অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথেরও সেখানে গতায়াত ছিল। সম্ভবত এই যোগাযোগের সূত্রে গৌরহরি সেন রবীন্দ্রনাথকে প্রবন্ধ পাঠের জন্য অনুরোধ করেন।

Ms. 246-এ ১৫ মাঘ [মঙ্গল 27 Jan] রবীন্দ্রনাথ দিনলিপির বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলিকে একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধের রূপ দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু প্রবন্ধটির মুদ্রিত রূপের [১৬ বৈশাখ ১২৯৮ 28 Apr 1891] সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভাষায়, অভিব্যক্তিতে, অলংকার-প্রয়োগে, নূতন চিন্তার সংযোজনে মুদ্রিত রচনাটি অনেক পরিণত ও সাহিত্যগুণ-সমন্বিত। পাঠকদের সরাসরি সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করার পদ্ধতি পূর্ববর্তী পাঠেও বর্তমান, কিন্তু মুদ্রিত প্রবন্ধে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক ব্যাপক। বিশেষত শেষ অনুচ্ছেদটিতে 'আমার শ্রোতৃবর্গের' বা 'সুধীগণ আমার রচনার বহুল পরিমাণ

নীর পরিত্যাগ ক'রে, যৎসামান্য ক্ষীরটুকুমাত্র, পথের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক-পূর্বক নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত হবেন'-জাতীয় উক্তি দেখে মনে হয়, সভায় প্রবন্ধপাঠের আহ্বান আসার পর রচনাটি পুনর্লিখিত হয়েছিল।

The Indian Mirror-এর 24 March সংখ্যায় এই সভার একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদকের মতে, সভায় বিভিন্ন শ্রেণী ও বয়সের প্রায় ১৫০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, রেভাঃ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, রেভাঃ এ টমোরি [Rev. A. Tomory, M.A.], জে. মুখার্জি, আশুতোষ চৌধুরী, বেদব্যাস সম্পাদক ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও *National Paper* সম্পাদক নবগোপাল মিত্র এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

'The lecturer rose amid loud cheers'. প্রবন্ধটি পাঠ করতে দু'ঘন্টা সময় লাগে, সকলে চুপ করে মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করেন। কিন্তু 'As soon as Babu Rabindra Nath Tagore resumed his seat, Babus NoboKrishna Ghosh and Bhudhar Chatterji spoke, one after another, most eloquently, dissenting from him on his views on female education and female emancipation. The former regretted that the speaker had dwelt on many points, which his subject did not invite. Then followed a speaker who expressed his views in Sanskrit.

Maharajah Kumar Benoy Krishna thanked the lecturer for his most lucid, humourous and entertaining paper. Though on certain points he was not at one with the lecturer, yet he was glad to say, he agreed with him on the whole.

The Hon'ble Chairman then made a few remarks, which were heard with deep attention and hearty approval. At the outset, he praised the fine style, the good humoured irony and above all, the masterly treatment of the subject by the lecturer. He said that though Rabindra Babu had made attacks, right and left upon Hindu Society, yet he was not sorry for them, for they are the outcome of a strong sense of justice, and an overpowering love of refrom. Mr. *Justice Bannerji asked the reformers to bear one thing in mind, before they thrust any reform upon Hindu Society, viz., that when the reformers touched this massive though dilapidated building of Hinduisim, they should approach it with caution and reserve, for it was no an ordinary building, but a Dev Mandir, an abode of God.* As to female education, he said, that the Hindu religious books strictly enjoined the education of women, but [t] o provide a girl with a[n] easy chair and a sensational novel, was not education, but rather destruction.' পরিশেষে তিনি এই ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বক্তৃতামালার আয়োজন করার জন্য চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ দেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসুস্থতা সত্ত্বেও সভা-পরিচালনার দায়িত্ব নিতে সম্মত হওয়ার জন্য, সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার প্রস্তাব করেন। আশুতোষ চৌধুরী প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

রাত্রি দশটায় সভাভঙ্গ হয়।

চৈত্র মাসে ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ পার্ক স্ট্রীটে যান চার বার—৬, ১২, ২১ ও ২৪ তারিখে। [২৪ চৈত্র] সোম 6 Apr তিনি বির্জিতলাতেও গিয়েছিলেন—এই দিন পারিবারিক খাতায় লেখেন সংক্ষিপ্ত দু'টি প্রস্তাব : 'ঘানির বলদ যদি মনে করে…' [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ৩৫] ও 'মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময় মনে হয়, গোলাকার মাথাটা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে ক্রমাগতই কতকগুলো জীবনের বুদবুদ উঠছে। …' [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১ । ৩৫], রবীন্দ্রবীক্ষা সম্পাদক কানাই সামন্ত মন্তব্য করেছেন : 'শিল্পী রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পরে…কবি রবীন্দ্রনাথের এই 'অস্থায়ী' ভাবনাবুদ্বুদটির 'স্থায়ী' রূপ দিয়াছেন…বিস্তৃত তমিস্রপটে বহুসংখ্যক নরনারী-শিশুর প্রায় গোলাকার মুখচ্ছবি। নিম্নে দক্ষিণ কোণে রবীন্দ্র হস্তাক্ষর : নরবুদ্‌বুদ/ রবীন্দ্র'।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

মহর্ষি ১২৭৬ বঙ্গাব্দে লিখিত তাঁর উইলটি গত বৎসর বাতিল করেন, সেকথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে। মহর্ষির শেষ উইল স্বাক্ষরিত হয় 8 Sep 1899 [শুক্র ২৩ ভাদ্র ১৩০৬] তারিখে। এই দু'টি উইলের মধ্যে প্রথমটির মূল এবং দ্বিতীয়টির টাইপ-করা অনুলিপি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আরও একটি উইল করেছিলেন, যার মূল বা অনুলিপি পাওয়া যায়নি—ফলে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিষয়-বন্টনের কী ব্যবস্থা হয়েছিল সে-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। মহর্ষির এই দ্বিতীয় উইল সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে ক্যাশবহির কয়েকটি হিসাব। ৮ আশ্বিন [মঙ্গল 23 Sep]-এর হিসাব : 'ব বাবু নবিনচন্দ্র বড়াল এটরনি দং উইল সম্বন্ধে লেখাপড়ার ব্যয় শোধ বিঃ ২ বিল গুঃ বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ১ বিল—৩৬৬ ১ বিল ১৭৩ / ৫৩৯'—একই দিনের আর একটি হিসাব : 'ঐ দলিল রাখিবার টিনবাক্স একটা ক্রয় ৩৫' অর্থাৎ উইলের মুসাবিদা এবং সেটিকে সযত্নে রাখার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ, কিন্তু কবে দলিলটি রেজেস্ট্রি হয়েছিল সেই মূল্যবান সংবাদটি সম্পর্কে ক্যাশবহি নীরব। ৩১ আশ্বিনের আর একটি হিসাব থেকে ১৪, ১৭ ও ১৮ আশ্বিন 'শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু ও দ্বিপেন্দ্রবাবুর উইল সম্বন্ধে যাতাতের' কথা আমরা জানতে পারি। মহর্ষির শেষ উইলের সময়ে মোহিনীমোহন ও দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু বর্তমান উইল-সম্পর্কে তাঁর ভূমিকা পার্শ্ব-চরিত্রের। ২১ শ্রাবণ [5 Aug] 'শ্রীযুত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের হাইকোর্ট হইয়া পার্ক স্ট্রীট যাওয়া ও তথা হইতে আসিবার গাড়িভাড়া'র হিসাব এবং ১০ আষাঢ় [23 Jun] 'উইল সম্বন্ধে' মোহিনীমোহনের পার্ক স্ট্রীটে যাওয়ার দিন রবীন্দ্রনাথও সেখানে গিয়েছিলেন—এই দু'টি তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ উক্ত উইল সম্পর্কে অন্তত অবহিত ছিলেন। কিন্তু আশ্বিন ১২৯৭ [sep 1890]-তে যদি উইলটি স্বাক্ষরিত ও রেজেস্ট্রি হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত হননি—কারণ ২৩ শ্রাবণ [বৃহ 7 Aug] বিলাত যাত্রার পথে সোলাপুরের উদ্দেশে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন।

[আরক্ষাবাহিনী ও আদালতের দপ্তরে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে আমাদের সুযোগ ও সাহসের অভাব আছে, সুতরাং কোনো রবীন্দ্রানুরাগী আইনজীবী যদি ঠাকুরপরিবার ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে যত্নবান হন আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হব।]

১১ মাঘ [শুক্র 23 Jan 1891] মাঘোৎসবের দিন রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় সন্তান ও মধ্যমা কন্যা রেণুকার জন্ম হয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

২৮ ফাল্গুন [বুধ 11 Mar] হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে আসামের বিখ্যাত লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার বিবাহ হয়। ঠাকুরপরিবারে এই ধরনের বিবাহ এই প্রথম। লক্ষ্মীনাথের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেও বিবাহের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তীব্র। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামক এক ব্যক্তি এই বিবাহে মধ্যস্থতা করেন। লক্ষ্মীনাথ লিখেছেন : 'ঠাকুরবাড়িতে যখন বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বস্ত কর্মচারী একজন আমার বাসায় এসে জিজ্ঞাসা করে—বিয়েতে আমার দিক থেকে কিছু দাবি আছে কিনা অর্থাৎ আমি কত টাকা চাই।···আমি সেই কর্মচারীটিকে উত্তর দিলাম—আসামে অসমীয়া লোকদের মধ্যে টাকা নিয়ে মেয়ে বিয়ে করার প্রথা নেই।' এই কারণেই বিবাহের ব্যয়ের [৯২৮॥০] যে হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে তা নিতান্তই কম। বিবাহের বর্ণনার পর লক্ষ্মীনাথ লিখেছেন : "মহর্ষি তখন পার্ক স্ট্রীটে ছিলেন। বিয়ের পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমরা দুজনে তাঁর কাছে আশীর্বাদ চাইতে গেলাম। তিনি আমায় আশীর্বাদ করে আমায় একটা সোনার কলম দিলেন। তারপর আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার এই কলম থেকে সুনিপুণ লেখা বেরুবে।' নাতনীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে হাতে সুন্দর গোলাপ একগুচ্ছ দিয়ে বললেন, 'তোমার যশ সৌরভ এই ফুলের সৌরভের মতো চতুর্দিকে বিস্তার হবে।'···" ক্যাশবহিতে এই বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়, অবশ্য মহর্ষি নাতনিকে গোলাপগুচ্ছের চেয়েও মূল্যবান কিছু দিয়েছিলেন : 'শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর শুভবিবাহে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় যৌতুক দিবার জন্য ব্রশলট ১ জোড়া ক্রয়ের মূল্য শোধ···১৩৫ বরকে দিবার জন্য সোনার কলম···৫০'।

আনন্দানুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই বাড়িতে শোকের ছায়া পড়ল। ৬ চৈত্র [বৃহ 19 Mar] রাত্রি ৮টার সময় দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুশীলা দেবীর মৃত্যু হয়। দিনেন্দ্রনাথ ও নলিনী দেবী—তাঁর দুটি সন্তান। সুশীলা দেবীর মৃত্যুর মাত্র এক মাস পাঁচ দিন পরে ১১ বৈশাখ ১২৯৮ [বৃহ 23 Apr] দ্বিপেন্দ্রনাথ হেমলতা দেবীকে বিবাহ করেন। ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় বলেছেন : 'আমার খুড়োজ্যাঠাদের কারো ২ বেশ [কম] বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কখনো দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করেননি। অথচ অনুরূপ ক্ষেত্রে ভাইরা বেশি কালক্ষেপ না করেই আবার অনায়াসে নতুন বউ ঘরে আনতে দ্বিধা বোধ করেননি। আমার মা দ্বিপুদাদার প্রথম স্ত্রী সুশীলা বৌঠানকে (লাখুটিয়ার জমিদারের মেয়ে) খুব ভালবাসতেন; তাই বড়দা যখন মোহিনী চাটুয্যের বোন হেমলতা দেবীকে স্ত্রীবিয়োগের অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে' আনলেন, তখন মা তাঁর সঙ্গে ভাল করে' কথাই কইলেন না।

1890-তে ইন্দিরা দেবী প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী-রূপে এবং সুরেন্দ্রনাথ ও জ্যোৎস্নানাথ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই সরলা দেবী বেথুন কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ইংরেজি অনার্স-সহ বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রমথ চৌধুরী ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেন। এফ. এ. পাশ করার পর আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জ্যোৎস্নানাথ ইংলন্ড যাত্রা করেন ও 13 Sep [শনি ২৯ ভাদ্র] লণ্ডনে পৌঁছন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

আদি ব্রাহ্মসমাজের একষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠিত হয় ১১ মাঘ [শুক্র 23 Jan 1891]। প্রাতঃকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও হেমচন্দ্র চক্রবর্তী বেদী গ্রহণ করেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একটি প্রবন্ধ পাঠ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ উদ্বোধন করেন। পরে স্বাধ্যায়ন্ত উপাসনা সমাপ্ত হলে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উপদেশ পাঠ করেন। সায়ংকালীন অধিবেশনে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করলে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধ পাঠ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় উপদেশ পাঠ ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রার্থনা করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিবরণে [ফাল্গুন। ২০১-২২] একটি মাত্র ব্রহ্মসংগীত মুদ্রিত হয় : ইমন-একতালা ।/ থাক নাথ থাক মোর সাথে অনুক্ষণ। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, এই অনুষ্ঠানের জন্য ১৩৫৯ টাকা ব্যয়িত হয়েছিল।

ইতিপূর্বে অগ্র° মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আদি ব্রাহ্মসমাজের নবনিযুক্ত কর্মচারীদের যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, পূর্বনিযুক্ত পদাধিকারীদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ অধ্যক্ষ হিশেবে নিযুক্ত হয়েছেন। নীতীন্দ্রনাথ স্থপতি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনি এর পর থেকে মাঘোৎসবের গৃহসজ্জার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে সর্বাধিক উৎসাহী ছিলেন। তাঁর উৎসাহের পরিচয় আছে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এর 'অধ্যক্ষসভা'-শীর্ষক প্রস্তাবে। এর ফলে তাঁর উপর কিছু কিছু দায়িত্বও এসে পড়েছে। ৬ ফাল্গুনের হিসাবে দেখা যায় : 'বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং আদি ব্রাহ্ম সমাজের বাটী মেরামত করাইবার জন্য দেওয়া যায়···৩০০্;' ৩০ চৈত্র [রবি 12 Apr] বর্ষশেষের উপাসনায় তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত'-শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং ভাদ্র ১২৯৮ থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের 'অন্যতর সম্পাদক' ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের পক্ষে বর্তমান বৎসরটি উল্লেখযোগ্য। আশ্রমটিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দিকে মহর্ষির মনোযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় ৩ ভাদ্রের একটি হিসাবে : 'ব° বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী শান্তিনিকেতনের ট্রষ্টীগণ দ° শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় জন্য দেওয়া যায়···১৫০০০্'। এখানে অন্যতম ট্রাস্টী রবীন্দ্রনাথের নাম নেই, কারণ তিনি তখন বিলাতযাত্রার পথে সোলাপুরে অবস্থান করছেন। মন্দির স্থাপনের ব্যবস্থাদি করার জন্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে সপরিবারে শান্তিনিকেতন যাওয়ার ১০০ টাকা খরচ দেওয়া হয় ১০ ভাদ্র। ২৫ ভাদ্রের হিসাব : 'শান্তিনিকেতনের মন্দির তৈয়ারীর নকসা জন্য প্রতাপবাবুর নিকট···যাতায়াতের গাড়িভাড়া' অর্থাৎ মন্দির-নির্মাণের প্রাথমিক কাজকর্ম এই ভাদ্র মাসেই গতিপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর ২২ অগ্র° [রবি 7 Dec] 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হল। তত্ত্ববোধিনী, পৌষ [পৃ ১৬৮-৬৯]-সংখ্যায় শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন'-শীর্ষক প্রতিবেদনে লিখিত হয় : '···এতদিন এই আশ্রমে ব্রহ্মোপাসনার জন্য পৃথক মন্দির না থাকায় প্রাসাদেই উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইত। মহর্ষি, সাধকদিগের এই অসুবিধার কথা জ্ঞাত হইয়া শান্তিনিকেতনে লৌহময় সুপ্রশস্ত ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ট্রষ্টী মহোদয়দিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য

আরম্ভ হইয়াছে। গত ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়। অনন্ত নীলাকাশের নিম্নে আশ্রম প্রাঙ্গণে উপাসনার জন্য সকলে একত্র হইয়াছিলেন। সুরুল, রায়পুর, বোলপুর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী ভদ্রপল্লী হইতে ৬০/৭০ জন নানাশ্রেণীর বিশিষ্ট ভদ্রলোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করেন; এবং অতিশ্রদ্ধেয় সুকবি ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুরাগভরে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। উপাসনাশেষে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য এবং স্বদেশবাসী জনগণের ধর্ম্মোন্নতির জন্য পরম ভক্তিভাজন মহর্ষির প্রাণগত যত্ন ও ভূরি পরিমাণ অর্থ ব্যয় ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই, "যদিও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় স্থান ব্রহ্মসত্তাতে পরিপূর্ণ এবং আমাদের হৃদয়ই যথার্থতঃ ব্রহ্মের মন্দির, কিন্তু বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া সামাজিক ভাবে ভগবদারাধনার জন্য ব্রহ্মমন্দিরের প্রয়োজন। আমরা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি।···তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া আমরা আজ যে বীজ প্রোথিত করিলাম, তাঁহার প্রসাদে কালক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইবে।..."

অনন্তর ভিত্তিমূলে যে খোদিত তাম্রফলক প্রোথিত করা হয়, সত্যেন্দ্র বাবু সর্ব্বসমক্ষে তাহা পাঠ করিলেন। তাম্রফলকে এই কয়েকটি কথা দেবনাগর অক্ষরে খোদিত আছে।

"ওঁ তৎসৎ। ঠক্কুরবংশাবতংসেন পরমর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ। অগ্রহায়ণ ২২ রবিবাসর।" পরে সকলে মন্দিরের ভিত্তি মূলে গমন করিলে তাম্রফলক, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা এবং উক্ত ২২ অগ্রহায়ণের Statesman পত্রিকা, এই অগ্রহায়ণ মাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" একটি আধারে আবদ্ধ করিয়া মন্দিরের ঈশান কোণে প্রোথিত করা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত দ্রব্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া স্বহস্তে কর্ণিক দ্বারা ভিত্তি প্রস্তর গাঁথিয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে সত্যেন্দ্রবাবু পরমেশ্বরের নিকট এই শুভকার্য্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ করিলেন।'[১]

এক বৎসর পরে মহর্ষির দীক্ষার দিনটি স্মরণ করে ৭ পৌষ ১২৯৮ [সোম 21 Dec] তারিখে মন্দিরের দ্বারোদঘাটন হয়। আশ্রমধারী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ও পরবর্তীকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মন্দিরের নির্মাণ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'এ-বিষয়ে প্রসিদ্ধ সিকদার কোম্পানীর প্রসন্নকুমার সিকদার মহাশয়ের কৃতিত্ব স্মরণীয়···তিনি কাজ দেখবার জন্যে প্রায়ই আসতেন, আমার মনে আছে। আমি বরাবরই শুনেছি, তিনিই এখানকার, মন্দিরের ইঞ্জিনিয়ার। কোনো বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারকে আস্‌তে দেখি নাই।···তখনকার দিনে পাথরের কাজ প্রায় সবই বিদেশী কোম্পানীর হাতে ছিল। মন্দিরের মার্বেল-পাথরের মেঝে ও বাইরের বালি-পাথরের পৈঠাগুলি কাদের কাজ তা আমি জানি না।···মন্দিরটি ঢালাই-লোহায় তৈরি, কলিকাতায় নানা অংশে প্রস্তুত করে এখানে আনা হয়।'[১]

১৪ পৌষ [রবি 28 Dec] মহর্ষির ৫২-২, পার্ক স্ট্রীট-স্থ বাসভবনে The Theistic Conference-এর প্রথম দিনের অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

সত্যেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত-সম্ভাষণ করেন। এর পর উপাসনার আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ আর একটি গান করেন। মহর্ষি কিছুক্ষণ সভায় উপস্থিত থাকার পর একটি সংস্কৃত আশীর্বচন উচ্চারণান্তর প্রস্থান করেন। মিঃ রানাডের বক্তৃতা, সংকীর্তন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ভাষণ ইত্যাদির পর রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। 30 Dec [মঙ্গল ১৬ পৌষ সন্ধ্যায় ও 31 Dec প্রাতে আরও দু'টি অধিবেশন হয় সিটি কলেজের হলে। আগামী বৎসরের জন্য যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় তাতে অন্যদের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী নির্বাচিত হন।

ইতিমধ্যে বাংলা দেশের হিন্দুসমাজে একটি প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। বোম্বাইয়ের সমাজ-সংস্কারক মিঃ মালাবারি বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য অনেক দিন ধরেই আন্দোলন করছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তর্কবিতর্কের কিছু বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। বর্তমান বৎসরের শুরুতে একটি ঘটনা এই বিতর্কের আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। হরিমোহন মাইতি নামক ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি তার দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা পত্নী ফুলমণির সঙ্গে জোর করে সহবাস করতে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটানোর দায়ে অভিযুক্ত হয় ও জুরিদের সর্বসম্মত রায়ে বিচারপতি উইলসন হরি মাইতিকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে Sir Andrew Scoble 9 Jan 1891 [শুক্র ২৬ পৌষ] বড়োলাটের আইন-পরিষদে [Supreme Legislative Council] সহবাস-সম্মতির বয়স-সম্পর্কিত আইনের খসড়া [Age of Consent Bill] উপস্থিত করেন। আইনটি সারা ভারতের জন্য, কিন্তু বঙ্গদেশে এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাকে এক কথায় বলা যায় অভূতপূর্ব। বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক ও তার সহযোগী 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকা এ-বিষয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি নব্যহিন্দুধর্মান্দোলনের নেতারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করতে থাকেন। জন্মভূমি, ফাল্গুন-সংখ্যায় [পৃ ১৬৮-৭২] ৫ মাঘ থেকে ১৪ ফাল্গুন পর্যন্ত এরূপ ৩৪টি সভার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ১৪ ফাল্গুন [বুধ 25 Feb] ময়দানে যে 'মহাসভা' হয়, জন্মভূমি-র হিসাব-অনুযায়ী তাতে 'প্রায় দুই লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিলেন।' *The Bengalee* [Feb 9, p. 103]-তে লিখিত হয় : 'Calcutta witnessed an enormous mass-meeting, the largest that has ever been held to protest against a measure of Government, at the Maidan on the Wednesday last. Several platforms had been erected from which the speakers addressed the vast audience.' কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও 19 Mar 1891 [বৃহ ৬ চৈত্র] আইনটি বিধিবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ উক্ত 'মহাসভা'র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি ওই দিন বির্জিতলায় গিয়ে পারিবারিক খাতায় একটি রচনা লেখেন—কিন্তু আলোচ্য আন্দোলন-সম্পর্কে তাঁকে কোনো মন্তব্য করতে দেখা যায় না। অবশ্য কয়েক মাস পরে [আষাঢ় ১২৯৮] তিনি 'হিতবাদী' সাপ্তাহিকে 'অকাল বিবাহ' প্রবন্ধ লেখেন ও চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে চিঠিপত্রে বিষয়টি অবলম্বন করে বিতর্কে প্রবৃত্ত হন।

আইনটি বিধিবদ্ধ হওয়ার পর বঙ্গবাসী-তে ১৫ চৈত্র [28 Mar] 'আমাদের অবস্থা' এবং ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৩ জ্যৈষ্ঠ [16 May] 'ইংরেজরাজের প্রকটমূর্তি' ও 'অসভ্য হিন্দুর প্রধান ও প্রথম ধারণা' ও ২৪ জ্যৈষ্ঠ [6 Jun] 'পরিণাম কি?' ও 'অসভ্যের পক্ষে অকপট নীতিই ভাল'—শীর্ষক পাঁচটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। কোনো প্রবন্ধেই লেখকের নাম না থাকলেও জানা গেছে, এদের মধ্যে দু'টি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ও একটি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা।[২] বাংলার লেফটেন্যান্ট গবর্নর চার্লস এলিয়ট ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে

রাজদ্রোহের অভিযোগে বঙ্গবাসী-কে অভিযুক্ত করেন। আনুগত্যের মুচলেকা নিয়ে মামলাটির সমাপ্তি ঘটানো হয়।

বঙ্গবাসী-র সহযোগী 'জন্মভূমি' পত্রিকার চৈত্র-সংখ্যায় 'সহবাস-সম্মতির আইন' প্রবন্ধটিও [পৃ ২১২-১৪] একই কারণে অভিযুক্ত হতে পারত। স্বাক্ষরহীন এই রচনাটির শেষে লেখা হয়েছে : 'ইংলন্ডের সমুদয় অধিবাসী, বিশেষত ইংলন্ডের বণিকসম্প্রদায়ই ভারতের প্রকৃত অধীশ্বর।···বিলাতের বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিতে পারিলেই বিলাতি বণিক স্বার্থের বশে আমাদের প্রতি সদয় হইবেন। যদি হিন্দুসন্তান কেহ থাক, যদি পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে লজ্জিত না হও, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিলাতি বিলাস পরিত্যাগ কর।' শুধু প্রস্তাব নয়, একে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে The Boycotters' League নামে একটি সংস্থাও গঠিত হয়। *The Indian Messenger*,-এ লেখা হয়েছে : 'A league under the above name is an outcome of the late agitation on the subject of the age of consent. The object of the members of this league is to boycott English goods.'[১] পনেরো বছর পরে 1905-এ বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রতিবাদে যে বিলাতি-বর্জন আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থরক্ষার তাগিদে একই ধরনের আহ্বান একটু কৌতুকাবহ হলেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি লক্ষণীয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

Dec 1889-এ বোম্বাইতে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে স্থির হয় পরবর্তী অধিবেশন হবে কলকাতায়—1886-এর পর দ্বিতীয় বার। এই প্রস্তাব অনুযায়ী 1890-র 26 Dec [শুক্র ১২ পৌষ] থেকে 29 Dec [সোম ১৫ পৌষ] পর্যন্ত চারদিন ধরে কলকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন মিঃ [পরে স্যার] ফেরোজশা মেটা [1845-1915]। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিশেবে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের [1840-99] নাম প্রস্তাবিত হয়, কিন্তু তিনি অসুস্থতার জন্য সম্মত না হওয়ায় সুপরিচিত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ [1844-96] এই পদে নির্বাচিত হন। সমিতির সম্পাদক হন জানকীনাথ ঘোষাল। এর আগের বারের অধিবেশন হয়েছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও টাউন হলে। কিন্তু ক্রমেই কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা বেড়েছে, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সংখ্যাও হয়েছে বিপুল। সুতরাং অনুষ্ঠানের জন্য সুপ্রশস্ত জায়গার প্রয়োজন ছিল। 'অল্প সময়ের মধ্যে সহজে সুবিধাজনক স্থান সংগৃহীত হয় নাই। পরিশেষে কলিকাতা নিবাসী পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বালিগঞ্জ স্থিত সুপ্রশস্ত উদ্যানের প্রতি (Trivoli Gardens) অনেকের চক্ষু নিপতিত হইল—···অনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির কতিপয় সভ্য উক্ত স্থান সংগ্রহার্থে উহার বর্ত্তমান সত্বাধিকারিগণের নিকট প্রস্তাব করিবামাত্র যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র কুমার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সম্মতি অনুসারে বিনামূল্যে তিন মাসের জন্য উহার সম্পূর্ণ অধিকার সমিতির হস্তে প্রদান করিলেন।···সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল তদীয় সহযোগীগণের সহিত দিবা-রজনী

অকাতরে ঘোরতর পরিশ্রম সহকারে বিবিধ আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।'[২] ২৫২ ফুট দীর্ঘ ও ১২৫ ফুট প্রস্থ একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হয়।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বক্তৃতা, প্রস্তাব-গ্রহণ ইত্যাদি গতানুগতিক ভাবেই সম্পন্ন হয়, সে দিক দিয়ে খুব বেশি বৈচিত্র্য ছিল না। সহবাস-সম্মতির আইনের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সামাজিক বিষয়ে আললাচনা চলতে পারে না এই যুক্তিতে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ছোটোলাটের দপ্তর থেকে প্রচারিত একটি সার্কুলারকে কেন্দ্র করে, এই সার্কুলারে কোনো সরকারী কর্মচারীর পক্ষে দর্শক-রূপেও কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান নিষিদ্ধ হয়। অধিবেশনের শেষ দিনে মনোমোহন ঘোষ এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব আনেন।

ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা কংগ্রেসের এই অধিবেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য 10 Jan [শনি ২৭ পৌষ] মনোমোহন ঘোষ যে উদ্যান-সম্মিলনীর আয়োজন করেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সক্রিয় উপস্থিতির কথা আগেই বলা হয়েছে। অমল হোমের সৌজন্যে প্রাপ্ত একটি আলোকচিত্রে কংগ্রেস-সভাপতি ফেরোজশা মেটা, প্রাক্তন সভাপতি ডব্লু সি. বোনার্জি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও দেখা যায়।

কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন শেষ হওয়ার দু'দিন পরে 31 Dec [বুধ ১৭ পৌষ] ট্রিভোলি গার্ডেনের মণ্ডপেই ব্যারিস্টার প্রিঙ্গল কেনেডি [Mr. Pringle Kennedy]-র সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

---

১ নব্যভারত, পৌষ ১২৯৭। ৪৯৯, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'মন্ত্রি-অভিষেক' [সমালোচনা] প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

২ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তজাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ১ [২য় সং, ১৩৮৯]। ৬৪

৩ নব্যভারত, পৌষ ১২৯৭। ৪৯৮

১ Ghosal, better known by her maiden little of Sreemati Swarna Kumari Davi, the grand-daughter of Dwarakanath Tagore, and sister of Bengal's most thoughtful poet,...'—*The Bengalee*, May 10, 1890 [Vol. XXX, No. 19, p. 217]-তে উদ্ধৃত।

২ প্রবাসী, অগ্র° ১৩২৪। ১২১-৩৪-এ মুদ্রিত 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে এই দুই শ্রেণীর ইংরেজকেই তিনি 'ছোটো ইংরেজ' ও 'বড়ো ইংরেজ' অভিধা দিয়েছিলেন, দ্র কালান্তর ২৪। ২৭২-৯৩; প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪। ২৩৫-৪৩-এ মুদ্রিত 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে [দ্র সমূহ ১০। ৬২৩-৩৫] এদের অভিধা 'ক্ষুদ্র ইংরেজ' ও 'বৃহৎ ইংরেজ'।

৩ পত্র, 5 Jan 1940: শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬। ৪৭৫

১ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৭৭]। ২৯১

২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ৪৯৮

৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচিতি' প্রথম খণ্ডের [১৩৮৫] ৭০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখেছেন : "এই সংস্করণে [১৩০৬] দ্বিত্বযুক্ত অক্ষরের পরিবর্তে 'বিসর্জন' লেখেন; ইতিপূর্ব্বে, লেখা 'বিসর্জ্জন'।" এই তথ্য যথার্থ নয়; প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে ও তত্ত্ববোধিনী-র বিজ্ঞাপনে 'বিসর্জন' বানানই পাওয়া যায়।

১ চিঠিপত্র ৫। ১৩৮-৩৯, পত্র ৪

২ ঐ। ১৩১, পত্র ১

১ দ্র শিশির বসু, একশ বছরের বাংলা থিয়েটার। ২৭০

২ চিঠিপত্র ৫। ১৪৭, পত্র ৪

৩ শিশির বসু-প্রদত্ত তালিকায় হরিভূষণ দেবদত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, অবশ্য সামান্য পরিবর্তনে একই ব্যক্তির পক্ষে উভয় চরিত্রে অভিনয় করা সম্ভব; তাঁর তালিকানুযায়ী শঙ্করের ভূমিকাভিনেতার নাম চুনিলাল মিত্র দ্র একশ বছরের থিয়েটার [১৩৮০]। ২৭০

৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩ [১৩৭৬]। ২৫৩, পাদটীকা ১

৫ ঘরোয়া। ১১৩-১৪

১ সাহিত্য, আষাঢ়। ১২০

২ চিঠিপত্র ৫। ১৩৫-৩৬, পত্র ২

৩ Talks in china [1925], PP. 67-68, At the Scholar's Dinner, Peking.

১ রবীন্দ্রনাথের জর্মান-চচা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'মুল জর্মান থেকে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ কবিতা ও অনুষঙ্গ প্রবন্ধে, দ্র দেশ, ৮ অগ্র° ১৩৮৬ [8918], ১৭-৩২; নানা রবীন্দ্রনাথ [১৩৮৯]। ৩৪-৬৬

২ 'সূচনা', চিত্রাঙ্গদা ৩। ১৫৯

৩ চিঠিপত্র ৫। ১৩৬-৩৭, পত্র ৩

১ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ১

২ পাণ্ডুলিপিতে তারিখ : '২০ অগষ্ট। ৯০। মঙ্গলবার'—কিন্তু Ephimeris অনুযায়ী 20 Aug 1890 বুধবার ছিল।

১ চিঠিপত্র ৫। ১৫২-৫৩, পত্র ৭ [সাজাদপুর * 4 Feb 1891]

২ রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা ১। ৪৪-৪৫

১ চিঠিপত্র ১। ১১, পত্র ২

১ 'সন্ধ্যায়' কবিতাটি 'মানসী' পাণ্ডুলিপি [Ms. 128] ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র পাণ্ডুলিপি [Ms. 250] উভয়েই পাওয়া যায়; অনুমান করতে পারি শেষোক্ত পাণ্ডুলিপিতেই প্রথম রচিত হয়েছিল, Ms. 128-এ নকল করা হয়েছে পরে। কিন্তু দুটি পাণ্ডুলিপিতেই কবিতা-রচনার স্থানকাল নির্দ্দেশিত হয়েছে; '২৯ অগষ্ট ৯০ Red sea/23/10/90 Suezcanal-এর মধ্যে '২৯ অগষ্ট' তারিখটি সন্দেহজনক, দিনলিপিতে কবিতাটি পাওয়া গেছে 31 Aug-এর বিবরণের পরে ও 29 Aug তিনি এডেন বন্দরে জাহাজ বদল করেছেন মাত্র, তখনও Red sea-তে প্রবেশ করেননি।

২ চিঠিপত্র ১। ১৩, পত্র ৩

১ এখানে সম্ভবত *Hamlet*-এর অভিনয়ও দেখেছেন। তৃতীয়বার বিলাত-যাত্রার পথে লিখেছেন : (···সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের হ্যাম্‌লেট ও ব্রাইড অফ লামার্মুর দেখিতে গিয়েছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।' —'অন্তর বাহির' পথের সঞ্চয় ২৬। ৫০৬

২ দ্র আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ১২

১ Rabindranath Tagore, A Biography, P.131

১ ছিন্নপত্রাবলী-তে চিঠির তারিখ লন্ডন/১০ অক্টোবর ১৮৯০'—কিন্তু এটি ভুল। 10 oct রবীন্দ্রনাথ টেম্‌স্ জাহাজে ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে Isle of Wright ও Ventnor শহর ভোরবেলাতেই পার হয়ে গেছেন। অপরপক্ষে ৪ oct-এর দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন, 'বাড়িতে চিঠি লিখলুম'—আমাদের অনুমান এই চিঠিটিই ছিন্নপত্রাবলী-র ৮ সংখ্যক পত্র [পৃ ২৫-২৬

২ মানসী ও য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-র পাণ্ডুলিপিতে 'শেষ উপহার' কবিতার শীর্ষে লেখা।

১ অমৃত, 9 Mar 1979, পৃ ৪৬, পত্র ২২।

১ গ্রন্থে কবিতাটি রচনার তারিখ '১১ কার্ত্তিক ১৮৯০', পাণ্ডুলিপিতেও [Ms. 128] আছে '২৭-১০-৯০ সোমবার Red Sea—কিন্তু য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-র পাণ্ডুলিপিতে তারিখ আছে '২৮-১০-৯০ মঙ্গলবার', এই তারিখটিকেই আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করেছি।

২ ডায়ারির তারিখ '৩ নভেম্বর' আমাদের ধারণানুযায়ী ভুল। দিনলিপিতে তিনি দিনগুলি চিহ্নিত করেছেন 'বার' দিয়ে ডায়ারিতে তাকে তারিখে পরিণত করতে গিয়ে হয়তো অনবধানতাবশত এই ভুলটি করা হয়েছে।

১ ভারতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ১ [১৩৮৯]। ৬৬-৬৭

২ 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন' : তত্ত্ব° পৌষ। ১৬৮

৩ রবীন্দ্রস্মৃতি। ২৮

১ ঘরোয়া। ১২৫, ১২৭

১ 'সাহিত্য-সেবকের ডায়ারি', সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১০। ৪০

২ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

১ চিঠিপত্র ১। ১৭, পত্র ৫; পত্রটিতে আনুমানিক তারিখ দেওয়া হয়েছে। '[কালিগ্রাম, ডিসেম্বর ১৮৯০]'-কিন্তু এটি হওয়া উচিত 'জানুয়ারি ১৮৯১'।

২ ছিন্নপত্রাবলী। ২৭, পত্র ৯

৩ ঐ। ৩০, পত্র ১০

১ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। ১২০-২১

২ ছিন্নপত্রাবলী। ৩১-৩২, পত্র ১১

৩ ঐ। ৩৩-৩৪, পত্র ১২ [? ৯ মাঘ বুধ 21 Jan]

১ চিঠিপত্র ৫।১৪৮। পত্র ৫

২ বরদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সাজাদপুরের নায়েব

৩ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৯, পত্র ১৫

৪ ঐ। ৩৯-৪০

৫ চিঠিপত্র ৫। ১৫২, পত্র ৭; পত্রটিতে তারিখ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খামে পোস্টমার্ক পাওয়া যায় 'PABNA 4 FEB 91।'

১ চিঠিপত্র ৫। ১৫৫, পত্র ৯

২ ছিন্নপত্রাবলী। ৪২, পত্র ১৬

৩ ঐ। ৪৬, পত্র ১৭

৪ চিঠিপত্র ৫। ১৫৩-৫৪, পত্র ৮

৫ দ্র প্রসন্নময়ী দেবী, 'আশুতোষ' ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩২। ৫১০; বাড়িটির আসল নম্বর-'63', লক্ষণীয় খামে দ্বিধাগ্রস্তভাবে '53/54' লেখা হয়েছে।

৬ শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ [১৩৮০]। ৩১৩

৭ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৭, পত্র ১৮

১ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

২ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, আমার জীবনস্মৃতি [১৩৮১]। ১২৮-২৯

৩ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩৩

১ রবীন্দ্রবীক্ষা ১।

১ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, 'আমার জীবনস্মৃতি'। ১২৪

১ একই বিবরণ তত্ত্ব-কৌমুদীর ১ পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

১ 'শান্তিনিকেতনের কথা' [১৩৫৭] ৮৯-৯০

২ দ্র 'তর্পণ/অক্ষয়-শতকোৎসব'। ৩৪

১ *The Indian Messenger*, 12 Apr 1891 [vol. VIII, No. 31], p. 242

২ 'মহাযজ্ঞ', ভারতী ও বালক, পৌষ-মাঘ। ৫৪২

এ ক ত্রিং শ অ ধ্যা য়

১২৯৮ [1891-92] ১৮১৩ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের একত্রিংশ বৎসর

রবীন্দ্রনাথ ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ চৈত্র [শনি 14 Mar 1891] জেনারেল অ্যাসেম্বলি'জ ইনস্টিটিউশনে চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাবের অষ্টাদশ অধিবেশন উপলক্ষে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র 'ভূমিকা' অংশ পাঠ করেন, একথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এর মাস দেড়েক পরে প্রবন্ধটি 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (ভূমিকা)। প্রথম খণ্ড' নামে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ : 5 May 1891 [মঙ্গল ২১ বৈশাখ ১২৯৮]। আখ্যাপত্রে আছে : 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি।/(ভূমিকা)/ প্রথম খণ্ড / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও/প্রকাশিত। ৫৫নং চিৎপুর রোড /মূল্য ॥০ আট আনা।'

৭৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে : 'উৎসর্গ/শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত/সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ/স্মরণোপহারস্বরূপে/উৎসর্গ করিলাম।/গ্রন্থকার'—লোকেন্দ্রনাথের উপরোধেই রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের পথে যাত্রা করেছিলেন, উৎসর্গ-পত্রে তারই স্বীকৃতি রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটিও [আখ্যাপত্রে মুদ্রিত তারিখ : ৮ আশ্বিন ১৩০০ শনি 23 Sep 1893] তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়েছে।

'১৬ বৈশাখ ১২৯৮' [মঙ্গল 28 Apr] তারিখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখেন : 'এই প্রবন্ধটি চৈতন্য-লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হয়। আমার ইংলণ্ড যাত্রার ভূমিকা-স্বরূপে ইহা রচিত হয়—কোন কারণবশতঃ ইহাকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিলাম। ডায়ারি-অংশ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।'

পরবর্তীকালে এই 'ভূমিকা' বা 'প্রথম খণ্ড'টিকে দু'টি প্রবন্ধে বিভক্ত করে গদ্য-গ্রন্থাবলী-র দ্বাদশখণ্ড 'স্বদেশ' গ্রন্থে 'নূতন ও পুরাতন' [দ্র ১১। ৪৬৯-৮৪] নামে প্রথম অংশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড 'সমাজ' গ্রন্থে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' [দ্র ১২। ২৩৬-৫০] নামে শেষাংশটি সংকলিত হয়। 'রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা'র 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট-সহ প্রকাশিত হয়েছে [আশ্বিন ১৩৬৭]।

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি প্রথম খণ্ডের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয় নব্যভারত-এর ফাল্গুন-সংখ্যায় [পৃ ৫৮৬] : "রবীন্দ্রবাবু বিলাতি সমাজের সঙ্গে বঙ্গসমাজের তুলনা করিয়া এই ডায়ারি লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখা চিরদিনই সরস, তবে চিত্রগুলি একপেশে রকমের হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বঙ্গরমণী সর্ব্বাংশে সুখী, একথা

কি সম্পূর্ণ সত্য? আর তা হ'লেও অজ্ঞ ও কুসংস্কারপূর্ণ বাঙ্গালীর মেয়ের ও একজন জ্ঞানালোক-প্রাপ্ত ইউরোপীয় মহিলার সুখের মধ্যে কি তারতম্য নাই? অসভ্য হটেন্টট ও সাঁওতাল প্রভৃতি জাতীর স্ত্রীলোকরাও কি আপন আপন পরিবারে সুখী নয়? তবে জ্ঞানের সঙ্গে সুখের মিলনে যাহা হয়, অজ্ঞানতার অবস্থায় তাহা হইতে পারে না। চিত্রগুলিতে যেন একটু বেশি মাত্রায় 'আর্য্যামি' প্রকাশ হইয়াছে।"

২৫ বৈশাখ [বৃহ 7 May] রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করে একত্রিংশ বৎসরে পদার্পণ করলেন। অন্যান্য বৎসরের মতো এ বৎসরও পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে তাঁর জন্মদিন পালিত হয়েছে। সত্যপ্রসাদ তাঁর হিসাব-খাতায় লিখেছেন : 'রবিমামার জন্মদিনে উপহার খরিদ ২০' টাকা। একটি মূল্যবান উপহার দেন প্রিয়ম্বদা দেবী, 'রবিবাবুকে জন্মদিনের উপহার।/প্রিয়/২৫শে বৈশাখ ১২৯৮' লিখে তিনি একটি বাঁধানো নোটবই রবীন্দ্রনাথকে অর্পণ করেন। এটি মূল্যবান এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ এতে সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের অনেকগুলি কবিতা লিখে রেখেছেন [রবীন্দ্রভবন সংগ্রহণ-সংখ্যা : Ms. 129]। এটি সম্ভবত মূল পাণ্ডুলিপি নয়, অন্য কোনো খসড়া-খাতা থেকে কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ এতে নকল করেছেন—হয়তো-বা প্রিয়ম্বদা দেবীরই অনুরোধে ['এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি কিছুটা কপি করার পর তিনি লিখেছেন : 'লেখা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আর কপি করতে পারিনে ইতি ২৩ ফাল্গুন ১৩০০ রামপুর বোয়ালিয়া/চৈত্রমাসের সাধনার জন্যে পাঠানো গেল—']। নোটবইটির প্রথম পাতাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

Entbehren Sollst du, sollst entbehren. Goethe

Thou must do without, do without!

—গ্যেটের এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল, 5 Oct 1895 [শনি ১৯ আশ্বিন ১৩০২] কুষ্টিয়া থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে তিনি এই বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন—সমস্ত পত্রটি যেন এরই ব্যাখ্যা [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৪৮৫-৮৬, পত্র ২৩৬]।

এই একত্রিংশতম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ সর্বোত্তম উপহারটি পেয়েছেন ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। 'রবিকার জন্মদিনে উপহার।/সুরি ও বাবি।/২৫ বৈশাখ ১২৯৮' [কোথাও '২৫।১।১২৯৮'] লিখে তাঁরা উপহার দিয়েছেন Herbert Spencer [1820-1903]-এর অনেকগুলি গ্রন্থের মূল্যবান সংস্করণ। এর মধ্যে আছে (১) *Essays: Scientific, Political and Speculative*, Vol. I [1883], (২) ঐ, Vol. II [1883], (৩) *The Principles of Psychology* [1881], (৪) *The Study of Sociology* [1880] (৫) *The Principles of Biology* [1884], (৬) *The Man versus The State* [1885], (৭) *Political Institutions* [1885] (৮) *Ecclestical Institutions* [1886] এবং (৯) *Ceremonial Institutions* [1889]। লন্ডনের Williams and Norgate প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এই সুমুদ্রিত গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। বইগুলি উপহার হিশেবে পেলেও রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে খুব একটা বেশি ব্যবহার করেন নি —একটি বইয়ের তো পাতাই কাটা হয় নি। ইন্দিরা দেবী এ-সম্পর্কে অবশ্য স্মৃতিবিভ্রম-জনিত একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন; তিনি লিখেছেন : 'সুরেনের এক জন্মদিনে তিনি হাবার্ট স্পেনসারের সমগ্র রচনাবলী তাকে উপহার দিয়েছিলেন'[১] –এর ঠিক উলটোটাই ঘটেছিল ও ইন্দিরা দেবী নিজে তার অংশীদার ছিলেন।

কলকাতায় থাকলে পার্ক স্ট্রীটে মহর্ষির কাছে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের অন্যতম কর্তব্য ছিল। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, বৈশাখ মাসে ৩, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৬, ২১, ২৪, ২৯ তারিখে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ২, ৬, ১২, ১৯, ২০, ২২, ২৪ ও ২৬ তারিখে তিনি জোড়াসাঁকো থেকে পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াত করেছেন—এর মধ্যে ১৯ জ্যৈষ্ঠ 'পার্কস্ট্রীটের বাটী হইয়া বির্জাতালায় যাওয়ার' হিসাব পাওয়া যায়।

এই সময়ের একটি কৌতুকজনক ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে 'পরিচারিকা' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ সংখ্যায় [পৃ ২৬] : '…প্রেসিডেন্সী কলেজে যে [ফনোগ্রাফ] যন্ত্রটী আসিয়াছে বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের গায়ক গায়িকা কয়টী নরনারীর গীত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।…এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একটী বড় মজার তামাসা হইয়া গিয়াছে। কোন বাবু কুকুর বিড়াল পাখীর ডাক ডাকিয়াছিলেন, একটী নলে তাহা রক্ষিত ছিল। পরে সেই নলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুদ্ধ ঈশ্বরের মহিমাপ্রতিপাদক একটী গান রাখা হয়। এক দিন যন্ত্রটী ঐ গান গাইতেছিল, শ্রোতাগণ শুনিতেছিলেন; গান গাইতে গাইতে হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে ঘেউ ঘেউ রবে কুকুরের শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় ঈশ্বরের মহিমাসঙ্গীত, আর কোথায় কুকুরের শব্দ! পূর্ব্বরক্ষিত কুকুরের শব্দ ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা হয় নাই, এই জন্য হঠাৎ কুকুর ডাকিয়া উঠে।'—নিঃসন্দেহে ঘটনাটি কৌতুকজনক, কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনেতিহাসের দিক দিয়ে তথ্যটি মূল্যবান। পরবর্তীকালে 'কুন্তলীন'-প্রস্তুতকর্তা হেমেন্দ্রমোহন বসু [?–1916]ফনোগ্রাফ যন্ত্রে মোমের সিলিণ্ডারের উপর রবীন্দ্রনাথের গাওয়া অনেকগুলি গান রেকর্ড করেছিলেন, কিন্তু বর্তমান বিবরণটি সেই ইতিহাসকে অন্তত এক দশক পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। অপরপক্ষে, Apr 1897-এ জগদীশচন্দ্র [1858-1937] য়ুরোপ-ভ্রমণান্তে স্বদেশে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের সূচনা হয় ব'লে অনুমান করা হয়েছে[১]—অন্তত উভয়ের পরিচয় যে তার অনেক পূর্বে ঘটেছিল, এই বিবরণ তার প্রমাণ।

১৭ জ্যৈষ্ঠ [শনি 30 May] একটি নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' প্রকাশিত হল। *The Bengalee* পত্রিকায় [Vol. XXXII, No. 18, May 2] প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞাপনে প্রধান লেখকদের তালিকা দেওয়া হয় : রমেশচন্দ্র দত্ত (কেবলমাত্র সাহিত্য-বিষয়ে), কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমূল্যচরণ বসু, আশুতোষ চৌধুরী, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, ও স্বর্ণকুমারী দেবী। উক্ত পত্রিকায় 23 May সংখ্যায় জানানো হয়: 'We have been requested to announce that Babu Bunkim Chundra Chatterjee has kindly consented to contribute on religious subjects only to the *Hitabadi*' [পরবর্তী বিজ্ঞাপনগুলিতে সর্বদা 'Babu Bankim Chunder Banerji, Religious subjects only' মুদ্রিত হয়েছে]।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পত্রিকাটির সম্পাদক হন। তিনি স্মৃতিচারণসূত্রে বলেছেন : "সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্রবাবুরই [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] সৃষ্টি, এবং 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ' এই Motto-টিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্রবাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রবাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন।"[২]

রবীন্দ্রনাথ হন এই পত্রিকার সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক। তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি তারিখহীন[৩] পত্রে লেখেন : 'আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি বড় রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্চে। ২৫,০০০ টাকা মূলধন। ২৫০ টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমল বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশদত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েচেন। যাইহোক্, ইতিমধ্যে দু'তিন মাসের লেখা আমার হাতে জড় না হলে আমাকে ভারি মুস্কিলে পড়তে হবে। আবার, কথা হয়েছে প্রতি সংখ্যায় একটা করে ছোট গল্প থাক্‌বে। তোমাকে এই সঙ্কটের সময় আমার সহযোগিতা করতে হচ্চে। গুটিকতক বেশ ছোট লঘুপাঠ্য সাহিত্য প্রবন্ধ পাঠাতে হচ্চে।…এই প্রসঙ্গে আর একটা খবর দেওয়া আবশ্যক —লেখকেরা কাগজের অংশ থেকে কিছু পরিমাণ পারিতোষিক পাবেন—…আর যদি এক আধটা share নিতে ইচ্ছুক হও তাও আমাকে লিখো'।[৪]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার হিতবাদী-তে কিছু লিখেছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হয়। হিতবাদী-র ফাইল পাওয়া যায় নি, সুতরাং রবীন্দ্র-রচনার পূর্ণ তালিকা দেওয়া শক্ত। তবে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি থেকেই জানা যায়, তিনি এই পত্রিকার জন্য অনেকগুলি ছোটো গল্প লেখেন। ইতিপূর্বে ভারতী পত্রিকায় তাঁর 'ভিখারিণী' ও 'ঘাটের কথা' এবং নবজীবন-এ 'রাজপথের কথা' প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু এগুলি ছোটো গল্পের আভাসমাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত ছোটো গল্পের সূচনা হিতবাদী-তেই হয়, পরে সাধনা পত্রিকাতে এই ধারা পূর্ণতা লাভ করেছে। বস্তুত 'সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ' মানবজীবনের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ পরিচয় ছোটো গল্পের প্রাণ, সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিল শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসরে জমিদারি-পরিদর্শনের সময়ে। তাই মাঝে মাঝে রোমান্সের ঊর্ধ্বলোকে প্রয়াণ করলেও রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের ছোটো গল্পের প্রধান বিষয় মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন।

'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' ও সম্ভবত 'খাতা' গল্পগুলি হিতবাদী-তে প্রকাশিত হয়। ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একটি পত্রে লেখেন : 'সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। …সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।'[১]—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে অনেকে অনুমান করেছেন, তিনি হিতবাদী-র ছয়টি সাপ্তাহিক সংখ্যায় ছয়টি ছোটো গল্প লেখেন। প্রমথনাথ বিশী-লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'-এর পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'তথ্যপঞ্জী'তে পুলিনবিহারী সেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সংকলিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' [শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৪৬।৮৯৪] থেকে উদ্ধৃত করেছেন : 'হিতবাদীর ফাইল পাই নাই, সুতরাং কোন্ তারিখে কোন গল্প প্রকাশিত হয় বলিতে পারিতেছি না।' অথচ রবীন্দ্রজীবনীকার এই রচনাটির কথা পাদটীকায় উল্লেখ করে গল্পগুলির তারিখ নির্ণয় করেছেন।[২] তাঁর যুক্তি অনুধাবন করা শক্ত। প্রথমত গল্পগুলির ক্রম নির্ধারণ করাই দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প-সংকলন 'ছোট গল্প' [১৫ ফাল্গুন ১৩০০] গ্রন্থে গল্পগুলি যে ক্রমে মুদ্রিত হয়েছে [দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, রামকানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা,

তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, ব্যবধান, খাতা, গিন্নি সেটি কালানুক্রমিক কিনা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, কারণ সাধনা থেকে যে গল্পগুলি এখানে সংকলিত সেগুলির ক্ষেত্রে কালানুক্রম স্পষ্টতই লঙ্ঘিত হয়েছে। সুতরাং যতদিন না হিতবাদী-র ফাইল উদ্ধার করা সম্ভব হয়, ততদিন পর্যন্ত গল্পগুলিকে প্রকাশের বা রচনার কাল অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। আমরা অনুচ্ছেদের প্রথমে প্রদত্ত তালিকায় রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে মুদ্রিত ক্রমটিই অনুসরণ করেছি।

'খাতা' গল্পটি সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : 'খাতা গল্পটিও বোধ হয় হিতবাদীতে সপ্তম সপ্তাহে বাহির হয়।'[৩] রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'আমাদের মতে হিতবাদীর জন্য গল্পটি লিখিত হইয়াছিল হয়তো, কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই।'[৪] আমরা সন্দেহ করি, গল্পটি হিতবাদী-তেই ছাপা হয়। হিতবাদী-র কোনো-কোনো সংখ্যায় দু'টি গল্প মুদ্রিত হওয়া সম্পর্কে সমালোচনা করে 'গরিব ব্রাহ্মণ' [বার্ষিক সূচীতে : 'শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম,এ'] লেখেন : 'প্রত্যেক সংখ্যাতে একটীর অধিক গল্প থাকিলে প্রবন্ধ-দারিদ্র্য মনে হয়। আর দুটী ক্ষুদ্র গল্পে যে স্থান দেওয়া যায়, তাহা একটা গল্পে দিলে তাহা অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ হয়। গল্পগুলিতে একটু প্লট (plot) না থাকিলে, তাহা প্রায়ই মনোহর হয় না। তারপর কি হইল, জানিবার ইচ্ছা যে গল্পে উদ্দীপিত না করে, সেই গল্পই অধিকাংশস্থলে প্রায় পঠিত হয় না। যেরূপ গল্প বাহির হইতেছে, ভরসা করি, তদপেক্ষা শীঘ্র মনোহর গল্প বাহির হইবে।'[৫] এর শেষ অংশটিকে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের একধরনের সমালোচনা বলে গণ্য করা গেলেও এখানে আমাদের লক্ষ্য উদ্ধৃতিটির প্রথমাংশ। এর থেকে আমরা জানতে পারি যে, হিতবাদী-র কোনো-কোনো সংখ্যায় নিশ্চয়ই একাধিক গল্প মুদ্রিত হয়েছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ-কথিত ছয় সপ্তাহের মধ্যে সাতটি গল্প প্রকাশের সম্ভাবনাটি সপ্রমাণিত হয়।

'পোস্টমাস্টার' গল্পটি হিতবাদীতে প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসুর চিঠিতে[৬] উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ ২৯ জুন ১৮৯২ [১৬ আষাঢ় ১২৯৯] সাজাদপুর থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখেন : 'যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্ আফিস ছিল এবং আমি এঁকে [পোস্ট্মাস্টার] প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনি আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম, এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল, তখন আমাদের পোস্ট্মাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।'[৭] এঁর কথা আগে লেখা একটি চিঠিতেও [? 9 Feb 1891][১] রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন। উদ্ধৃত পত্রাংশ থেকে গল্পটি রচনার স্থান ও কাল সম্পর্কে আমরা একটু ইঙ্গিত পাই। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই জানিয়েছেন, একদিন দুপুরবেলায় সাজাদপুরের কুঠিবাড়ির দোতলায় বসে তিনি গল্পটি লিখেছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি, তিনি ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ৬ ফাল্গুন [17 Feb 1891] নাগাদ শিলাইদহ থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন এবং তারপর অন্তত ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ [8 Jun] পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। এর পর 16 Jun [মঙ্গল ৩ আষাঢ়] ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি তার আগের দিন জলপথে ভ্রমণ করছেন; 22 Jun [সোম ৯ আষাঢ়] তাঁকে সাজাদপুর থেকে চিঠি লিখতে দেখা যায়। সুতরাং স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায়, গল্পটি এরই কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল—হিতবাদী-তে মুদ্রণ তার পরবর্তী ঘটনা। 'ছোট গল্প' গ্রন্থে বা রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে মুদ্রিত ক্রম যে রচনা বা প্রকাশের কালের যথাযথ নির্দেশক নয়, এটি তার

অন্যতম প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে।। মনে রাখা দরকার, হিতবাদী-র প্রথম প্রকাশের তারিখ 30 May শনি ১৭ জ্যৈষ্ঠ।

পোস্টমাস্টার গল্পটি বাস্তব ও কল্পনার একটি চমৎকার সংমিশ্রণ। বহুদিন পরে একটি সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটি সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'Then there was a Postmaster. He used to come to me. He had been away from his place for a long time and he was longing to go back. He didn't like his surroundings. He thought he was forced to live among barbarians. And his desire to get leave was so intense that he even thought of resigning from his post.'[২] —গল্পটিতে এইটুকুই বাস্তব, বাকিটুকু কল্পনা—কিন্তু সেই কল্পনার কারিগরিতে বাস্তব পোস্টমাস্টারকে অতিক্রম করে কল্পনার রতন চরিত্রটি তার নীরব বেদনা নিয়ে রসস্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

'গিন্নি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতিকে অবলম্বন করে রচিত—নর্ম্মাল স্কুলের হরনাথ পণ্ডিত তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই গল্পে শিবনাথ পণ্ডিতে পরিণত হয়েছেন। অন্যান্য গল্পগুলি এই ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় না করলেও, বাঙালি মধ্যবিত্তের অতি পরিচিত জীবনকে রূপায়িত করেছে—প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, 'অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষের সাক্ষাৎ নব্য বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম পাইলাম রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে'।[৩]

কিন্তু গল্প ছাড়া অন্যান্য রচনাও রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী-তে লিখেছেন। এ-সম্পর্কে তাঁর উক্তি আগেই উদ্ধৃত হয়েছে : 'সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম।' কিন্তু হিতবাদী-র ফাইল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় রচনাগুলির পরিচয় নির্ধারণ করা দুরূহ। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী' দ্বিতীয় ভাগে [1928] 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সম্বন্ধে পূর্ব্বালোচনা'-শীর্ষক তালিকা এবং সেই সব রচনা থেকে নিজের গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ এবং ঋণস্বীকার-প্রসঙ্গে 'হিতবাদী (১ম বর্ষ)-শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর উল্লেখ করেছেন।[৪] এর থেকে বোঝা যায়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী-র জন্য লিখেছিলেন। এই কাব্য সম্পর্কে তিনি এর আগে ও পরে বহুবার বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের একান্ত অভাব—এই রচনাটি উদ্ধার করা গেলে সেই শূন্যতা পূর্ণ হত। এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির [Ms. 246] শেষে সাদা পৃষ্ঠাগুলির ছ'টিতে 'সন্দেহস্থল' শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথ একটি পুঁথির ['আমাদিগের পুঁথি'] সঙ্গে মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গল মিলিয়ে বিভিন্ন শব্দের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। আমাদের মনে হয়, আলোচ্য প্রবন্ধের সঙ্গে এই শব্দচর্চার প্রয়াস সম্পর্কান্বিত।

হিতবাদীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লিখিত কয়েকটি সমসাময়িক চিঠিপত্রে। আমরা আগেই বলেছি, সহবাস-সম্মতির আইন নিয়ে হিন্দুসমাজে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল—নারী-পুরুষের বিবাহের ও মেয়েদের সন্তানধারণের উপযুক্ত বয়স নির্দেশ সেই বিতর্কের অন্যতম বিষয় ছিল। সমসাময়িক বাংলা মাসিকপত্র ও ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এই বিতর্কের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে—বাংলা সাপ্তাহিকপত্রগুলির [এইগুলিতেই সর্বাধিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল] দুষ্প্রাপ্যতা-হেতু প্রতিক্রিয়ার চিত্রটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ। এরই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী-তে 'অকাল বিবাহ' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি, সুতরাং বিচার্য

বিষয়টি তিনি কিভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন বলা শক্ত; কিন্তু দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যায় [২২ বৈশাখ ১৩৬৯] 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' প্রবন্ধে পুলিনবিহারী সেন 'অকাল বিবাহ' শিরোনামায় চন্দ্রনাথ বসুর দু'টি ও রবীন্দ্রনাথের যে-একটি পত্র উদ্ধৃত করেছেন [পৃ ৬২-৬৪] তার থেকে বিষয়টির দিক্-দর্শন করা সম্ভব। চন্দ্রনাথ ১৭ আষাঢ় [মঙ্গল 30 Jun] কলকাতা থেকে লিখিত পত্রে [রবীন্দ্রনাথ তখন সাজাদপুরে] লেখেন : 'আমরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কেবল অকালে বিবাহ করিতেছি, অকালে সন্তানোৎপাদন করিতেছি, জগতের কীর্তিভাণ্ডারে কিছুই দিই নাই। [একেবারে কি] কিছুই দিই নাই? তুমি বৈষ্ণব কবিতাকে জগতে অতুলনীয় বলিয়া কীর্তন করিয়াছ, সেটা তবে কি? আর চৈতন্যের ধর্ম্মসংস্কারটাই বা কি? আর নবদ্বীপের ন্যায়টাই বা কি? আর এই সেদিনকার রামমোহন রায়টাই বা কি? ওগুলা কি জগতের কীর্তিভাণ্ডারে দিবার মতন জিনিস হয় নাই? কিন্তু ওসবগুলাই ত অকালে বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন করিতে করিতেই করা হইয়াছিল। ফলতঃ এত শতাব্দীর পরাধীনতা ও অকাল বিবাহাদি সত্ত্বেও কেমন করিয়া অমন কীর্তিগুলা হইল এ কথার তুমি কি উত্তর দেও আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। হিতবাদীতেই এই কথাটার আলোচনা কর না কেন? এই চিঠি থেকে মনে হয়, ১৭ আষাঢ়ের পূর্বেই হিতবাদী-তে 'অকাল বিবাহ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। চন্দ্রনাথ সম্ভবত আরও একটি চিঠি লিখেছিলেন, কিংবা কোনো পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ২১ শ্রাবণ ১২৯৮ [বুধ 5 Aug] তারিখ দিয়ে তাঁকে যে পত্রটি লেখেন তাতে এমন কয়েকটি প্রসঙ্গ আছে যা ১৭ আষাঢ়ের পত্রে নেই। তাছাড়া এই চিঠিতে এমন এক ধরনের উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে, যা ১৭ আষাঢ়ের পত্রের উত্তরে প্রত্যাশিত নয়। রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রটি পাওয়া যায়নি। তিনি পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ চিঠিটি নকল করে রেখেছিলেন—সেইটিই আমাদের অবলম্বন। তিনি লিখেছেন : 'হিতবাদীতে অকালবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা পড়িয়া আপনি সন্তুষ্ট হন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।…আপনার পত্রে প্রকাশ পাইল আপনি একটা ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। যৌক্তিকতা এবং তার্কিকতা এক নহে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন।… পূর্বে আমি তার্কিকের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলাম বলিয়া যে আমার প্রকৃতি যুক্তিবিরোধী এবং অকালবিবাহ লেখায় তাহাই প্রমাণ করিতেছে এরূপ কথা সুযুক্তির পরিচায়ক নহে বরং কুতর্কের দৃষ্টান্তস্থল।' পরে তিনি লেখেন : '…এই প্রথম আপনার প্রমুখাৎ শুনিলাম যে আমি কাব্য প্রভৃতি ভাবপ্রকাশকে কীর্তি বলি না। এই কীর্তি শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় হইতেই যদি আপনার ধারণা দৃঢ় হইয়া থাকে যে আমার য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি, তবে শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন আপনার উক্ত ধারণা সমূলক নহে অনেকটা কাল্পনিক।' পরের অংশে তিক্ততা আরও তীব্র আকারে প্রকাশ পেয়েছে : 'আমার লেখায় হিন্দু ছাঁচের প্রকৃতি দেখা দেয় কি য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি দেখা দেয় তাহার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের সময় এখন উপস্থিত হয় নাই। …অতএব একথা লইয়া আপনি অধিক কষ্ট পাইবেন না। এ বিষয়ে আপনার মত আপনি লালন করুন এবং আমার মত লইয়া আমি থাকি—এ কথার সিদ্ধান্ত দূরে থাক্ তর্ক করিবারও সময় হয় নাই।' লক্ষণীয়, চন্দ্রনাথ কিন্তু সংযম ত্যাগ করেননি; ২৫ পৌষে লেখা একটি পত্রে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ও ২ ফাল্গুনের পত্রে অকালবিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও ব্যঙ্গোক্তির সামান্য আভাসেই 'ব্যঙ্গ করিতেছি না' বলে বিনয় প্রকাশ করেছেন।

হিতবাদী-তে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'মেঘদূত' সম্বন্ধেও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সাহিত্য পত্রিকার অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'মেঘদূত' প্রবন্ধের [পৃ ৩৬৪-৬৮] সূচনায় তিনি লেখেন : 'আমি ইতিপূর্ব্বেই

মেঘদূত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অনেক কথা বলা হয় নাই'—আমাদের ধারণা, উল্লিখিত প্রবন্ধটি হিতবাদী-তে মুদ্রিত হয়েছিল। 'সুহৃৎসমিতির আষাঢ় মাসের অধিবেশনে পঠিত' ও ভাদ্র-সংখ্যা সাহিত্য-তে প্রকাশিত [পৃ ২০৫-২২] সুরেশচন্দ্র শর্ম্মা [সমাজপতি]-র 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্র-প্রভাবের যে লক্ষণ দেখা যায়, সম্ভবত হিতবাদী-তে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধই তার কারণ।

হিতবাদী-তে প্রকাশিত আর কোনো রবীন্দ্র-রচনার সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই পত্রিকায় যে তিনি নানা বিষয়ে অনেক রচনা লিখেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 29 Sep [১৩ আশ্বিন] জৌনপুর থেকে লিখেছেন : 'হিতবাদীর কয়েক সংখ্যায় আপনার লেখনী-প্রসূত কতকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র "গল্প" ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেগুলি খুব মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী। তা রবির কর যে স্থানে গিয়া পড়ে সেই স্থানই ত' হাসিয়া উঠে।'[১]। চন্দ্রনাথ বসু তাঁর ১৭ আষাঢ়ের পত্রে সেই সময় পর্যন্ত হিতবাদী-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রশংসা করে লিখেছেন : 'তোমার সমালোচনাগুলির পারিপাট্য দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি। তোমার সকল কথা আমি অনুমোদন করি না সত্য। কিন্তু তোমার লেখা ও লিখিবার প্রণালী বড় পরিপাটী হইতেছে।' এই সমালোচনাগুলি গ্রন্থ-সমালোচনাও হতে পারে। 'গরিব ব্রাহ্মণ' হিতবাদী-র প্রথম তিনটি সংখ্যা অবলম্বনে লিখেছেন : 'সমালোচনা।—নূতন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ভাল করিয়া করিলে তাহাতে আমোদ ও শিক্ষা দুইই আছে।'[২] গ্রন্থ-সমালোচনার দায়িত্বও রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন ব'লে অনুমান করা যায়।

হিতবাদী-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, এই কয়েকটি গল্প বাহির হইবার পর সম্পাদক কৃষ্ণকমল তাঁহাকে বলেন, গল্পগুলি সাধারণের পক্ষে গুরুপাক হইতেছে, আরও লঘু রকমের রচনা আবশ্যক। এই কথায় রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া 'হিতবাদী'তে লেখা ছাড়িয়া দেন।'[৩] অবশ্য মাত্র ছয় সপ্তাহ পত্রিকাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল, এই ধারণা সঠিক নয়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 31 Sep[৪] [বৃহ ১৫ আশ্বিন] 'সীতামারী, মজফরপুর' থেকে প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন : '…রবীন্দ্র আজকাল "হিতবাদী" নিয়ে খুব ব্যস্ত, তোমার সঙ্গে কাগজটার কোন সম্পর্ক নেই? আমায় লিখতে হবে রবীন্দ্রের এ অনুরোধ, লিখতেই হবে কিন্তু এ দুর্জয় আলস্য পরিহার করার উপায় কি?'[৫] —এই পত্রাংশ থেকে অনুমান করা যায়, আশ্বিন ১২৯৮-তেও রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সম্ভবত এই সময়েই তিনি পত্রিকাটির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটান, আশ্বিন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে 'সাধনা' পত্রিকার 'বিজ্ঞাপন' প্রকাশিত হয় এবং এর পরের মাসেই সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়।

ফাল্গুন ১২৯৭-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বর্তমান বৎসরের অন্তত ২৬ জ্যৈষ্ঠ [সোম 8 Jun] পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন, সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। এরপর তিনি আষাঢ়ের শুরুতেই উত্তরবঙ্গে রওনা হন—এবারে সাজাদপুর তাঁর লক্ষ্য। 16 Jun [মঙ্গল ৩ আষাঢ়] ইন্দিরা দেবীকে তিনি একটি পত্রে লিখছেন : 'কাল [২ আষাঢ়] সন্ধের সময় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম—নদীটি ছোট্ট, যমুনার একটি শাখা, এক পারে বহু দূর পর্যন্ত সাদা বালি ধূ ধূ করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই—আর এক পারে

সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহু দূরে একটি গ্রাম।'[৬] তিনি চলেছেন কর্মের তাগিদে, কিন্তু কোনো তাড়াহুড়ো নেই—ফলে মন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিরসে নিমজ্জিত হতে পেরেছে। তাই এই নির্জন নদী ও গ্রামকে আচ্ছন্ন করে যখন সন্ধ্যা নামে, তখন তাঁর মনে হয় 'এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ—যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠে নি, অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়পূর্ণ ছম-ছম-নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন—যখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর'।[৭] এই দিনের এবং আরও অনেক দিনের মায়াময় সন্ধ্যার স্মৃতি তাঁর মনের গভীরে সঞ্চিত হয়ে কয়েকমাস পরে [ফাল্গুন ১২৯৮] একটি রাখাল বালকের আপন-মনে-গাওয়া গানের অভিঘাতে 'শৈশবসন্ধ্যা' [দ্র সোনার তরী ৩।১২-১৩] কবিতায় বাণীরূপ লাভ করেছে।

ইন্দিরা দেবীকে লেখা ছিন্নপত্রাবলী-র অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলির মূল্য এইখানে। নদীপথে ভ্রমণের সময়ে ও কাছারিতে জমিদারি কার্যোপলক্ষে প্রকৃতি ও মানুষের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ অন্তরে যে তরঙ্গ তুলেছে, এই চিঠিগুলির মধ্যে তার অব্যবহিত স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। আর সেইগুলিই পরবর্তীকালে অন্তর বা বাহিরের তাগিদে কবিতায়-গানে-গল্পে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

৩ আষাঢ় [মঙ্গল 16 Jun] তাঁর বোট পাল তুলে যমুনা নদীর মধ্য দিয়ে চুহালির পথে চলেছে। 19 Jun [শুক্র ৬ আষাঢ়] চুহালি থেকে তার আগের দিনের ঝড়বৃষ্টির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়ে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'বোটের খোলা জানলার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্রতালে আমিও বসে বসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম। সমস্ত ভিতরটা যেন ছুটি-পাওয়া স্কুলের ছেলের মতো ঝাঁপিয়ে উঠেছিল।'[১] ৬ আষাঢ় সন্ধ্যার সময়ে চুহালি ত্যাগ করে একটি ছোটো নদীর মধ্য দিয়ে সাজাদপুরে যাওয়ার পথে আর একটি ঝড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে—কিন্তু এবারে তাঁর প্রতিক্রিয়া অন্যরকম : 'আমরা কিনা প্রকৃতির নাতি-সম্পর্ক, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই রকম একটু-আধটু তামাসা করে থাকেন।'[২]

22 Jun [সোম ৯ আষাঢ়] দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে পৌঁছে গেছেন। পূর্ণিমা তিথির সেই দিনে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব। ...একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে।'[৩] এই চিঠির মধ্যে তিনি 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়' ['কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে' দ্র গীতবিতান ২।৩৬৯] গানটির প্রথম ছত্র উদ্ধৃত করেছেন দেখে মনে হয়, এটি ইতিপূর্বেই রচিত হয়েছিল। গানটি ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিসহ 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত গান' আখ্যায় ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯-সংখ্যা [পৃ ৩৫৮-৬১] সাধনা-য় মুদ্রিত হয়, [দ্র স্বরবিতান ১০, ভৈরবী-কাওয়ালি]।

পরের দিন [23 Jun মঙ্গল ১০ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন : 'আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে বব। রৌদ্রে চারি দিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে—মনটা ভারী উড়ু-উড়ু করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না।'[৪] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরের কুঠিবাড়ির পার্শ্বস্থ খালের উপর বোটে বাস করছিলেন—

কিন্তু এরই মধ্যে একদিন কুঠিবাড়ির দোতলায় বসে এমনই এক দুপুরবেলায় 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি লিখেছিলেন, এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

কুঠিবাড়ির পাশের এই খালটি রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে ও রচনায় বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। সাজাদপুরের প্রাক্তন অধিবাসী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন : 'কুঠিবাড়ীর উত্তরে দেখবেন, বিরাট মাঠ। হাটবারে এখানে বাঁশ, লকড়ি, কাঠ ও ধান প্রভৃতির বাজার বসে। সোম ও বৃহস্পতি শাহজাদপুরের হাটবার। ···মাঠের উত্তর পূর্ব কোণে এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ। তার নীচে খালের উপর ছিল খেয়া ঘাট ···কুঠিবাড়ীর পূর্ব দিক দিয়ে এই খালটি দক্ষিণ পশ্চিম ঘুরে প্রায় তিন মাইল দূরে হুড়া সাগরের স্রোতে মিশেছে, আর এসেছে পোয়া মাইল উত্তর পূর্বে ফুলঝোরের জলস্রোত থেকে। এর একটি অংশ সম্পূর্ণ ঠাকুর কাছারী ও কুঠিবাড়ীর পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে পরিখার মত বেষ্টন করে রেখেছে। বর্ষাকালে এই খাল ফুলঝোরের জলস্রোতে পূর্ণ হয়ে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলে। এই খালেই কবিগুরুর 'পদ্মা' 'চিত্রা' বোট এসে লাগতো।'[৫] রবীন্দ্রনাথ উক্ত 23 Jun-এর চিঠিতে খেয়াঘাটটির একটি বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে অবশ্য নরেশবাবুর প্রদত্ত বিবরণের একটু পার্থক্য আছে; নরেশবাবু যে অশ্বত্থ গাছের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথের লেখায় সেটি বটগাছ বলে অভিহিত ও সোমবারে যদি হাট বসে তবে রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখটি ভুল।

কিন্তু এহ বাহ্য। এই চিঠিগুলিতে যেটি লক্ষণীয়, সেটি হল গভীর অভিনিবেশ সহকারে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ ও প্রকৃতির পটভূমিকায় রেখে তার মূল্যায়ন। এই কারণেই সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের গল্পে ঘটনার ঘনঘটা কম, মানুষের সুখদুঃখ একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত লাভ করে স্বরগ্রামের নীচু সুরগুলোর মধ্যে খেলা করতে থাকে। এই বক্তব্যের সমর্থনে তাঁর চিঠি থেকেই উদ্ধৃত করি : 'মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়া নৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে, তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যাচ্ছে, এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখ দুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়—কিন্তু এই অনন্তপ্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু-আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতা-পূর্ণ মনে হয়।'[১]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য 'বস্তুতন্ত্রতাবিহীন'—এমন একটা সমালোচনা একসময়ে বাংলা সাহিত্যের আসর সরগরম করে তুলেছিল—তার প্রতিধ্বনি নানাভাবে পরেও শোনা গেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার পথে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বাধা ছিল বিস্তর—বাল্য ও কৈশোরের জীবন-বর্ণনায় তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। বর্তমান পর্বেও সেই বাধা কাটেনি; 25 Jun-এর পত্রে[২] তিনি লিখছেন : 'বিকেল বেলায় আমি এখানকার ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলেয় মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেয়াদবি মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, রাজার চতুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষে হয় —ইদিকে হতভাগ্য রাজার প্রাণ ত্রাহি

ত্রাহি করতে থাকে।'[৩] ফলে, বেশির ভাগ সময়েই রবীন্দ্রনাথের দেখা 'গবাক্ষ-দর্শন'—কিন্তু সেই কারণেই অন্তরের রসে জারিত হওয়ার সম্ভাবনা গভীর ভাবে দেখা দিয়েছে।

বক্তব্যটি প্রমাণ করা দুঃসাধ্য নয়। উক্ত পত্রের পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের খেলার কৌতুকরসস্নিগ্ধ বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৫৮-৬০]—এখানে যে 'সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি'র কথা আছে, সে-ই পরে 'ছুটি' [সাধনা, পৌষ ১২৯৯।১১৭-২৭, গল্পগুচ্ছ ১৭।২২৯-৩৫] গল্পের ফটিক চক্রবর্তীতে পরিণত হয়েছে; গল্পের প্রথমাংশটির সঙ্গে পত্রের বর্ণনার পার্থক্য সামান্য, কিন্তু তার পরেই আরম্ভ হয়েছে কল্পনার লীলা ['I then imagined what would happen to this loving and sensitive boy if he were taken to Calcutta for his education and made to live in an unsympathetic atmosphere of a family with his aunt'.][৪]—জীবনের 'বস্তুতন্ত্রতা' সাহিত্যের 'বাস্তবে' রূপান্তরিত হওয়ার ফলেই 'ছুটি' বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প।

অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত আছে শনিবার 4 Jul [২১ আষাঢ়] তারিখে লেখা পত্রে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৬৪-৬৫, পত্র ২৬]। এখানে স্বামীগৃহাভিমুখিনী 'আধা ছেলে আধা মেয়ে' যে বালিকাটির কথা বর্ণিত হয়েছে, 'সমাপ্তি' [সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০। ৪০৮-৩৮; গল্পগুচ্ছ ১৮।২৯২-৩১০] গল্পে মৃন্ময়ী চরিত্রে তা শিল্পরূপ পেয়েছে প্রায় দু'বছর পরে। বোঝা যায়, পথ-চল্‌তি অভিজ্ঞতাগুলি এইভাবে ছিন্নপত্রাবলীর পত্রে একমেটে রূপে প্রকাশ পেয়েই চোখের অন্তরালে আত্মগোপন করে ও দীর্ঘকাল পরে কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে বিচিত্র শিল্পমূর্তি আকারে দেখা দেয়।

এই সময়ে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা কয়েকটি চিঠি চিঠিপত্র প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এর মধ্যে ৮-সংখ্যক চিঠিটিতে তৃতীয় বন্ধনীর ভিতর উল্লেখিত তারিখ '২০ জুন ১৮৯১' [শনি ৭ আষাঢ়]; এতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'আজ আমার প্রবাস ঠিক একমাস হল। আমি দেখেছি যদি কাজের ভীড় থাকে তা হলে আমি কোন মতে একমাসকাল বিদেশে কাটিয়ে দিতে পারি। তার পর থেকে বাড়ির দিকে মন টানতে থাকে।'[৫] কিন্তু অনুমিত তারিখটি সম্ভবত ঠিক নয়। কারণ, ক্যাশবহির সাক্ষ্য থেকে আমরা জানি যে, অন্তত ২৬ জ্যৈষ্ঠ [8 Jun] পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন—সুতরাং 20 Jun তাঁর প্রবাসের এক মাস পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, চিঠিটিতে গৃহস্থ রবীন্দ্রনাথের চিত্রটি স্পষ্ট। আর একটি চিঠিতে কৌতুকপূর্ণ অনুযোগ : 'আচ্ছা, আমি যে তোমাকে এই সাহাজাদপুরের সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন করে উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘের্ত্ত, সেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম তৎসম্বন্ধে কোন রকম উল্লেখমাত্র যে করলে না তার কারণ কি বল দেখি? আমি দেখ্‌চি অজস্র উপহার পেয়ে পেয়ে তোমার কৃতজ্ঞতা বৃত্তিটা ক্রমেই অসাড় হয়ে আস্‌চে, প্রতি মাসে নিয়মিত পনেরো সের করে ঘি পাওয়া তোমার এমনি স্বাভাবিক মনে হয়ে গেছে যেন বিয়ের পূর্ব্বে থেকে তোমার সঙ্গে আমার এই রকম কথা নির্দ্দিষ্ট ছিল।'[১]

মফঃস্বল থেকে রবীন্দ্রনাথ কবে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, নিশ্চিত করে বলা শক্ত। ক্যাশবহির হিসাবে দেখা যায়, ১ শ্রাবণ [বৃহ 16 Jul] তিনি পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছেন—এর থেকে অনুমান করা যায়, আষাঢ় মাসের শেষেই তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। পার্কস্ট্রীট, বির্জিতলা ইত্যাদি স্থানে যাতায়াতের হিসাব অনুযায়ী তিনি ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় দেড় মাস এখানেই কাটান। এই সময় রবীন্দ্রজীবনের

উপকরণ সামান্য। ৫ শ্রাবণ [20 Jul] 'পার্ক ষ্ট্রীট হইতে বির্জাতালা', ১৮ শ্রাবণ [2 Aug] 'পার্কষ্ট্রিট হইয়া যোড়াসাঁকো আসিবার', ২৯ শ্রাবণ [13 Aug] 'শ্রীযুত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের বাদগেট কোম্পানির বাটী যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া (১৮৯০ সালের ঔষধের বিলের মিমাংসা করিতে)', ৩ ভাদ্র [19 Aug] 'হাইকোর্ট হইতে পার্ক ষ্ট্রীট' এবং ৮ ও ১১ ভাদ্র 'পার্ক ষ্ট্রীট' হিসাব থেকে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির হদিশ পাওয়া যায়। এর পরেই তিনি উড়িষ্যার জমিদারি পরিদর্শনে যাত্রা করেন।

এই সময়ে ঠাকুর পরিবারে হঠাৎ ব্যয় সংকোচের প্রয়োজন দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য ভ্রাতারা এতদিন যে হারে মাসোহারা পেতেন, বর্তমান বৎসরের প্রথম থেকে তা অর্ধেক হয়ে যায়। জাহাজী-ব্যবসার ঋণশোধের দায়িত্ব থাকার জন্যেই হয়তো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আগের মতোই ৩৮০ হারে মাসোহারা লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অঙ্কটি দাঁড়ায় মাসিক ১৫০ টাকা, 'ছোটবধূঠাকুরাণী' মৃণালিনীদেবীর ৩০ টাকা মাসোহারা অবশ্য অব্যাহত থেকেছে, কিন্তু খোরাকীর পরিমাণ ৩০ টাকার জায়গায় কমে ২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ক্যাশবহির ১১ ভাদ্রের (27 Aug] হিসাবে আর একটি তথ্য দেখা যায় : 'ব° বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উঁহার মাশহারা হইতে বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে দিবার বাবৎ গত বৈশাখ না° শ্রাবণ ৪ মাসের কাত ৩৩ হিসাবে…১৩২'। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য মাসোহারা থেকে ৩৩ টাকা করে কেটে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেবার হিসাব ১৩১১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত দেখা যায়। নিশ্চয়ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে কোনো কারণে রবীন্দ্রনাথ পাঁচ-ছ' হাজার টাকা ঋণ করেছিলেন, সেইটিই দীর্ঘকাল ধরে এইভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। বিলাত-যাত্রা এর কারণ কিনা বলা শক্ত, কিন্তু এই কারণে সত্যেন্দ্রনাথ সত্যপ্রসাদের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন, সত্যপ্রসাদের ব্যক্তিগত হিসাব-খাতায় তার বিবরণ রয়েছে ৪ চৈত্র ১২৯৭ তারিখে : 'শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মেজমামীকে হাওলাত দেওয়া যায় শতকরা ৬ সুদে ৩০০০০ (মেজমামার বিলাতের হাওলাত শোধ জন্য)'!!

১৩ শ্রাবণ [মঙ্গল 28 Jul] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরলোকগমন করেন। বিদ্যাসাগরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা চারিত্রপূজার অন্তর্গত 'বিদ্যাসাগরচরিত' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে, তার মধ্যে একটি '১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্নে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে এমারেল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত'—কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে-সব স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়, তার কোনোটিতে তিনি বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন কিনা কিংবা হিতবাদী-তে কিছু লিখেছিলেন কিনা এখনও জানা যায়নি। অবশ্য 8 Aug [শনি ২৪ শ্রাবণ] বেথুন কলেজ গৃহে অনুষ্ঠিত 'স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ মহিলা সভা'তে রবীন্দ্রনাথের 'যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাশরি' [কালমৃগয়া, গীতবিতান ৩।৬৩৩-৩৪] গানটি গীত হয় ['যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে' এই শেষ ছত্রটি পরিবর্তিত হয় : 'যাও, তাত, যাও সেই দেব সদনে']।[২]

মধ্য ও উত্তর বঙ্গ ছাড়াও উড়িষ্যার কটক কালেকটরেটের অধীনে পাণ্ডুয়া, বালিয়া ও পহরাজপুরে ঠাকুর পরিবারের কিছু জমিদারি ছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে জমিদারি-পরিদর্শনের দায়িত্ব আসার পর তিনি শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরে অবস্থিত তিনটি সদর কাছারিতেই গিয়েছিলেন—বাকি ছিল উড়িষ্যার জমিদারি। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি তিনি এই উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করলেন। তখন উড়িষ্যা পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হয়নি—স্টীমারে সমুদ্র ঘুরে বা নদীপথে নৌকায় সেখানে যেতে হত। রবীন্দ্রনাথ এবার স্টীমারেই যান। যাওয়াটা

জমিদারোচিত হয়নি—পথের অবর্ণনীয় কষ্টের কথা লিখেছেন ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৬৭-৬৮, পত্র ২৭]। পত্রটি 31 Aug [১৫ ভাদ্র] কলকাতায় পৌঁছেছিল, সুতরাং ১১।১২ ভাদ্র তারিখে রবীন্দ্রনাথ রওনা হয়েছিলেন বলে অনুমান করা যায়। নিজের দুঃখকষ্ট নিয়ে রসিকতা করা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ—বর্তমান পত্রটিও কৌতুক-রসে স্নিগ্ধ। এই কৌতুকের ভঙ্গি আছে 3 Sep [বৃহ ১৮ ভাদ্র] 'চাঁদনি চক। কটক' থেকে লেখা পরবর্তী চিঠিতেও—'খুব মোটাসোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোক' উড়িষ্যা-জমিদারি-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার জন্য নিযুক্ত উকিল হরিবল্লভবাবুর চেহারা, স্বভাব ও কথাবার্তার যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁকে একটি গল্পের চরিত্র বলে মনে হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের ন'দাদা বীরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে 'জ্যোতি' বলে উল্লেখ করেন দেখে রবীন্দ্রনাথের 'অন্তঃকরণ সসম্ভ্রমে শশব্যস্ত হয়ে উঠল'–'এর উপরে যখন তিনি—কারও পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে অকস্মাৎ অসময়ে এখানে আসা সম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন তখন আমি কী রকম ম্লান অপ্রতিভ হয়ে গেলুম তুই কতকটা অনুমান করতে পারবি।'[১] কবি-স্বভাব নবীন জমিদারের এই ধরনের অপ্রতিভতার আরও নমুনা আছে; পাল্কি করে পাণ্ডুয়ার কুঠিতে যাওয়ার সময়ে নৌকার অভাবে একটি নদী পার হওয়া যাচ্ছিল না, তখন রবীন্দ্রনাথের মনে হচ্ছিল 'এইখানেই পাল্কির মধ্যে বেঁকেচুরে দুমড়ে আজ রাতটা কাটাতে হবে'—তখন 'বরদা [প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়?] নৌকা আসার কোনো সম্ভাবনা না দেখে হুকুম দিলেন, পাল্কি মাথায় করে নদী পার করতে হবে। শুনে বেহারারা অনেক ইতস্ততঃ করতে লাগল এবং আমার মনেও দয়া এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হতে লাগল।'[২] সম্ভবত যথেষ্ট পরিমাণে 'জমিদার' না হতে পারার জন্যেই এই দ্বিধা। অনুরূপ দয়া ও দ্বিধা পরবর্তীকালেও তাঁর মধ্যে দেখা গেছে।

পাণ্ডুয়া কুঠীতে পৌঁছে তিরন থেকে 7 Sep [সোম ২২ ভাদ্র] যে পত্রটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তার মধ্যে কটক থেকে নৌকাযোগে যাত্রা করে বালিয়া হয়ে আসার বর্ণনা আছে :'বালিয়ার ঘাটটি বেশ দেখতে। দুই ধারে বড়ো বড়ো গাছ—সব-সুদ্ধ খালটা দেখে সেই পুনার ছোটো নদীটি মনে পড়ে। ...আমি ভালো করে ভেবে দেখলুম এই খালটাকে যদি নদী বলে জানতুম তা হলে ঢের বেশি ভালো লাগত।'[৩] দুই তীরের সৌন্দর্য যতই মনোহর হোক, 1871-এ কাটা খালের 'জলকলধ্বনির মধ্যে অনাদি প্রাচীনত্ব নেই, এ কোনো দূর দুর্গম জনহীন পর্বতগুহার রহস্য জানে না'—এই তাঁর আক্ষেপ।

বিকেল চারটের সময়ে নৌকা তারপুরে পৌঁছল। এর পর পাল্কিযাত্রা শুরু। ছ ক্রোশ পথ, সন্ধে আটটার মধ্যেই পাণ্ডুয়ার কুঠিতে পৌঁছনোর কথা, কিন্তু বহু দুর্ভোগের পর 'রাত্তির দুপুরের সময়' সেখানে পৌঁছনো গেল, দুর্ভোগের কিছু বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা থেকে তিরনে পৌঁছনো পর্যন্ত শারীরিক কষ্ট-উদ্বেগ-দুর্ভাবনার কিছু অভাব ছিল না, কিন্তু এখানে আসার পর রবীন্দ্রনাথের মন প্রশান্তিতে ভরে গেছে—9 Sep [বুধ ২৪ ভাদ্র] ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন : 'অনেক দিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল! ...হঠাৎ যখন কাল দশটা এগারোটার পর রোদ্দুর ভেঙে পড়ল তখন যেন একটা নতুন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। ...আমি দুপুর বেলায় স্নানাহারের পর বারান্দার সামনে একটি আরামকেদারার উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রত স্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম।'[৪] মনের এই অবস্থায় লিখলেন কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'। একবছর

আগে আষাঢ় ১২৯৭-এ শিলাইদহে তিনি এটি লিখতে শুরু করেন, 'অনঙ্গ আশ্রম' নামের প্রথম দৃশ্যটি সেখানে লেখা হয়েছিল। রচনাবলী-র 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'এই কাহিনীটি [মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী] কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।' পাণ্ডুয়ায় তিনি ছিলেন এক সপ্তাহেরও কম সময়। রচনাটি শেষ হয় কটকে গিয়ে। গ্রন্থে রচনা-শেষের তারিখ আছে—'কটক/২৮ ভাদ্র ১২৯৮' [রবি 13 Sep 1891]। কলকাতায় গিয়ে সম্ভবত তিনি পাণ্ডুলিপিটি আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে পাঠ করেছিলেন। প্রিয়নাথ সেনকে একটি তারিখ-হীন চিঠি তিনি লিখছেন: 'কাল, অর্থাৎ শনিবার প্রাতঃকালে আমাদের এখানে এসে মধ্যাহ্নভোজন করবে কি? কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দেবার ইচ্ছা আছে।'[১] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্রের উপরে 'চিত্রাঙ্গদা শুনিবার নিমন্ত্রণ' ও নীচে 'চিত্রাঙ্গদার হস্তলিপি পাঠ' কথাগুলি অন্য কেউ লিখে রেখেছেন; তথ্যটি সঠিক হলে চিঠিটির অনুমিত সময়কাল '১৮৯২' সংশোধন করার দরকার হবে।

অবনীন্দ্রনাথ-কর্তৃক চিত্রিত হয়ে চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হয় বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 13 Sep 1892 [মঙ্গল ২৯ ভাদ্র ১২৯৯], গ্রন্থের আখ্যাপত্রে মুদ্রিত তারিখ : '২৮ ভাদ্র, ১২৯৯ সাল'—যেন গ্রন্থ-সমাপ্তির বর্ষপূর্তিকে স্মরণ করে নির্ধারিত।

মহাভারতের একটি কাহিনীর কঙ্কাল অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃষ্টি এই 'চিত্রাঙ্গদা', অমিত্রাক্ষরে রচিত শেষ কাব্যনাট্য। লক্ষণীয়, রাজা ও রানী বা বিসর্জন নাটকের বেলায় বিভিন্ন সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক পরিবর্তন করেছেন, চিত্রাঙ্গদা-র ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি ঘটে নি। দ্বিতীয় সংস্করণে [১৩০১] ছন্দসৌকর্যের দিকে তাকিয়ে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে, সেই পাঠই হিতবাদী-র রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী [১৩১১] ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানী-সংস্করণে [১৩১৬] মুদ্রিত হয় কাব্য-গ্রন্থাবলী [১৩০৩]-সংস্করণে এই ধরনের পরিবর্তন আরও একটু ব্যাপক, রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে [দ্র ৩। ১৬১-২০০] সেই পাঠই গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সে লেখা নাটকগুলি পরে যখন ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছেন [*Sanyasi, King and Queen, Sacrifice*], ব্যাপক বর্জন তখন তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা-র রূপান্তর Chitra এদের মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। চিত্রাঙ্গদা ও মদনের দু'টি সংলাপ-সংবলিত প্রায় অপ্রয়োজনীয় ৭ম দৃশ্যটি বাদ দিয়ে ৬ষ্ঠ ও ৮ম দৃশ্য দু'টিকে একটি দৃশ্যে পরিণত করা এবং কিছু কিছু সংলাপের সংক্ষেপণ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন Chitra-তে করা হয় নি। রবীন্দ্রনাট্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নিজের রচনা সম্পর্কে তাঁর অতৃপ্তি অপরিসীম—কমেডিগুলি ছাড়া অন্য নাট্যরচনাকে নিয়ে তিনি বারবার ভাঙাগড়া করেছেন, চিত্রাঙ্গদা [এবং মালিনী] এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে গণনীয়।

বস্তুত, যে 'আনন্দিত অবকাশ'-এর মধ্যে চিত্রাঙ্গদা লেখা, সেই অবকাশ গীতিকাব্যের অনুকূল—চিত্রাঙ্গদা-র মধ্যে সেই গীতিকাব্যের আবহ বর্তমান; একটি সৌন্দর্যস্বপ্ন যেন মহাভারতের একটি কাহিনী অবলম্বনে নাট্য-সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেন, '. this is a lyrical drama *par excellence* ...which is one of Rabindranath's best, and perhaps the only one that is flawless, if anything made by man can be called flawless Not a line would one like to take away from it,...where every utterance quivers with lyrical passion held in masterly restraint.'[২]

অথচ বেশ কয়েক বছর পরে এই কাব্যনাট্যটিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ও দুর্নীতি প্রচারের অভিযোগ তুলে বাংলা সাহিত্যের আসর উত্তপ্ত করে তোলা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'কাব্যে নীতি' [সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬। ১১৪-১৯] প্রবন্ধে লেখেন : 'ঘরে ঘরে "বিদ্যা" হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়।···আর রবীন্দ্র বাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই।' বিষয়টি নিয়ে সেই সময়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক লেখালেখি হয়েছিল, যথাসময়ে আমরা সে-প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব; বর্তমানে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য দিয়ে প্রসঙ্গটির সমাপ্তি টানা যায় : "রবীন্দ্রনাথের যশঃ-সূর্য্যের কালমেঘরূপ দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য'-আকাশে উদিত"![৩]

চিত্রাঙ্গদা-রচনা সমাপ্ত হয় ২৮ ভাদ্র [রবি 13 Sep] কটকে, এর পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতা রওনা হন, ৩ আশ্বিন [শনি 19 Sep] তাঁর পার্ক স্ট্রীটে যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। এই দিন ও পরের দিন তিনি হয়তো সেখানেই কাটান, কারণ ৫ আশ্বিনের হিসাবে দেখি : 'পার্ক ষ্ট্রীট হইতে বির্জতালা হইয়া যোড়াসাঁকো আসিবার গাড়িভাড়া' বাবদ দেড় টাকা খরচ হয়েছে। ১৪ আশ্বিন [বুধ 30 Sep] পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকেন—এই দিন তিনি পার্কস্ট্রীটে যাতায়াত করেছেন। সম্ভবত এই দিনই তিনি শিলাইদহ যাত্রা করেন, পরদিন 1 Oct [বৃহ ১৫ আশ্বিন] সেখান থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্‌-তল্‌ থৈ-থৈ করছে।···তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকোলবনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম। ···পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। ···কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি—কেবল মৌলবিটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক্‌ বক্‌ করে আমাকে ব্যথিত করে তোলে'[১]—অনুরূপ উপলব্ধির কথা রবীন্দ্রনাথ আগেও লিখেছেন, আর মৌলবীও আমাদের অপরিচিত নন।

'মঙ্গলবার ২০ আশ্বিন' [6 Oct] তারিখে লেখা চিঠিটি[২] নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। প্রথমাংশটি যেন একটি অলিখিত গল্পের অঙ্কুর : 'বিদেশ থেকে প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে [২৪ আশ্বিন মহাসপ্তমী] পোঁটলা পুঁটলি বাক্স ধামা বোঝাই করে নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে সম্বৎসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নতুন কোঁচানো ধুতি পরলে, জামার উপর শাদা রেশমের একখানি চায়না কোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহু যত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে ছাতা ঘাড়ে ক'রে গ্রামের অভিমুখে চলল। ···বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র গ্রামে ফিরে এল তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ, এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, ···সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে এক রকম অভিভূত করে ফেলছিল'। আমরা আগেই দেখেছি [পরেও দেখা যাবে], এইরকম পথ-চল্‌তি খণ্ড অভিজ্ঞতা কল্পনায় ভরাট হয়ে ছোটোগল্পে পরিণত

হয়েছে। বর্তমান অভিজ্ঞতাটি গল্পের রূপ পায়নি বটে, কিন্তু বিদেশ থেকে ঘরে-ফেরা মানুষদের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই চোখে-দেখা ছবিটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

চিঠিটির শেষাংশ কিছু গভীর, দার্শনিকতার লক্ষণাক্রান্ত : 'জগতের হিত করা এবং যিশুখৃস্টের মতো মরা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো আইডিয়াল হতে পারে—কিন্তু আমি সব-সুদ্ধ যে রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না, এবং ওরকম করে শুকিয়ে মরতে ইচ্ছেও করে না।...উপবাস ক'রে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক ক'রে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত ক'রে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে।' সন্ন্যাসধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে একধরনের বিরূপতা ছিল, কতকগুলি প্রহসনে এই নিয়ে হালকা রসিকতাও করেছেন—জীবনের রূপ-রস-গন্ধকে দেহমনে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করার মানবিক আকাঙক্ষা থেকেই যে তার উদ্ভব, পত্রের এই অংশটিতে সুস্পষ্ট হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা সোনার তরীর 'খেলা' 'বন্ধন' 'গীতি' 'মুক্তি' [দ্র ৩। ১৪২-৪৪] কবিতাগুলির কথা স্মরণ করতে পারি।

চিঠিটির প্রাপ্তি-স্থল হিশেবে ইন্দিরা দেবী 'মাণিকগঞ্জ' লিখে রেখেছেন। এই বৎসর পুজোর ছুটিতে তারকনাথ পালিত, লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রভৃতির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী-যে ৪ Oct [২২ আশ্বিন] গোয়ালন্দ হয়ে 'Lark' নামক স্টীমারে লোকেন্দ্রনাথের তৎকালীন কর্মস্থল মাণিকগঞ্জে গিয়ে অন্তত 30 Oct [শুক্র ১৪ কার্ত্তিক] পর্যন্ত সেখানে ছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের খাতায় তার প্রমাণ রয়েছে। 8 Oct তিনি 'On board the "Lark" via Goalunda' ইন্দিরা দেবী ও জনৈক Dr. Cann-এর ছবি এঁকেছেন। 'মাণিকগঞ্জ' উল্লেখ-সহ একই তারিখে তারকনাথ পালিত ও ইন্দিরা দেবীর আরও একটি ছবি আঁকা হয়েছে। 10 Oct আঁকা হয়েছে লোকেন পালিতের ছবি; 'বাবুয়া, তারক পালিতের ভৃত্য' [9 Oct], 'বোটের মাঝি' [28 Oct] প্রভৃতিও মডেল হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি। ছিন্নপত্রাবলীর ৩২-৩৫ সংখ্যক চারটি চিঠিরই প্রাপ্তি-স্থল মাণিকগঞ্জ। চারটি পত্রেরই বিষয়বস্তু প্রকৃতি এবং মানবজীবন সম্পর্কে স্বগত আলোচনা। এর মধ্যে ২৯ আশ্বিনের [বৃহ 15 Oct] চিঠিটি একটু নাটকীয়; আগের দিন সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ যখন একবার 'পশ্চিম দিকের সোনার সূর্যাস্ত' ও একবার 'পূব দিকের রুপোর চন্দ্রোদয়ের' দিকে ফিরে নদীর তীরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন "মৌলবি এসে আমাকে ভীতকণ্ঠে চুপিচুপি খবর দিলে 'কলকাতার ভজিয়া আয়ছে'।" আগমনের কারণটি সামান্য—ভজিয়া ও তার মা, দুই 'পশ্চিম আর্যাবর্তের বীরাঙ্গনা'র দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও পরিণামে গৃহকর্ত্রী মৃণালিনী দেবীর রায় ভজিয়ার বিরুদ্ধে গেছে। তারই ফলে 'এখানকার সিকস্তি পয়স্তি খোদ্‌কস্ত পাইকস্ত ওজরি বেওজরির মধ্যে কলকাতার তেতালা থেকে এক নাকী সুরের গৃহবিপ্লব এসে উপস্থিত...মাথার উপরে একেবারে হঠাৎ বিনা নোটিশে ভজিয়াঘাত।' বর্ণনার গুণে পত্রটি উপভোগ্য, জমিদারি অভিধানে রবীন্দ্রনাথের পারঙ্গমতার পরিচয়টিও উপেক্ষণীয় নয়!

আমরা অনুমান করেছি, আশ্বিন মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিতবাদীর সম্পর্কের অবসান হয়। এরপর সাহিত্য পত্রিকার কার্ত্তিক ১২৯৮ সংখ্যায় [পৃ ৩০৯-১১] 'সাহিত্য এজেন্সির কার্য্যাধ্যক্ষ' অভিধায় তিনি লিখলেন একটি ব্যঙ্গরচনা : 'লেখার নমুনা' [দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৫১০-১২]। রবীন্দ্র-জীবনী-কার লিখেছেন : 'হিতবাদীতে গল্প লেখার পালা কিভাবে ও কেন শেষ হইয়াছিল, তাহার কারণ আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি; ফরমাইশি গল্প বা উদ্দেশ্য ও উপদেশমূলক কাহিনী রচনাকে কবি সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়া স্বীকার

করিতেন না। তাই তরুণ সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার নূতন মাসিকপত্র 'সাহিত্য'র জন্য রচনা চাহিলে রবীন্দ্রনাথ যে-দুইটি ব্যঙ্গকৌতুক ['লেখার নমুনা' ও 'প্রত্নতত্ত্ব'] লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তাহা হিতবাদীর পরিচালকগণের মনোভাবের প্রত্যুত্তর বলিয়া মনে হয়; 'লেখার নমুনা' 'প্রত্নতত্ত্ব' 'সারবান সাহিত্য' ও 'মীমাংসা' প্রভৃতি পাঠ করিলে পাঠকগণ দেখিবেন এই ব্যঙ্গ ও শ্লেষ কাহাদের উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল।'[১] হিতবাদী-র সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'গল্পগুলি সাধারণের পক্ষে গুরুপাক হইতেছে, আরও লঘু রকমের রচনা আবশ্যক' বলে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'উদ্দেশ্য ও উপদেশমূলক কাহিনী রচনা'র ফরমায়েশ করেন নি—সুতরাং উপরোক্ত মন্তব্য কতখানি যুক্তিযুক্ত ভেবে দেখা দরকার। 'মীমাংসা' [সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮। ৩১৩-১৫; ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৫১৬-১৮] লেখাটিকে 'লঘু রকমের রচনা'র ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশ হিশেবে গণ্য করা গেলেও, 'সারবান সাহিত্য' 'লেখার নমুনা' ও 'প্রত্নতত্ত্ব' রচনাগুলির লক্ষ্য চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়। সেই সময়কার সাময়িক পত্রে পুরাণাদির চর্বিতচর্বণ করে অর্থহীন শব্দচ্ছটাকীর্ণ যে অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল, উল্লিখিত তিনটি লেখাতেই তাদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গের শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, 'সারবান সাহিত্য' রচনাটির প্রকাশ-সূত্র জানা যায় নি, এটি হিতবাদী-তে মুদ্রিত হয়ে থাকতে পারে।

৩ কার্ত্তিকের পর ছিন্নপত্রাবলী-তে মুদ্রিত পরবর্তী চিঠির তারিখ 'শনিবার, ৬ অগ্রহায়ণ' [21 Nov]—সেটিও শিলাইদহ থেকে লেখা : 'সল্লির [সরলা দেবী] একখানা চিঠি পেয়েছি। সে আমার ভগ্নহৃদয় এবং রুদ্রচণ্ড সমালোচনা করে লিখেছে।'[২] অন্তর্বর্তী সময়টিও তিনি শিলাইদহে ছিলেন। বস্তুত আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি থেকে পৌষ মাসের ৩।৪ তারিখ পর্যন্ত তিনি এখানেই কাটান। 4 Dec [শুক্র ১৯ অগ্র°][৩] তারিখে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি পত্রে তিনি লিখছেন : 'আমাদের বিরাহিমপুর সেরেস্তা সবচেয়ে বিশৃঙ্খল—আমি আজ মাস দুয়ের অধিককাল এটাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছি। এখনো পেরে উঠ্‌লুম না। এককালে এই পরগণা নীলকরগণের ইজারাধীন ছিল সেই সময়ে তারা অনাদরে কাগজপত্র সমস্ত নষ্ট করে বসে আছে। সেই অবধি এ পর্যন্ত এখানে গোলমাল চলেই আসছে।'[৪] এই চিঠি থেকে জমিদার রবীন্দ্রনাথের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাহিমপুর পরগণা ঠাকুরপরিবারের বহু পুরোনো সম্পত্তি—রামলোচন ঠাকুরের স্বোপার্জিত জমিদারি। তারপর দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ এই জমিদারি দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই কাগজপত্রের বিশৃঙ্খলা দূর করার চেষ্টা করেন নি—বা করলেও তাতে সফল হন নি। রবীন্দ্রনাথ এই দু'মাস ধরে সমস্যার মূলে যাবার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া প্রকাশিতব্য সাধনা পত্রিকার জন্য লেখালেখি, রচনা-নির্বাচন প্রভৃতি নিয়েও ব্যস্ত থেকেছেন। অবশ্য সবই করতে হয়েছে পত্র-মারফৎ, যার মধ্যে বলেন্দ্রনাথকে লেখা একটি মাত্র পুত্র পাওয়া গেছে।

ঠাকুর পরিবারের পক্ষ থেকে 'সাধনা'নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনাটি ভাদ্র মাসেই পাকা হয়ে গিয়েছিল, তাই আশ্বিন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-র চতুর্থ মলাটে এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :

'সাধনা।/মাসিক পত্রিকা।/আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে প্রকাশিত।/আকার ক্রাউন ১৬ পেজী ৮০ পৃষ্ঠা।

প্রথম সংখ্যায় যে সকল প্রবন্ধ থাকিবার সম্ভাবনা নিম্নে উল্লিখিত হইল।/শকুন্তলা (কবিতা) শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।/রাইচরণ (গল্প) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ঋতুসংহার (সমালোচনা) শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।/আধুনিক বিজ্ঞান—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।/স্বরলিপি (মায়ার খেলা—গীতিনাট্য)/স্বপ্নপ্রয়াণ (চিত্র) শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/

সাময়িক সংবাদ—/ সোরাব ও রস্তম (গল্প) শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ জানালার ধারে—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।/বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া/প্রবন্ধ বা কবিতা শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ ঘরকন্না—/বাগান—/সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা—/বিবিধ—

বার্ষিক মূল্য ২্ দুই টাকা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।ল০ছয় আনা।

শ্রীনীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/কার্য্যাধ্যক্ষ ।/৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি,/ যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।'

বিজ্ঞাপনটি কার্ত্তিক-সংখ্যাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকা-প্রকাশের একটি পটভূমিকা দিয়েছেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া : "সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা মিলে 'সুহৃদ সমিতি' নাম দিয়ে একটা সমিতি করলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আমরা সবাই ছিলাম সেই সমিতির সভ্য। বাইরের দুচারজন শিক্ষিত বন্ধুকেও সেই সমিতির সভ্য করা হয়েছিল। সভার উদ্দেশ্য—সভ্যদের মধ্যে প্রীতি বাড়ানো। উপায়—সাহিত্য চর্চা এবং মধুর প্রীতিভোজন। সমিতির অনেকগুলো অধিবেশন হয়েছিল। সেখানে সভ্যদের দ্বারা রচিত ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় রচনা পাঠ করা হত এবং তার সমালোচনাও করা হত। এর থেকেই বাংলা মাসিক পত্র 'সাধনা'র জন্ম।"[১] সমিতিটির সম্পর্কে এর বেশি আর কিছু জানা যায় নি, কিন্তু এটিকে খামখেয়ালী সভা-র অগ্রজ বলা যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এ. পত্রিকাটির সম্পাদক হন ও তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথ হন কার্যাধ্যক্ষ। বলেন্দ্রনাথও যে পত্রিকাটির পরিচালক-গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন, তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। হিতবাদী-র মতো সাধনা-র মূলধনও শেয়ারের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। সত্যপ্রসাদ তাঁর হিসাব-খাতায় ২৯ আশ্বিন ১২৯৯ [14 Oct 1892] তারিখে লিখছেন : 'সাধনা পত্রিকার এক বৎসরের সেয়ারের টাকা শোধ ৭০্'—অবশ্য একে শেয়ার না বলে চাঁদা বলাই ভালো, কারণ এই লোকসানের ব্যবসায়ে কেউ যে লভ্যাংশ পেয়েছিলেন একথা মনে করার সুযোগ নেই। তবে সখারাম গণেশ দেউস্কর বা দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রবন্ধ লেখার জন্য পাঁচ টাকা ক'রে 'পারিশ্রমিক' পেয়েছেন, ১৩০১-০২ বঙ্গাব্দের 'সাধনার ক্যাশবহি'তে তার হিসাব রয়েছে—কিন্তু সেটি পারিশ্রমিক, না অর্থসাহায্য?

উপরে আমরা যে বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করেছি, তাতে রবীন্দ্রনাথের 'রাইচরণ (গল্প)'-এর উল্লেখ আছে। এটিই 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' নামে সাধনা-র প্রথম সংখ্যায় [অগ্র°। ৬-১৮] মুদ্রিত হয়। সম্ভবত হিতবাদী-র জন্যই গল্পটি লিখিত হয়েছিল, কিন্তু এরই মধ্যে পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াতে গল্পটি সাধনা পত্রিকার সম্ভাব্য রচনাসূচীর অন্তর্গত হয়।

সুধীন্দ্রনাথের নাম সাধনা-র সম্পাদক হিশেবে মুদ্রিত হলেও পত্রিকাটির প্রাণপুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—রচনার দিক দিয়ে তো বটেই, পত্রিকা মুদ্রণের ব্যাপারে উপদেশ-নির্দেশ, রচনা-নির্বাচন ইত্যাদি গুরুতর সম্পাদকীয় দায়িত্বও তিনিই পালন করেছেন। বলেন্দ্রনাথকে একটি তারিখহীন পত্রে লিখছেন : "ঋতির "অভিমান" কবিতাটা আমি ভাল বুঝতে পারলুম না—সপ্তস্বর কবিতাটি সবচেয়ে ভাল হয়েচে। এইটে পৌষমাসে দিলে ভাল হয়। ...আমার য়ুরোপের ডায়ারি পাঠালুম। এই লেখাগুলোর হেডিংয়ের নীচে ব্র্যাকেটের মধ্যে ("য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি") সাব্‌হেডিং বসিয়ে দিয়ো। 'যক্ষি' নাম দেওয়াটা সঙ্গত হয় না তাহলে পাঠক শেষ পর্য্যন্ত পড়বার পূর্ব্বেই গল্পটা কতক বুঝতে পারবে। বরং 'বিষয় দান' কিংবা 'সম্পত্তি সমর্পণ' নাম দেওয়া ভাল। সেই গল্পটাই পৌষ সংখ্যায় দিয়ো—এবারকার গল্পটা বড় মস্ত হয়েচে—তার নাম

"স্বর্ণমৃগ" কিংবা "মরীচিকা" দেওয়া যেতে পারে। পৌষমাসের সাময়িক সাহিত্যের জন্যে বাঙ্গলা কাগজ পাঠিয়ো।

যদি সাধনা ছাপার ব্যাঘাত না হয় এবং তোমার সুবিধে হয় তা হলে বোটে আমাদের এখানে এলে আমি তোমাকে দিয়ে কতকগুলো লেখাতে পারি।...

আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, কার্ত্তিকমাসের "সাহিত্য" পত্রিকার সমালোচনা, প্রাচ্যসমাজ, পৌষমাসের জন্য সাময়িক সারসংগ্রহ—এ সবগুলো পাওনি?"[১]

ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ঠিকই অনুমান করেছেন যে, পত্রটি সাধনা-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বেই লেখা।[২] কারণ, 'কার্ত্তিক মাসের সাহিত্য পত্রিকার সমালোচনা অগ্রহায়ণ-সংখ্যাতেই [পৃ ৯২] মুদ্রিত হয়েছিল। তাছাড়া পৌষ-সংখ্যার 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য', 'প্রাচ্য সমাজ' প্রবন্ধ ও অন্যান্য কয়েকটি রচনা যে অগ্রহায়ণের গোড়াতে বা তার পূর্বেই, লেখা হয়ে গিয়েছিল, এই পত্রটি থেকে তা জানা যায়। 'স্বর্ণমৃগ' গল্পটি মুদ্রিত হয় সাধনা-র ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ সংখ্যায়, কিন্তু পত্রটি থেকে জানতে পারি, তার রচনা-কাল অনেক পূর্বে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের কালানুক্রমিক তালিকা তৈরি করতে গিয়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশের কাল অনুসরণ করা যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, চিঠিটি তার অন্যতম প্রমাণ—এরূপ উদাহরণ আরও আছে।

১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৮ [সোম 30 Nov 1891] তারিখে সাধনা-র প্রথম সংখ্যা 'কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত' হল। প্রথম সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচীটি উদ্ধার করি :

১-৪ 'সাধনের সূর্য্যালোক [প্রবন্ধ]/দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪-৬ 'শকুন্তলা' [কবিতা]/ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬-১৮ 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' [গল্প] দ্র গল্পগুচ্ছ ১৬। ২৯৫-৩০৩
১৮-২৭ 'ঋতুসংহার' [প্রবন্ধ]/বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৭-৩৪ 'প্রাণ ও প্রাণী' [প্রবন্ধ]/সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বপ্নপ্রয়াণ—'সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল...আধো-আধো ফুটি' [চিত্র]/ শিল্পী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৫-৪৪ 'সার্গম স্বরলিপি "আকার-মাত্রিক" নূতন পদ্ধতি' [প্রবন্ধ]/জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৪-৫৪ 'সাময়িক সারসংগ্রহ।/নাইন্‌টীন্থ সেঞ্চুরি।'/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৪-৪৬ 'মণিপুরের বর্ণনা' দ্র সাধনা ও সাহিত্য।[৩] ৩৩৭-৩৮
৪৭-৪৮ 'আমেরিকার সমাজচিত্র' দ্র ঐ। ৩৩৮-৩৯
৪৯ 'পৌরাণিক মহাপ্লাবন দ্র ঐ। ৩৩৯-৪০
৪৯-৫২ 'মুসলমান মহিলা' দ্র সমাজ : পরিশিষ্ট ১২। ৪৫৫-৫৬
৫২-৫৩ 'প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৪০-৪১
৫৪-৬৫ 'সোরাব ও রোস্তম'/সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৫-৭১ 'স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ।/ (হর্বর্ট স্পেন্‌সরের মত)/জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২-৭৪ ‘জানালার ধারে’ [রম্যরচনা]/বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪-৭৮ ‘বৈজ্ঞানিক সংবাদ’/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৭২-৭৪

৭৪-৭৫ ‘গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়’

৭৫-৭৭ ‘ইচ্ছামৃত্যু’

৭৭ ‘মাকড়শা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব’ [সূচীতে : ‘মাকড়শার দাম্পত্য’]

৭৭-৭৮ ‘উটপক্ষীর লাথি’

৭৮-৮০ ‘বাগান’ [প্রবন্ধ]/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০-৮৪ ‘যাত্রা আরম্ভ। (যুরোপযাত্রীর ডায়ারী)’ দ্র য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ৬৫-৬৮

৮৪-৯২ ‘সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা’ দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩০৪-১০

৮৪-৮৬ ভারতী। আশ্বিন ও কার্ত্তিক

৮৭-৮৮ নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্ত্তিক

৮৮-৯২ সাহিত্য। আশ্বিন; ৯২ কার্ত্তিক

বিজ্ঞাপনে পত্রিকাটি ৮০ পৃষ্ঠার হবে বলে জানালেও প্রথম সংখ্যা ৯২ পৃষ্ঠার। রচনার নীচে লেখকদের নাম নেই, কিন্তু সূচীপত্রে আছে—এবং সকলেই ‘ঠাকুর’, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রায় ৪০টি পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। চিরদিনই নতুন পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের রচনাশক্তিকে বহুধা-বিস্তৃত করেছে—স্বর্ণকুমারী দেবীর হাতে যাওয়ার আগে ভারতী [১২৮৪-৯০] ও ১২৯২ বঙ্গাব্দের বালক তার উদাহরণ; পরেও নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকা নূতন প্রকাশের সূত্রে তাঁর রচনাপ্রতিভাকে উস্‌কে দিয়েছে। কিন্তু সাধনা-র সঙ্গে তাদের কোনো তুলনা হয় না। পূর্ণ যৌবনের উদ্যম এবং সৃষ্টিশীলতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাধনা-পর্ব [১২৯৮-১৩০২] রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে অনন্য স্থানের অধিকারী—অন্যান্য বাঙালি সাহিত্যসেবীর মধ্যে একমাত্র বঙ্গদর্শন-পর্বের [১২৭৯-৮২] বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে।

সাধনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকদের দ্বারা আদৃত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পৌষ-সংখ্যা সাহিত্য-তে লেখেন : ‘আমরা সাদরে “সাধনার” আবাহন করিতেছি। পত্রিকার আকার প্রকার অতি সুন্দর ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন বলা যাইতে পারে। সাধনার প্রথম সংখ্যায়, বিলক্ষণ নূতনত্ব আছে, নানাবিধ প্রবন্ধের সমাবেশে বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে, সাধনার উন্নতি ও সম্পূর্ণ সিদ্ধি কামনা করি।’

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী-সম্পাদিত ‘নব্যভারত’ পত্রিকার ফাল্গুন-সংখ্যায় [পৃ ৫৯১] লিখিত হয়েছে : ‘তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তিন সংখ্যাই পাইয়াছি। উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা, এরূপ পরিপাটী পত্রিকা এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। আমরা যত ভাবি, ততই বুঝি, মহর্ষির বাড়ীর সকলই মধুর, সকলই সুন্দর। বঙ্গের আর কোন পরিবারে এতগুলি বাঙ্গালা ভাষার সাধক দেখিতে পাওয়া যায় না। মাতৃ [ভাষা] সেবার জন্য এবাড়ীর সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে লালায়িত। যাঁহার যেরূপ শক্তি, তিনি সেইরূপ কৃতিত্ব লাভ

করিতেছেন। সাধনার লেখার পারিপাট্য দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। আশা করি, পত্রিকাখানি মহর্ষির পরিবারের গৌরব আরো উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে।'

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'সমালোচনা'য় সাধনা-র 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'র অনুসরণে প্রথম সংখ্যার বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পটি সম্পর্কে তিনি লেখেন; 'আমরা রবীন্দ্রবাবুর "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন" পড়িতে আরম্ভ করিয়া যেমন আমোদ পাইয়াছি; উপসংহারে তেমনই নিরাশ হইয়াছি।…রবীন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়, তাঁহার বলিবার প্রণালী চমৎকার; তিনি নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লিখিতে পারেন, সুতরাং তাহাতে বেশ আন্তরিকতা থাকে, কিন্তু তাঁহার বলিবার বিষয়ের বড় অভাব।' কিন্তু চন্দ্রনাথ বসু গল্পটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ২৫ পৌষ [8 Jan 1892] রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথ/"খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন" নামক গল্পটী আমাকে বড় সুন্দর বোধ হইয়াছে। কেমন করিয়া কি ঘটাইয়াছ তাহা ঠিক্ ঠিক্ বুঝাইয়া দিতে পারি না, কিন্তু অস্বাভাবিকও কিছু দেখি না, যথার্থ প্রতিভাপ্রসূত পদার্থ।—পরিমাণে যৎকিঞ্চিৎ, গুণে অপূর্ব্ব।…এটাতে মানবপ্রকৃতিজ্ঞান বড় সরল ও সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—…এটা প্রতিভার তুলিতে আঁকা। 'তোমার তুলিতেও বোধ হয় আর এমন ছবি উঠে নাই। বিধাতা তোমায় দীর্ঘজীবী করুন'।[১]

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে সাধনা-র প্রধান সংযোজন দু'টি : 'সাময়িক সারসংগ্রহ' ও 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'। 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বা অন্য নামে গ্রন্থ-সমালোচনা অধিকাংশ সাময়িক পত্রের নিয়মিত বিভাগের অন্তর্গত ছিল, সাময়িকপত্রের কোনো রচনার প্রতিবাদও ছাপা হত—কিন্তু অন্যান্য পত্রিকাদির রচনার সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ সমালোচনাকে নিয়মিত বিভাগে পরিণত করার আদর্শ প্রথম সাধনা-তেই অনুসৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ একাই বিভাগটিতে লিখতেন, তাঁর সময়াভাবে বা লেখকদের বিরক্তির আশঙ্কায় কার্ত্তিক ১২৯৯-সংখ্যা থেকে বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। স্ব-সম্পাদিত ভারতী (১৩০৫)-তে ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ স্বল্পকালের জন্য বিভাগটির পুনঃ প্রবর্তন ঘটান। 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগে ইংরেজি সাময়িকপত্রের বিশিষ্ট প্রবন্ধসমূহের সারবস্তু মন্তব্য-সহযোগে পরিবেশিত হত—প্রথম দু'টি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একাই লিখেছেন, পরবর্তী সংখ্যা থেকে বলেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই বিভাগটিতে লিখতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে কোনো-কোনো সংখ্যায় বিভাগটি মুদ্রিত হয় নি, শ্রাবণ ১৩০১-সংখ্যা থেকে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী পত্রিকার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে তাঁদের চিত্তোৎকর্ষ-বৃদ্ধির এই পদ্ধতিটি রবীন্দ্রনাথ খুবই পছন্দ করতেন; পরবর্তীকালে প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনী-তে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ, নিজের কন্যাদ্বয় মাধুরীলতা দেবী ও মীরা দেবী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হেমলতা দেবী প্রভৃতিদের দিয়ে বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকা থেকে সার-সংকলন করিয়েছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই বিভাগেরও প্রশংসা করেছেন। বিভাগ দু'টি তাঁর পত্রিকাতেও প্রবর্তিত হয়—সুরেশচন্দ্রের খ্যাতি-অখ্যাতির অনেকটা এরই একটি অন্যতম বিভাগ 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

সাধনা প্রকাশিত হওয়ার চার দিন পরে 4 Dec [শুক্র ১৯ অগ্র°] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন; '…সাধনা প্রথম সংখ্যা কি তোমার হস্তগত হয়েছে? আমার ত সবসুদ্ধ মন্দ লাগ্‌ল না।

কিন্তু এর আরো উন্নতি সাধন করা আবশ্যক—আমি রাজধানীতে ফিরে একবার ঐদিকে মনোযোগ করব। আসল কথা, একটা কাগজের ভারি দরকার হয়েছে। অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক, অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব, এবং তাদের মধ্যেও দুই একজন নতুন নতুন বুলি বের করচেন। একে ত বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুব যে পরিষ্কার তা নয় তার পরে সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েচে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েচে।'[১] সাধনা পত্রিকার লক্ষ্য হিশেবে এই পত্রাংশটিকে গণ্য করা যায়। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই লক্ষ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে 'সাময়িক সারসংগ্রহ'-এ কয়েকটি মন্তব্যে ও 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য়। 'পৌরাণিক মহাপ্লাবন'-এ হাক্সলির প্রবন্ধ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমাদের দেশে প্রাচীন ধর্ম্ম যে যে স্থানে জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে নব্য পণ্ডিতেরা সেইখানে বিজ্ঞানের "ঠেকো" দিয়া তাহাকে অটল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।...কিন্তু সত্যের দ্বারা ভ্রমকে বজায় রাখা অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলেও সুসিদ্ধ হয় না। যখনি দেখা যায় সরল বিশ্বাসের স্থানে কুটিল ভাষ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখনি জানা যায় শাস্ত্রের স্বাভাবিক মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে।' 'প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব'-তে ম্যাকস্‌মূলারের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করে মন্তব্য করেছেন : 'ম্যাক্সমূলার মহাত্মার মত কথা বলিয়াছেন। হায়, তিনি জানেন না তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই "আর্য্য" শব্দ লইয়াই আমাদের দেশে দূর নিকটে মানবে মানবে কাল্পনিক ব্যবধান স্থাপিত হইতেছে। বাঙ্গালী পণ্ডিতের মুখে যখন এই "আর্য্য" নাম উচ্চারিত হয় তখন তাহার সুদূরব্যাপী উদারতা ঘুচিয়া গিয়া তাহা একটা গ্রাম্য দলাদলির কলকোলাহলে পরিণত হয়। নামের দোষ নাই, যাহার যেমন প্রকৃতি, ভাষা তাহার মুখে তেমনি আকার ধারণ করে।' রবীন্দ্রনাথ কাদের লক্ষ্য করে এইসব মন্তব্য করেছেন, বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'-তে রবীন্দ্রনাথ ভারতী [ও বালক], নব্যভারত ও সাহিত্য পত্রিকা-তিনটির পাঁচটি সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটো গল্প 'লজ্জাবতী' [ভারতী ও বালক, আশ্বিন-কার্ত্তিক। ২৯৫-৩০৫], শরৎকুমারী দেবী চৌধুরানীর 'এ কাল ও এ কালের মেয়ে' [ঐ। ৩৮৮-৯৬], সখারাম গণেশ দেউস্করের 'শকাব্দ' [নব্যভারত, আশ্বিন-কার্ত্তিক। ৩৩৯-৪৫] তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। অপরপক্ষে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের 'বিলাপ' [ভা ও বা। ৩৬৫-৬৮], 'বরখাস্তী উমেদার' [যোগিনীমোহন চট্টো°]-এর 'লিটারেরী [ঐ। ৩৮৩-৮৬] প্রভৃতি রচনা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কঠোর সমালোচনাপূর্ণ। আশ্বিন সংখ্যা 'সাহিত্য'-তে মুদ্রিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'শিক্ষিতা নারী' [পৃ ২৮৬-৯১] প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। 'পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অর্থোপার্জ্জন স্ত্রীলোকের কার্য্য নহে' প্রভৃতি কথায় তাঁর ছ'বছর আগে লেখা 'লাঠির উপর লাঠি' [বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২। ৬০-৬৩] প্রবন্ধে প্রকাশিত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কৃষ্ণভাবিনী মাঘ-সংখ্যা 'সাহিত্য'-তে [পৃ ৪৭৪-৭৮] রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেন। রবীন্দ্রনাথ সাধনার ফাল্গুন সংখ্যায় এই প্রত্যুত্তর নিয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু সেখানে যুক্তির চেয়ে রসিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে।

'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' সম্ভবত 'সাময়িক সারসংগ্রহ'-এর মতো ইংরেজি পত্রিকা থেকে সংকলিত। দু'টি সংখ্যার পর রবীন্দ্রনাথ এই বিভাগে আর কিছু লেখেন নি; অগ্র° ১৩০০-সংখ্যা ছাড়া বিভাগটির সাক্ষাৎও পাওয়া যায় না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির লেখা বৈজ্ঞানিক

প্রবন্ধ সাধনা-য় প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত এই ধরনের রচনার একটি আদর্শ সম্ভাব্য লেখকদের কাছে উপস্থিত করার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ উক্ত দু'টি সংখ্যাতে লিখেছিলেন। সরস বর্ণনাভঙ্গী ছাড়া রচনাগুলি বৈশিষ্ট্যবিহীন, কিন্তু এখানেও তিনি সামান্য সুযোগে নব্যহিন্দুদের 'আধ্যাত্মিক বিবাহ' মতবাদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন—স্ত্রী-মাকড়সা অনেক সময়ে পুরুষ-মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে এ-বিষয়ে তাঁর মন্তব্য : 'এরূপ সম্পূর্ণ দাম্পত্য একীকরণের দৃষ্টান্ত উচ্চশ্রেণীর জীবসমাজে আছে কি না সন্দেহ'।

য়ুরোপ-যাত্রার সময়ে রক্ষিত দিনলিপি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি রচনা শেষ করেন ৩ ফাল্গুন ১২৯৭ [14 Feb 1891], একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রচনাটি আরও সংস্কৃত হয়ে সাধনা-র বর্তমান সংখ্যা থেকে আরম্ভ হয়ে এগারোটি কিস্তিতে মুদ্রিত হয়। রচনা-সৌকর্যের জন্য ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি সমালোচকদের সমাদর লাভ করেছিল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন : "য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি", এই সংখ্যার আর একটি মনোজ্ঞ বিষয়। কিন্তু এত অল্প যে, পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। আমরা আশা করি, বারান্তরে ডায়ারি একটু অধিক করিয়া প্রকাশিত হইবে।' এই অতৃপ্তিজনিত ক্ষোভের কথা *The Indian Mirror* পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচক প্রায় প্রতিটি সংখ্যার সমালোচনায় ব্যক্ত করেছেন। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি/দ্বিতীয় খণ্ড' নামে রচনাটি '৮ আশ্বিন ১৩০০'-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অগ্র°-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ৩৬৪-৬৮] রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' [দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫। ৫০৮-১০] প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। গদ্য গ্রন্থাবলী-র প্রাচীন সাহিত্য খণ্ডে সংকলিত হবার সময়ে প্রবন্ধটির প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদ বর্জিত হয়, বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণের 'গ্রন্থপরিচয়'-এ বর্জিত অংশটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সাধনার পৌষ-সংখ্যায় [১। ২] রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি মুদ্রিত হয় :

৯৪-১০৬ 'সম্পত্তি সমর্পণ' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৬। ৩০৩-১১

১১৪-১৯ 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য' দ্র পাঠ সঞ্চয়

১১৯-২৭ 'সাময়িক সারসংগ্রহ' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৪১-৪৬

১১৯-২২ 'ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়'

১২২-২৬ 'সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য'

১২৬-২৭ 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ'

১৫২-৫৬ 'আমার সহযাত্রী।/(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী।)' দ্র য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ৬৮-৭২

১৫৭-৬২ 'প্রাচ্য সমাজ' দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২। ৪৫৭-৬০

১৬৫-৭১ 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৭৪-৭৮

১৬৫-৬৬ 'জীবনের শক্তি'

১৬৬-৬৯ 'ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা'

১৬৯-৭১ 'মানবশরীর'

১৭১-৮১ 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর মত' দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২। ৪৬১-৬৭

১৮২-৮৮ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩১০-১৪

১৮২-৮৭ নব্যভারত। অগ্র; ১৮৭-৮৮ সাহিত্য। অগ্র°

এই সংখ্যার অধিকাংশ রবীন্দ্র-রচনাই যে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই লেখা হয়ে গিয়েছিল, বলেন্দ্রনাথকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রই তার প্রমাণ। 'পৌষ মাসের সাময়িক সাহিত্যের জন্য বাংলা কাগজ' নিশ্চয়ই পাঠানো হয়েছিল এবং সমালোচনাও সম্ভবত লেখা হয়ে যায়—নব্যভারত ও সাহিত্য-এর অগ্র°-সংখ্যাই শুধু আলোচিত হয়।

'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য' এই বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ'-এরই অংশ, আকারে একটু বড়ো হওয়ায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধ-রূপে মুদ্রিত হয়েছে; এখানে তিনি প্রসঙ্গত পূর্ব-সংখ্যায় মুদ্রিত সুরেন্দ্রনাথের লেখা 'প্রাণ ও প্রাণী' প্রবন্ধেরও উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে 'প্রাচ্য সমাজ' প্রবন্ধটি আসলে 'সাময়িক সারসংগ্রহ'-এর অন্তর্গত; আগের সংখ্যায় মুদ্রিত 'মুসলমান মহিলা' রচনাটির প্রসঙ্গক্রমে লিখিত। অবশ্য কেবলমাত্র সারসংগ্রহ করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, তার উপর দীর্ঘ মন্তব্যও করেছেন—তাঁর সামাজিক চিন্তার দিক্-নির্দেশক হিশেবে তা মূল্যবান : 'এককালে আদর্শ উচ্চতর ছিল ক্রমশঃ তাহা বিকৃত হইয়া আসিয়াছে এবং এককালে কোন মহাপুরুষ তৎসময়ের উপযোগী যে সকল বিধান প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধিচালনাপূর্বক সচেতনভাবে সমাজ তাহার অধিক আর এক পা অগ্রসর হয় নাই—এ-কথা বর্তমান মুসলমানেরাও বলিতেছেন এবং বর্তমান হিন্দুরাও বলিতেছেন। গৌরব করিবার বেলাও এই কথা বলি, বিলাপ করিবার বেলাও এই কথা বলি। যেন আমাদের এসিয়ার মজ্জার মধ্যে সেই প্রাণক্রিয়ার শক্তি নাই যাহার দ্বারা সমাজ বাড়িয়া উঠে, যাহার অবিশ্রাম গতিতে সমাজ পুরাতন ত্যাগ ও নূতন গ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়তই আপনাকে সংস্কৃত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে।

'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর মত' রচনাটি তেমনই 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'র অংশভূত। অগ্র°-সংখ্যা 'সাহিত্য'তে মুদ্রিত চন্দ্রনাথ বসুর 'আহার' [পৃ ৩৫৭-৬৩] প্রবন্ধটির দীর্ঘ সমালোচনা করা হয় এই রচনাটিতে। আহার-বিষয়ে চন্দ্রনাথ বসুর এটি দ্বিতীয় রচনা—প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য-এর শ্রাবণ ১২৯৭-সংখ্যায়, আর একটি লেখেন পত্রিকাটির চৈত্র ১২৯৮-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সেটিরও সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসুর শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রে ব্যক্ত হয়েছে। তবু যে রবীন্দ্রনাথ বার বার তাঁর প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, এর কারণ চন্দ্রনাথকে একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি হিশেবেই মনে করা। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে যে লিখেছিলেন, 'অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক, অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব, এবং তাঁদের মধ্যেও দুই একজন নতুন নতুন বুলি বের করচেন'—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি এই 'নতুন নতুন বুলি'র প্রচারক হলেও, তাঁদের প্রধান সাহিত্যিক মুখপাত্র চন্দ্রনাথ বসু—এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। চন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করলেও তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল আর্য-ধ্বজাধারী নব্যহিন্দুসমাজ—একথা মনে রাখলে 'এ যেন তর্কের জন্যই তর্ক, কোন মহৎ উদ্দেশ্য বা সৃষ্টি প্রেরণা এর পিছনে ছিল না'[২] মন্তব্য মেনে নেওয়া শক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরে এই কথা লিখেছেন : 'তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্ত্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ প্রতিবাদে আমার কখনই রুচি হইত না।'[৩]

একই কারণে ব্যক্তি চন্দ্রনাথকেও তিনি আক্রমণ করেছেন। যে ক্ষোভে মানসী কাব্যের 'পরিত্যক্ত' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,/ কোথা গেল সেই আশা!

আজিকে বন্ধু, তোমাদের মুখে/এ কেমনতর ভাষা! ···
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ/ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে/উজান স্রোতের কাল।

—সেই একই ক্ষোভ বঙ্কিম-শিষ্য চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তির্যক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়েছে : 'তিনি বলেন এই আহার তথ্যের "শিক্ষা গুরুপুরোহিতেরা দিলেই ভাল হয়। কিন্তু তাঁহারা যদি এ শিক্ষা দিতে অক্ষম হন তবে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই এ শিক্ষা দিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;···লেখক-মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কেবল একটিমাত্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা উক্ত রচনার সর্ব্বপ্রান্তে নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেটি তাঁহার স্বাক্ষর শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।···চন্দ্রনাথ বাবুর স্বাক্ষরের প্রতি আমাদের যথোচিত শ্রদ্ধা থাকিলেও তাহা ছাড়াও আমরা প্রমাণ প্রত্যাশা করিয়া থাকি।' রচনা শেষেও এই তির্যক ভঙ্গি বর্তমান : 'গুরুর ভঙ্গীতে কথা বলা একটা নূতন উপদ্রব বঙ্গ-সাহিত্যে সম্প্রতি দেখা দিতেছে। এরূপ ভাবে সত্য কথা বলিলেও সত্যের অপমান করা হয়, কারণ সত্য কোন লেখকের নামে বিকাইতে চাহে না, আপনার যুক্তিদ্বারা সে আপনাকে প্রমাণ করে, লেখক উপলক্ষ মাত্র।···একেবারে অভ্রান্ত অভ্রভেদী গুরুগৌরব ধারণ করিয়া বিশ্বসাধারণের মস্তকের উপর নিজের মতকে বেদবাক্যস্বরূপে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করা কখনো হাস্যকর, কখনো উৎপাতজনক।'

চন্দ্রনাথ কিন্তু এই খোঁচা নীরবে পরিপাক করেছিলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার কয়েক দিন পরে ২৫ পৌষ [শুক্র 4 Jan 1892] রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে পত্রটি লেখেন, তার মধ্যে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটির অকুণ্ঠ প্রশংসা ও রবীন্দ্র-প্রতিভার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিই আছে, আহত চিত্তের কোনো উষ্মা-জড়িত প্রত্যাঘাত নেই এবং ফাল্গুন-সংখ্যা সাহিত্য-তে যখন একই বিষয়ে তৃতীয় প্রবন্ধটি লেখেন তখন সেখানেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের কোনো জবাব দেবার চেষ্টা করেননি। অবশ্য 'অমৃতং বালভাষিতম্' ভেবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে অবজ্ঞা করার মনোভঙ্গি এই নীরবতার পশ্চাতে কার্যকর ছিল কি না বলা শক্ত।

'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ নব্যভারত-এর অগ্র°-সংখ্যার আলোচনায় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার' প্রবন্ধটিতে নিজের মতের সাদৃশ্য দেখে বহুল উদ্ধৃতি-যোগে প্রশংসা করেছেন [একটি মন্তব্য : 'বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন এ কথা মুহূর্ত্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে'।] রমেশচন্দ্র দত্তের ক্রম-প্রকাশিত 'হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধটিও একই কারণে তাঁর সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ও এই সূত্রে নব্যহিন্দুদের প্রতি তিনি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য-শর নিক্ষেপ করেছেন : 'রমেশ বাবু যে এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, কারণ, আমাদের দেশের বুদ্ধিমানগণ প্রাচীন হিন্দুসমাজ ঘরে বসিয়া গড়িয়া থাকেন। সে সমাজে কি ছিল কি না ছিল, কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু সেটা যেন বিধাতাপুরুষ সূতিকাগৃহে তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্য কোন ইতিহাস নাই! ঐতিহাসিক প্রণালী

অনুসরণ করিয়া রমেশ বাবু এই যে প্রাচীন সমাজচিত্র প্রকাশ করিতেছেন ইহার সহিত আমাদের বাঙ্গলার আজন্ম-পণ্ডিতগণের মস্তিষ্কলিখনের ঐক্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। নিজের সখ অনুসারে তাঁহারা প্রত্যেকেই দুটি চারিটি মনের মত শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানকে তাহার কাছে ঘেঁসিতে দেন না।'

মধুসূদন রাও-এর 'ঋষিচিত্র' [পৃ ৪০৫-০৯] কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লেখেন : 'নাম শুনিয়া কবিকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ কবিত্ব প্রকাশ আর কোন বিদেশীর দ্বারায় সাধিত হয় নাই। কবির রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশিরস্নাত পবিত্র নবীন উষালোক অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল এবং মহভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। ...প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাঙ্গলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু ঋষিচিত্র কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন গম্ভীর ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে।' রবীন্দ্রনাথ ঠিকই অনুমান করেছিলেন—'ভক্তকবি' মধুসূদন রাও [1853-1912] মহারাষ্ট্রীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু আজন্ম উড়িষ্যা-বাসী হওয়ায় ওড়িয়াই তাঁর মাতৃভাষা-স্বরূপ হয়। সম্ভবত উক্ত প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ করেন এবং এর পর রবীন্দ্রনাথ যখন ১২৯৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের শেষে [Feb 1893] উড়িষ্যা-ভ্রমণে যান, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে।

'সাহিত্য' পত্রিকার অগ্র°-সংখ্যার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছোট গল্প 'মুক্তি' সম্পর্কে যা লিখেছেন তাঁর দার্শনিক ভাবনা হিশেবে তা উদ্ধৃতিযোগ্য : '...মুক্তি যে সংসারের বাহিরে হিমালয়ের শিখরের উপরে প্রাপ্তব্য তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। মুক্তি অর্থে আত্মার স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা অর্থে শূন্যতা নহে। অধিকার যত বিস্তৃত হয় আত্মার ক্ষেত্র ততই ব্যাপ্ত হয়। সেই অধিকার বিস্তারের উপায় প্রেম। প্রেমের বিষয়কে বিনাশ করিয়া মুক্তি নহে, প্রেমের বিষয়কে ব্যাপ্ত করিয়াই মুক্তি। বৈষয়িক স্বার্থপরতায় আমরা সমস্ত সুখ সম্পদ কেবল নিজের জন্য সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করি—কিন্তু সুখকে অনেকের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিলে সুখের প্রসারতা হয় না—এই জন্য কৃপণ প্রেমের বৃহত্তর সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। আত্মসুখে বিশ্বসুখকে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তেমনি আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় আমরা আপনার আত্মাটি কক্ষে লইয়া অনন্ত বিশ্বকে লঙ্ঘন করিয়া একাকী মুক্তি শিখরের উপরে চড়িয়া বসিতে চাহি। কিন্তু প্রেমের মুক্তি সেরূপ নহে—যে বিশ্বকে ঈশ্বর ত্যাগ করেন নাই, সে বিশ্বকে সেও ত্যাগ করে না। যেদিন নিখিলকে আপনার ও আপনাকে নিখিলের করিতে পারিবে সেই দিনই তাহার মুক্তি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অসংখ্য সোপান আছে তাহার কোনটিকে অবহেলা করিবার নহে। অধিকারের স্বাধীনতা এবং অধিকারহীনতার স্বাধীনতায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ।' সোনার তরী-র অনেকগুলি কবিতার মধ্যে এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে—তারপর সারা জীবনই কাব্যে-গানে-প্রবন্ধে বারবার এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ নানা ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন।

ইন্দিরা দেবী-কৃত মায়ার খেলা-র প্রথম দৃশ্যটির স্বরলিপি পৌষ-সংখ্যায় [পৃ ১৪৮-৫২] মুদ্রিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সার্গম-স্বরলিপির "আকার-মাত্রিক" নূতন পদ্ধতি' নামে গানের স্বরলিপি-রচনার একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন সাধনা-র অগ্র° [পৃ ৩৫-৪৪] ও পৌষ [পৃ ১৪১-৪৮]-সংখ্যায়। ইন্দিরা দেবী এই পদ্ধতি অনুসারেই স্বরলিপি তৈরি করেন। কিছু কিছু পরিবর্তন-সহ এই পদ্ধতিটিই বাংলা গানের ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসটি শিলাইদহেই ছিলেন, পৌষ মাসের প্রথমে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন— ৫ পৌষ [শনি 19 Dec] তাঁকে পার্ক স্ট্রীটে যেতে দেখা যায়। এই সময়ে তাঁর কলকাতা আসার মুখ্য কারণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার সমবেত ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করা। মহর্ষির দীক্ষাদিনটি স্মরণ করে ৭ পৌষ [সোম 21 Dec] মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনটি ধার্য হয়। এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন করার এইটিই সূচনা। ৬ পৌষ অপরাহ্নে সকলে হাওড়া থেকে বোলপুর যাত্রা করেন। তত্ত্ব-কৌমুদী-তে লেখা হয় : 'বিগত ২১এ ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুর শান্তিনিকেতনস্থ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রহ্মোৎসব হয়। কলিকাতা হইতে আদি, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি সভ্য এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য হাওড়া স্টেশনে একখানা গাড়ি রিজার্ভ করা হইয়াছিল। ২০এ তারিখে ব্রাহ্মগণ এখান হইতে বোলপুরে যান। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আদি সমাজের অপর গাহকগণ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সঙ্গীতের কার্য্য এবং পণ্ডিত অচ্যুদানন্দ উপনিষদ্ পাঠ করেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মগণ উৎসবানন্দ সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া তৎপর দিবস [৮ পৌষ] কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন।'[১]

কলকাতায় ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করেন। ১৭ পৌষ [বুধ 31 Dec] তাঁকে 'পার্ক স্ট্রীট হইতে বীর্জাতালা' যেতে দেখা যায়। এর পর 4 Jan 1892 [সোম ২১ পৌষ] তিনি শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে 'কিছু আগেই পাবনা থেকে এঞ্জিনিয়ার তার মেম এবং কচিকাচা নিয়ে এসে উপস্থিত' হওয়ার কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা লিখে পাঠিয়েছেন।[২] বোটে বাস করার সময়ে নির্জনতাই তাঁর প্রধান সঙ্গী, তার মধ্যে সাহেব মেম ও তাদের দুটি বাচ্ছার আগমন মোটেই অভিপ্রেত নয়—ফলে তাঁর মানসিক অবস্থা কিরকম হয়েছিল তার বর্ণনা আছে 6 Jan-এ লেখা পত্রে, এর মধ্যে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয় : 'আমার এই দুটো দিন একেবারে ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে—আবার থিতিয়ে নিতে দুদিন যাবে—মেজাজটা এমনি খারাপ হয়ে আছে যে ভয়ে ভয়ে আছি পাছে কাউকে অন্যায় অকারণে তাড়না করে উঠি—এত বেশি সাবধানে আছি যে সহজ অবস্থায় যখন একজনকে ধমক দিতুম এখন তাকে খুব নরম নরম করে বলছি—মেজাজ বিগড়ে গেলে অনেক সময় আমার এই রকম উল্টো রকম ব্যাপার হয় যে, সে সময়ে ছেলেরা কাছে থাকলে ভয় হয়···পাছে তাদের লঘু দোষে গুরু দণ্ড দিই এই জন্য তাদের দণ্ডই দিই নে, খুব দৃঢ় করে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে থাকি।'[৩] সারা জীবন রবীন্দ্রনাথ এই স্বভাববৈশিষ্ট্য রক্ষা করে গেছেন।

(ছিন্নপত্রাবলীর ৩৭-৪৩ সংখ্যক চিঠিগুলির তারিখ ও বারে মিল নেই; তারিখের সঙ্গে বারের কখনো একদিন, কখনো দু'দিন পার্থক্য ঘটেছে—ভুলগুলি রবীন্দ্রনাথ করেছেন, না ইন্দিরা দেবী নকল করার সময়ে ভুল করে ফেলেছেন, বলা শক্ত। ৩৯-সংখ্যক চিঠির তারিখ 'বৃহস্পতিবার, ৯ জানুয়ারি' [শনি ২৬ পৌষ]—রবীন্দ্রনাথ এতে লিখছেন : 'দুই-এক দিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্ততঃ করছে—···বসন্ত অনেকটা কাছে এসে পৌঁচেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে,' এর একটু পরেই লেখা : 'আজ পূর্ণিমা রাত—ঠিক আমার বাঁ দিকের খোলা জানলার উপরেই একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—···আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা' ইত্যাদি। শৈত্যের অভাবে শীতকালেও কখনো-কখনো বসন্তের অনুভূতি দেখা দিতে পারে, কিন্তু জানুয়ারির প্রথমে বসন্তের প্রথম পূর্ণিমাকে সম্ভাষণ জানানো

কোনো কবির পক্ষেও অস্বাভাবিক—তাছাড়া এদিন পূর্ণিমা ছিল না, পূর্ণিমা হয় 14 Jan [বৃহ ১ মাঘ]। সুতরাং এই চিঠির বার ও তারিখ, এমন-কি পত্র-প্রাপ্তির তারিখেও ভুল আছে বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়—চিঠির তারিখ 11 Feb [বৃহ ২৯ মাঘ] হলে অনেকটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব [12 Feb ১ ফাল্গুন পূর্ণিমা ছিল]।)

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ১১ মাঘ [রবি 24 Jan] দ্বিষষ্টিতম সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠানের পূর্বে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁর রচিত দু'টি ব্রহ্মসংগীত গীত হয় : 'এ মোহ আবরণ খুলিয়া দাও' ও 'শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর' [সিন্ধু—ঢিমাতেতালা; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৭; গীতবিতান ১। ১৭৫-৭৬; স্বর ৪৫]। প্রথম গানটি ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। ১২ মাঘ তাঁর 'পার্কস্ট্রীট হইয়া বীর্জাতালা', ১৩ মাঘ 'পার্কস্ট্রীট হইতে যোড়াসাঁকো আসিবার' ও ১৭ মাঘ 'পার্কষ্ট্রীট হইতে বীর্জাতালা যাওয়ার' গাড়িভাড়ার হিসাব পাওয়া যায়। এই সময়ে মহর্ষিও অসুস্থ ছিলেন। ২৭ মাঘ [মঙ্গল 9 Feb] 'শ্রীযুত রবীন্দ্রবাবুর নিকট একপত্র পাঠান'র হিসাব থেকে মনে হয়, তিনি এর পূর্বে শিলাইদহে ফিরে গিয়েছিলেন।

সাধনা, মাঘ ১২৯৮ [১/ ৩] :

১১৮-২১১ 'দালিয়া' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৬। ৩১২-২০

২১১-১৮ 'কর্ম্মের উমেদার' দ্র সমাজ (পরিশিষ্ট) ১২। ৪৬৭-৭১

২৩৭-৪৩ 'তরী পরিবর্ত্তন।' (য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী) দ্র য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ৭২-৭৮

২৪৪-৫০ 'সাময়িক সারসংগ্রহ' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৪৬-৫০

২৪৪-৪৭ 'স্ত্রী-মজুর'

২৪৭-৪৯ 'প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার'

২৪৯-৫০ 'ক্যাথলিক সোশ্যালিজম'

২৮২-৮৫ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩১৪-১৬

২৮২-৮৩ নব্যভারত। পৌষ; ২৮৩-৮৪ সাহিত্য। পৌষ;

২৮৪-৮৫ সাহিত্য ও বিজ্ঞান। কার্ত্তিক

'দালিয়া' গল্পটি ইতিহাসের ক্ষীণ আভাস অবলম্বনে লিখিত রোমান্স। অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই লিখেছিলেন হেমন্তবালা দেবীকে : 'দালিয়া গল্পটায় ইতিহাস যেটুকু আছে সে আছে গল্পের বহিঃপ্রাঙ্গণে—অর্থাৎ গাছে চড়িয়ে দিয়ে মুই নিয়েছে ছুটি। আসল গল্পটা ষোলো আনাই গল্প।'[1] চন্দ্রনাথ বসু গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে ইতিপূর্বে প্রশংসিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন [২ ফাল্গুন ১২৯৮] : 'দালিয়া-টুকু বীরে-মধুরে বড়ই মনোহর হইয়াছে। এটুকু কাব্য—উপন্যাস নামে। আর এই মনোহর কবিত্বটুকুর সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর স্থান—সেই শেষটুকু, ছুরিকার সেই ঝিকিমিকি হাসিটুকু। খোকাবাবুতে মানবপ্রকৃতির রহস্য অতি নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছ—দালিয়াতে কবিত্বের বড় কোমল একটী কলি ফুটাইয়া দিয়াছ। খোকাবাবু বুঝিয়া দেখিবার জিনিস, দালিয়া ভোগ করিবার জিনিস—কিন্তু দুইয়েতেই আনন্দ অপার। দালিয়াতে প্রাচীন কালের—দস্যুতস্করের সময়ের একটা ভাঁজ আছে—তাই দালিয়া কিছু romantic. কাব্য ও romance-এর সুন্দর মিলন-মিশ্রণ হইয়াছে। কিন্তু কবিত্বই প্রবল।'[2] শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ দালিয়া-র চিত্রনাট্য রচনার প্রয়াস করেছিলেন।

এই সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখা 'কর্ম্মের উমেদার' প্রবন্ধটি। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি-র যে অংশ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, তার একজায়গায় আছে : 'য়ুরোপ মনুষ্যের নব নব অভাব সৃষ্টি করে' সেইটাকে মোচন করাকেই সুখ বলে, আমরা মনুষ্যের ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি চিরসঙ্গী আজন্ম অভাবগুলিকেও খোরাক বন্ধ ও অন্যান্য কৌশল দ্বারা হ্রাস করে' বসে' থাকাকেই সন্তোষ বলি।' য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র পাণ্ডুলিপি এক বছর আগে প্রস্তুত হয়ে গেলেও, রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি সংখ্যার জন্য আলাদা করে লিখে পাঠাচ্ছিলেন—দু'টি পাঠের তুলনা করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সম্ভবত উদ্ধৃত অংশটুকু লেখবার সময়ে প্রবন্ধের ভাবটি তাঁর মনে দেখা দেয়। লক্ষণীয়, এবারের 'সাময়িক সারসংগ্রহ'-এর অন্তর্ভুক্ত 'স্ত্রী-মজুর' রচনার বিষয়টিও অনেকটা এক। যন্ত্রসভ্যতার বিস্তারে য়ুরোপে মনুষ্যত্ব পীড়িত ও বিদ্রোহী হচ্ছে এই চিন্তাসূত্রেই সব-ক'টি রচনা গ্রথিত এবং নব্যহিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণমুখী তাঁর সমকালীন মনোভাবের ফলে স্বভাবতই আলোচনাটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে ভারতীয় সমাজের দিকে : 'যাহারা মান্ধাতার আমলের লাঙ্গলে চাষ করিতেছে, যাহারা মনুর আমলের ঘানিতে তেল বাহির করিতেছে, যাহারা, যেখানে পড়ে সেইখানে পড়িয়া থাকাকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ গৌরবের বিষয় বলিয়া গর্ব্ব করে আবশ্যক হইলেই তাহারাই সহিষ্ণুভাবে নতশিরে সমস্ত য়ুরোপের কল টানিতে পারিবে। যদি বরাবর পবিত্র আর্য্যশিক্ষাই জয়ী হয় তবে আমাদের প্রপৌত্রদিগের চাক্‌রির জন্য বোধ হয় আমাদের পৌত্রদিগকে অধিক ভাবিতে হইবে না।' অনুরূপভাবে 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত সখারাম গণেশ দেউস্করের 'এটা কোন্ যুগ' প্রবন্ধ সম্বন্ধীয় আলোচনা গড়িয়ে গেছে নব্যহিন্দুদের বিরুদ্ধে বক্রোক্তিতে : 'আমরা দেখিতেছি আজকাল হঠাৎ সত্যযুগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে; আর কোথাও না হৌক্ বাঙ্গালা দেশে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে কলির কুয়াশা ক্রমেই কাটিয়া উঠিতেছে এবং এক রাত্রির মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার নব নব কুশাঙ্কুর সূচির মত জাগিয়া উঠিয়া গত কলিযুগের বকেয়া পাপীদিগের পথ চলা বন্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। অতএব পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পূর্ব্বাচলে নব সত্যযুগের অভ্যুদয় যে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'

'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগে 'স্ত্রী-মজুর' রচনাটি সেপ্টেম্বর মাসের 'নিউ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত ফরাসী লেখক জুল সিমঁ-রচিত ফ্রান্সের স্ত্রীমজুর-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও 'প্রাচীন পুঁথি-উদ্ধার' রচনাটি নভেম্বর মাসের 'লেজার আওয়ার' [*'Leisure Hour'*] পত্রিকার একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত—'ক্যাথলিক্ সোশ্যালিজ্‌ম্' রচনাটিতে কোনো পত্রিকার উল্লেখ নেই।

'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' পত্রিকায় মুদ্রিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী' প্রবন্ধের সমালোচনায় সমাজে মেয়েদের স্থান বিষয়ে নিজের পূর্বপোষিত মতের উপর জোর দিয়ে লিখেছেন : 'আমার বোধ হয় স্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন না হইয়া নিরভিমান ও সহজভাবে আত্মকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর শ্রেষ্ঠতা আছে; আজকাল নারীগণ সেই শ্রেষ্ঠতা হইতে বিচ্যুত হইবার আয়োজন করিতেছেন।···নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ, তিনি পুরুষের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীত ঘটিতে পারে; তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য নহে।'

মায়ার খেলা-র দ্বিতীয় দৃশ্যের ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি এই সংখ্যায় [পৃ ২১৮-২৬] প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণনগরের শরৎকুমারী দেবীর [জগদানন্দ রায়ের স্ত্রী] 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর

দেন ‘সম্পাদক’ [পৃ ২৮৬]।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ফাল্গুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত শিলাইদহে ছিলেন। 12 Feb [শুক্র ১ ফাল্গুন] ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে কালিদাসের ‘রম্যাণি বীক্ষ্য’ ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন : ‘সৌন্দর্য যে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটা পড়ে আমার ভারী আনন্দ হল।’[১] এই আনন্দিত মনের উপকূলে বহুদিন পরে কাব্যের সোনার তরী এসে ভিড়ল। ফাল্গুন মাসে লিখলেন তিনটি কবিতা—‘সোনার তরী’ [সোনার তরী ৩। ৭-৮] ‘বিম্ববতী’ [ঐ। ৯-১১] ও ‘শৈশব সন্ধ্যা’ [ঐ। ১২-১৩]—তিনটিতেই স্মৃতি একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফায়ুন মাসে লেখা ‘সোনার তরী’ কবিতার আবহে রয়েছে শ্রাবণের ছায়ামেদুর প্রভাতের ছবিটি, ‘বিম্ববতী’ কবিতাটি লেখা ভাইঝি অভিজ্ঞার কাছে শোনা রূপকথার কাহিনী অবলম্বনে, আর ‘শৈশবসন্ধ্যা’ নামটিই স্মৃতিরোমন্থনের পরিচয়বাহী।

উল্লেখ্য, ‘সোনার তরী’ কবিতাটি মজুমদার-পুঁথি ও Ms. 129 উভয় পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেলেও সংশোধনবাহুল্যে মজুমদার-পুঁথিতেই আদি পাঠ রচিত হয়েছিল ব’লে অনুমান করা যায়। অপর কবিতা-দু’টির পাণ্ডুলিপি কেবল মজুমদার-পুঁথিতেই আছে। অনেক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে কবিতা-দু’টি গড়ে উঠেছে।

‘সোনার তরী’ কবিতাটি রচিত হওয়ার দীর্ঘ দিন পরে সাধনা-র আষাঢ় ১৩০০ [পৃ ১২৭-২৮]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক অভিনন্দিত হয় : ‘এবারকার সাধনার আর একটি মহামূল্য অলঙ্কার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোণার তরী।’ আমরা বহুদিন এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত কবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই।…ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য বচনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়; তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ।’[১] অথচ এক যুগ পরে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবিতাটির বিরূপ সমালোচনা করেন ‘কাব্যের অভিব্যক্তি’ [প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩১৩। ৩৬১-৬৬] প্রবন্ধে, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার নানা অসংগতি দেখিয়ে লেখেন : ‘এ কবিতাটি দুর্ব্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে—একেবারে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী।’ এর আগে আশ্বিন-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ৩৭৭-৭৯]‘একটি পুরাতন মাঝির গান। [আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।]’ রচনায় তিনি কবিতাটিকে ব্যঙ্গ করেন। যদুনাথ সরকার ও ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী-র অগ্র°-সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যুত্তরে ‘সোনার তরী’র ‘ব্যাখ্যা’ দেন [পৃ ৪৬৭-৬৯]। রবীন্দ্রনাথও ৯ অগ্র° ১৩১৩ [25 Nov 1906] বীরেশ্বর গোস্বামীর [অতুলচন্দ্র ঘোষ] প্রশ্নের উত্তরে ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন : ‘সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে, আমারও ওই সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদিগকেই দুই দিনেই ভুলিয়া যায়।’[২] এর পর ১৩১৫ সালের চৈত্র মাসে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি ‘সোনার তরী’র অর্থ ব্যাখ্যা করেন : ‘মহাকাল মানুষের কর্ম কীর্তি বহন করিয়া লইয়া যায়, রক্ষা করে; কিন্তু স্বয়ং কীর্তিমান্ মানুষকে সে রক্ষা করিতে চায় না।’[৩] পরদিন ৪ চৈত্র ১৩১৫ [বুধ 17 Mar 1909] প্রত্যূষে মন্দিরের উপাসনায় এই ভাবটিই ব্যক্ত করেন।[৪] অবশ্য প্রসঙ্গ-সূত্রে এই-সব ব্যাখ্যা করলেও তাঁর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে উপরোক্ত পত্রটির শেষাংশে : ‘কিন্তু, এ সমস্ত

ব্যাখ্যাকে ধিক্। কবিতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যদি নির্ভর করে তবে ইহা বৃথাই লিখিত হইয়াছিল। মনে কর না কোনোই বিশেষ অর্থ নাই; কেবল বর্ষা, নদীর চর, কেবল মেঘলা দিনের ভাব, একটা ছবি, একটা সঙ্গীতমাত্রই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কি?'

কিন্তু, উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলি পরবর্তীকালের পরিণত চিন্তার ফল বলে মনে করলে ভুল হবে। রচনাস্রোতে প্রবাহিত হতে হতে মাঝে মাঝেই তিনি নিজের রচনার মূল্যায়ন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। সাতাশ বছর বয়সে পদার্পণ করে 27 Jul 1887 [১২ শ্রাবণ ১২৯৪] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে হালকা ভঙ্গিতে লিখেছিলেন : 'আর তো ফাঁকি দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অল্প ছিল, ভবিষ্যতে সাবালক অবস্থার ভরসায় লোকে ধারে খ্যাতি দিত। এখন ত্রিশ বৎসর হতে চলল, আর তো তাদের বসিয়ে রাখল চলে না।'[৫] কিন্তু ১৭ মাঘ ১২৯৭ [29 Jan 1891] প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠির ভাবটি গাম্ভীর্যপূর্ণ : 'নিজের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে চেষ্টা করা দুরাশা —কারণ আমার প্রতিমুহূর্ত্তই আমার নিজের কাছে এমনি জীবন্ত এবং বলবান যে, মোটের উপরে আমি যে কী তা দেখতে পাইনে।'[৬] আমাদের ধারণা, মানসী কাব্য প্রকাশিত হবার [পৌষ ১২৯৭] দীর্ঘকাল পরে আবার কবিতা লেখবার মুহূর্তে তাঁর অবচেতনে এইরূপ ভাবনাই কার্যকর ছিল, রূপকের আবরণে যা প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষণীয়, এক বৎসর পরে ২২ ফাল্গুন ১২৯৯ [শনি 4 Mar 1893] তালদণ্ডা খালপথে পাণ্ডুয়া থেকে কটক যাবার সময়ে লেখা 'অনাদৃত' [সোনার তরী। ৩। ৭৭-৭৯] কবিতায় প্রায় একই রকম ভাব ব্যক্ত হয়েছে—ছন্দ, স্তবক-বন্ধ একই ধরনের, শুধু শেষোক্ত কবিতাটি দীর্ঘতর। ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে [৩০ আষাঢ় ১৩০০] রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাব ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেটি বর্তমান কবিতাটির ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রযোজ্য : 'বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারছে না —তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়—অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে,…কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে।'[১] পস্টারিটি-র ভাবনা উভয় কবিতারই আলম্বন।

অবনীন্দ্রনাথের আঁকা দু'টি চিত্রে ভূষিত হয়ে 'বিম্ববতী' কবিতাটি বৈশাখ ১২৯৯-সংখ্যা সাধনা-য় [পৃ ৫৩৫-৩৮] প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নলিনী তালুকদারকে লেখা একটি পত্রে [23 Sep 1924] রচনার ইতিহাসটি জানিয়েছেন : 'অভি বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কি একটা কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময়ে যা-তা বকে গেল, এক মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল। সে আজ, অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজো মনে আছে। তারই মুখে রূপকথা শুনে আমি সোনার তরীতে বিম্ববতীর গল্প লিখেছিলাম।'[২] কবিতাটিও 'রূপকথা' আখ্যায় চিহ্নিত। ড আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন : '"বিম্ববতী'র কাহিনীটির সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় রূপকথার কিছু সাদৃশ্য আছে।… 'বিম্ববতী'র কাহিনী এবং Cinderella-র কাহিনী উভয়েরই অভিপ্রায় (motif) অভিন্ন।…কাহিনী নায়িকার 'বিম্ববতী' নামটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রদত্ত, বাংলার কোন রূপকথার নায়িকা-রূপে এই নামটি শুন্‌তে পাওয়া যায় না।'[৩] অভিজ্ঞা হয়তো

ইংরেজি অনুবাদে পড়া রূপকথার গল্প পিতৃব্যকে শুনিয়েছিলেন, সেই স্মৃতিই 'বিম্ববতী' কবিতার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বস্তুত শিলাইদহের জনহীন, নিস্তব্ধ প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে মাঝেমাঝেই রূপকথার মোহময় পরিবেশটি রচনা করেছে। এইজন্য কয়েকদিন পরে ৪ Apr [শুক্র ২৭ চৈত্র] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'এখানে এসে আমি এত এলিমেন্ট্স্ অফ পলিটিক্স্ এবং প্রব্লেম্স্ অফ্ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় তোর খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে।…এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।'[৪] এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই লিখিত হয়েছে 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' [জোড়াসাঁকো, চৈত্র ১২৯৮; সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯। ১০৫-০৬ দ্র সোনার তরী ৩। ১৪-১৬], 'নিদ্রিতা' [শান্তিনিকেতন ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯; দ্র ঐ ৩। ১৬-১৯] ও 'সুপ্তোত্থিতা' [শান্তিনিকেতন, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯; দ্র ঐ ৩। ১৯-২৪]-র মতো কবিতা। ড আশুতোষ ভট্টাচার্য 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতার উৎস হিশেবে 'পুষ্পমালার রূপকথা'কে নির্দেশ করেছেন,[৫] কিন্তু বাকি দু'টি কবিতা কেবলমাত্র রূপকথার আবহটিকে অবলম্বন করেছে—গীতিকবিতার রসই সেখানে প্রধান। অবশ্য এ-কথা 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ফাল্গুন-সংখ্যা সাধনা-য় [১। ৪] রবীন্দ্রনাথের রচনা :

২৮৭-৯৮ 'কঙ্কাল' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৬। ৩২১-২৮

৩১৩-১৫ 'মীমাংসা' দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৫১৬-১৮

৩২০-২৭ 'আলোচনা' (পত্র) দ্র সাহিত্য ৮। ৪৬৩-৬৮ ['পত্রালাপ : ১']

৩৪৩-৪৮ 'লোহিত সমুদ্রে।/(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি) দ য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ৭৮-৮৩

৩৪৮-৫২ 'সাময়িক সারসংগ্রহ'

'আমেরিকানের রক্তপিপাসা' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৫০-৫৩

৩৭১-৭৮ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'

সাহিত্য, মাঘ

'কঙ্কাল' গল্পটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সীতা দেবীকে বলেছিলেন : 'ছেলেবেলা আমরা যে ঘরে শুতুম তাতে একটা মেয়ে skeleton ঝুলোনো ছিল। আমাদের কিন্তু কিছু ভয়টয় করত না। তার পর অনেক দিন কেটে গিয়েছে, আমার বিয়েটিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি তখন ভিতরবাড়িতে শুই। একদিন কয়েকজন আত্মীয়া এসেছেন, তাঁরা আমার ঘরে শোবেন, আমার উপর হুকুম হয়েছে বাইরে শোবার। অনেক দিন পরে আমি আবার সেই ঘরে এসে শুয়েছি। শুয়ে চেয়ে দেখলুম, সেজের আলোটা ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল। আমার মাথায় বোধ হয় তখন রক্ত বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছিল, আমার মনে হতে লাগল কে যেন মশারির চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, "আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল, আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল?" …এই আমার মাথায় গল্প এসে গেল আর-কি।'[১] জীবনস্মৃতি-তেও এই কঙ্কালের কথা আছে। গল্পের প্রথমাংশটি যেন

জীবনস্মৃতি-র ওই অংশের প্রথম খসড়া। ‘শৈশবসন্ধ্যা’ কবিতা ও ‘কঙ্কাল’ গল্প উভয়েরই মধ্যে ‘তিন বাল্যসঙ্গী’র কথা আছে।

‘মীমাংসা একটি ব্যঙ্গরচনা। লঘু হৃদয়বৃত্তির হাহুতাশে পূর্ণ রম্যরচনা জাতীয় যে-সব লেখা সাময়িকপত্রগুলিতে মুদ্রিত হচ্ছিল, তাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে এটিতে। কৌতুকের বিষয়, সাধনা-য় মুদ্রিত বলেন্দ্রনাথ রচিত ‘জানালার ধারে’ [অগ্র°। ৭২-৭৪], ‘দেয়ালের ছবি’ [পৌষ। ১৬২-৬৫], ‘পুরাতন চিঠি’ [ফাল্গুন। ৩৩৫-৩৭] প্রভৃতি রচনা একই শ্রেণীর—রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী ভারতী-র সূচনা-পর্বে এ-ধরনের লেখা অনেক লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ‘আলোচনা’ নামে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে আপোষে একটি বিতর্কের সূচনা করেন এই সংখ্যায়। সাধনা-র প্রথম বর্ষের বাকি সাতটি সংখ্যা জুড়ে এই বিতর্ক চলে। কিছুকাল আগে ‘পারিবারিক খাতা’য় এই পদ্ধতিতে আলোচনা চলেছিল। মৌখিক ভাবে রবীন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে যে-ধরনের আলোচনা চলত তার কিছু নমুনা উক্ত খাতায় আছে। সেই আসর ভেঙে যাওয়াতে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন : ‘মুখোমুখি বসে আকার ইঙ্গিত ও কণ্ঠস্বর-যোগে অবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে যে একটি উত্তাপ আছে চিঠিতে সেটি পাওয়া যায় না, সেই উত্তাপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের মধ্যে অনেক ভাবের অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে; ···এতে মানসিক জীবনের যে একটা চর্চ্চা হয় সেটা ভারি আনন্দের এবং কাজেরও।’[২] অগত্যা পত্রেরই আশ্রয় নিতে হয়, যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে নিয়েছেন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ সাবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে। অবশ্য এই ‘পত্রালাপ’ ব্যক্তিগত নয়, ব্যক্তিত্বের স্বাদ মিশিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে বন্ধুর সঙ্গে ‘আলোচনা’—সম্ভবত এইজন্য সাধনা-র পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে স্বতন্ত্র শিরোনাম নিয়ে ‘পত্রোত্তর’ মুদ্রিত হয়েছে, শেষ চারটি সংখ্যায় এই অভিধাও বর্জিত। কি পদ্ধতিতে সাধনা-য় এই আলোচনা ছাপা হত, তার একটু হদিশ পাওয়া যায় বলেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি তারিখ-হীন [আষাঢ় ১২৯৯] চিঠিতে; ‘আজকের রেজেষ্ট্রি ডাকে যে যে লেখা পাঠান যাচ্চে আগে তার একটা নম্বরওয়ারি ফর্দ্দ’তে ‘৫’। সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ। (লোকেনের পত্র)—/৬। মানব প্রকাশ।—(তদুত্তর)’ ইত্যাদি লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বক্তব্য’ জানিয়েছেন : ‘···নম্বর ৫, পেন্সিলে লেখা, কিঞ্চিৎ অপরিষ্কার, একটু সাবধানে ছাপ্‌তে হবে। আর কপি কর্ত্তে পারিনে।—/ নম্বর ছয়—ভাদ্রমাসের। ওটা এইবেলা ছাপিয়ে একটা প্রুফ লোকেনের কাছে পাঠাতে হবে, সে সেইটে দেখে তার শেষ উত্তর লিখ্‌লে তবে সেইটে আবার ঐ ভাদ্র আশ্বিনের কাগজে ছাপা হবে।’[৩] ‘সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ’ শ্রাবণ-সংখ্যায় [পৃ ২৫২-৫৫] ছাপা হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথের ‘তদুত্তর’ ‘মানব প্রকাশ’ মুদ্রিত হয় ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ সংখ্যায়—লোকেন্দ্রনাথ এর উত্তর দেন নি।

‘সাময়িক সারসংগ্রহ’ বিভাগে প্রথম তিনটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন, বর্তমান সংখ্যায় বলেন্দ্রনাথ তাঁর সহযোগী হয়ে ‘খৃষ্টীয় নরক’ [পৃ ৩৫২-৫৭] ও ‘কৃত্রিম দাম্পত্য নির্ব্বাচন’ [পৃ ৩৫৭-৫৯] রচনা দু’টি লেখেন—রবীন্দ্রনাথ লেখেন নভেম্বর মাসের *Contemporary Review* পত্রিকার একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে ‘আমেরিকানের রক্তপিপাসা’। প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ করে তিনি মন্তব্য করেন ‘যেখানে অপ্রতিহত পশুবলচালনার স্থান সেইখানেই মানুষের ভয়ানক বিপদ। স্বার্থ অথবা আত্মগৌরবের অনুরোধে নিরুপায়ের

প্রতি আপনার কর্ত্তৃত্ব প্রচার করিতে গিয়া নিজেরই অমূল্যধন স্বাধীনতাপ্রিয়তা ম্লান হইয়া আসে। ভারতশাসন ভারতবাসীদের পক্ষে যেমনই হউক্ ইংরাজের পক্ষে সুশিক্ষার কারণ নহে। আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে একটি অনুরাগহীন অবহেলার ভাব সহজেই উদয় হইতেছে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের চরিত্রের উচ্চ আদর্শ অল্পে অল্পে অবনত হইতেছে সন্দেহ নাই। ফিট্জ্জেম্স্ ষ্টীফ্ন্, সার্ লেপেল্ গ্রিফিন্ প্রভৃতি অনেক অ্যাঙ্গ্লোইণ্ডিয়ান্ লেখকের রচনায় একপ্রকার কঠিন নিষ্ঠুরতা, একটা নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ দেখা যায়, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভারতবর্ষে অসীম ক্ষমতা-মদিরার স্বাদ পাইয়া তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।' 'মন্ত্রি-অভিষেক' ভাষণে এই ভাবনার আভাস আছে, য়ুরোপ-যাত্রার পথে ইভান্স্কে তিনি এই কথাটিই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন [দ্র য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি। ৮৬], 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' [সাধনা, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০০; রাজাপ্রজা ১০। ৩৭৯-৪০৩] প্রভৃতি বহু রাজনৈতিক প্রবন্ধের বক্তব্য প্রধানত এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই উপস্থাপিত হয়েছে।

এবারে 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় কেবলমাত্র 'সাহিত্য' পত্রিকার মাঘ-সংখ্যাটিই আলোচিত—যার বৃহদংশ চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়' [দ্র সাহিত্য, মাঘ। ৪৬৫-৭৪] প্রবন্ধটির সমালোচনায় ব্যয়িত হয়েছে। চন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, পরব্রহ্মের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হওয়া মানবের চরম লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের পথ অত্যন্ত কঠিন—'দেখিবে যেখানে জীবনের আত্মহীনতার পূর্ণ উপলব্ধি ও ব্রহ্মত্বের গৌরবজ্ঞান উদ্দীপিত সুতরাং ব্রহ্মত্বলাভের তৃষ্ণা অপরিমেয়, কেবল সেইখানেই এই সাধনা, এই সিদ্ধি, এই পরিণতি। আর দেখিবে এই পরিণতি যেমন বিরাট, এই সাধনাও তেমনি বিরাট। জীবের জীবত্ব এবং ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের মধ্যে ব্যবধান যেমন বিরাট, যে সাধনায় সে বিরাট ব্যবধান বিনষ্ট করিতে হয়-সে সাধনাও তেমনি বিরাট। নহিলে সেই বিরাট ব্যবধান কেমন করিয়া বিনষ্ট হইবে? সে বিরাট সাধনায় কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত যুগ অতিবাহিত হইয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। ···এক হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে এমন বিরাট পরিণতির কথাও নাই, এমন বিরাট পথের কথাও নাই, এমন বিরাট সাধনার কথাও নাই।' রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য যুক্তিতর্ক ছাড়াও চন্দ্রনাথের এই 'বিরাট'ত্বকে আক্রমণ করেছেন তির্যকভাবে : 'সৌভাগ্যক্রমে এরূপ বিরাট নাস্তিকতা মহামারীর মত সমস্ত বৃহৎ জাতিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে না।···বিরাট নিপীড়নে সেই প্রেমানন্দকে পরাহত করিতে পারে নাই বলিয়াই চৈতন্য আসিয়া যেমনি প্রেমের তান ধরিলেন অমনি "বিরাট" হিন্দুর "বিরাট" হৃদয়ের কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেমের স্রোত আনন্দধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবার কি সেই বিরাট পাষাণখানাকে তিল তিল করিয়া গড়াইয়া জগতের অনন্ত জীবনউৎসের মুখদ্বারে তুলিয়া বিরাট হিন্দুর বিরাট জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে?' [কিছুদিন পরে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর 'বিরাট'-প্রীতি নিয়ে কৌতুক করেছেন।[১]]

রবীন্দ্রনাথ অগ্র°-সংখ্যা সাধনা-য় কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। "শিক্ষিতা নারী'র প্রতিবাদের উত্তর" দেন কৃষ্ণভাবিনী সাহিত্য-এর মাঘ-সংখ্যায় [পৃ ৪৭৪-৭৮]। অত্যন্ত সংযত, যুক্তিপূর্ণ এই উত্তরের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রসিকতা, কবিত্ব ও শব্দতত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন।

ফাল্গুন মাসের সম্ভবত শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা আসেন। ২৬ ফাল্গুন [মঙ্গল 8 Mar] তাঁকে পার্ক স্ট্রীটে যেতে দেখা যায়। আবার ১৬ চৈত্র পার্ক স্ট্রীট, ১৯ ও ২৩ চৈত্র 'বীর্জাতালা হইয়া পার্ক স্ট্রীটের বাড়ী

যাওয়া ও তথা হইতে যোড়াসাকো আসিবার গাড়িভাড়া’ প্রভৃতি হিসাব থেকে মনে হয় এই এক মাস-কাল তিনি কলকাতাতেই ছিলেন। এর মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে লেখেন ‘রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে’ কবিতাটি [দ্র সোনার তরী ৩। ১৪-১৬], যেটি সাধনা-র আষাঢ় ১২৯৯-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। [কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় মজুমদার-পুঁথিতে। এতে কবিতাটির ছন্দ সম্পর্কে একটি তথ্য কৌতূহলজনক। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ‘রাজার ছেলে যেত পাঠশালে’ এইভাবে ৭ + ৪ মাত্রা-বিন্যাসে সম্পূর্ণ কবিতাটি লিখে পরে ৭ + ৫ মাত্রায় পরিবর্তিত করেছেন।]

চৈত্র মাসের শেষে রবীন্দ্রনাথ আবার শিলাইদহে ফিরে যান। 7 Apr [বৃহ ২৬ চৈত্র] ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠি লিখেছেন, তার ভাবটি আলস্যে ভরপুর; শুকিয়ে আসা নদীর মাঝখানে বোট বেঁধে ঘাটের দিকে তাকিয়ে নরনারীর স্নান করার দৃশ্য দেখছেন ও অলস কল্পনায় উভয়ের পার্থক্য নিরূপণ করে জলের সঙ্গে মেয়েদের সাদৃশ্য ও সখিত্ব অনুভব করছেন। এইরকম মানসিক আলস্যের মধ্যে ইংরেজি উপন্যাসের কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা’তাঁর ভালো লাগার কথা নয়। তাই পরের দিন [8 Apr শুক্র ২৭ চৈত্র] চিঠিতে লিখেছেন ‘সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে’ রূপকথা লেখার আকাঙ্ক্ষার কথা—নতুবা Henry Sidgwick [1838-1900]-এর লেখা ‘*The Elements of Politics*’ কিংবা ‘*Problems of the Future*’ পড়াও ভালো, কারণ ‘এলিমেন্ট্‌স্ অফ পলিটিক্স জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়, একে কোনো রকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না।’[১]

চৈত্র মাসের সাধনায় রবীন্দ্রনাথের এই লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল :

৩৮৪-৮৮ ‘কাব্য’ দ্র সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৮। ৪৫৯-৬১

৩৮৮-৪০১ ‘মুক্তির উপায়’ দ্র গল্পগুচ্ছ ১৬। ৩২৯-৩৭

৪০৭-১৩ ‘বিদ্যাপতির রাধিকা’ দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪৪১-৪৫

৪১৩-১৮ ‘সাময়িক সারসংগ্রহ’

 ৪১৩-১৬ ‘উন্নতি’

 ৪১৬-১৮ ‘সুখ দুঃখ’

৪৪৪-৫০ ‘ভূমধ্য সাগরে /(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী)’ দ য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ৮৩-৮৮

৪৫৮-৬৩ ‘সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা’ দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩২২-২৫

 ৪৫৮-৫৯ নব্যভারত। মাঘ; ৪৫৯-৬৩ সাহিত্য। ফাল্গুন

৪৬৭-৬৯ ‘নিছনি। (উত্তর)’ দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২। ৫৩৫-৩৭

‘কাব্য’ প্রবন্ধটি কোনো নতুন লেখা নয়। 12 Jan 1891 [১৯ পৌষ ১২৯৭] তারিখে ‘বির্জিতলাও’-এর বাড়িতে ‘পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক’-এ রবীন্দ্রনাথ ১১০-সংখ্যক যে প্রস্তাবটি [pp. 128-31] রচনা করেন, তারই প্রথম ও শেষ এগারটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে এখানে ‘কাব্য’ নামে সংকলিত হয়েছে। বর্জিত অনুচ্ছেদগুলির জন্য দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ৩২-৩৫।

'মুক্তির উপায়' গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ পরে নাটকে রূপান্তরিত করেন [দ্র অলকা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৫; র°র° ২৬। ৫৭-৮৮]।

'সাময়িক সারসংগ্রহ'-এর অন্তর্গত 'উন্নতি' প্রবন্ধে Monist পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত দিনেমার দার্শনিক হারাল্ড্ হ্যফডিঙ্গ -এর 'মঙ্গলের মূলতত্ত্ব' প্রবন্ধের অংশবিশেষের সারসংক্ষেপ করেছেন। অংশ নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট : 'তাহার যে অংশ ভারতবর্ষীয় পাঠকদের পক্ষে বিশেষ অবধানের যোগ্য আমরা সংকলিত করিয়া দিলাম।' জীবনধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংস্থান করতে পারাই মানবজাতির চরম লক্ষ্য নয়—এই কথা ব্যাখ্যা করে তিনি শেষে লিখেছেন : 'উন্নতি বলিতে সর্ব্বকামনার পর্য্যবসানরূপিণী একটা নিরুদ্যম অবস্থা বুঝায় না। ভবিষ্যতের নব নব মঙ্গল সম্ভাবনার জন্য নব নব শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলাই উন্নতি। সেই সমস্ত শক্তির উত্তেজনায় ক্রমাগত নূতন নূতন চেষ্টা ধাবিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে কেবল উদ্যমেই কার্য্যে বিকাশেই একটা সুখ জাগ্রত হইয়া উঠে, সমগ্র প্রকৃতির পরিচালনাতেই একটা গভীর আনন্দ লাভ হয়।…এই যে একটি স্বতন্ত্র উন্নতির প্রবৃত্তি, এই যে কর্ম্মের প্রতিই একটা স্বতন্ত্র অনুরাগ, ইহা লইয়াই সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে প্রধান প্রভেদ।'

'সুখ দুঃখ' রচনাটিও হ্যফ্ডিঙ্-এর প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা।

'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় মাঘ-সংখ্যা 'নব্যভারত'-এর অধিকাংশ রচনাই কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। সিদ্ধেশ্বর রায়ের "আলোক কি অন্ধকার?" 'সম্পূর্ণ অন্ধকার। এবং এরূপ লেখায় সে অন্ধকার দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।…'; মধুসূদন সরকারের 'জাতীয় একতা': 'লেখক কৌতুক করিতেছেন কি জ্ঞান দান করিতেছেন সহসা বুঝা দুঃসাধ্য; এই পর্য্যন্ত বলা যায় দুইটির মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই।' অনঙ্গমোহন ঘোষের 'দোকানদারী' 'বঙ্গ সাহিত্যে এই ধরণের অশ্রু গদ গদ সানুনাসিক প্রলাপোক্তি উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কোন উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক পত্রে এরূপ গদ্যপ্রবন্ধ কেন স্থান প্রাপ্ত হয় বুঝা কঠিন।'—'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন চৌধুরীর 'সাধনা' ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মনোভাব এ পর্যন্ত অনুকূলই ছিল, কিন্তু এই-সব সমালোচনার আঘাতে 'উত্তরোত্তর' কঠিন হয়ে উঠেছে!

ফাল্গুন-সংখ্যা 'সাহিত্য'-এর আলোচনার প্রধান অংশ চন্দ্রনাথ বসুর 'আহার' প্রবন্ধের তৃতীয় কিস্তি। চন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।' রবীন্দ্রনাথ আহারের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মন্তব্য করেছেন : 'স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানুষের কর্ত্তব্য অতএব তাহা ধর্ম্ম এ মূলনীতির কোন কালে পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে, কিন্তু কোন একটা বিশেষ উপায়ে বিশেষ দ্রব্য আহার করা ধর্ম্ম, না করা অধর্ম্ম এরূপ বিশ্বাসে গুরুতর অনিষ্টের কারণ ঘটে।'

মাঘ-সংখ্যা সাধনায় [পৃ ২৮৬] 'শব্দতত্ত্বান্বেষী' প্রশ্ন করেছিলেন : 'প্রাচীন কাব্যে "নিছনি" শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তাহার প্রকৃত অর্থ কি এবং তাহা সংস্কৃত কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন?' প্রত্যুত্তরে ফাল্গুন-সংখ্যায় [পৃ ৩৮১] কৃষ্ণনগর থেকে জগদানন্দ রায় [পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রখ্যাত শিক্ষক ও বিজ্ঞান-লেখক] জানিয়েছেন, 'নিছনি' শব্দের অর্থ অনিচ্ছা। রবীন্দ্রনাথ 'নিছনি' প্রবন্ধে এই অর্থ-নির্ণয় প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি পরবর্তী সংখ্যাতেও চলেছিল।

এই বৎসরের শেষ দিনটিতে [৩০ চৈত্র সোম 11 Apr 1892] প্রভাত-সঙ্গীত-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল :

প্রভাত-সঙ্গীত /শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/দ্বিতীয় সংস্করণ।/(সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত) কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে /শ্রীকালীদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত/ও শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের/দ্বারা প্রকাশিত।/চৈত্র ১৮১৩ শক।/মূল্য ॥০ আট আনা।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২+২+২+১০+৯৬। মুদ্রণ-সংখ্যা : ১০০০।

এই সংস্করণে 'স্নেহ-উপহার' ও 'শরতে প্রকৃতি' এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতাগুলি বর্জিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

১১ বৈশাখ [বৃহ 23 Apr 1891] দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা হেমলতা দেবীর [1874-1967] বিবাহ হয়। এটি দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহ। তাঁর প্রথমা পত্নী সুশীলা দেবীর মৃত্যু হয় ৬ চৈত্র ১২৯৭ [বৃহ 19 Mar 1891]। তিনি একটি পুত্র দিনেন্দ্রনাথ [৮] ও একটি কন্যা নলিনীকে [৭] রেখে মারা যান। সম্ভবত এই শিশু সন্তানদের দেখাশোনার জন্যই এত দৃষ্টিকটু ভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করা হয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যে স্পষ্টতই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, সে-কথা লিখেছেন ইন্দিরা দেবী : 'আমার খুড়োজ্যাঠাদের কারো ২ বেশ [অল্প] বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কখনো দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করেন নি। অথচ অনুরূপ ক্ষেত্রে ভাইরা বেশি কালক্ষেপ না করেই আবার অনায়াসে নতুন বউ আনতে দ্বিধা বোধ করেন নি। আমার মা দ্বিপুদাদার প্রথম স্ত্রী সুশীলা বৌঠানকে (লাখুটিয়া জমিদারের মেয়ে) খুব ভালবাসতেন; তাই বড়দা যখন মোহিনী চাটুয্যের বোন হেমলতা দেবীকে স্ত্রীবিয়োগের অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে' আনলেন, তখন মা তাঁর সঙ্গে ভাল করে' কথাই কইলেন না।'[১] বিবাহে ধূমধামের অভাব ছিল। ২৪ আষাঢ় ক্যাশবহিতে বিবাহের সম্পূর্ণ হিসাব লিখিত হয় : 'শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যয় শোধ···২৭৫॥২/ ৬/গাত্রহরিদ্রা ২১ ৬ আদি ব্রাহ্মসমাজে দান ১০ পুরোহিতের দক্ষিণা ১৫ সয্যা তোলা দিগর ৪৮ গাড়ি ভাড়া ৭/০ প্রণামী ৮৭ ফুলশয্যা আনায় লোক বিদায় ২ বর ও কন্যার কাপড় ক্রয় ৮৫॥ল০'। হেমলতা দেবীর বয়স তখন ১৭ বৎসর ৩ মাস [জন্ম :২৯ পৌষ১২৮০]। এঁর দুই দাদা মোহিনীমোহন ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে বসবাসের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বহু কাজে তিনি সহযোগিতা করেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

'পরিচারিকা' পত্রিকার ভাদ্র-সংখ্যায় [পৃ ৯৮] নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় : 'লণ্ডনের ট্রিনিটি কলেজ সংক্রান্ত সঙ্গীত বিদ্যার যে পরীক্ষা কলিকাতায় হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালীর মধ্যে কুমারী সুকুমারী রায়, মনীষা ঠাকুর, লাহন গুপ্ত, ইন্দিরা ঠাকুর, সরলা ঘোষাল উত্তীর্ণা হইয়াছেন।' 'এদের মধ্যে তিন জন ঠাকুর পরিবারের। ইন্দিরা দেবী এ-সম্পর্কে লিখেছেন : 'তখনকার কালে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অব্ মিউজিক

থেকে গানের ঔপপত্তিক প্রশ্ন এ দেশে পাথানো হত। তার ইন্টারমিডিয়েট পর্ব পর্যন্ত আমি পাস করেছিলুম।'[২] মনীষা দেবী পরে ইংলণ্ডে গিয়ে সংগীতবিদ্যায় তাঁর দক্ষতা দেখিয়ে স্বয়ং ম্যাক্স্‌মূলারের স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

১২৯৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। ওই মাসেই রমণীমোহনের পরিবর্তে ক্ষিতীন্দ্রনাথ সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এই পরিবর্তন আদি সমাজের পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর তরুণ সঙ্গীদের নিয়ে এই সমাজ ত্যাগ করার পর নিয়মিত উপাসনা চালু রাখা ছাড়া বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে আদি সমাজের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। ১২৯১ বঙ্গাব্দে সম্পাদক পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করলেও ধীরে ধীরে তাঁর সেই আগ্রহ মন্দীভূত হয়ে পড়ে। এই অনুৎসাহ নিয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ কটাক্ষ করেছিলেন। পিতামহের পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে তাঁর উপদেশ শোনা ও অনুলেখন নেওয়ার কাজ ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রায়ই করতেন। মহর্ষি তার পুরস্কার দিলেন তাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত করে। ভাদ্র ১২৯৮-তে তাঁর আরও পদোন্নতি ঘটে, তিনি 'আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সম্পাদক ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারি সম্পাদক' নিযুক্ত হন—তাঁর জায়গায় আদি সমাজের সহকারী সম্পাদক হন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এর পর তিনি আদি সমাজের ও অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে থাকেন ও সেগুলি তত্ত্ববোধিনী-তে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে মুদ্রিত হত। এই মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন আরও অনেক পরে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রচারমুখী ছিল না, তা আমরা আগেই দেখেছি। অনেকেই মহর্ষির কাছ থেকে মাসিক বৃত্তি পেতেন, কিন্তু 'প্রচারক' বলতে যা বোঝায় আদি সমাজে সেরূপ ব্যক্তি কখনই ছিলেন না। কিন্তু নূতন কর্মোৎসাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হেমচন্দ্র চক্রবর্তীকে 'আদি ব্রাহ্মসমাজের পরিব্রাজক' নিযুক্ত করা হয়, ১২৯৭ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে তাঁর 'কার্য্য বিবরণ'ও তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত হয় [দ্র জ্যৈষ্ঠ ১৮১৩ শক। ৩৯-৪০]। অবশ্য নববিধান বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদের কার্যবিধির সঙ্গে তাঁর কাজের কোনো তুলনাই হয় না—বর্ধমান, হড়া প্রভৃতি দু'একটি জায়গায় যাওয়া ছাড়া ভবানীপুর-বালিগঞ্জেই তাঁর গতিবিধি সীমায়িত ছিল। পরের বছর অচ্যুতানন্দ স্বামীকে প্রচারকের ভূমিকায় দেখা যায়, তাঁর সম্পর্কে সোৎসাহে লেখা হয় : 'আমাদের শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার যাত্রায় বহির্গত হইয়া জেলা ছাপরার অন্তর্গত বিদৌলী নামক গ্রামে এক মহা সভা করিয়া সে দেশে ব্রাহ্মধর্মের বীজ প্রোথিত করিয়াছেন।'[৩] অল্পে সুখী আদি ব্রাহ্মসমাজ এছাড়া আর কী-ই বা লিখতে পারত!

গত বৎসর ২২ অগ্র° [রবি 7 Dec 1890] শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। মন্দিরটি প্রস্তুত হওয়ার পর মহর্ষির দীক্ষাদিন স্মরণ করে ৭ পৌষ ১২৯৮ [সোম 21 Dec 1891] প্রতিষ্ঠা-উৎসব পালিত হল। সৌদামিনী দেবী ৩ পৌষ পার্ক স্ট্রীট থেকে লেখা একটি পত্রে দেওঘরের রাজনারায়ণ

বসুকে এই খবর জানিয়েছেন : 'শান্তিনিকেতনের উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য খুব ধুমধাম হইতেছে, বড়দাদা কাল সেখানে যাইবেন···সকল দলই সেখানে একত্রিভূত হইবেন'।[১] 'শান্তিনিকেতনে মঠপ্রতিষ্ঠা' নামে তত্ত্ববোধিনী-তে [মাঘ। ১৮২-৯৭] অনুষ্ঠানটির একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। প্রায় পঞ্চাশ জন ৬ পৌষ অপরাহ্নে হাওড়া থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যার পরে বোলপুরে পৌঁছন। যাত্রীদের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেশনে গাড়ি ছিল। যাত্রীরা শান্তিনিকেতন আশ্রমে পৌঁছলে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁদের অভ্যর্থনা করেন।

'পরদিন প্রত্যুষেই প্রান্তরের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দ্দিষ্ট সময় আসিয়া পড়িল। সকলে একত্রে মিলিয়া বিনীত ভাবে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে অট্টালিকা হইতে মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বেহালা হইতে আগত কয়েক জন ব্রাহ্মবন্ধু মৃদঙ্গযোগে "প্রাণ ভরে আজ গান কর, ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়" [শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত] গাহিতে গাহিতে অগ্রে চলিলেন। মন্দিরের দ্বারে আসিবা মাত্র কীর্ত্তন থামিল।' এর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ মহর্ষির ট্রাস্ট ডীডের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে 'প্রতিষ্ঠা পত্র' পাঠ করেন। 'অনন্তর সকলে মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে অর্চ্চনা পাঠ করিলেন। তৎপরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর···প্রতিষ্ঠা কার্য্যের উপযোগী বক্তৃতা করিলেন।···বেদীর পার্শ্বদেশ হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।···অনন্তর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্যের উপসংহার করিলেন।···শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত কার্য্যে যোগদান করিয়া উপাসক মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।' প্রত্যেকের বক্তৃতাই তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন্ গান গেয়েছিলেন তার কোনো উল্লেখ নেই।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ছাতিমতলায় মহর্ষির উপাসনা-বেদীর কাছে উপস্থিত হন। 'বৃক্ষের স্কন্ধ দেশে "কর তাঁর নাম গান" ধাতু ফলকে লিখিত[২] দেখিয়া তাঁহারদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। দশ পনর জন সাধক মিলিত হইয়া হৃদয় খুলিয়া "কর তাঁর নাম গান" [দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত] এই গীতটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

'বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্থানীয় অধ্যাপকগণের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলেই উপাসনার সময় মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাদিগকে যোগ্যতা অনুসারে পাথেয় ও বিদায় প্রদান করিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলী ব্রহ্মোপাসনার গম্ভীর ও শান্ত ভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।···

'বেলা দুইটার সময় ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দশ বার জন ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত কলিকাতা হইতে সমাগত হইলেন, এবং ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে আহারাদি করিলেন।

'সূর্য অস্তমিত হইল, ক্রমে উপাসনার সময় নিকটে আসিয়া পড়িল। দূরাগত সাধক সজ্জনকে মন্দিরের মধ্যে স্থান দিয়া মন্দিরের দ্বার অবারিত করা হইল। লোকাধিক্যে মন্দিরের বাহিরে তিলমাত্র স্থান অবশিষ্ট রহিল না।

'প্রথমেই ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন।···

'পরে সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। রাত্রিকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বেদী অধিকার করেন। উদ্বোধন উপাসনা বক্তৃতা একাকী তাবতই সম্পন্ন করেন। উপাসনার সময় স্তোত্র ও "অসতো মা সদ্‌গময়" পাঠে সাধারণে যোগ দিয়াছিলেন।···

'এবেলাও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতে যোগদান করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।'

পরদিন ৮ পৌষ সকলে কলকাতা প্রত্যাগমন করেন।

১১ মাঘ [রবি 24 Jan 1892] দ্বিষষ্টিতম সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের প্রাতঃকালের উপাসনা হয় মহর্ষিভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে। ক্ষিতীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন ও দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রার্থনা এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। সায়ংকালে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন, শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রার্থনা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। দু'টি অধিবেশনে গীত ব্রহ্মসংগীতগুলি ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ২১৬-১৭] মুদ্রিত হয় :

[১] ইমনকল্যাণ—সুরফাঁকতাল। নমঃ শঙ্করায় [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

[২] ইমন—আড়াঠেকা। এ মোহ আবরণ [রবীন্দ্রনাথ]

[৩] সাহানা-কাওয়ালি। দশ দিশি কি বা আজি মধুময় [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

[৪] সুরট-তেওট। দরশন দাও হে প্রভু এই মিনতি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

[৫] কর্ণাটি তিলককামোদ-তেওরা। বিঘ্নহরণ, প্রভু শান্তিদাতা

[৬] নিসাসাগ—ঝাঁপতাল। দেহি হৃদয়ে সদা শান্তি রস প্রভু হে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

[৭] সুরট-চৌতাল। বাজে সুতানে সুন্দর এই বিশ্ব যন্ত্র [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

[৮] মাদ্রাজি ভজন। অন্তরের ধন, প্রাণ রঞ্জন, স্বামি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

[৯] সিন্ধু—একতালা। শূন্যপ্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর [রবীন্দ্রনাথ]

[১০] জয়জয়ন্তী কোকব—ঝাঁপতাল। নিকটে নিকটে থাক হে নাথ। [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই অনুষ্ঠানের প্রধান গীতিকার ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ-রচিত দু'টি গান গাওয়া হয়, কিন্তু তার মধ্যে 'এ মোহ আবরণ খুলে দাও' গানটি ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবের সায়ংকালীন অধিবেশনে গীত হয়েছিল।

১৪ মাঘ [বুধ 27 Jan] মহর্ষির পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে এক ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। বামাবোধিনী পত্রিকা-য় লিখিত হয় : '···ব্রাহ্মসমাজের শিরোমণি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে ব্রাহ্মদিগের এক সম্মিলন হইয়াছিল, বৃদ্ধ মহাত্মা উৎসাহের সহিত স্বয়ং তাহার কার্য্য সম্পাদন করেন।'[১] তত্ত্ববোধিনী-তে সংবাদটি 'আশীর্ব্বাদ' শিরোনামায় প্রকাশিত হয় : 'গত ১৪ মাঘ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট স্বদেশ ও বিদেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম সমাগত হইয়াছিলেন এই শুভ সমাগমে তিনি তাঁহাদিগকে যে আশীর্ব্বাদ করেন' সেটি পত্রিকাটির ফাল্গুন-সংখ্যায় ২১৭-১৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাদিবসকে উপলক্ষ করে মহর্ষির বাড়িতে এই ধরনের সম্মিলন গত কয়েক বছর ধরে একটি প্রথায় পরিণত হয়েছিল।

এই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রাকে কেন্দ্র করে একটি নূতন আন্দোলন দেখা দেয়। ইংরেজদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে বহুসংখ্যক ভারতবাসী সমুদ্রপাড়ি দিতে

আরম্ভ করেন। উচ্চশিক্ষা ও উচ্চ রাজকার্যের উপযোগী হবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয়দের ইংলণ্ড না গিয়ে কোনো উপায় ছিল না। দেশীয় খৃষ্টান, পার্শি বা ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রে সমুদ্রযাত্রা স্বাভাবিক ছিল, হিন্দুসমাজও এ নিয়ে কোনো কলরব করে নি। কিন্তু ক্রমে হিন্দু পরিবারের সন্তানগণও যখন ঐহিক সমৃদ্ধির আকর্ষণে য়ুরোপাভিমুখী হতে লাগল, তখনই লোকাচারপ্রিয় গোঁড়া হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বিলাতগামী সন্তানদের বাধা দেওয়া, ত্যাজ্যপুত্র করা, বিলাতফেরৎদের মস্তকমুণ্ডন গোময়াদিভক্ষণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত করানো নিয়ে হিন্দুসমাজ তখন খুবই চঞ্চল। এর সঙ্গে আরও একটি সমস্যা যুক্ত হল। 1890-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে ইংলণ্ডে কংগ্রেসের একটি অধিবেশন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি কার্যকরী না হলেও সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ম্লেচ্ছ দেশে গিয়ে ম্লেচ্ছ আহার গ্রহণের সম্ভাবনাতেই গোঁড়া হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি আরম্ভ হয়। 8 Dec 1891 [মঙ্গল ২৩ অগ্র°] স্টুডেন্টস্‌' ক্লাবের উদ্যোগে কুমার বিনয়কৃষ্ণের সভাপতিত্বে জেনারেল অ্যাসেম্বলি'জ ইনস্টিট্যুশনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বঙ্কিমবিহারী মিত্র 'হিন্দুগণের সমুদ্রযাত্রা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী মিত্র ও চন্দ্রনাথ বসু আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। *The Bengalee* পত্রিকায় সভার বিস্তৃত বিবরণ [দ্র Dec 12 pp. 571-72] দেওয়া ছাড়াও 'Sea-voyages amongst the Ancient Hindus' নামে সম্পাদকীয় নিবন্ধ [দ্র Dec 19, pp. 580-81] ও 'Public opinions on Sea-voyages' [দ্র Dec 26, pp. 594-95] শিরোনামায় বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত সংকলিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অভিমত মুদ্রিত হয় *The Indian Mirror*-এর 12 Jan 1892-সংখ্যায় :The patriarch of the Bengali Pundits, Babu Bunkim Chunder Chatterji, being asked his opinion on this: subject, write :—"I am of opinion that a journey to a foreign country by sea and residence therein are not inconsistent with Hinduism, and need not involve loss of caste." ··· বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতেও সমুদ্রযাত্রার পক্ষে-বিপক্ষে নিশ্চয়ই লেখালেখি হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাগুলির ফাইল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সেই ইতিহাস অনেকটাই বিলুপ্ত। বঙ্গবাসীপরিচালিত মাসিক 'জন্মভূমি' পত্রিকায় বিরোধিতার খানিকটা নমুনা পাওয়া যায়। '২১শে চৈত্র···অহিন্দু-ভাবাপন্ন কোন এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিভূষণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের···নিকট যে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর' দিয়েছেন শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ 'বিলাতযাত্রা নিষেধ' [জন্মভূমি, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। ৩৬২-৭২] প্রবন্ধে। পত্রিকাটির ভাদ্র-সংখ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন 'বঙ্কিম বাবুর সমুদ্র যাত্রা' প্রবন্ধে [পৃ ৫৪৩-৪৮] বঙ্কিমবিহারী মিত্রকে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথও চুপ করে থাকেন নি, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি তাঁর অভিমত দেন সাধনা-র ফাল্গুন ১২৯৯-সংখ্যায় 'প্রসঙ্গ-কথা (সমুদ্র যাত্রা)' [পৃ ৩৪৬-৫৬] প্রবন্ধে [দ্র সমাজ ১২। ২১১-১৭]। প্রবন্ধটির পটভূমিকা বোঝার পক্ষে বর্তমান আলোচনা সহায়ক হবে। বৈশাখ ১২৯৯-সংখ্যা সাধনা-য় প্রকাশিত 'ত্যাগ' [দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭। ১৫৭-৬৭] গল্পটির মধ্যে এই সমস্যার উল্লেখ আছে, এ-কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

স্বর্ণকুমারী দেবী-প্রবর্তিত সখি সমিতি-র উদ্যোগে মহিলা শিল্প মেলা ১২৯৫ বঙ্গাব্দ থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল, তার কিছু-কিছু বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের মেলা অনুষ্ঠিত হয় ৫-৭ ফাল্গুন [মঙ্গল-বৃহ 16-18 Feb 1892]। *The Indian Mirror* পত্রিকায় মেলার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় দীর্ঘ দিন ধরে। বিজ্ঞাপনটি যথেষ্ট তথ্যবহুল বলে আমরা সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:

'Under the distinguished Patronage of H.E. The Marchioness of Lansdowne Mahila Silpa Mela or Ladies' Fancy Fair at No. 20, Beadon Street. For Ladies only.

The Fancy Fair will be opened by Lady Elliott on Tuesday, the 16th, and last till Thursday, the 18th instant, both days inclusive. Doors will be opened at 11 A.M.

Stalls will be kept by Bengali ladies of some of the best families in Calcutta.

Tickets of admission 8 annas. Children under 10 years, halfprice. Boys above 7 years of age will not be admitted.

The Fair will close everyday at 4 P.M., after which there will be a short dramatic performance entirely by ladies. Box-seat Rs.3 each other seats Rs. 2 each."

এই মেলায় 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যটি অভিনীত হয়। এটি একটি যৌথ রচনা—৭টি দৃশ্যে মোট ৪৫টি গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান ২৮টি, অন্য গানগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী ও স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা। গীতিনাট্যটি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি [দ্র রবিজীবনী ২। ২৫৬-৫৯]। সেক্ষেত্রে একটি ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজন আছে। উক্ত গ্রন্থের ২৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছিল, 'মেলাটি সম্ভবত মাঘ ১২৯৮-এ হয়'—কিন্তু এখন নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, ৫-৭ ফাল্গুন মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পুস্তিকাকারে 'বিবাহ-উৎসব' মুদ্রিত হয় [বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থ-প্রকাশের তারিখ 13 May 1892 : ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯]; সরলা দেবী-কৃত অনেকগুলি গানের স্বরলিপি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ভারতী ও বালক-এর ভাদ্র-আশ্বিন, কার্ত্তিক ও বৈশাখ ১৩০০-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।

---

১ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৪১

১ দ্র চিঠিপত্র ৬ [1957]। ১৫৫

২ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' [১৩৭৩]। ৪৪

৩ রবীন্দ্রভবনে শ্রীশচন্দ্রকে প্রেরিত একটি খামের উপরে অন্যের হস্তাক্ষরে 'হিতবাদী' শব্দটি লেখা দেখে অনুমান করা যায়, হিতবাদী-সংক্রান্ত পত্রটি এই খামের মধ্যে ছিল; সীতামুরী [seetamurhee] ঠিকানায় পাঠানো খামটিতে ডাকঘরের ছাপ : BARABAZAR 8 AP 91–সুতরাং পত্রটি 8 Apr 1891 [বুধ ২৬ চৈত্র ১২৯৭] তারিখে লেখা বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

৪ বি. ভা. প.; শ্রাবণ ১৩৪৯। ৩০-৩১

১ আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৭শ খণ্ড, লিপিচিত্র

২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৭৭]। ৩১০

৩ 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৪৬। ৮৯৪

৪ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৭৭]। ৩১০

৫ "হিতবাদী", নব্যভারত, আষাঢ় ১২৯৮।১৩৯

৬ 'হিতবাদীতে বোধ হয় যেন এক পোষ্ট মাষ্টারের গল্প লিখিয়াছিলে —তাহাতে সচরাচর যাহাকে কবিত্ব বা Sentiment বলে তাহা বেশী ছিল। কিন্তু সে গল্পটা আমাকে এত ভাল লাগে নাই।'—২৫ পৌষ ১২৯৮-এ লেখা পত্র; বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১। ৪২৭

৭ ছিন্নপত্রাবলী [১৩৬৭]। ১৩২, পত্র ৬২

১ দ্র ঐ। ৪৬, পত্র ১৭

২ 'শ্রীচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসুদর্শন, শ্রীসত্যবতী দেবী, শ্রীবনারসীদাস চতুর্বেদী রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহার বিবরণ Forward পত্রে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) প্রকাশিত হইয়াছিল।' প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প [১৩৯২], পুলিনবিহারী সেন-কৃত 'তথ্যপঞ্জী'। ৫১

৩ ঐ। ২৮

৪ অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় এই তথ্যটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭২। ২১

২ নব্যভারত, আষাঢ়। ১৩৭

৩ 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৪৬। ৮৯৪

৪ অনবধান-বশত '৩১শে সেপ্ট', ৯১' লিখেছেন, 1 Oct হওয়াই সম্ভব

৫ দেশ, রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯।

৬ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৯, পত্র ১৯

৭ ঐ। ৪৯-৫০, পত্র ১৯

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৫১, পত্র ২০

২ ঐ। ৫৩, পত্র ২১

৩ ঐ। ৫৪, পত্র ২২

৪ ঐ। ৫৬, পত্র ২৩

৫ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ' [১৩৮৭]। ৫-৬

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৫৭, পত্র ২৩

২ পত্রটি তারিখহীন, কলকাতায় পৌঁছনোর তারিখ থেকে অনুমিত।

৩ ছিন্নপত্রাবলী। ৫৮, পত্র ২৪

৪ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, 'তথ্যপঞ্জী'। ৫০

৫ চিঠিপত্র ১ [১৩৭২]। ২১, পত্র ৮

১ চিঠিপত্র ১ [১৩৭২] ২১, পত্র ৮

২ দ্র বামাবোধিনী, ভাদ্র ১২৯৮। ১৪১

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৬৯, পত্র ২৮

২ ঐ। ৭৩, পত্র ২৯

৩ ঐ। ৭০

৪ ঐ। ৭৪, পত্র ৩০

১ চিঠিপত্র ৮। ৫২, পত্র ৬৭

২ Krishna Kripalam, *Rabindranath Tagore : A Biography*, p. 143

৩ 'চিত্রাঙ্গদা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, সাহিত্য, অগ্র° ১৩১৬। ৪৪৩

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৭৫, পত্র ৩১

২ ঐ। ৭৬-৭৭, পত্র ৩২

১ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ২৮২-৮৩

২ ছিন্নপত্রাবলী। ৮৪, পত্র ৩৬

৩ পত্রটি তারিখ-হীন, কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একটি খামে পোস্টমার্ক 4 De 91—পত্রটি কাঁথিতে 6 Dec পৌঁছয়

৪. বি. ভা, প., শ্রাবণ ১৩৪৯। ৩১

১ আমার জীবনস্মৃতি [১৩৮১]। ১২৯

১ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩। ২৮৮

২ দ্র রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য [১৩৮৮]। ৩১-৩২

৩ ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য' [১৩৮৮] : এই গ্রন্থে ড ভট্টাচার্য, গ্রন্থভুক্ত হয় নি সাধনা-য় প্রকাশিত এমন অনেক রচনা, সংকলন করে দিয়েছেন। আমরা অতঃপর গ্রন্থটির উল্লেখ এইভাবে করব।

১ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১। ৪২৭

১ বি. ভা. প., শ্রাবণ ১৩৪৯। ৩১

১ সমাজ ১২। ৪৫৯

২ ড করুণাময় মজুমদার, চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য [1984]। ৬৯

৩ 'রবীন্দ্র বাবুর পত্র', সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০। ৮৩

১ তত্ত্বকৌমুদী ১৬ পৌষ [১৪। ১৮]। ২১৪

২ দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৮৫-৮৬, পত্র ৩৭

৩ ঐ। ৮৭-৮৮, পত্র ৩৮

১ চিঠিপত্র ৯ [১৩৭১]। ৯৪, পত্র ৪৫ [৭ আশ্বিন ১৩৩৮]

২ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১। ৪২৭-২৮

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৯১, পত্র ৪০ [পাণ্ডুলিপিতে পত্রের শেষে দীর্ঘ অংশ কালি বুলিয়ে কাটা]।

১ সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০০। ৩৪০

২ বৈশাখী, বার্ষিকী ১৩৫০ ১-৩

৩ রবিরশ্মি ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ)। ২৯৪

৪ দ্র 'তরী বোঝাই', শান্তিনিকেতন [৭] ১৪। ৩৭৫

৫ ছিন্নপত্র [১৩৬২]। ২১, পত্র ৮

৬ চিঠিপত্র ৫। ১৫১, পত্র ৬

১ ছিন্নপত্রাবলী। ২৩২, পত্র ১০৭

২ অলকা, আশ্বিন ১৩৪৯। ২

৩ রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য [১৩৮০]। ৭২

৪ ছিন্নপত্রাবলী। ৯৪, পত্র ৪২

৫ দ্র রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য। ৭৫

১ সীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি' [১৩৭১]। ১৯২

২ চিঠিপত্র ৫। ১৩০, পত্র ১

৩ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩। ২৮৯

১ 'কিন্তু যে-সকল বিদ্রূপে কোন রকম স্থূলত্বের আভাসমাত্র দেয় তার দিক দিয়েও মেয়েদের যাওয়া উচিত হয় না; সে হচ্ছে আমাদের সাব্লাইম (চন্দ্রনাথ বাবুর ভাষায়—'বিরাট') স্বজাতীয়ের জন্যে।'—ছিন্নপত্রাবলী। ১০২, পত্র ৪৭ [৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯]

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৯৫, পত্র ৪২

১ শ্রুতি ও স্মৃতি [অপ্রকাশিত]

২ রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৩

৩ তত্ত্ব°, আষাঢ় ১৮১৪ শক [১২৯৯]। ৬০

১ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৬৯। ৮২৫

২ লক্ষণীয়, এখানে শ্বেতপ্রস্তরের উপর ক্ষোদিত 'তিনি/আমার প্রাণের আরাম,/মনের আনন্দ,/আত্মার শান্তি।' বাণীর কোনো উল্লেখ নেই। এটি পরবর্তীকালের সংযোজন।

১ 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ রচিত বলে উল্লিখিত, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা স্বরলিপি ও গানের খসড়া অনুসারে গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে দ্র গীতবিতান, জ্ঞাতব্যপঞ্জী। ৯৬৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

১২৯৯ [1892-93] ১৮১৪ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের দ্বাত্রিংশ বৎসর

বর্তমান বৎসরের প্রথম মাসটিতে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধি সম্বন্ধে কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। যে ক্যাশবহিগুলির সাহায্যে তাঁর জীবনের মোটামুটি অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল, ১২৯৯ ও ১৩০০ বঙ্গাব্দের সেই খাতাগুলি হারিয়ে গেছে। 'কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিজ স্বতন্ত্র ক্যাশবহি' নামের ১২৯৯–১৩০০ বঙ্গাব্দের যে খাতাটি রক্ষিত হয়েছে, তার হিসাবপত্রের প্রকৃতি ভিন্ন—মাঝে মাঝে আমরা সেটি ব্যবহার করব, কিন্তু আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রয়োজন তার দ্বারা সিদ্ধ হবে না।

ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, আগের বছর চৈত্র মাসের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ছিলেন। সম্ভবত এই বৈশাখ মাসেই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী ও তিনটি সন্তান-সহ মৃণালিনী দেবী শিলাইদহে গিয়েছিলেন। এই অনুমানের ভিত্তি, ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি। ৯ জ্যৈষ্ঠ তিনি রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন : "দেখেছি এক-এক সময়ে কোনো কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, 'বাবা, শিলাইদয়ে নদী ছিল—না?' অনেক চিন্তার অবসানে হঠাৎ মাকে বলে, 'মা, শিলাইদয়ে আমরা বেশ ছিলুম'।" আবার 21 Jul [৭ শ্রাবণ] লিখেছেন : 'আজকাল নদীর আর সে মূর্তি নেই—তোরা যখন এসেছিলি তখন নদীতে প্রায় একতলা-সমান উঁচু পাড় দেখেছিলি, এখন সে সমস্ত ভরে গিয়ে হাত-খানেক দেড়েক বাকি আছে মাত্র।...আমরা প্রায়ই শীতের শেষে কিম্বা গ্রীষ্মের আরম্ভে আসি, তখন শীর্ণ নদী নিস্তেজভাবে পোষ মেনে থাকে—দুরন্তপনা একেবারেই থাকে না। তাতেই তোর মা কত ভয় পেয়েছিলেন, এখনকার নদী দেখলে বোধহয় ডাঙায় থাকতেও ভয় পেতেন।'

২৫ বৈশাখ [শুক্র 6 May] রবীন্দ্রনাথের দ্বাত্রিংশ জন্মোৎসব পারিবারিক মহলে পালিত হয়। খবরটি জানা যায় সত্যপ্রসাদের ব্যক্তিগত হিসাবখাতা থেকে, ১২ টাকা দিয়ে তিনি 'রবিমামার জন্মদিনোপলক্ষে উপহার খরিদ' করেছিলেন। ২২ বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষেও তিনি উপহার কিনেছিলেন, উক্ত হিসাব-খাতায় তার উল্লেখ আছে।

সাধনা-র বৈশাখ ১২৯৯ [১/৬]-সংখ্যায় যথারীতি রবীন্দ্রনাথের রচনা সর্বাধিক :

৪৭১-৭৩ 'বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা' দ্র সাহিত্য ৮।৪৬১-৬৩

৪৭৪-৮৪ 'ত্যাগ' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।১৫৭-৬৭

৪৯৫-৫০১ 'রেলপথের দুই পার্শ্বে (য়ুরোপযাত্রী ডায়ারী)' দ্র য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]।৮৮-৯৪

৫০২-১৩ 'সাহিত্য/(পত্রোত্তর)' দ্র সাহিত্য ৮।৪৬৮-৭৫ ['পত্রালাপ : ২']

৫৩৫-৩৮ 'বিম্ববতী/(রূপকথা)' দ্র সোনার তরী ৩।৯-১১ [অবনীন্দ্রনাথ-বিচিত্রিত]

৫৪৮-৫১ 'হাইনের কবিতা/(জর্ম্মান হইতে অনুবাদিত)' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ১৩৩-৩৮

৫৫১-৫৫ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩২৫-২৭

৫৫১-৫৩ নব্যভারত। চৈত্র; ৫৫৩-৫৫ সাহিত্য। চৈত্র

এ-ছাড়া ইন্দিরা দেবীকৃত স্বরলিপি-সহ রবীন্দ্রনাথের দু'টি গান এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে : ৫৪৩-৪৫ 'শুধু' ['শুধু যাওয়া আসা'] দ্র গীতবিতান ২।৫৭৩-৭৪; স্বর ১০; গানটি পাদটীকায় 'নূতন গান' ব'লে অভিহিত।

৫৪৬-৪৮ 'ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে'। 'কি গাব আমি কি শুনাব' দ্র গীতবিতান ১।১২৮; স্বর ৪; গানটি ১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গাওয়া হয়েছিল।

'বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা' প্রবন্ধটি নূতন রচনা নয়, 24 Mar 1890 [সোম ১২ চৈত্র ১২৯৬] বির্জিতলায় পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ একই শিরোনামায় লিখিত হয়েছিল। উক্ত রচনাটির শেষ কয়েকটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে সাধনা-য় মুদ্রিত হয়। বর্জিত অংশটির জন্য দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১।৩১-৩২।

হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিয়ে যে বিতর্ক তখন সমাজে আলোড়ন তুলেছিল, 'ত্যাগ' গল্পটির মধ্যে সেই সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছে, এ-কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। হিন্দু সমাজপতিদের প্রতি কটাক্ষ কাহিনীটিতে দুর্লক্ষ্য নয়। 'The Renunciation' নামে গল্পটির ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজি অনুবাদ *The Modern Review* পত্রিকার Aug 1910 [pp. 163-67]-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'সাহিত্য' পত্রালাপ-পর্যায়ের তৃতীয় কিস্তি। লোকেন্দ্রনাথ চৈত্র-সংখ্যায় 'সাহিত্যের সত্য' সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পত্রে বলেছিলেন, সত্য মানবজীবনের সঙ্গে অন্বিত হয়েই সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং সেইভাবেই সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে। লোকেন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য পাঠকের আত্মোপলব্ধির উপায় মাত্র, সত্য তারই একটা উপাদান—হৃদয়ের আবেগ উদ্রেক করা ছাড়া তার আর কোনো গুরুত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্তমান পত্রে প্রধানত এই বিষয়টিকে তাঁর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

'হাইনের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ মূল জর্মান থেকে হাইনে [Heinrich Heine, 1797-1856]-র ৯টি কবিতা অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জর্মান ভাষা-চর্চা ও হাইনের কবিতা অনুবাদের প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'নানা রবীন্দ্রনাথ' [১৩৮৯] গ্রন্থে 'জর্মান-চর্চা' [পৃ ৩৪-৬৬] প্রবন্ধে বিষয়টির আনুপূর্বিক আলোচনা আগ্রহী পাঠককে দেখে নিতে অনুরোধ করি। কিন্তু ড. ভট্টাচার্য-যে লিখেছেন, '১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ হাইনের অনুবাদ করেন'[১]—এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথের জর্মান ভাষা-চর্চা যে খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়েছিল, এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই—রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর পূর্বোদ্ধৃত ভাষণে সেকথা বলেছেন। সেইজন্য আমাদের ধারণা, 1890-তে গ্যেটের ফাউস্ট পড়তে চেষ্টা করার আগেই তাঁর হাইনে-চর্চা ও অনুবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সাধনা-র কলেবর পূরণের তাগিদে যেমন পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ লিখিত বিভিন্ন রচনা স্ব-নির্ধারিত নিয়মাবলী লঙ্ঘন করে সাধনা-য় ছাপতে হচ্ছিল, তেমনই হাইনের কবিতাগুলির পূর্বকৃত অনুবাদ এখানে মুদ্রিত হয়েছে।

এই সংখ্যার 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-প্রবৃত্তি কিছু পরিমাণে সংযত। চৈত্র-সংখ্যা 'সাহিত্য'-সমালোচনায় তিনি রজনীকান্ত গুপ্তের 'প্রাচীন ভারত' প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ করেছেন,

নব্যভারত-এ মুদ্রিত শরচ্চন্দ্র দাসের 'সুখাবতী' প্রবন্ধটির ক্ষেত্রেও তা-ই—প্রবন্ধ-দুটি তাঁর ভালো লেগেছিল, তার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'জীবন ও কাব্য' [নব্যভারত, চৈত্র।৬১২-১৭] প্রবন্ধটি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কঠোর : '…লেখক একটি নূতন সমাচার দিয়াছেন—তিনি বলেন বর্তমান বাঙ্গলা কবিদের জীবনের সহিত কাব্যের সামঞ্জস্য নাই। বঙ্গ কবিদের জীবনবৃত্তান্ত লেখক কোথা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন বলা শক্ত। সামান্যতম মানব জীবনেও কত প্রহেলিকা কত রহস্য আছে, তাহা উদ্ভেদ করিতে কত যত্ন, কত নিপুণতা, কত সহৃদয়তার আবশ্যক। লেখক ঘরে বসিয়া অবজ্ঞাভরে বঙ্গ কবিদের জীবনের উপর দিয়া যে, তাঁহার মহৎ লেখনীর একটা কালীর আঁচড় চালাইয়া গিয়াছেন কাজটা তাঁহার মত লোকের উচিত হয় নাই।…একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত—আজকালকার কবি যদি কাব্যে কাপট্য করেন সত্য হয়, যাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন তাঁহারা যে অকৃত্রিম সারল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। আসল কথা, কাব্যই লিখুন আর সমালোচনাই লিখুন, সকল বিষয়েই অধিকার অনধিকার আছে, তাহাই বুঝিতে না পারিয়া অনেক লেখক মিথ্যা কাব্য লেখেন এবং অনেক সমালোচক কাব্য হইতে যথার্থ সত্য এবং সৌন্দর্য্য উদ্ধার করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।'

জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে অবসর যাপন করছেন। মৃণালিনী দেবী, বেলা, রথীন্দ্রনাথ ও রেণুকা-কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিবারটি তখন বেশ বড়ো, এর সঙ্গে ভাগিনেয়ী স্বয়ম্প্রভা ও কয়েকজন চাকরবাকর নিয়ে শান্তিনিকেতনে তখন অনেকেই গিয়েছিলেন; ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে দু'জন বন্ধুরও উল্লেখ পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের নির্জন পরিবেশের মধ্যে এই জনতা তাঁর ভালো লাগেনি —ইন্দিরা দেবীকে ২ জ্যৈষ্ঠ [শনি 14 May] চিঠিতে লিখছেন : 'জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স্ আছে, তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী এক জন মানুষ—অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি।'[১] কিন্তু পরের দিন নিজের সন্তানদের আচরণ বর্ণনা করে যে চিঠি লিখছেন, সেটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ : 'বেলি স্পষ্টই বলছে সে বিলেতের নীচেই বোলপুর ভালোবাসে, খোকাও সেই মতে ডিটো দিয়ে যাচ্ছে—রেণুকা কোনোপ্রকার ব্যক্ত শব্দে আপন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে না। দিবানিশি নানা প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করছে, এবং তাকে সামলে রাখা দায় হয়েছে।'[২] দু'টি চিঠিই কলকাতা পৌঁছয় 16 May; এদের বক্তব্যের মধ্যেও 'প্যারাডক্স' দেখে প্রত্যুত্তরে ইন্দিরা দেবী সম্ভবত মন্তব্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে নিজের মনোভাব ব্যাখ্যা করলেন : 'যাদের খুব ভালোবাসা যায় তারা সীমাবদ্ধভাবে আমাদের মনের গতিরোধ করে না, তাদের মধ্যে আমাদের হৃদয় চিরকাল সঞ্চরণ করতে পারে—যাদের আমরা ততটা ভালোবাসি নে, তারা আমাদের কাছে অসীম নয়। তাদের আমরা আংশিকভাবে দেখি, তারা যতটুকু প্রতীয়মান কেবল ততটুকু, এই জন্যে তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকলে অস্বচ্ছ দেয়ালের মতো আমাদের চারদিক থেকে রুদ্ধ করে রাখে, মনকে কোনো-একটা চিন্তার প্রসারতার মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলে পদে পদে তাদের উপরে গিয়ে ঠেকে যায়, এবং আপনার মধ্যে সে বিরক্তভাবে ফিরে আসে। এই জন্যে সকল সময়ে সাধারণের সঙ্গ ভালো লাগে না।'[৩]

শান্তিনিকেতন থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিগুলি নানা রসের। অনেকগুলিতেই স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় পুত্র-কন্যাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছে : 'বেলিটা বড়ো হলে খুব স্নেহময়ী সরলস্বভাব লক্ষ্মী মেয়ে হবে। খোকাটারও ভারী স্নেহশীল ভাব। রেণুকে সে এমনি ভালোবাসে। এমনি মিষ্টি মিষ্টি করে আদর করে, তার সমস্ত উপদ্রব এমন সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় যে, অনেক মাও এমন পারে না।'[৪] রূপকথার আবহ তাঁর মনের মধ্যে কিছুদিন ধরেই বিরাজ করছিল, সন্তানদের এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলেই হয়তো এই সময়ে কবিত্বের উদ্বোধন ঘটালো রূপকথাশ্রয়ী হয়ে—১৪ ও ১৫ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ-শুক্র 26-27 May] লিখলেন, 'নিদ্রিতা' [দ্র সোনার তরী ৩।১৬-১৯] ও 'সুপ্তোত্থিতা' [দ্র ঐ ১৯-২৪], স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হলেও কাহিনীর সূত্রে দু'টি কবিতা পরস্পর-গ্রথিত।

নারী-পুরুষের প্রকৃতি ও উভয়ের সম্পর্ক-নির্ণয় কিছুদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আলোচনীয় বিষয়। কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি সাধনা-র পাতায় উভয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছিলেন, ইন্দিরা দেবীকে এই সময়ে লেখা কয়েকটি চিঠিতেও বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। সম্ভবত এই ভাবনার সূত্রই ১৬ জ্যৈষ্ঠ [শনি 28 May] লেখেন 'তোমরা ও আমরা' [দ্র সাধনা, পৌষ ১২৯৯। ১৩৬-৩৮; সোনার তরী ৩।২৪-২৬] কবিতা। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লেখার একটি বর্ণনা দিয়েছেন ইন্দিরা দেবীকে লেখা এই দিনকার চিঠিতে : 'আজ সকালে কিছু বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বুকের উপর স্লেট রেখে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সকালের বাতাস এবং পাখির ডাকের মধ্যে একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। বেশ জমে এসেছিল—মুখ সহাস্য, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত, মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত এবং গুন্ গুন্ আবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল'[৫]—কবিতা রচনায় নিরত রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা পরবর্তীকালে অনেকেই করেছেন, কিন্তু এই আত্মপ্রকৃতিটি সে-তুলনায় অনেক বেশি সজীব ও সমুজ্জ্বল। এর পরের বিশ্লেষণটিও উদ্ধারযোগ্য : 'একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে করে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক বস্তা আলগা জিনিস—একটি জায়গায় ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না—একেবারে একটা বোঝা-বিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ এক রকম আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা করে আসছি, ও জিনিসটা এখনো তেমন পোষ মানে নি, প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়।'

পরের দিন ১৭ জ্যৈষ্ঠ [রবি 29 May] লিখিত হ'ল আর একটি কবিতা 'সোনার বাঁধন' [দ্র সোনার তরী ৩২৬-২৭]—এটি যেন 'তোমরা ও আমরা'র পরিপূরক; নারী-পুরুষের পার্থক্যের একটি দিক পূর্ববর্তী কবিতায় রূপ লাভ করেছে, 'সোনার বাঁধন'-এ আঁকা হয়েছে আর একটি বৈপরীত্য;

> পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন
> সংসারসংগ্রামে সদা বন্ধনবিহীন; ···
> তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে—
> শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।

এই দিনই তিনি শেষ করলেন 'বর্ষা-যাপন' কবিতাটি—এটি 'আরম্ভ বহুদিনের', সম্ভবত গত বৎসরের [১২৯৮] আষাঢ়ের শেষ দিকে কবিতাটি লেখা শুরু হয়েছিল। বর্ষণমুখর কলকাতা ও জোড়াসাঁকো বাড়ির স্থানিক রঙে কবিতাটির প্রথমাংশ রঞ্জিত। পাণ্ডুলিপি দেখে অবশ্য বোঝা যায় না কোন অংশটি শান্তিনিকেতনে লেখা হয়েছিল।

১৮ জ্যৈষ্ঠ [সোম 30 May] লেখা হ'ল সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের একটি কবিতা—'হিং টিং ছট' [দ্র সাধনা, শ্রাবণ। ১৯৩-৯৯; সোনার তরী ৩।৩১-৩৭]। বাংলা মঙ্গলকাব্যের স্বপ্নদেশের আবহে রচিত কবিতাটির উপনাম 'স্বপ্নমঙ্গল'; এটি সম্ভবত পরবর্তী চিন্তার ফল, কারণ পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় 'স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,/গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান' এই ভনিতা-সদৃশ ছত্র-দুটি প্রথমে কবিতার সর্বশেষে লেখার পর প্রতিটি স্তবকের অন্তে পেনসিলে লিখে যোগ করা হয়েছে।

কবিতাটি সমকালীন সাময়িক সাহিত্যে বিতর্কের কারণ হয়। ফাল্গুন সংখ্যা সাহিত্য-তে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'তর্কবৈচিত্র্য' [পৃ ৬৭৬-৮০] শীর্ষক একটি প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিতর্কের ইতিহাস দিয়ে লেখেন : 'এ পর্য্যন্ত বাদপ্রতিবাদ গদ্যে চলিতেছিল। শ্রাবণ মাসের সাধনায় "হিং টিং ছট্" নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সেই কবিতা বাবু রবীন্দ্রনাথের রচনা।···এই ব্যঙ্গপূর্ণ রচনার লক্ষ্য কে?··· রবীন্দ্রনাথবাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন, জানি না। চন্দ্রনাথবাবু কি বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু। এ কথা যদি রবীন্দ্রনাথবাবু অস্বীকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রুচির প্রশংসা করা যায় না। এরূপ লেখা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যে কেহ কাহাকে এরূপ বিদ্রূপ ও হতশ্রদ্ধা করিয়া থাকে! কবির লড়াই আর কতদূর বাকি রহিল!' বার্ষিক সূচীতে নগেন্দ্রনাথের নাম প্রকাশিত হলেও রচনাটি লেখকের নাম ছাড়াই মুদ্রিত হয়েছিল। সাধারণভাবে এই ধরনের রচনা সম্পাদক-কর্তৃক লিখিত বলেই মনে করা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই ৬ ফাল্গুন [বৃহ 16 Feb 1893] পুরী থেকে 'সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু' একটি পত্র লিখে উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন : "হিং টিং ছট্" নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোন প্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।···এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যাহারা আমার সেই কবিতাটি বুঝিয়াছে তাহারা সেরূপ বুঝে নাই। অবশ্য আপনি অনেককে জানেন এবং আমিও অনেককে জানি—আপনার অনেকের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি যে অনেককে জানি তাঁহাদের মধ্যে একজনও এরূপ মহৎ ভ্রম করেন নাই। এবং আমার আশা আছে চন্দ্রনাথবাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন।'[১] যাঁরা কবিতাটি ও রবীন্দ্রনাথ-কৃত চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধগুলির সমালোচনা মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা এই কৈফিয়ৎ গ্রহণ করবেন না। ৮ জ্যৈষ্ঠ [20 May] ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রে লিখেছেন : 'রসিকতা জিনিসটা বড়ো বিপদের জিনিস—ও যদি প্রসন্ন সহাস্য মুখে আপনি ধরা দিলে তো অতি উত্তম, আর ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবে বড়োই 'ব্যাভ্রম' হবার সম্ভাবনা। হাস্যরস প্রাচীন কালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো, যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে—আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে', হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে

তোলে।'[২]—আমাদের ধারণা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯-সংখ্যা সাহিত্য-তে মুদ্রিত চন্দ্রনাথ বসুর 'লয় ২' [পৃ ৬৭-৭৯] প্রবন্ধটি পড়ে তাঁর-কৃত রসিকতা সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীর কোনো মন্তব্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন। পত্রটিতে চন্দ্রনাথের 'বিরাট'-প্রীতির প্রতি কটাক্ষ রয়েছে, এই তথ্যও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' নামে উক্ত প্রবন্ধের একটি সমালোচনা সাধনা-র আষাঢ়-সংখ্যায় [পৃ ১২৫-৩১] মুদ্রিত হয়—'হিং টিং ছট্' কবিতাটি এরই সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

এই পর্বে শান্তিনিকেতন-বাসকালে রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা 'পরশ পাথর' [দ্র সাধনা, ভাদ্র ১২৯৯। ৩০৪-০৮; সোনার তরী ৩।৩৭-৪০] লিখিত হ'ল ১৯ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 31 May]। এই দিনই ভোরে ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'এখনো পাঁচটা বাজে নি—কিন্তু আলো হয়েছে, বেশ বাতাস দিচ্ছে এবং বাগানের সমস্ত পাখিগুলি জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল—সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্যন্ত বোঝা গেল না—···তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে কিন্তু হতভাগার সে উদ্দেশ্য কি কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না!···আবার আর খানিকটা দূরে আর-একটা কী পাখি নিতান্ত মৃদুস্বরে কেবলই কুক্ কুক্ করছে—তাতে কিছুমাত্র উৎসাহ আগ্রহের ঝাঁজ নেই-লোকটা যেন নেহাৎ মন-মরা হয়ে গেছে, সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু ছায়ায় বসে সমস্ত দিন ওই একটুখানি কুক্-কুক্-কুক্-কুক্ ওটুকু ছাড়তে পারছে না।' এই Local colour সমস্ত ভাবনা-চিন্তার অনুষঙ্গ-সহ কবিতাটিতে বর্তমান :

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু   বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে   সারা নিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন   আশাহীন শ্রান্তিহীন,
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।

মাসখানেক পরে 28 Jun [১৫ আষাঢ়] ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি!···এই সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠেছে, এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তা হলে আর কিছু অসাধ্য সাধন করতে চাই নে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই।'[২] 'পরশ পাথর' কবিতাটির মধ্যে এই ভাব রূপকের আবরণে আবৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, অপেক্ষাকৃত অবারিত প্রকাশ আছে ২২ আষাঢ়ে লেখা 'আকাশের চাঁদ' [দ্র সোনার তরী ৩।৪৫-৪৯] কবিতায়। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে আরম্ভ করে এই ভাবটি রবীন্দ্র-রচনায় বারে বারে ফিরে এসেছে। সাধনা-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত 'একরাত্রি' গল্পটির theme-এর সঙ্গে 'পরশ পাথর' কবিতাটির সাদৃশ্য আছে, এই তথ্যটি উল্লেখযোগ্য। কয়েক দিন আগেই এই গল্প-সংবলিত সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁচেছিল।

উক্ত খবরটি আছে ১৬ জ্যৈষ্ঠ [28 May] ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনার তালিকা :

১-৬ 'আদিম আর্য্য নিবাস' দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২।৪৭২-৭৫

৬-১৬ 'একরাত্রি' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।১৬৫-৭১

১৯-২৪ 'প্যারিস্ হইতে লণ্ডনে।/(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী)' দ্র য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি[১৩৬৭ ৯৪-৯৯

৭২-৭৫ 'শৈশব সন্ধ্যা' দ্র সোনার তরী ৩।১২-১৩

৮৭-৯৪ 'সাময়িক সারসংগ্রহ'

৮৭-৯১ 'সোশ্যালিজ্‌ম্' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৫৩-৫৬

৯৮-১০০ 'পহুঁ (২)' দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২।৫৩৯-৪১

১০১-০৪ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' দ্র সাধনা ও সাহিত্য।৩২৮-৩০

১০১-০৪ নব্যভারত। বৈশাখ; ১০৪ সাহিত্য। বৈশাখ

'আদিম আর্য নিবাস' প্রবন্ধটি সাময়িক সারসংগ্রহ-এরই বৃহত্তর সংস্করণ। পূর্বে ও পরে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে।

'একরাত্রি' গল্পটির সঙ্গে 'পরশ পাথর' কবিতাটির মূল ভাবের মিল রয়েছে, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন [দ্র পৃ ৪৫-৪৬]। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার-কৃত গল্পটির অনুবাদ *The Modern Review* পত্রিকার June 1912-সংখ্যায় [pp. 579-83] '*The Supreme Night*' নামে মুদ্রিত হয়।

'সাময়িক সারসংগ্রহ'-এর অন্তর্গত 'সোশ্যালিজ্‌ম্' প্রবন্ধটি বেল্‌ফর্ট ব্যাক্স-এর গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। এখানে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারের বক্তব্যেরই সারসংক্ষেপ করেছেন, সুতরাং একে তাঁর নিজস্ব ধারণার প্রতিফলন ভাবা ঠিক হবে না—তবে বিষয়টির প্রতি তাঁর ঔৎসুক্যের পরিচয় এতে রয়েছে, প্রতিবাদী মন্তব্যের অভাব মানসিক আনুকূল্যের আভাস ব'লে গণ্য হতে পারে।

নব্যভারত-এর বৈশাখ-সংখ্যার সমালোচনায় সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী লিখিত বর্ষারম্ভের ভূমিকা-প্রবন্ধ 'পুরাতন ও নূতন' কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে : 'এরূপ লেখা পড়িতে পড়িতে অবশেষে লেখকের অদ্ভুত সংযমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। লেখক যে বিস্তর কথা জোটাইতে পারেন ক্রমে সেটা আর তেমন আশ্চর্য্য বোধ হয় না, কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও যে একটা জায়গায় আসিয়া থামিতে হয় সেইটেই বিস্ময় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। একথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে অবাধে বাক্য সৃষ্টি করিয়া যাওয়া এবং অবসর পাইলেই পুরাতন উপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসা ব্রাহ্মদের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছে।'—এই জাতীয় স্পষ্টোক্তি যে শত্রুবৃদ্ধিতেই সহায়তা করে তার প্রমাণ পেতে রবীন্দ্রনাথকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের 'মামলায় মরণ' প্রবন্ধটির প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'লেখক মহাশয় মামলার পরিবর্ত্তে সালিশি নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এ পরামর্শ কাহার কর্ণগোচর হইবে? দেশে এমন কয়টা মোকদ্দমা হয় যেখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য নিষ্পত্তির প্রার্থী? অধিকাংশ স্থলেই, হয় দুই পক্ষেই নয় একপক্ষে ফাঁকি দিতে চায়, সে অবস্থায় আদালতের মত এমন সুবিধার জায়গা কোথায় পাওয়া যাইবে? মামলা

ত একপ্রকার আইনসঙ্গত জুয়াখেলা, অনেকটা দৈব এবং অনেকটা কৌশলের উপর জয়পরাজয় নির্ভর করে। সেই খেলার সর্ব্বনাশী উত্তেজনায় যাহারা সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত পণ করিয়া বসে তাহাদিগকে উপদেশ বাক্যে কে নিবৃত্ত করিবে?' জমিদারির দায়িত্ব নেওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথকেও মামলা-মোকদ্দমায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছে, কিন্তু সর্বদাই চেষ্টা করেছেন একে এড়িয়ে যেতে—মামলায় জয়লাভ করার পর অ-জমিদারসুলভ ঔদার্যে সেই জয়ের সুযোগ ত্যাগ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র-জীবনে বিরল নয়।

রবীন্দ্রনাথ স-পরিবারে কবে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেছিলেন বলা যায় না। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে তাঁকে শিলাইদহে দেখা যায়। রবিবার 12 Jun [৩১ জ্যৈষ্ঠ] ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠি লিখেছেন তার থেকে বোঝা যায় এর কয়েকদিন পূর্বে তিনি কলকাতা হয়ে শিলাইদহে এসে পৌঁচেছেন। কলকাতায় থাকার সময়ে নতুন-লেখা কবিতা পড়া ও বিশেষত 'পরশ পাথর' কবিতাটি নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু আলোচনা হয়েছিল, সম্ভবত সেই প্রসঙ্গেই লিখছেন : 'কালকের চিঠিতে জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে যা লিখেছিস তা ঠিক কথা। আমরা যে যেখানে এসে পড়েছি আমাদের যথাসাধ্যমত সেই জায়গাটুকু সুখে শান্তিতে উজ্জ্বল করে তোলাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। তোদের প্রসন্ন প্রফুল্ল সুন্দর মুখে, নিঃস্বার্থ সেবা স্নেহ ভালবাসায় তোরা তাই, করিস—তার চেয়ে আর-কিছু করবার নেই।'[১] 'পরশ পাথর' কবিতার মূল ভাবটি রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার অনেকগুলি চিঠিরই প্রধান সুর।

পরের দিনের [৩২ জ্যৈষ্ঠ সোম 13 Jun] চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ উত্তেজিত। শিলাইদহে অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি-সমাগম হয়েছিল, উত্তেজনা সেই কারণেই—'এ-সব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না—আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!' বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা! দিনরাত্রি বিচার আচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না ক'রে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ করি।' এর আগে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা দু'টি পত্রে [২ ও ৫ জ্যৈষ্ঠ] লোকারণ্যের উপর বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, এখানে সেই কথাটি লিখেছেন চিঠির শেষে : 'এমনি আমি স্বভাবত অসভ্য—মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ।···বোধহয় আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও মনুষ্যসাধারণ ভালো ভালো সদ্‌বন্ধু খুঁজে পেতে পারবেন। তাঁদের সান্ত্বনার অভাব হবে না।'[১] ইন্দিরা দেবী এমনিতেই চিঠির অনেক অংশ বাদ দিয়ে নকল করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তারও উপরে 'ছিন্নপত্র' সংকলনের সময়ে এই শেষ অনুচ্ছেদটি বাদ দেন—যার ফলে তাঁর উত্তেজনার মূল কারণটি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ছিন্নপত্রাবলী-র পাণ্ডুলিপিতে দেখি, 'কুষ্টিয়া, শিলাইদহ, সোমবার ১৩ই জুন' স্থান তারিখ-সংবলিত একই দিনে লেখা আর একটি পত্র নকল করা হয়েছিল—কিন্তু কালি বুলিয়ে অক্ষরগুলিকে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে, কিছুই পড়া যায় না। পাণ্ডুলিপির পরের পৃষ্ঠার ঊর্ধ্বাংশ কর্তিত, এই তথ্যটিও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইগুলি রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন বলে মনে হয়। যে-সব বর্ণনা যথেষ্ট ব্যক্তিগত নয় ভেবে ইন্দিরা দেবী নকল করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেও রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। যে অংশগুলি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে, সেগুলি উদ্ধারের আর কোনো উপায় নেই; কিন্তু কালি বুলিয়ে যে-অংশগুলিকে অবোধ্য করা হয়েছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তার পাঠোদ্ধার সম্ভব বলে মনে করি। এই স্পর্শকাতর, জটিল মানসিকতার অধিকারী মানুষটির অর্ন্তলোকে উঁকি

দেওয়ার ইচ্ছা দোষণীয় নয়, প্রতিভার কারখানাঘরের চিত্রটি উদঘাটিত হলে আমাদের শিক্ষার ও অনুভবের ক্ষেত্রটি অনেকটা প্রসারিত হতে পারে।

২ আষাঢ় বুধবার [15 Jun] তারিখে লেখা চিঠিটিতেও সামাজিক ভদ্রতারক্ষার দায় সম্পর্কে বিরক্তি আছে, কিন্তু সৌন্দর্যরস পিপাসার আন্তরিক প্রকাশের দিক দিয়ে পত্রটি অনবদ্য। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক'-এর খবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'আমি প্রায়ই এক-এক সময়ে ভাবি, এই-যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে, কোনোটি সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য!···আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিন-রাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে!···লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরও লক্ষযোজন দূরে!' জীবনের সৌন্দর্যরসস্নিগ্ধ কয়েকটি দিনের কথা উল্লেখ করে পরে নিজের পরম আকাঙক্ষাটি জানিয়েছেন : 'যদি বাসনা এবং সাধনা অনুরূপ পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি।'[২] তাঁকে অবশ্য পরকালের জন্য অপেক্ষা করতে হয় নি, উত্তরবঙ্গের নদীমাতৃক ভূখণ্ডই তাঁর কাছে সৌন্দর্যলোক হয়ে উঠেছিল।

অতিথিরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের মানসিক উত্তেজনা ও বিরক্তি কেটে গিয়েছিল। 16 Jun [বৃহ ৩ আষাঢ়]-এর পত্রেই লিখছেন : 'যতই একলা আপন মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায় ততই প্রতিদিন পরিস্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না!'

শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর রওনা হন সম্ভবত ৭ আষাঢ় [সোম 20 Jun] তারিখে। 21 Jun 'গোয়ালন্দের পথে' লেখা চিঠিটিতে তিনি লিখছেন, 'আজ সমস্ত দিন নদীর উপরে ভেসে চলেছি।···এই যে একলাটি চুপ করে বসে চেয়ে থাকা—দুই ধারে গ্রাম ঘাট শস্যক্ষেত্র চর বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে, আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সন্ধের সময় নানা রকম রঙ ফুটছে—···এই সমস্ত পরিবর্তমান ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুই পারে সুদূর তটদৃশ্যের মতো নব নব আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিতে থাকে।'[১]

এখানে একটি তথ্য-বিচার করে নেওয়া দরকার। এই চিঠির পরবর্তী ছিন্নপত্রাবলী-র ৫৯ ও ছিন্নপত্র-র ৫৭ সংখ্যক চিঠির তারিখ স্থান : শিলাইদহ/সোমবার, ২২ জুন ১৮৯২। 22 Jun ছিল বুধবার, সোমবার নয়। তাছাড়া এর আগের দিনের চিঠিতেই দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরের উদ্দেশ্যে বোটে করে গোয়ালন্দের পথে চলেছেন। পরের চিঠিটি 'সোমবার, ২৭ জুন সাজাদপুর' থেকে লেখা। এই কারণেই মনে হয়

ছিন্নপত্রাবলীর ৫৯-সংখ্যক চিঠিটির তারিখ ভুল আছে; স্থান শিলাইদহ ও সোমবারে কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু তারিখটি হবে 20 Jun বা ৭ আষাঢ়—এই দিনই বিকেলে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে রওনা হন।

চিঠিটি একটি সংবাদের জন্য মূল্যবান। এতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন : 'কাল আমার নাটকটাকে শেষ পোঁচ দেওয়া সমাপ্ত করেছি। একটু-আধটু বদল-সদল হয়েছে—নাটকে আবার খুব বেশি হাত ছেড়ে দেওয়া যায় না —কাজটা অনেকটা চৌঘুড়ি হাঁকানোর মতো—অনেকগুলো ঘোড়াকে এক গাড়িতে জুতে,এক রাস্তা দিয়ে, এক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং ওর মধ্যে কোনো একটা ঘোড়াকে বেশি লাগাম ছেড়ে দেওয়া যায় না, সব কটাকে সমান গতিতে ছোটানো চাই।'[২] নাটকটি হ'ল তাঁর প্রথম গদ্যে-লেখা কমেডি 'গোড়ায় গলদ' [র°র° ৩।২০৫-৮০]। কয়েকদিন আগে [১৬ জ্যৈষ্ঠ] শান্তিনিকেতন থেকে একটি পত্রে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন : 'এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপনা-আপনি এসে পড়ছে ব'লে আর নাটকে হাত দিতে পারছি নে। নইলে দুটো-তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না।'[৩] দেখাই যাচ্ছে যে, শীতকাল পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি—১৯ জ্যৈষ্ঠ শান্তিনিকেতনে কবিতা লেখার পালা শেষ হয়েছিল, তার পরেই তিনি নাটকটিতে হাত দেন। কিন্তু চিঠিটির ভাবে মনে হয়, নাটকটি তিনি আগে থেকেই লিখছিলেন যার কথা ইন্দিরা দেবী জানতেন —এখন তাতে 'শেষ পোঁচ দেওয়া অর্থাৎ সংস্কার করা হয়েছে মাত্র। না-কি নাটকটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের পৌষ-মাঘ মাসে লেখা?

নাটকটি প্রকাশিত হয় ভাদ্র মাসে—আখ্যাপত্রে মুদ্রিত তারিখ ৩১ ভাদ্র ১২৯৯ [15 Sep 1892], বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকার তারিখও তাই। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ :

গোড়ায় গলদ্।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক/প্রণীত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/অপার চিৎপুর রোড ৫৫ নং।/৩১ ভাদ্র, ১২৯৯ সাল।/মূল্য ২ টাকা।

আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় : ভ্রমসংশোধন।/গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভ্রমক্রমে "বিনোদ" ও "বিনু"/নামের পরিবর্ত্তে "নীরদ" ও "নীরু" বসিয়াছে। পাঠকেরা/অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

উৎসর্গপত্র : উৎসর্গ।/শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন/প্রিয় বন্ধুবরেষু।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪+১৩৬।

রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত প্রথম সংস্করণের যে বইটি আমরা দেখেছি, তাতে 'নাটকের পাত্রগণ'-সূচক পরিচয়টি মুদ্রিত নেই, রবীন্দ্রনাথের মতো হস্তাক্ষরে হাতে লেখা রয়েছে। 'হিতবাদীর উপহার' 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' [১৩১১]-র অন্তর্গত 'গোড়ায় গলদ' [পৃ ৮৫০-৯০৩]-এর সূচনায় অবশ্য অংশটি, মুদ্রিত হয়েছে—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 'নীরদ' ও 'নীরু'-সংক্রান্ত ভ্রমটি সংশোধিত হয়নি।

রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে গোড়ায় গলদ-এর একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি আছে [Ms. 245]। প্রেসকপির মতো ক'রে খাতার এক-পৃষ্ঠায় লেখা এই পাণ্ডুলিপিটির প্রথম দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা স্পষ্টতই হারিয়ে গেছে —চন্দ্রকান্তের উক্তি 'কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে "হৃদয়বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ…' প্রভৃতি থেকে তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের কিয়দংশ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিতে আছে। মুদ্রিত পুস্তকের দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য ও তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য পাণ্ডুলিপিতে নেই, সম্ভবত মুদ্রণের পূর্বে প্রুফে বা অন্যত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, পাণ্ডুলিপির সর্বত্র বিনোদের নাম নীরদ, নীরদবিহারী ও নিরু—রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মুদ্রাকরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এগুলিকে বিনোদ, বিনোদবিহারী ও বিনু-তে পরিবর্তিত করতে, অনবধানতাবশত সর্বত্র সেই নির্দেশ পালিত হয়নি। অনুরূপভাবে পাণ্ডুলিপিতে দু'টি বন্ধুর নাম গোপাল ও ভূপাল—গ্রন্থে তারা যথাক্রমে শ্রীপতি ও ভূপতি। এই পরিবর্তনের রহস্য বোঝা শক্ত।

পাণ্ডুলিপিতে নাটকের যে অংশটি পাওয়া যায়, মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে তার পার্থক্য যৎসামান্য। পাণ্ডুলিপিতেও সংযোজনের তুলনায় বর্জন-সংশোধনের পরিমাণ কম।

পাণ্ডুলিপিটি দেখলে মনে হয় স্বচ্ছন্দ সংলাপ-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছেন, এতে সংযোজনের তুলনায় বর্জন-সংশোধনের পরিমাণ কম। মুদ্রিত গ্রন্থেও মোটামুটি পাণ্ডুলিপির পাঠই অনুসৃত। তবে একটি বর্জিত পাঠ উল্লেখযোগ্য। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের শেষে চন্দ্রকান্তের উক্তি '···একটি ছিঁচকাঁদুনে দুধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মানুষ করতে বসবে, সে কিছুতেই মনে করতে পারি নে'-র পর পাণ্ডুলিপিতে ছিল : 'আমার সেই বদন অধিকারীর গানটা মনে পড়চে—

এখনো তারে চোখে দেখি নি—শুধু বাঁশি শুনেচি—···'

—এর পর গীতবিতান-এর পাঠ থেকে সামান্য পার্থক্য-সহ গানটি সম্পূর্ণ লেখা হয়েছে। গানটি গ্রন্থে বর্জিত হলেও এই সুযোগে রচনার উপলক্ষটি আমরা জানতে পারছি। বৈশাখ ১৩০০-তে প্রকাশিত 'গানের বহিও বাল্মীকি প্রতিভা' গ্রন্থে গানটি প্রথম মুদ্রিত হয় [দ্র গানের বহি। ৯৯ (বিবিধ), মিশ্র ইমন—কাওয়ালি; গীতবিতান ২।৪১৫; স্বর ৩২]। নাটকটিতে গান ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য সংযম দেখিয়েছেন। মুদ্রিত গ্রন্থে একটি মাত্র গান বাউলের সুরে গেয় : 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো' [দ্র গীতবিতান ২।৫৯৪, স্বর ৫]।

প্রহসন হিশেবে 'গোড়ায় গলদ'-এর মূল্য নিরূপণ করেছেন ও করবেন রস-বিশ্লেষক সাহিত্য-সমালোচকেরা। এখানে আমরা দু'টি সংলাপের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম দৃশ্যে বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের সময়ে চন্দ্রকান্ত বলছে : 'এর চেয়ে সাধের মানবজন্ম একেবারেই ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কোনো গতিকে একটা ইংরেজ নভেলিস্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একখানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম —কখনো ঈডিথ, কখনো এলেন, কখনো লিওনোরার সঙ্গে বেশ ভালো ইংরিজিতে প্রেমালাপ করছি—মেয়ের বাপ বিয়ে দিতে চাচ্ছে না, মেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাচ্ছে, শেষকালে নভেলের শেষ পাতায় বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দুটিতে মিলে ঘর-করনা করছি—হুহু করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে আর পাঁচ পাঁচ শিলিঙে বিক্রি হচ্ছি।' এর সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি সাধনা-র ফাল্গুন ১২৯৮-সংখ্যায় প্রকাশিত 'আলোচনা' পত্র-প্রবন্ধে [দ্র সাহিত্য ৮।৪৬৬] কিংবা ইন্দিরা দেবীকে লেখা 8 Apr 1892-র পত্রে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী] ইংরেজি উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচনা-মূলক মন্তব্যগুলির। আবার শেষ দৃশ্যে বিনোদবিহারী কায়স্থ নলিনাক্ষের বিবাহ-প্রসঙ্গে চন্দ্রকান্তকে বলছে : '··· একটা খোঁজ করো। একটি সৎ কায়স্থের মেয়ে। ওঁদের আবার একটু সুবিধে আছে—খাদ্যের সঙ্গে হজমিগুলিটুকু পান, রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের জোগাড় হয়'—প্রহসনটি রচনাকালে কায়স্থজাতির বিবাহে অতিরিক্ত বরপণ দাবির বিরুদ্ধে পত্রিকায় ও সভাসমিতিতে যে আন্দোলন চলছিল, এই উক্তিতে সেই

সামাজিক সমস্যার প্রতি সূক্ষ্ম কটাক্ষ রয়েছে। এইটুকু ছাড়া প্রহসনটি নিছক হাস্যরসাত্মক—কেবল কল্পলোকের সামগ্রী। সমকালে রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রিয় ব্যসন নব্যহিন্দুদের প্রতি আক্রমণ থেকে 'গোড়ায় গলদ' আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত, এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হতে পারে।

1928-এ প্রহসনটি 'শেষরক্ষা' নামে পুনর্লিখিত হয়। এর পর রবীন্দ্র রচনাবলী ছাড়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'গোড়ায় গলদ' আর প্রকাশিত হয়নি। প্রথম প্রকাশের পর ১৩০৬-এ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১১-তে 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' ও ১৩১৫-তে গদ্যগ্রন্থাবলী-র ৯ম খণ্ডের 'প্রহসন' অংশে 'গোড়ায় গলদ' পুনর্মুদ্রিত হয়।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন : '···এই সমাজের [ভারত সঙ্গীত-সমাজ] অভিনয়ার্থ "গোড়ায় গলদ" রচিত হয়।···প্রথমে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি হইতে যথাযথ ভূমিকা শিক্ষা দেওয়া হয়। নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ পুস্তকখানির অভিনয়কালে দেখা গেল যে উহা দীর্ঘ ও অত্যধিক সময়সাপেক্ষ হইয়াছে এবং নাটকীয় রস তেমন জমিল না। তখন রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব অধ্যবসায়ের ও ক্ষিপ্রতার সহিত উহার আমূল সংশোধন করিলেন। লিখিত অংশের বহু স্থান নির্মম ভাবে কাটিয়া দিলেন। নূতন কথোপকথন সংযোগ ও অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের পরিবর্তন দ্বারা উহাকে যে নূতন রূপ দান করিলেন তাহাতে সকলের মনস্তুষ্টি ও সময়ের সাশ্রয় হইল।'[১] রবীন্দ্রজীবনী-কার এই বিবরণকে বিনা বিচারে গ্রহণ করেছেন ও এর উপর নির্ভর করে নানাবিধ অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন।[২] কিন্তু ভারত সঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৫ মাঘ ১৩০৪ [বৃহ 27 Jan 1898] তারিখে : সাপ্তাহিক 'সংসার' পত্রিকার ১৭ মাঘ ১৩০৪ [১।৫]-সংখ্যায় খবর বেরোয় : 'একটি সঙ্গীত সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। অনেক বড় বড় লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক। গত বৃহস্পতিবার দ্বারবঙ্গের মহারাজা সঙ্গীত সমাজ খুলিয়াছেন।' ২৯ মাঘ ১৩০৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জমাখরচের খাতায় হিসাব লেখা হয় : 'ব° ইন্ডিয়ান সংগীত সমাজ দং উক্ত সমাজে ভরতি হওয়ার ফি ৫/১৮৯৮ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী দুই মাসের দান ৪ /৯,'। বিষয়টি নিয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

সাজাদপুরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনের আনন্দে আছেন। কিন্তু তারই মধ্যে আপন পরিবারের জন্য কিছুটা উদ্বিগ্ন। 26 Jun [রবি ১৩ আষাঢ়] মৃণালিনী দেবীকে লিখছেন···'এখানে কাল থেকে কেমন একটু ঝোড়ো রকমের হয়ে আস্‌চে—···গণৎকার যে বলেচে ২৭ জুন অর্থাৎ কাল একটা প্রলয় ঝড় হবার কথা, সেটা মনে এক্‌টু এক্‌টু বিশ্বাস হচ্চে। আমার ইচ্ছে করচে কালকের দিনটা তোমরা তেতালা থেকে নেবে এসে দোতলায় হলের ঘরে যাপন কর—কিন্তু আমার এ চিঠিটা তোমরা পর্শু পাবে—যদি সত্যিই কাল ঝড় হয় আমার এ পরামর্শ কোন কাজে লাগ্‌বে না।'[৩] প্রিয়জনদের জন্য ভালোবাসা-মেশানো উদ্বেগ, পরামর্শ এবং নিখুঁত হিসাবজ্ঞান দেখে যথার্থই মনে হয় 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।' স্ত্রীর পত্রে জোড়াসাঁকো বাড়ির কিছু অশান্তির খবর পেয়ে তাঁকে লিখছেন : 'আমরা যদি সকল অবস্থাতেই দৃঢ় বলের সঙ্গে সরল পথে সত্য পথে চলি তা হলে অন্যের অসাধু ব্যবহারে মনের অশান্তি হবার কোন দরকার নেই—বোধ হয় একটু চেষ্টা করলেই মনটাকে তেমন করে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে।'—এ শুধু উপদেশ নয়; একধরনের স্বগত-কথন—মানসিক চাঞ্চল্য দমন করার জন্য অনুরূপ আত্মকথনের দৃষ্টান্ত ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে সুপ্রচুর।

ইন্দিরা দেবীর একটি চিঠি পেয়েও তাঁর মন চঞ্চল হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তাঁকে 28 Jun [মঙ্গল ১৫ আষাঢ়] একটি পত্রে লিখছেন : 'তোর আজকের চিঠির মধ্যে এক জায়গায় অভির গানের একটুখানি উল্লেখ আছে—পড়ে মনটা কেমন হঠাৎ হুহু করে উঠল—জীবনের অনেকগুলি ছোটো ছোটো উপেক্ষিত সুখ, যারা শহরের গোলমালের মধ্যে কোনো আমল পায় না, বিদেশে এলে তারা সময় বুঝে হৃদয়ের কাছে আপন আপন দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়।' এইটিই সেই চিঠি, 'পরশপাথর' কবিতা-প্রসঙ্গে যার কিয়দংশ আমরা আগেই উদ্ধৃতি করেছি। চিঠির শেষাংশটির সুর অবশ্য আলাদা। 'বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা' না করার সংকল্পই সেখানে বিঘোষিত : 'এবারো কলকাতায় গিয়ে কত কী যে করব তার ঠিক নেই—কাজ করব, গান করব, হাসব, গল্প করব, ভালোবাসব, রাত্তিরে গভীর নিদ্রা দেব এবং সকালে উঠে নব নব সূর্যোদয়কে আনন্দে অভ্যর্থনা করে প্রতিদিনের কাজের মধ্যে প্রবেশ করব।' তিনি জানেন যে, লেখার চেয়ে করা কিছু শক্ত হবে—'কিন্তু সেই কঠিন হবে বলেই সুখ আছে।'[৪]

সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯ [১।৮] :

১০৫-০৭ 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে / (রূপকথা) দ্র সোনার তরী ৩। ১৪-১৬

১০৮-২০ 'একটা আষাঢ়ে গল্প' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৪। ১৭২-৮০

১২৫-৩১ 'চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব'

১৩১-৩৮ 'লন্ডনে।/ (য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)' দ্র য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ৯৯-১০৬

১৪২-৫১ 'সাহিত্যের প্রাণ' দ্র সাহিত্য ৮। ৪৭৫-৮১ ['পত্রালাপ : ৩']

১৭৮-৮২ 'আদিম সম্বল' দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২। ৪৭৫-৭৮

১৮৭-৮৯ ''স্বরবর্ণ 'অ''' দ্র শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৪৩-৪৪

'স্বরলিপি / (রাজা ও রানী হইতে)' শিরোনামায় ইন্দিরা দেবী কৃত 'সখি, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে' গানটির স্বরলিপি [দ্র স্বরবিতান ২৮] এই সংখ্যার ১২০-২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন চৈত্র ১২৯৮-তে। রূপকথার আবহ তাঁর মনে অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। 'একটি আষাঢ়ে গল্প'-তেও সেই আবহ বজায় রাখা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে হিন্দু অচলায়তনের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ। আমরা বার বার দেখেছি, এই পর্বে হিন্দুসমাজকে আঘাত করার কোনো সুযোগই তিনি ত্যাগ করেননি—এই গল্পেও সেই সমাজ তাসের দেশে পরিণত হয়েছে : 'টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা দহলারা অন্ত্যজ—তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।/ কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জো নাই। সকলেই যথানির্দিষ্টমতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়। বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ববর্তীদিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।' অনেক দিন পরে গল্পটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' [১৩৪০] গীতিনাট্যটি রচনা করেন।

‘চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব’ প্রবন্ধটি আসলে ‘সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা,’ আকারের দীর্ঘতার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় উক্ত বিভাগটির অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। চন্দ্রনাথ বসুর ‘লয়’-সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় মাঘ ১২৯৮-সংখ্যায় সাহিত্য-তে, রবীন্দ্রনাথ তার সমালোচনা করেন সাধনা-র ফাল্গুন সংখ্যায়। সেই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথ উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচনা করেন, সেটি মুদ্রিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ৬৭-৭৯]। তিনি লেখেন : ‘লয় যেমন বহু সাধনা সাপেক্ষ যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত লয় হয় না সে ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনি বহু অনুশীলনসাপেক্ষ। যাহা দেখিলে, যাহা বুঝিলে, যাহা অনুভব করিলে, ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনের উপায়। অতএব পদার্থবিদ্যা প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাখ্যাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিস। আবার লয়ের প্রতি চলিতে গেলে কঠোর প্রণালীতে ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হয়, বলিয়া মায়ামোহ হইতে দূরে গমন করিতে হয় বলিয়া যে বিশ্বের সৌন্দর্য্য, কোমলতা, কমনীয়তা, রমণীয়তা, মাধুর্য্য ত্যাগ করিতে হয় তাহা নয়। ত্যাগ করা দূরে থাকুক, সে সকল নহিলে চলে না।···হিন্দুর লয়তত্ত্বে এবং বিশ্বের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যতত্ত্বে বড়ই আত্মীয়তা।’ রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র এই বক্তব্যের অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেছিলেন : ‘···ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—/ সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্।’ কিন্তু এখানে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে একটু বিস্তারিত করে বলেছেন। তিনি প্রবন্ধটির উপসংহার করেছেন এই ভাবে : ‘আসল কথা, চন্দ্রনাথ বাবু নিজের সহৃদয়তাগুণে লয়তত্ত্ব সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছেন। অথচ সেই সহৃদয়তাই দেশানুরাগের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে লয়তত্ত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রমাণের চেষ্টা করিতেছে। সেই হৃদয়ের প্রাবল্যবশতঃই তিনি অকস্মাৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদিগকে গালি দিয়াছেন, এবং ভরসা করি, সেই সহৃদয়তাগুণেই তিনি আমাদের নানারূপ প্রগল্‌ভতা মার্জনা করিবেন।’ ‘বিরাট’ শব্দটি নিয়ে কৌতুক এই রচনাটিতেও আছে।

‘সাহিত্যের প্রাণ’ প্রবন্ধটি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় [পৃ ৮৩-৮৭] লোকেন্দ্রনাথ পালিতের ‘সাহিত্যের উপাদান’ পত্র-প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি সহজলভ্য, সুতরাং সেটি নিয়ে বাগবিস্তার বাহুল্য। আমরা এখানে সেইজন্য এমন দু’একটি অংশ উদ্ধার করতে চাই যার মধ্যে তিনি নিজের চিন্তাপ্রণালী ও রচনার কৌশলটি ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখছেন : ‘তুমি পূর্ব হতেই জান, খণ্ড খণ্ড ভাবে তর্ক করা আমার কাজ নয়। সমস্ত মোট কথাটা গুছিয়ে না উঠতে পারলে আমি জোর পাই নে। মাঝে মাঝে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় তুমি যেখানটা ছিন্ন করছ সেখানকার জীর্ণতা সেরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আগাগোড়া ফেঁদে দাঁড়াতে হচ্ছে।—তার উপরে আবার উপমার জ্বালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে। মনের কোনো একটা ভাব ব্যক্ত করবার ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সেগুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়, অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়।’ লোকেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ-আলোচনায় এই তর্ক শেষ করতে চেয়েছিলেন। [এই প্রস্তাব সাধনার পূর্ব-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়নি], রবীন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি করেছেন : ‘তা হলে কেবল টুকরো নিয়েই তর্ক হয়, মোট কথাটা আজ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তোমাকে বোঝাতে পারি নে। নিজের অধিকাংশ মতের সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না। তারা যদিচ আমার আচারে ব্যবহারে লেখায় নিজের কাজ নিজে করে যায়, কিন্তু আমি কি সকল সময়ে তাদের খোঁজ রাখি?···লেখবার একটা সুবিধে এই

যে, আপনার মতের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা অবসর পাওয়া যায়; লেখার সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজের মতটাকে যেন স্পর্শদ্বারা অনুভব করে যাওয়া যায়—নিজের সঙ্গে নিজের নূতন পরিচয়ে প্রতিপদে একটা নূতন আনন্দ পাওয়া যায়, এবং সেই উৎসাহে লেখা এগোতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথ-যে কেন এত বেশি লিখেছেন, তার একটি ব্যাখ্যা এই উদ্ধৃতির মধ্যে পাওয়া যায়।

'আদিম সম্বল' একটি ছোটো প্রবন্ধ, কিন্তু নূতন শিক্ষার সঙ্গে নূতন জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ নব্য বাঙালির জন্য পথ-নির্দেশের দিক দিয়ে প্রবন্ধটি মূল্যবান। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'যে-জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে তাহার বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলো অমূলক বিশ্বাস কিংবা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি'। রবীন্দ্রনাথের মতে, কোনো জাতির আদিম সম্বল দু'টি—স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস ও সত্যপ্রিয়তা, অভ্যাস আবশ্যক ও আশঙ্কার কথা তুলে এদের নির্বাসিত করা চলে না। যেখানে যুক্তির স্বাভাবিক অধিকার সেখানে শাস্ত্রকে রাজা করিয়া, 'যেখানে স্বভাবের পৈতৃক সিংহাসন সেখানে কৃত্রিমতাকে অভিষিক্ত করিয়া আমরা এতদিন সহস্রবাহু অধীনতা' রাক্ষসকে সমাজের দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি; স্বাধীন মনুষ্যত্বকে ধর্মে সমাজে দৈনিক ক্রিয়াকলাপে সূচ্যগ্র ভূমিমাত্র না ছাড়িয়া দেওয়াকেই আমরা উচ্চ মনুষ্যত্ব জ্ঞান করিয়া আসিতেছি।' কিন্তু যতদিন বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, ততদিন এইভাবে চলা সম্ভব ছিল। 'কিন্তু যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই, তবে যে-সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদবেদনা-সহকারে বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক।' চন্দ্রনাথ বসুর লেখা প্রবন্ধাবলীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বোঝাতে চাইছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে সেই বক্তব্যটিই ব্যক্ত হয়েছে।

শব্দতত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বাল্যাবধি, এ-সম্বন্ধে পূর্বেও কিছু আলোচনা হয়েছে। আমরা দেখেছি, ইতিপূর্বে তিনি সাধনা-র কয়েকটি সংখ্যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহৃত 'নিছনি' ও 'পহুঁ' শব্দ-দু'টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মনে হয়, এই আলোচনার সূত্রেই তিনি বাংলা শব্দরহস্যের প্রতি পুনর্বার আকৃষ্ট হন। 'বালক' পত্রিকার আশ্বিন ১২৯২-সংখ্যায় 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে তিনি আদ্যক্ষরবর্তী অকার উচ্চারণের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ''স্বরবর্ণ 'অ''' প্রবন্ধের সূচনায় তিনি উক্ত আলোচনাটিকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, উদাহরণগুলি ছাড়া উভয় প্রবন্ধের বক্তব্য এক। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : 'মধ্যাক্ষর বা শেযাক্ষরের নিয়ম অবধারণের অবসর পাই নাই।' বর্তমান প্রবন্ধেও তিনি উক্ত দুই শ্রেণীর 'অ'-এর উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করেননি। 'এ' স্বরবর্ণের উচ্চারণবিধি নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রচনাটি শেষ হয়, সেটি রক্ষিত হয় সাধনা-র কার্তিক-সংখ্যায়।

'সাহিত্য' পত্রিকার আষাঢ় ১২৯৯-সংখ্যায় [পৃ ১৬৫] রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাঁধন' [দ্র সোনার তরী ৩। ২৬-২৭] কবিতা মুদ্রিত হয়। উল্লেখ্য, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এই সনেটটি অবলম্বনে ভাদ্র-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ২৯৫] 'সোনার শিকলি', 'রূপার বাঁধন' ও 'লোহার বাঁধন' সনেট-তিনটি প্রকাশ করেন; প্রথম কবিতাটির টীকায় লেখেন : 'প্রিয় সাহিত্য! বলা বাহুল্য, আমার এ সনেটটি রবি বাবুর ''সোনার বাঁধন'' কবিতার অনুকরণে লিখিত। প্রভেদ এই যে, তাঁহার খাঁটি সোনা, আর আমার Chemical Gold তা ভাই! যার যেমন

ব্যাসাত!' আমরা আগেই বলেছি, সাজাদপুরে এসে রবীন্দ্রনাথ বেশ আনন্দে ছিলেন। কলকাতার খবর মাঝে-মাঝে চঞ্চল করলেও সাধারণভাবে আনন্দরসাস্বাদনের পরিমাণই বেশি। তাই 29 Jun [বুধ ১৬ আষাঢ়]-এর চিঠিতে লিখছেন : 'তোকে চিঠিতে লিখেছিলাম [এই চিঠিটি ইন্দিরা দেবী হয় নকল করেননি, নতুবা অংশটি বাদ দিয়েছেন] কাল 7 p.m.' এর সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট্ করা যাবে।' কিন্তু যথাসময়ে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এলেন সাজাদপুরের পোস্টমাস্টার। কালিদাসের বদলে এঁকে চৌকি ছেড়ে দিতে রবীন্দ্রনাথের খারাপ লাগেনি, কারণ 'ওর মধ্যে আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।···সমস্ত দিন চুপচাপ একলা বসে থেকে মাঝে মাঝে এইরকম জীবন্ত মানুষের সংঘাতে আবার যেন সমস্ত জীবনটা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে।' পোস্টমাস্টার চলে গেলে রবীন্দ্রনাথ সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর পড়তে লাগলেন। 'সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা বসে গেছেন—এবং এক সময়ে শঙ্খ এবং তূরী-ধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ পরে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানের সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে! তার পরে সুনন্দা এক-এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর! যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে! ইংরাজ গর্বিণীর ঔদ্ধত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো।' সংস্কৃত সাহিত্যের রস-বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন কালিদাসের মেঘদূত দিয়ে। পরে অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব নিয়েও আলোচনা করেছেন। পত্রের এই অংশটি পড়ে আক্ষেপ জাগে, কেন রঘুবংশকে নিয়ে সম্পূর্ণ একটি আলোচনা তিনি করলেন না! আশুতোষ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের ব্যবহারজীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় ১৪ আষাঢ় [সোম 27 Jun] তারিখে। সেই কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ চিঠির শেষে লিখেছেন : 'কিন্তু অজের গলায় মালা দেবার পূর্বেই অনেক রাত হওয়াতে শুতে যেতে হল—তাই কাল প্রিয়র বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দুমতীর বিয়েটা সমাধা হয়ে উঠল না।'[১]

আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিভা দেবীর বিবাহ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঐ পরিবারটির সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হন। প্রিয়ম্বদা দেবী [1871-1935]-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় সেই সূত্রে। দশ বছরের ছোটো এই বিদূষী মেয়েটিকে তিনি স্নেহ করতেন, উভয়ের মধ্যে পত্রালাপও ছিল। তাই সুদূর রায়পুরের অপরিচিত পরিবেশে তাঁর নূতন জীবনযাত্রার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করেছে। 30 Jun [বৃহ ১৭ আষাঢ়]-এর পত্রে তাই লিখছেন : 'মেয়েদের নূতন জীবনে প্রবেশ করার যে কী ভাব তা পুরুষের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত—···আমার পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ, একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত স্থানে দিন রাত কেমন করে কাটে! মনে করলে অসহ্য শ্রান্তি বোধ হয়। তার কারণ আমি নিজে পুরুষমানুষ।···আমরা কী করে ঠিক বুঝব একজন নবীনা তার সমস্ত প্রস্ফুটিত হৃদয় মন নিয়ে যখন একটা জীবন থেকে আর-একটা নূতন আশাপূর্ণ জীবনের উপর গিয়ে পড়ে তখন সেই প্রথম মুহূর্তে তার সমস্ত অস্তিত্ব কিরকম একটা দীপ্তিতে উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে!'[২]

পরের দিন ১৮ আষাঢ় [শুক্র 1 Jul] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বৈষ্ণব কবিতা' [দ্র সাধনা, ফাল্গুন। ২৮৮-৯১; সোনার তরী ৩। ৪০-৪৩]—কবিতাটি 'পরশ পাথর'-এর ঠিক এক মাস পরে লেখা। বৈষ্ণব পদাবলী

আকৈশোর তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী—বৈষ্ণবদের অনুকরণে তিনি কবিতা লিখেছেন, বৈষ্ণব কবিদের ও কাব্যের রস-বিশ্লেষণ করেছেন, বৈষ্ণব কবিদের ব্যবহৃত শব্দ অবলম্বনে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর অনেকগুলি চিঠিতেই দেখা যায়, জমিদারি কার্যোপলক্ষে মফস্বলে থাকার সময়ে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীও তাঁর পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের অন্যতম ফল 'বৈষ্ণব কবিতা', যা পদাবলী-সাহিত্যের রসাস্বাদনের চিরাগত পদ্ধতিটিকেই পরিবর্তিত করেছে। এ-কথা বলতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয়, পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপদের রস-ব্যাখ্যা অনেক পরিমাণে এই কবিতাটির দ্বারা প্রভাবিত। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মনুষ্য' প্রবন্ধে [দ্র সাধনা, বৈশাখ ১৩০০। ৫৩০-৪৩; পঞ্চভূত ২। ৫৭৫-৮৩] এই গীতিকাব্যিক আবেগ তত্ত্বের আকার লাভ করেছে।

১৯ আষাঢ় [শনি 2 Jul] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'দুই পাখি' [দ্র সোনার তরী ৩ | ৪৩-৪৫], ভারতী ও বালক-এর অগ্র০-সংখ্যায় [পৃ ৪৭৬-৭৭] কবিতাটির নাম 'নরনারী'—কবিতার রূপকটি এই নামকরণে অনেকটাই বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে ব'লেই হয়তো পরে নামটি পরিবর্তিত হয়। পরে কিছুটা ভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিতার ভাবটি ব্যাখ্যা করেছেন : 'আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ, ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শতসহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর একজন খাঁচার পাখি। এই বনের পাখিটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে এবং বিচিত্র রাগিনীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।'[৩]

3 Jul [রবি ২০ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্টেনেন্ট্ গবর্নর এসেছে এবং তার অভ্যর্থনা-উপলক্ষে উৎসব হচ্ছে।···একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে।···গাইয়েটা একটা বড়োরকম ইমনকল্যাণ গান গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে—তার পর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ তার সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল—···তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা আহা' করে উঠলেন, একজন প্রকৃত আর্টিস্টের মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন।'[১] এই স্বপ্নবৃত্তান্ত কয়েকদিন পরে ২৪ আষাঢ় [বৃহ 7 Jul] শিলাইদহে বোটে থাকার সময়ে 'গানভঙ্গ' কবিতায় রূপ লাভ করে, কবিতাটি সাধনা-র চৈত্র ১২৯৯ [পৃ ৩৯৬-৪০০]-সংখ্যায় 'সভাভঙ্গ' নামে মুদ্রিত হয় [পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নাম 'গানভঙ্গ']; কবিতাটি প্রথমে সোনার তরী-তে ও পরে 'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থের 'কাহিনী' অংশে সংকলিত হয়েছে [দ্র কথা ও কাহিনী ৭। ৯৩-৯৫]। রবীন্দ্র রচনাবলী-তে ভ্রমক্রমে কবিতাটির রচনা-কাল '২৪ আষাঢ় ১৩০০'।

পরের দিন 4 Jul [সোম ২১ আষাঢ়]-এর পত্রের বিষয়বস্তু সেদিন বিকেলে সাজাদপুর স্কুলের ছাত্রদের সভায় তাঁর সভাপতিত্ব : যদিও আমার সভ্যেরা সমস্তই প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু পাড়াগেঁয়ে ছাত্র, তবু

দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা করবার আসন্ন সম্ভাবনায় সমস্ত ক্ষণ আমার বুকে ব্যথা করতে লাগল'।[২] ইংরেজি ও বাংলাতে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী শ্রবণ করবার পর রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন 'এবং বক্তৃতাটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়নি।'

২২ আষাঢ় [মঙ্গল 5 Jul] সাজাদপুরে পুণ্যাহ অনুষ্ঠান হয়। পুণ্যাহ জমিদারির সদর কাছারির একটি প্রধান অনুষ্ঠান, যা আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হত। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী অনুষ্ঠানটির খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : 'সদর কাছারির একতলার প্রকাণ্ড হলঘরটি ঐ উপলক্ষে পরিপাটি করে সাজান হত, সিংহদরজায় নহবত বসত।…জমিদারবাবু পুণ্যাহ-সভায় তাঁর প্রকাণ্ড সুসজ্জিত আসনে বসলেই কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য [আচার্য নন, কোনো-একজন উপাচার্য] সমাজের প্রথামত প্রথমেই গুরুগম্ভীর স্বরে প্রার্থনা করতেন এবং জমিদারবাবুকে পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি দিয়ে অভিষিক্ত করে আশীর্বাদ করতেন।… তারপরে জমিদারবাবু সমবেত প্রজা ও আমলাবর্গকে সম্বোধন করে তাঁদের শুভকামনা করতেন। ম্যানেজার তাঁকে পুষ্পমাল্যে অর্চনা করে প্রণাম করতেন, …'পুণ্যাহপাত্র' হিসাবে নির্দিষ্ট সম্ভ্রান্ত প্রজাকে নূতন কাপড়, চাদর, দধি, মৎস্য, তাম্বুলাদি দিয়ে কপালে চন্দন, আর গলায় ফুল ও শোলার মালা দিয়ে অভিষেক করা হত। 'পুণ্যাহপাত্র' সসম্ভ্রমে হাঁটু গেড়ে বসে জমিদারবাবুকে নজরানা দিয়ে সকলের প্রথমে 'কর প্রদান' করতেন। তারপরেই প্রজাদের ও নায়েবদের কর-গ্রহণ পর্ব আরম্ভ হত।'[৩]

রবীন্দ্রনাথ এই দিন ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'আজ সকালে একটা সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর কী বলব—আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তরনিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল—বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর—সেই সুরটাই গলায় কেন যে তেমন করে আসে না বুঝতে পারি নে।' চিঠির শেষে লিখেছেন : 'আমার আজকাল ভারী গান শিখতে ইচ্ছে করে—বেশ অনেকগুলো ভূপালী…এবং করুণ বর্ষার সুর—অনেক বেশ ভালো ভালো হিন্দুস্থানী গান—গান প্রায় কিছুই জানি নে বললে হয়।'[৪] অনেকদিন নতুন কোনো গান লেখেন নি, মফস্বলে এসে ভালো গান শোনার সুযোগও নেই—আক্ষেপ হয়তো সেই কারণেই।

পুণ্যাহ-অনুষ্ঠানের পরেই রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর থেকে শিলাইদহ রওনা হন। 'বিরাহিমপুরের পথে' যমুনা নদীতে বোটে বসে লিখলেন 'আকাশের চাঁদ' [দ্র সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০। ৮-১২; সোনার তরী ৩। ৪৫-৪৯] কবিতা। 'পরশ পাথর' কবিতাটির সঙ্গে এটির ভাবসাদৃশ্যের কথা আগেই বলা হয়েছে।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র-সম্পর্কে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। বলেন্দ্রনাথকে লেখা এই পত্রে তারিখ নেই, পত্রের বিষয়বস্তু থেকে অনুমান করা যায় এটি আষাঢ় ১২৯৯-র কোনো সময়ে লেখা। আমাদের অনুমান, পত্রটি ১৮ আষাঢ় [শুক্র 1 Jul] তারিখে সাজাদপুর থেকে লেখা হয়েছিল। কারণ চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন : 'শনিবার দিন তুমি আমার এই চিঠি পাবে যদি সেইদিন কিংবা রবিবার দিন জবাব দাও তাহলে আমি এখানেই পাব—নইলে শিলাইদহের ঠিকানায় দিয়ো।' রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় ২২ আষাঢ় মঙ্গলবার সাজাদপুরের পুণ্যাহের পর শিলাইদহ যাত্রা করেন, সুতরাং তার আগের শুক্রবার তিনি এই পত্র লিখেছিলেন ব'লে অনুমান করা যায়। ডাক-ব্যবস্থার সেই স্বর্ণযুগে সাজাদপুর থেকে কলকাতায় চিঠি পৌঁছতে একদিন লাগত!

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'তোমাকে আজকের রেজেষ্ট্রি ডাকে যে যে লেখা পাঠান যাচ্ছে আগে তার একটা নম্বর ডায়ারি ফর্দ্দ দিই পরে তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিখ্ব।—১। কাবুলিওয়ালা। (গল্প)/ ২। সমস্যাপূরণ। (ঐ)/ ৩ | সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা—/৪। জাহাজের কাহিনী। (ডায়ারি)—/ ৫। সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ। (লোকেনের পত্র)—/ ৬। মানব প্রকাশ। (তদুত্তর) / ৭। স্বরবর্ণ "এ"।/ ৮। দুর্ব্বোধ বৈষ্ণব পদাবলী।/ ৯। গোবিন্দ দাস।/ ১০। পঁহু সম্বন্ধে ক্ষীরোদবাবুর পত্র।—

প্রথম কথা হচ্ছে—এবারে ১৩ আশ্বিন পূজার দিন, অতএব ভাদ্র আশ্বিন মাসের কাগজ একসঙ্গে বের করা উচিত। দুটো কাগজ আলাদা না করে একসঙ্গে করবার গোটাকতক সুবিধা আছে—প্রথমতঃ মলাট এবং দপ্তরী খরচ কম পড়ে, দ্বিতীয়তঃ অনেক লেখা একত্র থাকাতে বেশ বৈচিত্র পাওয়া যায়, তৃতীয়তঃ বড় কাগজখানা হাতে এলে লাগে ভাল, চতুর্থতঃ বড় বড় লেখাগুলো একেবারে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়—অতএব এই বেলা থেকে তৎপ্রতি মন দিয়ো।—

প্রথম দুটো গল্প তোমার কাছে রেখে দিয়ে ওদুটো আপাততঃ ব্যবহারের জন্য নয়।

এরপর দফাওয়ারি বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে তিনি লিখেছেন : 'ভাদ্রমাসের কাগজটা বোধ করি অক্সফোর্ড অথবা অন্য কোন প্রেসে দেওয়া আবশ্যক হবে, নইলে ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে ভাদ্র আশ্বিনের কাগজ সমাজ থেকে বের করা অসাধ্য হবে। এ বিষয়ে তোমরা পরামর্শ করে তথাকর্ত্তব্য স্থির কোরো, দ্বিধায় পড়ে কালবিলম্ব কোরো না। কিন্তু ভাদ্র আশ্বিনের কাগজ একসঙ্গে বের না করলে ভারি মুস্কিলে পড়বে। কারণ পূজোর ছুটির সময় অনেক গ্রাহকেরই ঠিকানা পরিবর্ত্তন হবে পনেরই ভাদ্রে আশ্বিনের কাগজ পাঠালে নিশ্চয়ই তারা নিজ নিজ স্থানেই পাবে। কিন্তু ওদিকে আবার ১৩ আশ্বিন থেকে ১৩ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সমাজ বন্ধ থাকবে, অতএব কার্ত্তিকমাসের কাগজটাও খুব সম্ভব Oxford Mission Pressএ ছাপতে হবে। সেখানে তা হলে এইবেলা খবর নিয়ো তাদের ছুটির নিয়ম কি রকম?

ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়, আমার কোন দুটো গল্প দেবে? "ছুটি" এবং "স্বর্ণমৃগ" দিয়ো।—...'[১]

দীর্ঘ এই চিঠিটি বিভিন্ন দিক দিয়ে মূল্যবান। এখানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কেবল পরমার্শদাতার নয়, একেবারে যেন সম্পাদকের—বিভিন্ন লেখা তাঁর কাছেই পাঠানো হয়েছে, তিনি বিভিন্ন নির্দেশ ও মন্তব্য-সহ সেগুলি ফেরৎ পাঠাচ্ছেন তাঁর কার্যাধ্যক্ষকে। পত্রিকাটির ঘোষিত সম্পাদক ও কার্যাধ্যক্ষ হিশেবে সুধীন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথের নাম থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কাজ করতেন রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ—তাঁরা স্বনামে আবির্ভূত হন সাধনা-র শেষ বৎসরে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির প্রকাশ-কাল ও রচনা-কাল যে এক নয়, এই চিঠিটি তা আর-একবার প্রমাণ করেছে। 'কাবুলিওয়ালা' ও 'সমস্যা-পূরণ' গল্প-দু'টি সাধনা-য় মুদ্রিত হয় যথাক্রমে অগ্র° ১২৯৯ ও অগ্র° ১৩০০-সংখ্যায়, কিন্তু পত্রটি থেকে জানা যাচ্ছে এদু'টি আষাঢ় ১২৯৯-র মধ্যে লেখা হয়ে গিয়েছিল। বলেন্দ্রনাথকে লেখা আর-একটি চিঠি থেকে জানা যায়, 'স্বর্ণমৃগ' গল্পটি অগ্র° ১২৯৮-এ লেখা হয়েছিল। 'ছুটি' গল্পটি এই চিঠি লেখবার আগে থেকেই বলেন্দ্রনাথের কাছে ছিল, এটি মুদ্রিত হয় পৌষ ১২৯৯-সংখ্যায়। সুতরাং গল্পগুলির প্রকাশকাল ও সমকালীন কবিতার মধ্যে ভাবসাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা অনেকটা ভ্রম-সংকুল। অবশ্য একটি ভাবপ্রবাহ মনের মধ্যে অনেকদিন সজীব থাকতে পারে, একথা অনস্বীকার্য।

5 Jul [২২ আষাঢ়]-এর পর থেকে 19 Jul [৫ শ্রাবণ] পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠিপত্র নেই। তা থেকে অনুমান করা সম্ভব, এর মধ্যে তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু উপকরণের অভাবে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। পরবর্তী চিঠি 20 Jul [বুধ ৬ শ্রাবণ] শিলাইদহ থেকে—একই দিনে স্ত্রীকে ও ইন্দিরা দেবীকে দু'টি চিঠি লিখেছেন। চিঠি দু'টির বিষয়বস্তু একটি নৌ-দুর্ঘটনা। মৃণালিনী দেবীকে লেখা বিবরণটি কিছু সংক্ষিপ্ত : 'আজ আর একটু হলেই আমার দফা নিকেশ হয়েছিল। তরীর সঙ্গে দেহতরী আর একটু হলেই ডুবেছিল। [ছিন্নপত্রাবলীর বর্ণনা : 'কী করে যে বাঁচল ঠিক বুঝতে পারছি নে। যা হোক, বেঁচেছে সে জন্য দুঃখিত নই।] আজ সকালে পান্টি[১] থেকে পাল তুলে আস্‌ছিলুম—গোরাই ব্রিজের নীচে এসে আমাদের বোটের মাস্তুল ব্রিজে আট্‌কে গেল—সে ভয়ানক ব্যাপার—একদিকে স্রোতে বোটকে ঠেল্‌চে আর এক দিকে মাস্তুল ব্রিজে বেধে গেছে—মড়মড় মড়মড় শব্দে মাস্তুল হেল্‌তে লাগল একটা মহা সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম হল এমন সময় একটা খেয়া নৌকো এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল এবং বোটের কাছি নিয়ে দুজন মাল্লা ['তপ্‌সি এবং আর একজন মাঝি'] জলে ঝাপিয়ে সাঁতরে ডাঙ্গায় গিয়ে টানতে লাগ্‌ল—ভাগ্যি সেই নৌকো এবং ডাঙ্গায় অনেক লোক সেই সময় উপস্থিত ছিল তাই আমরা উদ্ধার পেলুম, নইলে আমাদের বাঁচবার কোন উপায় ছিল না—···। এ যাত্রায় দু তিনবার এই রকম বিপদ ঘট্‌ল। পান্টিতে যেতে একবার বটগাছে বোটের মাস্তুল বেধে গিয়েছিল সেও কতকটা এই রকম বিপদ—কুষ্টিয়ার ঘাটে মাস্তুল তুল্‌তে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে মাস্তুল পড়ে গিয়েছিল আর একটু হলেই ফুলচাঁদ মারা গিয়েছিল।—মাঝিরা বল্‌চে এবার অযাত্রা হয়েচে।'[২] ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে বর্ণনা আরও খুঁটিনাটিতে পূর্ণ, আর বিপদের সময়ে নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারার জন্য একটু গর্বিত : 'আমার একটা এই তৃপ্তি বোধ হচ্ছে, খুব সংকটের সময়েও আমি কেবল মাল্লাদের সাবধান করে দিয়েছি, নিজের জন্যে, কিছুমাত্র হাঁউমাউ করি নি, বুদ্ধি স্থির ছিল।'[৩]

এই ঘটনার পরের দিন সকালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে পাবনায় চলেছেন। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ গোরাই নদীর উপর দিয়ে যেতে যেতে তার সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে লেখা এই দিনের চিঠিতে শুধু নদীরই কথা : 'যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো ঘাড়-বাঁকানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে—এই ক্ষ্যাপা নদীর উপরে চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি।··· এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে···সে মেয়ে বোধহয় একেবারে উন্মাদ ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, ···তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়—নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে।[৪]

সম্ভবত পাবনা-ভ্রমণের কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। চিত্রাঙ্গদা লেখা শেষ হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে ২৮ ভাদ্র ১২৯৮ তারিখে। তরুণ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের উপর দায়িত্ব পড়েছিল ছবি এঁকে গ্রন্থটি সাজিয়ে দেবার। অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণ করে বলেছেন : 'বসলুম পাকাপাকি স্টুডিয়ো ফেঁদে। রবিকা খুব উৎসাহ দিলেন। সেই স্টুডিয়োতেই সেই সময় রবিকা চিত্রাঙ্গদার ছবি আঁকতে আমায় নির্দেশ দিচ্ছেন, ···চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে। রবিকা বললেন, 'ছবি দিতে হবে।' আমার তখন একটু সাহসও হয়েছে, বললুম, 'রাজি আছি।' সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি।

চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হল। এখন অবশ্য সে-সব ছবি দেখলে হাসি পায়। কিন্তু এই হল রবিকাকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ।'[৫] অবনীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির জন্য মোট ৩৬টি ছবি আঁকেন, তার মধ্যে কয়েকটি অবশ্য নিছক অলঙ্করণ। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে, ১৫ শ্রাবণ ১২৯৯' [শুক্র 29 Jul] তারিখ দিয়ে লেখেন : 'উৎসর্গ।/স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পরম কল্যাণীয়েষু।/তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি/উপহার দিয়াছ আমি তোমাকে আমার কাব্য/এবং স্নেহ আশীর্বাদ দিলাম।/ মঙ্গলাকাঙক্ষী/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' কয়েকদিন পরে তত্ত্ববোধিনী-র ভাদ্র-সংখ্যার দ্বিতীয় মলাটে 'বিজ্ঞাপন' মুদ্রিত হয় : 'চিত্রাঙ্গদা।/নাট্যকাব্য।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/প্রচুর পরিমাণ চিত্রে পরিপূর্ণ।/মূল্য পাঁচ টাকা।/ অতি উৎকৃষ্ট কাগজ, ছবি এবং বাঁধাই, অল্প সংখ্যক মুদ্রিত হইতেছে। দুই এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ হইবে। ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রাপ্তব্য।/শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়'। দ্বি-বর্ণে মুদ্রিত ৪১ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

'চিত্রাঙ্গদা।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক/প্রণীত।/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক/ চিত্রাঙ্কিত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/অপার চিৎপুর রোড ৫৫ নং।/২৮ ভাদ্র, ১২৯৯ সাল ।/মূল্য পাঁচ টাকা।' বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ-অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ 13 Sep 1892 [মঙ্গল ২৯ ভাদ্র]।

সাধনা, ভাদ্র ১২৯৯ [১।৯] :

১৯৩-৯৯ 'হিং টিং ছট্‌।/(স্বপ্নমঙ্গল)' দ্র সোনার তরী ৩।৩১-৩৭

২১০-১৪ 'বাঙ্গালা শব্দ ও ছন্দ' দ্র ছন্দ ২১।৩৮১-৮৩

২১৪-২২ 'ভাসমান।/(য়েরোপযাত্রীর ডায়ারি।) দ্র য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি (১৩৬৭]। ১০৬-১৪

২২৮-৪৫ 'জীবিত ও মৃত' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।১৮১-৯৩

২৫৫-৫৭ 'ঠাকুরঘর' দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৮৪।২১-২২

২৬২-৬৫ 'প্রত্যুত্তর' দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২।৫৪১-৪৩

২৭৯-৮২ 'সাময়িক সারসংগ্রহ।/সার লেপেল গ্রিফিন' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৫৩৫-৩৬

২৮৬-৮৮ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৩০-৩২

২৮৬-৮৭ সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ; ২৮৭-৮৮ সাহিত্য। আষাঢ়

এ-ছাড়া ইন্দিরা দেবী-কৃত 'বর্ষার দিনে' ['এমন দিনে তারে বলা যায়'] কবিতার 'রাগিনী দেশ মল্লার—রূপক' তালে নিবদ্ধ গীতিরূপটির 'স্বরলিপি' [পৃ ২২২-২৭] বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। পাদটীকায় লেখা হয় : '"মানসী'র এই কবিতাটির চতুর্থ শ্লোকটি সুরে বসান হয় নাই। ষষ্ঠ শ্লোকের সুর দ্বিতীয়টিরই অনুরূপ। সেই জন্য স্বতন্ত্র স্বরলিপি দেওয়া হয় নাই।" সাতটি স্তবকের সম্পূর্ণ কবিতাটি অবশ্য এখানে মুদ্রিত হয়েছে।

'বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ৩০ অগ্র° ১২৯৫ [শুক্র 14 Dec 1888] তারিখে জোড়াসাঁকোয়, পরে অনুলিখিত হয় পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ।

'জীবিত ও মৃত' গল্পটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সীতা দেবীকে বলেছিলেন : "ছোটবৌ তখনও বেঁচে। আমার তখনকার দিনে ভোররাত্রিতে উঠে অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি অনেকরকম কবিত্ব ছিল। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে পড়লুম, ভেবেছিলুম আমার সময় হয়েছে, আসলে কিন্তু তখন দুপুর রাত। অন্ধকার বারান্দার ভিতর দিয়ে, দালান পার হয়ে আমি grope করতে করতে চলতে লাগলুম। সব ঘরে দরজা বন্ধ,··· সব একেবারে নীরব, নিঝুম। খানিক দূরে আসতেই আপিস-ঘরে না কোথায় ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। আমি থম্‌কে দাঁড়ালুম, ভাবলুম, তাই তো, এই গভীর রাত্রে আমি সারা বাড়িময় এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ মনে হল আমি যেন প্রেতাত্মা, এ বাড়ি haunt করে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মোটেই আমি নয়, আমি'র রূপ ধরে বেড়াচ্ছি মাত্র। একটা খেয়াল মাথায় এল যে, আচ্ছা, আমি যদি এখন পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে গিয়ে, মশারিটা তুলে, খুব solemn ভাবে প্রশ্ন করি, "তুমি জান আমি কে?" তা হলে কেমন হয়? অবশ্য আমি তা করি নি, করলে খুব একটা scene হত নিশ্চয়। হয়তো রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে সে ভাবতেও পারত, "তাই তো, এ সত্যিই আর কিছু নয় তো?' কিন্তু ideaটা আমাকে পেয়ে বসল, যেন একজন জীবিত মানুষ সত্য সত্যই নিজেকে মৃত বলে মনে করছে।'[১] অনেক দিন পরে মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন।

'ঠাকুরঘর' প্রবন্ধটি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ভান এবং অন্ধ অহঙ্কারের উপর স্বভাবতই দুটো শক্ত কথা বলিতে ইচ্ছা করে।' কিন্তু মুশকিল এই যে, 'এখানে সকলেই সকল কথা গায়ে পাতিয়া লয়।' এর কারণ কি? 'তবে কি আমরা দেশসুদ্ধ লোকই ঠাকুরঘরে বসিয়া কলা খাইতেছি? ···যে নৈবেদ্যটা সম্পূর্ণ স্বদেশের প্রাপ্য তাহার সারভাগ নিজের জন্য সঞ্চয় করিতেছি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অন্তর্গুহাশায়ী জড়ত্বটাকে দুধকলা খাওয়াইতেছি।' রচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মুখর, 'আমাদের ঠাকুর'কে সম্বোধন করে বলেছেন : 'আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; আপনি এমনি পট্টবস্ত্র পরিয়া কেবল পবিত্র হইয়া বসিয়া থাকুন। ম্লেচ্ছদের মত আপনি কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না। মহাপুরুষেরা যে সকল বচন রচনা করিয়া গেছেন আপনি সেইগুলি সুর করিয়া আওড়ান (অর্থ না জানিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই)। যেগুলা সরল হৃদয়ের কথা সেগুলাকে পরম কৌশলে অতি সূক্ষ্ম তর্কের কথা করিয়া তুলুন্ এবং যেগুলা স্বভাবতই তর্কের কথা সেগুলা হইতে যুক্তি নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া সহসা অকারণ হৃদয়াবেগপ্রাচুর্য্যে শ্রোতাদিগকে আর্দ্র বিগলিত বিমুগ্ধ করিয়া দিন। গোপনে কলা খান্ এবং দেশের শ্রাদ্ধ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করুন।' রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গের লক্ষ্য চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

'প্রত্যুত্তর' 'পঁহু' শব্দের বুৎপত্তি-নির্ণয় প্রসঙ্গে 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্মাননীয়েষু'21 Jun 1892 [১৬ আষাঢ়] মধুপুর থেকে লেখা ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর দীর্ঘ খোলা চিঠির [দ্র সাধনা, শ্রাবণ। ২৫৭-৬২] উত্তরে লিখিত। ক্ষীরোদচন্দ্রের চিঠি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'এই লেখাটা ক্ষীরোদবাবু সাহিত্যে পাঠিয়েছিলেন—সাহিত্য সম্পাদক, এটা সাধনাতেই ছাপা উচিত বিবেচনা করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।' রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর শিলাইদহে থাকার সময়েই লেখেন বলে মনে হয়, কারণ তিনি এর এক জায়গায় লিখেছেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে বহি নাই'। সাধনা-র চৈত্র ১২৯৯-সংখ্যায় আবার উভয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হয়।

Sir Lepel Griffin নামে একজন দুঁদে ইংরেজ সিভিলিয়ান June-সংখ্যা *The Fortnightly Review* পত্রিকায় 'The Place of the Bengali in Politics' নামে একটি প্রবন্ধে দুর্বল জাতি হিশেবে রাজ্যতন্ত্রে বাঙালির অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করেন প্রচুর গালিগালাজ সহযোগে। স্বভাবতই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধটির বিরুদ্ধে উচ্চকিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। *The Indian Mirror* পত্রিকার 8 Jul 1892-সংখ্যায় 'Sir Lepel Griffin on the Bengalis' শিরোনামায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়—এই পত্রিকায় [5 Jul] প্রকাশিত সংবাদ এই যে, *The Pioneer*-এর মতো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকাতেও গ্রিফিনের প্রবন্ধ সমালোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'সাময়িক সার-সংগ্রহ' করতে গিয়ে 'সার লেপেল গ্রিফিন' প্রবন্ধে তাঁর ধিক্কার জানালেন তীব্র ভাষায় : 'কুকুর-সম্প্রদায়ের মধ্যে খেকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে। তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোনোপ্রকার গাম্ভীর্য অথবা গৌরব নাই, কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই। সার লেপেল গ্রিফিন জুন মাসের ফর্টনাইট্‌লি রিভিয়ু পত্রে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারি-একটা খেঁই খেঁই আওয়াজ দিতেছে। ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।' গ্রিফিন লিখেছিলেন, বাঙালিদের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া বানরকে দেওয়ারই তুল্য। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'গ্রিফিন যে জন্তুটার উল্লেখ করিয়াছেন সে বেচারার কিচিমিচিপূর্বক মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ-প্রকাশের অন্য উপায় নাই—কিন্তু ভদ্রলোকের হাতে এতপ্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে যে, অশিষ্ট মুখভঙ্গিমা তাহার পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক।' এরপর রবীন্দ্রনাথ সেই ভদ্রোচিত অস্ত্র ব্যবহার করেছেন : 'আমি একটা তত্ত্ব বাঁধিয়াছিলাম যে, ইংরেজ পুরুষের লেখায় যদি-বা কোনো কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে একটা সংযত আত্মমর্যাদা থাকে; কারণ যে লোক সৌভাগ্যবান এবং ক্ষমতাবান তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যেই একটি প্রবল পৌরুষ থাকে। আমাদের মতো যাহারা দুর্ভাগ্য, যাহাদের মুখ ছাড়া আর কিছুই নাই, সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিফিনের লেখা ইংরেজি বড়ো কাগজে বাহির হইয়া থাকে, এবং সেইসঙ্গে আমার প্রিয়তত্ত্বটিকে বিসর্জন দিতে হয়।' রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ সময়বিশেষে কতখানি তীক্ষ্ণ হতে পারে, এই অংশটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় দু'টি সংখ্যার আলোচনা করেন। বলেন্দ্রনাথকে পূর্বোক্ত পত্রে তিনি লিখেছিলেন : 'নব্যভারত এ পর্যন্ত না পাওয়াতে কেবল দুই সংখ্যা সাহিত্যের সমালোচনাই পাঠিয়ে দিলুম'—সেই কারণেই এই সংখ্যায় নব্যভারত-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি। সাহিত্য-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'প্রাইভেট্ টিউটার' গল্প ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের 'বৈদিক সোম' প্রবন্ধ এবং আষাঢ়-সংখ্যায় মুদ্রিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'কাশ্মীরের বর্ত্তমান অবস্থা' ও শ্যামলাল মিত্রের 'সমুদ্রযাত্রা ও জন্মভূমি পত্রিকা' প্রবন্ধ দুটি প্রশংসিত হয়।

ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৯ [১৬/৪] :

২২১-২৫ 'বর্ষা যাপন' দ্র সোনার তরী ৩।২৭-৩১

২৩৫-৩৭ 'সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব'

এ-ছাড়াও 'বর্ষার গান' শিরোনামে বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটির সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয় [পৃ ২০০-০৪]—পাদটীকায় লেখা : 'পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানের সুর-রচয়িতা।'

'সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব' নূতন কোনো প্রবন্ধ নয়, Oct 1889-এ ['১৫ই বোধ হয়'] পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ লিখিত 'সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে notes' রচনাটি এই নামান্তরে মুদ্রিত হয়েছে। রচনাটি এখনও গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

ভাদ্র মাসের প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে আবার দেখা যায় শিলাইদহে, শারদপ্রাতের সৌন্দর্যরসে তাঁর মন পরিপ্লুত। ৩ ভাদ্র বৃহ [18 Aug] একটি চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'চারদিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান এক রকম মিলিত ভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু করে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলছে—আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎ-প্রকৃতির উপর আর এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপরে আর-একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে।'[১]

দু'দিন পরে 20 Aug [শনি ৫ ভাদ্র] তারিখে লেখা চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধের পরিচয় হিশেবে অসামান্য। রোজ সকালে চোখ চেয়ে এক দিকে জল ও অন্যদিকে সূর্যকিরণ-প্লাবিত নদীতীর দেখে তাঁর মনে হয়, যেন তিনি বাস্তবজগতের কাঠিন্য-বিরহিত একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে বাস করছেন : 'ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্‌ক্রুশো পৌলভর্জিনি প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত—এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারী জেগে ওঠে। এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নে—এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান—এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে। আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধী উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে। পড়ে—আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্ করে কাঁপছে।'[২] এর পর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আন্তরিক আত্মীয়-বৎসলতার ভাব আছে ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে, কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না—কী একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে। সেই জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্তি হয় না।' এইজন্যই হয়তো তিনি এই ভাবটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন দীর্ঘকাল পরে ২৬ কার্ত্তিক ১৩০০ [11 Nov 1893] তারিখে 'বসুন্ধরা' [দ্র সোনার তরী ৩।১৩১-৪১] কবিতায়। উপরের চিঠি ও কবিতাটির কিয়দংশের সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে, মনে হয় চিঠিটি সামনে রেখে কবিতাটি লেখা হয়েছিল।

সাধনা-র ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশিত হয় ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি, মলাটে মুদ্রিত তারিখ '১৫ই ভাদ্র'। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা এইগুলি :

২৮৯-৩০৪ 'স্বর্ণমৃগ' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।১৯৪-২০৫

৩০৪-০৮ 'পরশ-পাথর' দ্র সোনার তরী ৩।৩৭-৪০

৩১৭-৩১ 'জাহাজের কাহিনী।'/(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।) দ্র য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ১১৪-২৮

৩৪৪-৪৫ 'মানবপ্রকাশ' দ্র সাহিত্য ৮।৪৮১-৮৮ [পত্রালাপ : ৪]

৪৩৬-৪২ 'রীতিমত নভেল' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।২০৫-০৯

৪৪২-৪৬ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৩২-৩৫

এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দু'টি গানের ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয়। একটি মায়ার খেলা-র 'দেলো, সখি, দে, পরাইয়ে গলে' [পৃ ৩৫৫-৫৭] ও অন্যটি ভৈরবী-একতালা সুর-তালে নিবদ্ধ 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়' [পৃ ৩৫৮-৬১]। শেষ গানটির পাদটীকায় লিখিত হয় : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত গান।'

'পরশ-পাথর' কবিতাটির সঙ্গে 'একরাত্রি' গল্পের ভাবসাদৃশ্যের কথা আমরা আগে বলেছি, 'স্বর্ণমৃগ' গল্পের মধ্যেও একই ভাবের লক্ষণ আছে। গল্পটি অবশ্য অনেক আগে লেখা, সাধনার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার [১৫ অগ্র° ১২৯৮] আগে বলেন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'এবারকার গল্পটা মস্ত হয়েছে—তার নাম 'স্বর্ণমৃগ' কিংবা 'মরীচিকা' দেওয়া যেতে পারে'—এর থেকে আমরা গল্পটির রচনাকাল অগ্র° ১২৯৮-এর প্রথম সপ্তাহ ব'লে অনুমান করতে পারি।

বর্তমান সংখ্যাটি যুগ্ম-সংখ্যা বলে আর-একটি গল্প 'রীতিমতো নভেল' এতে মুদ্রিত হয়। গল্পটি একটি লঘুস্বাদের রচনা—সমকালীন গল্পকারদের বিষয়বস্তু ও রচনারীতিকে বিদ্রূপ করে লিখিত। 'পাঠক বলিতে পার, কে ওই দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশজন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল?···বলিতে পার, সেদিনকার আর্যস্থানের সূর্যদেব সহস্ররক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারিকে আশীর্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন? বলিতে পার কি পাঠক।' পাঠককে সম্বোধন করে প্রশ্নাত্মক বাক্যের সাহায্যে গল্প বলার এই রীতি তখন বহুব্যবহারে জীর্ণ-রবীন্দ্রনাথ গল্পটিতে ব্যঙ্গ করেছেন এই রীতিতে। গল্পের কাহিনীর মধ্যেও মেরুদণ্ডহীন রোমান্সের প্রতি কটাক্ষ রয়েছে।

লোকেন্দ্রনাথ পালিতের পত্র শ্রাবণ-সংখ্যায় [পৃ ২৫২-৫৫] 'সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ' নামে মুদ্রিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের 'মানবপ্রকাশ' তারই প্রত্যুত্তর। তিনি আগাগোড়া যে বক্তব্যটির উপর জোর দিতে চাইছিলেন, এখানেও সেই কথাটিকেই বলেছেন : 'নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হোক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর-সমস্ত উপলক্ষ্য।' পত্র-প্রবন্ধের শেষটুকু ব্যক্তিগত : 'কিন্তু তুমি শুনছি কলকাতায় আসছ; আমিও সেখানে যাচ্ছি। তা হলে তর্কটা মোকাবিলায় নিষ্পত্তি হবার সম্ভাবনা দেখছি।' সম্ভবত মোকাবিলাতেই তর্কটির নিষ্পত্তি হয়েছিল, কারণ পত্রালাপের আর কোনো কিস্তি সাধনা-য় মুদ্রিত হয় নি।

এবারের 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ নব্যভারত-এর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এবং সাহিত্য-এর শ্রাবণ সংখ্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। সাধনা-য় এই জাতীয় সমালোচনা আর মুদ্রিত হয়নি। এর কারণ

খানিকটা প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য-তে 'সমালোচক'-প্রণীত 'আদর্শ সমালোচনা' [পৃ ২৪০-৪২] প্রবন্ধের আলোচনায় : 'বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব "আদর্শ-সমালোচনা"-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সে জন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হই নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের নিপুণতার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারি যে, তিনি যদি রসিকতা প্রকাশের নিস্ফল চেষ্টা না করিয়া অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ত হয় ত কৃতকার্য্য হইতেও পারেন।' রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাঘাত করেছেন বটে, কিন্তু এই সমালোচনার ফলেই তিনি আপাতত 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় বিরত হন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি যাঁদের শত্রুতে পরিণত করেছেন, তাঁরা তাঁকে রেহাই দেন নি।

সাহিত্য-এর আর-একটি রচনা 'উপাধি উৎপাত' [বার্ষিক সূচীতে লেখকের নাম নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; পৃ ২১২-১৯] নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে গবর্মেন্ট সামান্য রায়বাহাদুর উপাধি দিয়ে ও বঙ্কিমচন্দ্র সেই উপাধি গ্রহণ করে উপযুক্ত কাজ করেন নি, এই বলে লেখক ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে লেখেন : 'যাঁহাদের আত্মসম্মান আপনাতেই পর্য্যাপ্ত, যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মত মানী লোক জগতে সর্ব্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু সাধারণতঃ যাঁহারা রাজোপাধি লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা কি এতই তীব্র আক্রমণের যোগ্য! তাঁহাদের মধ্যে কি দেশের অনেক যথার্থ সারবান যোগ্য লোক নাই?···বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেন্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই—তিনি গবর্মেন্টের পুরাতন কর্ম্মচারী—তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেন্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত 'সম্মানচিহ্ণ [যদ্দৃষ্টং] দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা বৃথা।'

এই সংখ্যায় চন্দ্রনাথ বসুর 'আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব' [পৃ ২৫১-৫৬] মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি সম্পর্কে লেখেন : '···আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি।' শেষে লেখেন : 'দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশঃ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।' লয়-সংক্রান্ত আলোচনা উক্ত 'নব্য লয়তত্ত্ব' প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গেই শেষ হয়েছিল বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অব্যবহিত পরেই চন্দ্রনাথ বসুর 'কড়াক্রান্তি' প্রবন্ধ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করেন।

মধুসূদনের প্রথম জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু 'মেঘনাদবধ চিত্র' নামে নব্যভারত পত্রিকায় ধারাবাহিক আলোচনা করতে থাকেন। এই আলোচনা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার

প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।'

সাহিত্য-এর ভাদ্র সংখ্যায় চন্দ্রনাথ বসুর 'আমার "স্বরচিত"লয়তত্ত্ব'-এর রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রত্যুত্তর 'নব্য লয়তত্ত্ব' [পৃ ২৯৭-৩০০] মুদ্রিত হয়। তিনি লিখেছেন : 'বিষয়টা গুরুতর, অতএব এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু উত্তরোত্তর আমাদের প্রতি রাগ করিতেছেন, ইহাতেই আমরা কিছু চিন্তিত হইয়াছি। চন্দ্রনাথ বাবুর যে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে, তাঁহার মতের সহিত যখন আমাদের বিরোধ, তখন অবশ্যই আমরা হিন্দুমতদ্বেষী, এ কথাটা কিছু গুরুতর। তিনি নানা ছলে আমাদিগকে সেইরূপ ভাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া জন্মিলেই যে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত কোন মতভেদ হইবে না, এমন কথা কি করিয়া বলিব।' এরপর তিনি রামপ্রসাদ ও শ্রীচৈতন্যের লয়বিরোধী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দুশাস্ত্রে লয়তত্ত্ব আছে, কিন্তু চন্দ্রনাথ যে লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন সেটি শাস্ত্রানুমোদিত নয়—এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করে বিস্তৃত আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'চন্দ্রনাথ বাবু যাহাকে "বিরাট লয়" বলেন, তাহা লয় নহে, আত্মসম্প্রসারণ, অর্থাৎ লয়ের ঠিক বিপরীত। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, প্রকৃতপক্ষে সগুণ এবং এই জগৎ তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার লীলা। অসৎ জগৎ প্রকৃত পক্ষে অসৎ নহে, বরং বহু সাধনার চরম জ্ঞান লাভ করিলে একটা বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ লয়তত্ত্ব যে আমাদের মতের বিরুদ্ধ নহে, তাহা আমাদের প্রতিবাদ পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।' অতএব চন্দ্রনাথবাবু 'লয়' শব্দ ব্যবহার না করে যদি 'আত্মসম্প্রসারণ' শব্দ ব্যবহার করেন, তবে 'সাধনার সমালোচক এবং সাহিত্যের পাঠকগণকে কোনরূপ বিভ্রাটে ফেলা হইবে না।'

সাময়িকতা-দুষ্ট ব'লে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এইজাতীয় রচনাগুলি কোনো গ্রন্থভুক্ত করেননি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্র-রচনাবলীর-সম্পাদকেরাও এই প্রবন্ধগুলিকে কোনো গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্থান দেন নি! ইতিহাসের সূত্র রক্ষা করা ছাড়াও, বিভিন্ন মতের সংঘর্ষে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও রচনাপ্রণালী কিভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছিল তার দৃষ্টান্ত হিশেবে এই রচনাগুলি মূল্যবান। তাছাড়া পৃথিবীর সৌন্দর্যমুগ্ধ একজন কবি আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে কেমন করে নিজের রসদৃষ্টির অনুকূল করে নিয়ে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন সেই পরিচয়টিও উপেক্ষনীয় নয়।

তত্ত্ববোধিনীর ভাদ্র সংখ্যায় [পৃ ১০২] রবীন্দ্রনাথের 'শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর' ব্রহ্মসংগীতটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয় [দ্র গীতবিতান ১।১৭৫-৭৬; স্বর ৪৫]। ভারতী ও বালক-এর ভাদ্র-সংখ্যায় 'মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত' 'বিবাহ উৎসব' গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্যের সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে অন্যান্য গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নাচ শ্যামা তালে তালে' গানটি [দ্র গীতবিতান ৩। ৭৭০; স্বর ৫১] মুদ্রিত হয়, কিন্তু গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয় পত্রিকাটির কার্ত্তিক-সংখ্যায় [পৃ ৩৯৫-৯৭]।

ভাদ্র মাসের গোড়ায় শিলাইদহ থেকে কলকাতা ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথের গতিবিধি অস্পষ্ট। এই সময়কার একটি হিসাব কিছুটা তাৎপর্যবহ। মহর্ষির নিজস্ব ক্যাশবহির ১৭ ভাদ্র [বৃহ 1 sep] তারিখের একটি হিসাবে আছে : 'ব০বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উঁহার বাটীতে থিয়টার হওয়ায় সাহায্য: ···২০০্'। কোন্ নাটক অভিনীত হয়েছিল, কারা অভিনয় করেছিলেন ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান হিসাবটি থেকে পাওয়া যায় না, বিভিন্ন স্মৃতিকথা থেকেও এই অভিনয়ের হদিশ করা শক্ত। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'

গ্রন্থে একটি ড্রামাটিক ক্লাবের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু ক্লাবটি প্রতিষ্ঠার কোনো সময় নির্দেশ করেন নি। আমাদের অনুমান, উক্ত হিসাবটি এই ড্রামাটিক ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত—সম্ভবত যার বিধিবদ্ধ নাম ছিল 'গার্হস্থ্য নাট্যসমিতি'। রবীন্দ্রভবনে চারটি রুল টানা পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি পাণ্ডুলিপি আছে [Ms. 228]। পেনসিলে লেখা, অনেক কাটাকুটিযুক্ত এই পাণ্ডুলিপিটি হ'ল উক্ত গার্হস্থ্য নাট্যসমিতির নিয়মাবলীর খসড়া। খুঁটিনাটি অনেক নিয়মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

'প্রথম প্রস্তাব লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়—

নামকরণ—গার্হস্থ্যনাট্যসমিতি।—

দ্বিতীয়।—অভিনেতৃসভ্য দশজন—

তৃতীয়।—কমিটি পঞ্চ। সভাপতি ও কার্য্যাধ্যক্ষসমেত। তিন জনে ক্বোরাম। তন্মধ্যে প্রেসিডেন্ট অথবা সেক্রেটারির উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

চতুর্থ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি।/গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্য্যাধ্যক্ষ।/ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়/ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর— /প্রমথনাথ চৌধুরী।

পঞ্চম। অভিনেতৃসভ্যদিগকে মাসিক ৫ টাকা চাঁদা দিতে হইবে। অপর সাধারণদিগকে মাসিক দুই টাকা।

ষষ্ঠ। এককালীন একশত টাকা দান করিলে মুরুব্বি সভ্য হইতে পারিবেন।···

অষ্টম। অভিনয়ের পূর্ব্বে কমিটি একজন ষ্টেজম্যানেজ'র নির্ব্বাচন করিবেন। উক্ত ষ্টেজ্ ম্যানেজা'র্ অভিনয়ের অংশ নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। কোন অভিনেতৃসভ্যের আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

নবম। মাসের প্রথম রবিবারে কমিটির অধিবেশন হইবে।

একাদশ। কার্য্যাধ্যক্ষ কোষাধ্যক্ষের কাজ করিবেন।

দ্বাদশ। কার্য্যাধ্যক্ষের ভবনে সভার অধিবেশন।' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'গোড়ায় গলদ' নাটক-রচনা নিয়ে ব্যস্ত। নাটকটি কি এই ড্রামাটিক ক্লাব অর্থাৎ গার্হস্থ্য নাট্যসমিতিতে অভিনয়ের জন্য রচিত ও অভিনীত হয়েছিল? দুঃখের বিষয়, অবনীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী বা সরলা দেবী এ-সম্পর্কে কোনো সংবাদ তাঁদের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন নি।

ভারতী ও বালক-এর আশ্বিন-সংখ্যায় [১৬ ৬] রবীন্দ্রনাথের দু'টি রচনা মুদ্রিত হয় :

৩১০-১১ 'নিষ্ফল চেষ্টা'

৩১১-১৩ ''সফলতার দৃষ্টান্ত'

হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গের হুল-ফোটানো এই গদ্যরচনা দু'টি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। সমকালীন বাংলা গল্প ও গদ্যরচনারীতি নিয়ে ব্যঙ্গরচনা রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে অনেকগুলি লিখেছিলেন, সাধনা-র ভাদ্র-আশ্বিন-সংখ্যায় মুদ্রিত 'রীতিমতো নভেল' গল্পটিতে তার নমুনা দেখেছি আমরা। বর্তমান রচনা-দু'টিও তারই নিদর্শন। অবশ্য এদের 'দুটি' রচনা বলা ঠিক নয়, একটি বক্তব্যই দুটি ভাগে বিভক্ত করে বলা হয়েছে। 'নিষ্ফল চেষ্টা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'অনেকগুলি বাংলা পদ্য, বিশেষতঃ গদ্যপ্রবন্ধ পড়িয়া, আমার সর্ব্বদাই কি-যেন কে-যেন কখন-যেন কেমন-যেন কি-যেন-কি ময় হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।/কিন্তু কোনরূপ সুযোগ পাইয়া উঠি না।···

'দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই নীরব কবি। সকলেরই প্রায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেছে, অশ্রুজল শুকাইয়া গেছে, আশা ফুরাইয়া গেছে, কেবল স্মৃতি আছে। সুতরাং তাঁহাদের কাছে আমার মনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।/ হৃদয় আছে অথচ প্রাণপণ চেষ্টাতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না এ কথা আমি কেমন করিয়া স্বীকার করি!'

'সফলতার দৃষ্টান্ত' এই ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির সাফল্যের কাহিনী : '···কিছু দিন হইতে প্রত্যহ সকালে আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়? ···

'রোজ মনে করি আজ দেখিব—এই নীরব হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস আমার ডেস্কের উপর কে রাখিয়া যায় আজ তাহাকে ধরিব, আমার অন্তরে অন্তরে যে ব্যথা হাহাকার করিতেছে আজ তাহাকে বলিব এবং মরিব।···

'দেখিলাম আমার বাগানের মালী তোড়া হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছে।···

'···আমি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।···হরি হরি, সেই অবধি আমার এ কি হইল। কি যেন আমাকে কি করিল! কে যেন আমাকে কি বলিয়া গেল! কোথায় যেন আমার কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল! কখন যেন তাহাকে হারাইয়াছি।···জগতের লোকে সকলে জানে যে, আমার জগা মালী আমাকে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া দেয়, কেবল আমার অন্তর জানে, আমাকে কে যেন গোপনে তোড়া পাঠাইয়া দেয়।' ভগ্নহৃদয়-সন্ধ্যাসংগীতের ভাবলোক থেকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সরে এসেছেন, ভাবলে অবাক হতে হয়!

আশ্বিন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১২২] রবীন্দ্রনাথের 'এ মোহ আবরণ খুলে দাও' গানটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয় [দ্র গীতবিতান ১।১৭২; স্বর ৮]।

আমাদের অনুমান, ভাদ্র-আশ্বিন দু'টি মাস রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতে ছিলেন। ড্রামাটিক ক্লাব বা গার্হস্থ্য নাট্যসমিতির উদ্যোগে কোনো অভিনয় হয়ে থাকলে তো তাঁর উপস্থিতি অবিসংবাদিত হয়ে ওঠে। সত্যপ্রসাদের হিসাব-খাতাতে ২৯ ভাদ্রের [13 Sep] হিসাব : 'রবিমামাকে হাওলাত দেওয়া যায় ২০০ '—অন্তত এই সময়ে তাঁর কলকাতায় উপস্থিতির প্রমাণ। সোনার তরী-চিত্রার পাণ্ডুলিপি [Ms. 129] থেকে জানা যায়, আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি কলকাতায় ছিলেন। এই সময়ে তিনি দু'টি গান রচনা করেন :

১. [P. 63] 'মিশ্র কানাড়া/আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলিবে, ওগো/বির্জ্জিতলাও। কলিকাতা/আশ্বিন' দ্র ভারতী ও বালক, পৌষ। ৫৩৬-৩৭; গীতবিতান ২।২৮২; স্বর ১০।

২. [P. 64-65] 'ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধরে!/৫০ পার্ক স্ট্রীট। ২২ আশ্বিন' দ্র ভারতী ও বালক, কার্ত্তিক। ৪২১-২২; গীতবিতান ১।২৬৬-৬৭; স্বর ৫১।

কার্তিক মাসের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত গাজিপুরে যান। কবি-ভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেনকে তিনি এক খণ্ড 'চিত্রাঙ্গদা' পাঠিয়েছিলেন। সেটি পড়ে 23 Oct রবিবার [৮ কার্ত্তিক] জৌনপুর থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি আর "চিত্রাঙ্গদা" পাইয়াছি ও তিন বার পাঠ করিয়াছি। ইহার সুখ্যাতি করিয়া ইহার গৌরব ও মর্য্যাদা হ্রাস করিতে মন সরিতেছে না।' এই তারিখে চিঠিটি লিখলেও তিনি সেটি প্রেরণ করেন 22 Jan 1893 [১০ মাঘ], কৈফিয়ৎ-স্বরূপ পরিশিষ্টে লিখেছেন : 'জ্বর গায়ে লিখিতে

বসিয়াছিলাম, অত্যন্ত পীড়া হয়, রক্ষা পাইবার বড় একটা আশা ছিল না, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। লেফাফার শিরনামাটাও আগে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—তখন আপনি গাজিপুরে। আজ 6 Dwaraka N. Tagore লিখিলাম।'[১] এই পত্রাংশ থেকে রবীন্দ্রনাথের উক্ত সময়ে গাজিপুরে যাওয়া অনুমিত হয়েছে।

কয়েক দিনের মধ্যে অবশ্য তিনি গাজিপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন ১৪ কার্ত্তিক [শনি 29 Oct] জোড়াসাঁকোয় লেখেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'যেতে নাহি দিব' [দ্র সাধনা, অগ্র°। ২৫-৩২; সোনার তরী ৩। ৪৯-৫৫]। ড সুকুমার সেন কবিতাটিকে 'ভারতীয় সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম মহাকাব্য'[২] বলে উল্লেখ করেছেন। মজুমদার-পুঁথিতে কবিতাটির পাণ্ডুলিপি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। প্রবহমান পয়ারে লেখা ১৭৩ ছত্রের দীর্ঘ কবিতাটি যেন প্রায়-সম্পূর্ণ আকার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে আবির্ভূত হয়েছিল, ইতস্তত কিছু কাটাকুটি ছাড়া সমগ্র কবিতাটি অব্যাহত গতিতে লিখিত। জোড়াসাঁকো সদর কাছারির মুনশির পাকা হাতে লেখা 'জমিদারির সদর খাজনার হিসাব', বিরাহিমপুরের ২৮ জুনের সদর খাজনা' প্রভৃতির বিবরণ স্থূল উপলখণ্ডের মতো মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপিতে এসে পড়েছে বটে, কিন্তু কবিতাটি সেগুলিকে অতিক্রম করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে পার্বত্য স্রোতস্বিনীর মতো।

কবিতাটির প্রথমাংশ তো রবীন্দ্রজীবনের বাস্তব বর্ণনা। জমিদারির দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁকে বারবারই জোড়াসাঁকোর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত সংসার ছেড়ে দূর মফস্বলে যাত্রা করতে হয়েছে। জমিদারবাবুর এই রাজ্য-পরিদর্শনে যাত্রার আয়োজনটি নিতান্ত সামান্য ছিল না। এ-সংক্রান্ত একটি হিসাব উদ্ধৃত করি : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বিরাহিমপুর গমনের ব্যায়/কামিনী চাউল, কাঁচামুগের ডাল, বাদাম, কিস্‌মিস্, কলা, কমলালেবু, পেয়ারা, আপেল, ওটমিল, কোয়েকার ওট, সেনিটেরিয়ান টোস্ট, গ্লয়, ভ্যাপালিন, মলিন সোপ, হ্যাজালিন ক্রীম, টুথপাউডার ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের কুষ্টিয়া যাইবার ১ম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় বিপিন চাকরের ৩য় শ্রেণীর উক্ত স্থান যাইবার টিকীট ও গাড়ি ও মুটে ভাড়া ইত্যাদি ব্যয়···৪৭।/ ৯'। হিসাবটি অনেক পরবর্তী কালের—২১ অগ্র° ১৩১৪ [7 Dec 1907] তারিখের—মৃণালিনী দেবী তখন বেঁচে ছিলেন না, সুতরাং তাঁর জীবৎকালে আয়োজনটি আরও কত খুঁটিনাটিতে পূর্ণ হত তা সহজেই অনুমান করা যায়। তারই একটি সুন্দর চিত্র আছে কবিতাটিতে :

'কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে?
সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান;
ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল;
আমসত্ত্ব আমচুর; সের দুই দুধ—
এই-সব শিশি কৌটা ওষুধবিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,

মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।'

পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই তালিকার মধ্যে স্ত্রীর স্বহস্ত-রচিত 'দুটি কুমড়ার বড়ি'র স্থান সংকুলান ক'রে দেবার অন্তত দু'বার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু 'গুড়ের পাটালি' ও 'কিছু ঝুনা নারিকেলে'-এর দৌরাত্ম্যে তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয় নি!

এর পরের বর্ণনার বাস্তবতা অবশ্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না—

তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে, কহিলাম ধীরে
'তবে আসি'। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

'কন্যা মোর চারি বছরের' - যে বর্ণনা, সন্দেহ নেই, তার লক্ষ্য জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা—যদিও তাঁর বয়স তখন ছয় বৎসর, যাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন : 'বেলিটা বড়ো হলে খুব স্নেহময়ী সরলস্বভাব লক্ষ্মী মেয়ে হবে' :

কহিনু যখন
'মাগো, আসি' সে কহিল বিষণ্ণ-নয়ন
ম্লানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল—'যেতে আমি দিব না তোমায়'।

উল্লেখ্য, শেষ চারটি ছত্র পাণ্ডুলিপিতে নেই, প্রুফে বা অন্যত্র সংযোজিত হয়েছে—কিন্তু কী আশ্চর্য সংযোজন!

কার্ত্তিক-সংখ্যা সাহিত্য-তে রবীন্দ্রনাথের 'একটি পত্র [পৃ ৪৩০-৩৩] মুদ্রিত হয় [দ্র নন্দরানী চৌধুরী, সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ। সাহিত্য (১৩৭৭)। ১৩২-৩৫]। 'সহৃদয়েষু' সম্বোধন ক'রে পত্রের আকারে লিখিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রবন্ধ—কাব্য-সমালোচনার রীতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত। রচনার শুরুতে তিনি লিখছেন : 'অল্প দিন হইল, আমি কোন কাব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ কোন কাগজে বাহির করিয়াছিলাম। সেটা পড়িয়া আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার মতে এরূপ লেখাকে রীতিমত সমালোচনা বলা যায় না।'—আমাদের অনুমান, এটি নিছক ভঙ্গী মাত্র। 'অল্পদিন'-এর মধ্যে কোনো কাগজে রবীন্দ্রনাথ কোনো কাব্যের সমালোচনা করেন নি, সুতরাং এ-সম্পর্কে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে পত্র-বিনিময়ের কোনো সুযোগ থাকার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'কাব্যসমালোচনা ব্যক্তিগত।···বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আমি যে কোন তত্ত্বকথা লিখি, তাহা কালক্রমে মিথ্যা হইবার কোন আটক নাই, কিন্তু আমার কেমন লাগিল, তাহা কোন কালে মিথ্যা হইবার যে নাই। আমি যদি এমন করিয়া লিখিতে

পারি, যাহাতে আমার ভাল মন্দ লাগা অধিকাংশ যোগ্য লোকের মনে সঞ্চার করিয়া দিতে পারি, তবে সেটা একটা স্থায়ী সাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়'। এইভাবেই 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অনেকগুলি সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্গত।

ভারতী ও বালক-এর কার্ত্তিক-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন' গানটি [দ্র গীত ১। ২৬৬-৬৭] ক্ষ্যাপার প্রতি।/(বাউলের সুর)' শিরোনামায় মুদ্রিত হয় [পৃ ৪২১-২২]। গানটির সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি পত্রিকাটির অগ্র°-সংখ্যায় [পৃ ৪৬৫-৬৮] ছাপা হয়েছিল [দ্র স্বর ৫১]; টীকা হিশেবে লেখা হয়; কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে "ক্ষ্যাপার প্রতি" শীর্ষক যে গান প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার স্বরলিপি প্রদত্ত হইল। তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের অন্তরায় একইরূপ সুর এবং চতুর্থ শ্লোকের সুর, তৃতীয় শ্লোকের অনুরূপ, সেই জন্য উহাদের পৃথক স্বরলিপি করা হয় নাই।' আগেই বলা হয়েছে, 'বিবাহ উৎসব' গীতিনাট্যের অন্তর্গত 'নাচ্ শ্যামা তালে তালে' গানটির সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল [পৃ ৩৯৫-৯৭; দ্র স্বর ৫১]।

সাধনা-র কার্ত্তিক-সংখ্যায় পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ সম্পূর্ণ হল। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা লক্ষণীয়ভাবে কম :

৪৪৯-৬২ 'জয় পরাজয়' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।২১০-১৯

৪৬৬-৭৩ 'যাত্রা-সমাপন।/(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।) দ্র য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ১২৮-৩৪

৪৭৩-৭৭ "স্বরবর্ণ 'এ'" দ্র শব্দতত্ত্ব ১২।।৩৪৫-৪৭

এছাড়া 'মায়ার খেলা হইতে' 'সখি, বহে গেল বেলা' গানটির ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি [মিশ্র ভূপালী-ছন্দ একতালা; দ্র স্বর ৪৮] এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয় [পৃ ৪৯২-৯৫]।

আচার্য প্রমথনাথ বিশী 'জয় পরাজয়' গল্পটির সঙ্গে 'মানসসুন্দরী' [৪ পৌষ] কবিতাটির ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।[১] আমরা সে তুলনায় 'পুরস্কার' [১৩ শ্রাবণ ১৩০০] কবিতাটির সঙ্গে গল্পটির অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। কোনো-কোনো অংশে 'বৈষ্ণবকবিতা' কবিতাটির মর্মবস্তুরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রূপকথার আবহটি দেখে সন্দেহ হয়, গল্পটি জ্যৈষ্ঠ মাসে শান্তিনিকেতনে বসে লেখা। 'The Victorious in Defeat' নামে গল্পটির যদুনাথ সরকার-কৃত ইংরেজি অনুবাদ *The Modern Review* পত্রিকার Dec 1911 [PP. 560-65]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। 'The victory' নামে রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ *Hungry stones and Other Stories [1916]* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

'যাত্রা-সমাপন'-এর সঙ্গে সাধনায় য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র প্রকাশ সমাপ্ত হল। পরের বছর ৮ আশ্বিন ১৩০০' 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি/দ্বিতীয় খণ্ড' নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

সাধনা-র আষাঢ়-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'এ' স্বরবর্ণের উচ্চারণবিধি নিয়ে আলোচনা করবেন—বর্তমান সংখ্যায় প্রতিশ্রুতিটি পালিত হল।

অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় উত্তরবঙ্গে। আশ্বিন মাসের প্রথমে ময়মনসিংহের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর লোকেন্দ্রনাথ পালিত রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর J.C. Price ছুটিতে যাওয়ায় তাঁর স্থানে নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ এবার সেখানে যান প্রধানত তাঁরই আহ্বানে। এই সময়েই ইন্দিরা

দেবীর সঙ্গে মৃণালিনী দেবী তিন পুত্র কন্যাকে নিয়ে সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ 18 Nov [শুক্র ৪ অগ্র°] রামপুর বোয়ালিয়া থেকে সেই যাত্রাপথের কথা স্মরণ করে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'যদি জব্বলপুর লাইন দিয়ে যেতিস তা হলে আমি বেশ কল্পনা করতে পারতুম এতক্ষণ তোরা কিরকম দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিস। এই সময়টা সকাল বেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপরে সূর্যোদয় হয়। তোদের নাগপুর লাইনেও বোধ হয় সেই রকম হওয়ার সম্ভব।···আজ সকালবেলা উঠে অবধি আমি মনে মনে তোদের গাড়ির জানলার পাশে বসে তোদের সঙ্গে রেলের দুই পার্শ্বের রৌদ্রোজ্জ্বল চিত্রগুলি দেখে যাবার চেষ্টা করছি।'[১] স্নেহকাতর পারিবারিক মানুষটি যেন এইভাবেই প্রিয়জনদের সঙ্গ লাভ করবার চেষ্টা করে চলেছেন!

এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী; তিনি লিখেছেন : 'আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজশাহী যাই। লোকেন পালিত তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সম্ভবতঃ দিন পনেরো আমরা দু'জনে তাঁর অতিথি হয়ে থাকি'।[২] এর কিছুদিন আগে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় [1868-1926] ও রাজশাহীর উকিল ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় [1861-1930]-র সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় হয়েছিল। তাঁরই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের পরিচয় হয়, জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে তো সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণতিলাভ করেছিল। প্রমথনাথ লিখেছেন : 'আমরা রাজশাহী যাবার অব্যবহিত পরে মহারাজা সেখানে এসে উপস্থিত হন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা অক্ষয় মৈত্র এবং তিনি লোকেন পালিতের বাড়ীতে আসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্পসল্প করতে।···ভূভারতে এমন জিনিস নেই, যা নিয়ে আমরা আলোচনা না করতুম। সে আলোচনায় মহারাজাও যোগ দিতেন।···আমাদের এই সান্ধ্যসম্মিলনে লোকেন আর আমি ঘোর তর্ক করতুম। তার কারণ, লোকেনের সঙ্গে আমার কি সাহিত্য, কি আর্ট, কি ফিলজফি,—কোনো বিষয়েই মতের মিল ছিল না। লোকেন মধ্যে মধ্যে Mill's Examination of Hamilton আমাদের পড়ে শোনাতে চেষ্টা করত;—যা আমার অসহ্য বোধ হত, এবং রবীন্দ্রনাথেরও তাই।···রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে কোনরূপ লেখাপড়া করতেন না। কিন্তু মনে মনে একখানি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করতেন। সে বইয়ের নাম পঞ্চভূতের ডায়ারি; যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং আমাদের তর্কের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। লোকেনের সঙ্গে তর্কে আমার মতামতের অনুকূল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং মহারাজ।'[৩] লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর তর্কের কিছু পরিচয় আছে পারিবারিক স্মৃতিলিপি-পুস্তকের অন্তর্গত, 'Dialogue'-শীর্ষক রচনায়। [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ২৪-২৬]। পঞ্চভূতের ডায়ারি'র 'ভূমিকা' প্রকাশিত হয় সাধনার মাঘ-সংখ্যায় [পৃ ১৯৮-২১৬]।

রামপুর-বোয়ালিয়াতে থাকার সময়ে ১২ অগ্র° [শনি 26 Nov] রবীন্দ্রনাথ 'রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে'র[৪] উদ্যোগে রাজশাহী কলেজে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হের-ফের' [দ্র সাধনা, পৌষ। ৯৩-১১২; শিক্ষা ১২। ২৭৭-৮৯] পাঠ করেন। নাটোরের মহারাজা ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। সম্ভবত তাঁরই অনুরোধে সেখানে পাঠ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেন।

The Indian Daily News[৫] পত্রিকার 2 Dec [শুক্র ১৮ অগ্র°] সংখ্যায় 'A LECTURE ON EDUCATION' শিরোনামায় নিজস্ব সংবাদদাতা-প্রেরিত এক কলম-ব্যাপী এক প্রতিবেদনে বক্তৃতানুষ্ঠানের

বিবরণ মুদ্রিত হয়: 'On Saturday evening a lecture was delivered at the Rajshai College by Mr. Robindro Nath Tagore, on the subject of Education, when the Maharaja of Nattore was in the chair. Mr. Tagore is a very distinguished member of the celebrated Tagore family of Calcutta. He is also one of the greatest Bengali poets in the province, being considered by some the Shelly, by others, the Tennyson of Bengal. His lecture was in Bengali. It was delivered with great eloquence and attracted an enormous audience.'

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করার পর প্রতিবেদক লিখেছেন : 'After the lecture a discussion was begun, in which the Collector [Lokendra Palit], the Principal of the College Mr. Ahmed, Professor Kumudini Kanta Banerjea, Professor Syed Abdul Salek, Mr. [Akshay Kumar] Maitra, and Mr. [Pramatha Choudhuri] took part.' এঁরা সকলেই বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাশ করার পদ্ধতির নিন্দা করেন।' After some further discussion, Mr. Tagore got an opportunity of replying to his critics, and the Maharaja of Natore delivered an exceedingly sensible closing speech, which showed the folly of teaching young Bengali boys through the medium of English, which they did not understood.'

সভার শেষে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আমেদ ছাত্রদের নীতিশিক্ষার আবশ্যকতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানান যে, তিনি এই বিষয় নিয়ে একটি বই লিখছেন। সম্ভবত এই বইটিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ সাধনা-র মাঘ-সংখ্যার 'প্রসঙ্গ-কথাটি রচনা করেন। এ-সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

বাংলা দেশে শিক্ষার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা অনেক দিনের—বিভিন্ন রচনায় প্রসঙ্গক্রমে এ-বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও করেছেন, যথাস্থানে আমরা সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু শিক্ষা-বিষয়ে এইটিই তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। সেই যুগে কলেজী শিক্ষায় তো বটেই, স্কুলের পাঠ্যসূচীতেও ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজি। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষা-শিক্ষার বিরোধিতা করেন নি—কিন্তু তিনি বলতে চাইলেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাই শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু কথাটি তাঁকে একটু ঘুরিয়ে বলতে হল, একটি ঐতিহাসিক কারণে।

11 Jul 1891 [শনি ২৮ আষাঢ় ১২৯৮] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় [1864-1924, পরে স্যার] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত। প্রস্তাবের সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, Rev. K.S. Macdonald ও মহেন্দ্রনাথ রায় ভাষণ দেন। রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, নবাব আবদুল লতিফ, Colonel Jarret, মৌলবী সিরাজ-উল-ইসলাম ও রজনীনাথ রায় বলেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। ডি. পি. আই sir Alfred Croft ও তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহানুভূতি সত্ত্বেও ১১-১৭ ভোটে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।[১] *The Bengalee* পত্রিকার এই দিনের সম্পাদকীয়তে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন।

ইংরেজ-শিক্ষিত বাঙালির অংশবিশেষের এই মনোভাব রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। সুতরাং মাতৃভাষার মাধ্যমে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার কথা বললে প্রতিবাদ কত তীব্র হতে পারে সেকথা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। সেই কারণে তিনি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন শিশুপাঠ্য পুস্তকের অভাবের কথা দিয়ে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোল-বিবরণ ও নীতিপাঠ তাঁর মতে শিক্ষাপুস্তক মাত্র, কিন্তু এই অত্যাবশ্যক শিক্ষাপুস্তকের মধ্যে শিশুদের একান্তভাবে বদ্ধ রাখলে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে না—ফলে 'বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।' তারা এমন করে বাংলা শেখে না যাতে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বাংলা কাব্য নিজে পড়ে তার রসাস্বাদন করতে পারে, অপরপক্ষে অপরিচিত দেশ ও জীবনযাত্রার কাহিনী-সংবলিত ইংরেজি বাল্যগ্রন্থ পড়ে বোঝার মতো ইংরেজিও তারা জানে না। এন্ট্রেন্স-পাস বা এন্ট্রেন্স-ফেল যে-সমস্ত শিক্ষক নিচের ক্লাসে পড়ান ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার ও সাহিত্য তাঁদের কাছে এত অপরিচিত যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনে ভাবের উদ্বোধন ঘটানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। 'তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রইল কী। যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, ···আর ইংরেজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল।' ফলে বড়ো বয়সে 'যখন ইংরেজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।' রবীন্দ্রনাথের মতে, 'আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' বাংলাভাষা বাংলাসাহিত্যই পারে এই মিলন ঘটাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন এই কারণেই দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগতকে অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত করে তুলেছিল—কোনো নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করে নয়—ইংরেজি শিক্ষা ও বাঙালির অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভেঙে দিয়ে। এই দৃষ্টান্তে শিক্ষিত লোক বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু শৈশবাবধি চর্চা না থাকায় উন্নত ভাব প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা তাঁরা খুঁজে পান না। রবীন্দ্রনাথের মতে, এইটিই হ'ল 'শিক্ষার হেরফের'—এই 'হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই'।

পৌষ-সংখ্যা সাধনা-য় 'শিক্ষার হের-ফের' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র, ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুকে পত্র লিখে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানতে চান। '৫০ পার্ক স্ট্রীট' থেকে ১৬ পৌষ [শুক্র 30 Dec] তিনি ড গুরুদাসকে লেখেন : 'পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষার হের-ফের" নামক প্রবন্ধের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আমার একান্ত বিশ্বাস স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে না। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত জানিতে পারিলে বাধিত হইব। যদি মতের অনৈক্য না থাকে তবে কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে যদি অবসর মত জানান তবে চরিতার্থ হইব।'[১] বঙ্কিমচন্দ্র ও আনন্দমোহন বসুকেও সম্ভবত একই ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। তিন জনেই পত্রের উত্তর দেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া অপর দু'জনের মূল পত্র রবীন্দ্রভবনে

রক্ষিত আছে। ড গুরুদাস পত্রের উত্তর দেন ২৩ পৌষ [6 Jan 1893] ও আনন্দমোহন লেখেন 3 Feb [২২ মাঘ]। তিন জনের চিঠির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত ক'রে সাধনা-র চৈত্র ১২৯৯-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রসঙ্গ-কথা (তিনখানি পত্র)' [পৃ ৪৪০-৫৪] নামে আলোচনা করেন [দ্র গ্রন্থপরিচয় ১২.৬১৬-২৩]। লক্ষণীয়, উক্ত তিন জনেই সিনেটে বাংলা-ভাষার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ও চিঠিতে সে-কথার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন যে, স্বদেশীয়দের পক্ষ থেকেই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে লিখলেন : 'আমাদের স্বদেশীয়েরা যে এ-সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। যদি না করিতেন তবে আমাদের দেশের এমন দুর্দশা হইবে কেন।···নতুবা, স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, এ-কথা কে না বোঝে।···দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই, এ-কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।' অবশ্য হাল তিনি ছাড়েন নি, বরং পূর্ব-প্রবন্ধে যে-কথা স্পষ্ট করে বলেন নি এখানে সেটিই খুলে লিখলেন : 'বাল্যকাল হইতেই ইংরেজিভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিক রূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলাশিক্ষা ইংরেজিশিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষাশিক্ষা রূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়; বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া লিখিবার যথার্থ অবসর থাকে।'

এই প্রবন্ধের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায় তবে পরশু ওই বড়ো বড়ো [বিশ্ব][২] বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্বুদের মতো প্রতীয়মান হইবে।/ভালোরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলোকে বুদ্বুদ বলিয়া বোঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোকপ্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনো মূল নাই।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের এই উক্তি ভালো লাগে নি, এবং 'ওগুলোকে'-জাতীয় শব্দপ্রয়োগ তাঁর কাছে অমার্জিত ঠেকেছে। ভারতী-র জ্যৈষ্ঠ ১৩০০-সংখ্যায় তিনি প্রধানত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরোধিতা করে 'শিক্ষা-সঙ্কট' [পৃ ১১১-১৭] প্রবন্ধ লেখেন। এটি তাঁর প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি, অপর দু'টি কিস্তি প্রকাশিত হয় আষাঢ় [পৃ ১৬০-৬৭] ও শ্রাবণ [পৃ ১৯০-৯৩] সংখ্যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিটি অবলম্বনেই 'প্রসঙ্গ-কথা' [দ্র 'শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি', শিক্ষা-পরিশিষ্ট ১২। ৫০১-০৫] লিখলেন সাধনা-র আষাঢ় ১৩০০-সংখ্যায় [পৃ ১৯৪-২০০]। এই কারণে মোহিনীমোহন অনুযোগ করেছেন তাঁর 'শিক্ষা-সঙ্কটের কৈফিয়ৎ' রচনায় [দ্র ভারতী, শ্রাবণ ১৩০০] ১৯০-৯৩]। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লোকেন্দ্রনাথ পালিত সাধনা-র মাঘ ১২৯৯-সংখ্যায় 'শিক্ষা-প্রণালী' [পৃ ১৮৯-৯৭] নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। মোহিনীমোহন ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছিলেন। লোকেন্দ্রনাথ পরে 'ভাষা-বিভ্রাট' [দ্র ভারতী, শ্রাবণ ১৩০০। ২০৫-১১] ও মোহিনীমোহন 'ভাষা-পুষ্টি' [ঐ, ভাদ্র। ৩১২-১৬] নামে দু'টি প্রবন্ধ রচনা করেন—কিন্তু সে-দু'টি প্রধানত পরিভাষা-বিষয়ক।

আলোচনা-সূত্রে আমরা কালানুক্রমিকতা থেকে অনেকটা সরে এসেছি। অগ্র° ১২৯৯-সংখ্যা সাধনা-য় রবীন্দ্র-রচনার সূচীটি অবলম্বনে যথাস্থানে ফিরে যাওয়া যাক্ :

১-১৩ 'কাবুলিওয়ালা' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭। ২২০-২৮

২৫-৩২ 'যেতে নাহি দিব' দ্র সোনার তরী ৩।৪৯-৫৫

৩২-৩৫ 'টা টো টে' দ্র শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৪৮-৫০

৭৭-৭৯ 'সারসংগ্রহ। প্রাচীন শূন্যবাদ' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৫৬-৫৮

৮৮-৯২ 'সমালোচনা'

ইন্দিরা দেবী-কৃত 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই' [দ্র গীত ১।২৫৩-৫৪; স্বর ৪৭] গানটির স্বরলিপি এই। সংখ্যায় মুদ্রিত হয় [পৃ ৪১-৪৬]।

ভারতী ও বালক, অগ্র° ১২৯৯ [১৬।৮] :

৪৭৬-৭৭ 'নরনারী' ['খাঁচার পাখী ছিল'] দ্র সোনার তরী ৩। ৪৭৬-৭৭ ['দুই পাখি']

কার্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত 'ক্ষ্যাপার প্রতি' ['ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন'] গানটির সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয় ৪৬৫-৬৮ পৃষ্ঠায়, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি।

'কাবুলিওয়ালা' গল্প ও 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মধ্যে সমালোচক 'মর্মগত মিল' লক্ষ্য করলেও [দ্র প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। ৪৯] গল্পটি অনেক পূর্বেই রচিত হয়েছিল, বলেন্দ্রনাথকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রে তার সাক্ষ্য রয়েছে। অনেক পরে ৭ আশ্বিন ১৩৩৮ [24 Sep 1931] রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে লিখেছিলেন : 'কাবুলিওয়ালা বাস্তব ঘটনা নয়। মিনি আমার বড়ো মেয়ের আদর্শে রচিত।'[১] তার আগে [Jul 1918] সীতা দেবীকে বলেছিলেন: 'বেলাটা ঠিক অমনি ছিল, মিনির কথা প্রায় তার কথাই সব তুলে দিয়েছি'।[২] কিন্তু দিঘাপতিয়ার শরৎকুমার রায় বলেছেন অন্য কথা : "শুনিয়াছিলাম, 'কাবুলিওয়ালা'র ক্ষুদ্র 'মিনি' রবিবাবু তাঁহার বন্ধু রাধারমণ কর মহাশয়ের (সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের ভ্রাতা) কন্যা মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন।"[৩] আমরা অবশ্য এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করি।

'টা টো টে' শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ। মজুমদার-পুঁথির একটি পৃষ্ঠায় [P.5] দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রত্যয়ান্ত কিছু শব্দ সংকলন করেছেন। উল্লেখ্য, এরই দু'টি পৃষ্ঠা পরে 'যেতে নাহি দিব' কবিতা লেখা আরম্ভ হয়েছে।

'সারসংগ্রহ'-এর অন্তর্গত 'প্রাচীন শূন্যবাদ' রচনায় 'বিনয় সূত্র' নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থের চন্দ্রকীর্তি আচার্য-বিরচিত ভাষ্য 'মধ্যমকবৃত্তি' অবলম্বনে কিছু কৌতুক করা হয়েছে। শূন্যবাদী এই দার্শনিক কিছুই যে নেই প্রমাণ করতে গিয়ে কিভাবে তর্কজাল বিস্তার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত-সহ তার বর্ণনা করেন। কিন্তু এই কৌতুকের পিছনে যে ব্যঙ্গের হুল আছে, সেটি স্পষ্ট করলেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত পৌষ-সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথা' [পৃ ১৭৩-৭৯]-য়, সূচীপত্রে যার নাম 'কথার ভেল্কি।' সেখানে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর 'বিরাট লয়তত্ত্ব'কে কথার ভেল্কির একটি নমুনা হিশেবে দেখিয়েছেন।

'সমালোচনা'য় সাতখানি গ্রন্থ সমালোচিত হয়েছে। সূচীপত্রে সমালোচকের নাম নেই বটে, কিন্তু সমালোচনার ভঙ্গি ও ভাষা দেখে আমরা এগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা ব'লে গ্রহণ করেছি। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রায় মহাশয়' উপন্যাসের আলোচনায় সমালোচক লিখেছেন : 'যখন এই গল্পটি খণ্ডশঃ "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইতেছিল তখনি আমরা "সাধনা"-য় ইহার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম'। আমরা জানি, 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'র উক্ত সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাছাড়া উচ্ছ্বাসময় গদ্যরচনা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিভিন্ন প্রবন্ধের সমালোচনায় বা 'লেখার নমুনা'-জাতীয় ব্যঙ্গকৌতুকে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে অনুরূপ মনোভাব দেখা যায় অন্তত তিনটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে। নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্র' সম্পর্কে লিখিত হয়েছে : 'আজকালকার উচ্ছ্বাসময় লেখামাত্রেই স্থানে অস্থানে "হরি হরি" "মরি মরি" এবং "বুঝি" শব্দ-প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। উহা আমাদের কাছে কেমন একটা ভঙ্গিমা বলিয়া ঠেকে—প্রথম যে লেখক এই ভঙ্গীটি বাহির করিয়াছিলেন তাঁহাকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জনা করা যায়—কিন্তু যখন দেখা যায় আজকাল অনেক লেখকই এই সকল সুলভ উচ্ছ্বাসোক্তির ছড়াছড়ি করিয়া হৃদয়বাহুল্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন অসহ্য হইয়া উঠে। নবীন বাবুও এই সকল সামান্য বাক্য-কৌশল অবলম্বন করিবেন ইহা আমাদের নিকট নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে হয়'; 'জ-রি' ছদ্মনামে লেখা 'অপরিচিতের পত্র' সম্পর্কে : 'ইহাতে নির্লজ্জ ও ঝুঁটা সেন্টিমেন্টালিটির চূড়ান্ত দেখান হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে আড়-স্বর-পূর্ব্বক জগতের নিকট ক্ষমাভিক্ষার অভিনয়টি সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য।'

নামহীন লেখকের 'প্রকৃতির শিক্ষা'-র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায় সবচেয়ে বেশি : 'গদ্যে অবিশ্রাম হৃদয়োচ্ছ্বাস বড় অসঙ্গত শুনিতে হয়। গদ্যে যেমন ছন্দের সংযম নাই তেমনি ভাবের সংযম অত্যাবশ্যক—নতুবা তাহার কোন বন্ধন থাকে না, সমস্ত অশোভনভাবে আলুলায়িত হইয়া যায়। গদ্যে যদি হৃদয়ভাব প্রকাশ করিতেই হয় তবে তাহা পরিমিত, সংযত এবং দৃঢ় হওয়া আবশ্যক।···যদি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে না পারা যায়, তবে সাহিত্যে হৃদয়ের ভাব প্রকাশের কোন অর্থ নাই। কারণ, হৃদয়ভাব চিরপুরাতন, তাহা নূতন সংবাদও নহে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালকও নহে। তাহা সহস্রবার শুনিয়া কাহারো কোন লাভ নাই। তবে যদি ভাবটিকে অপরূপ নূতন সৌন্দর্য্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় তবেই তাহা মানবের চিরসম্পত্তিস্বরূপ সাহিত্যে স্থান পায়। এই জন্য ছন্দোময় পদ্য হৃদয়-ভাব প্রকাশের অধিক উপযোগী। ভাবের সহিত একটি সঙ্গীত যোগ করিয়া তাহার অন্তরের চিরনূতন সৌন্দর্য্যটি বাহির করিয়া আনে। কিন্তু সাধারণ গদ্যে হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে গেলে তাহা প্রায়ই নিতান্ত মূল্যহীন প্রগল্‌ভতা হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে যদি বা কোন চিন্তাসাধ্য জ্ঞানের কথা তবে তাহাও উচ্ছ্বাসের ফেনরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়।' এই বক্তব্য ও ভাষা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের।

এ ছাড়াও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গল্প-সংকলন 'সংগ্রহ' ও উপন্যাস 'লীলা' এবং কালীপ্রসন্ন দত্ত-রচিত 'দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী' সমালোচিত হয়েছে। কেবল গল্প-সংকলনটি প্রশংসিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ রামপুর-বোয়ালিয়ায় ১৬ অগ্র° [বুধ 30 Nov] 'প্রতীক্ষা' [দ্র সোনার তরী ৩। ৫৯-৬৪] নামক কবিতাটি লিখতে শুরু করেন। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন : 'সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের শরীর খুব ভাল ছিল না। তিনি সন্দেহ করতেন যে, তাঁর হৃদরোগ হয়েছে। আমি সে ভয় কখনো পাইনি। আমার মনে হতো সেটি

রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ mood মাত্র, যাকে তিনি হৃদরোগ ব'লে ভুল করতেন।'[১] কিন্তু আশঙ্কাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য ছিল, 'প্রতীক্ষা' কবিতাটি মৃত্যু-ভাবনায় পূর্ণ।

মজুমদার-পুঁথিতে দেখা যায়, কবিতাটি এইদিন শেষ হয়নি, প্রথম তিনটি মাত্র স্তবক এখানে লেখা হয়। এরপর সম্ভবত দুপুরের দিকে তিনি ও লোকেন্দ্রনাথ রামপুর-বোয়ালিয়া থেকে নাটোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পরের দিন 1 Dec [বৃহ ১৭ অগ্র°] ইন্দিরা দেবীকে পথের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : 'ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘ পথ যেতে হয়। সম্মুখে আটাশ মাইল পথ এবং কেবল 'আমরা দুজনে যাত্রী।' লোকেন একটা সিগারেট এবং একখানা বই আরম্ভ করে দিলে—আমি গুন্ গুন্ স্বরে 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' গান ধরলুম [উল্লেখ্য, গোবিন্দদাস কবিরাজ-রচিত এই বৈষ্ণব পদটিতে রবীন্দ্রনাথ সুর দেন দ্র স্বর ২১][১]—এইরকম করে যখন প্রায় মাইল দশেক অতিক্রম করেছি এবং সূর্য ক্ষীণজ্যোতি হয়ে অস্তাচলের খুব কাছে গিয়ে পৌঁচেছে এমন সময় লোকেন আমার ঐ গানটা উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণব কবিদের বিরুদ্ধে তর্ক আরম্ভ করে দিল।'[২] একটি কৃশকায়া নদী এই তর্কে ছেদ টানল। গাড়ি থেকে নেমে পদব্রজে একটি নৌসেতু পার হয়ে 'ও পারে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল, আকাশে আধখানি চাঁদ উঠেছে এবং সুন্দর জ্যোৎস্না [২০ অগ্র° পূর্ণিমা ছিল]। দুজনে পরামর্শ করা গেল, হেঁটে যতটা দূর পারা যায় যাওয়া যাক। তখন তর্ক বন্ধ করে সেই জ্যোৎস্না এবং গাছের ছায়ায় খচিত নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলুম।' এইভাবে মাইল দুয়েক হেঁটে আবার গাড়িতে উঠে তাঁরা যখন নাটোরে এসে পৌঁছলেন তখন অনেক রাত। প্রমথ চৌধুরী সম্ভবত আগেই নাটোরের মহারাজার সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর স্থির হল মহারাজ আমাদের একটা ড্রাইভ দিয়ে তার পরে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। সকলেই বললে : Such a night was not meant for sleep. বাস্তবিক সুন্দর রাতটি হয়েছিল।···বোধ হয় রাত্তির দেড়টার সময় বাড়িতে এসে শুয়েছিলুম।' এর পর পাণ্ডুলিপিতে চিঠির শেষাংশ কালি বুলিয়ে কাটা!

পরের দিনের [2 Dec শুক্র ১৮ অগ্র°] চিঠিটি প্রকৃতিরসসম্ভোগের বর্ণনায় পূর্ণ : 'কাল ব্রেকফাস্ট্ খেয়ে মহারাজার ওখানে গিয়েছিলুম, বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে গিয়েছিলুম।···বাংলা দেশের ধূ ধূ জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত যে কী সুন্দর সে আমি কিছুতে [বলতে] পারি নে—কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা—আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী-একটি [স্নেহভারবিনত] মৌন ম্লান মিলন![৩]

কিন্তু শীতের রাত্রে খোলা মাঠে ঘুরে প্রকৃতির সৌন্দর্য-পর্যবেক্ষণ প্রকৃতি দেবী ক্ষমা করেন নি! প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন : রাজশাহী থেকে নাটোর ফিরে আসবার পর দাঁতের ব্যথায় রবীন্দ্রনাথ অতি কাতর হয়ে পড়েন। এবং মহারাজ যদু লাহিড়ী নামে তাঁর একটি আমলাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। যদু তিন দিন তিন রাত অবিরত তাঁর শুশ্রূষা করে।'[৪] কিছুদিন পরে 18 Dec [রবি ৪ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'আমার দাঁত-কানের ব্যথার খবর এত দিনে বুঝি তোদের কানে গিয়ে পৌঁছল? যখন সুকোমল তুলোর স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ বহুযত্নে লালন-পালন করছিলুম —পীড়িত শিশুসন্তানকে যেমন ঢেকে ঢুকে ঘিরে-ঘেরে রাখে নিজের এই মুখমণ্ডলটিকে তেমনি করে রেখেছিলুম তখন পৃথিবীর লোক আমাকে সুখী এবং সুস্থ-জ্ঞানে দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিল। আর, এখন যখন তার

স্মৃতিমাত্র এবং কষের দাঁতের ফুলোর ঈষৎ মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন ভয় ভাবনা ভর্ৎসনা নানারকম শোনা যাচ্ছে।'[৫]

এই অসুস্থতার মধ্যে ২০ অগ্র° [রবি 4 Dec] তিনি লিখলেন 'প্রতীক্ষা' কবিতার আরও চারটি স্তবক—৪র্থ থেকে ৭ম স্তবক পর্যন্ত নাটোরে লেখা; মজুমদার-পুঁথিতে ৭ম স্তবকের শেষে লিখে রেখেছেন : '২০ অগ্রহায়ণ/নাটোর/রোগশয্যা—অসুস্থতার স্মৃতিটি পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন : 'নাটোরে বোধহয় আমরা দিন সাতেক থাকি'—সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কিছুটা সুস্থ হয়ে সম্ভবত ২২/২৩ অগ্রহায়ণ নাগাদ শিলাইদহে ফিরে আসেন। 9 Dec [শুক্র ২৫ অগ্র°] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি।···অনেক দিন তীব্র রোগভোগের পর শরীরটা শিথিল দুর্বল অবস্থায় আছে, এই রকম সময়ে প্রকৃতির এই ধীর স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ভারী মধুর লাগছে।'[১] চিঠির পরের অংশটি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রকৃতিচেতনার পরিচয়বাহী : এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণ পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম' ইত্যাদি। এই ভাব কিছুদিন পূর্বে 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় [চিঠিটিতে এই কবিতার একটি ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে] প্রকাশ পেয়েছিল, আরও স্পষ্টভাবে রূপ নিয়েছে 'সমুদ্রের প্রতি' [১৭ চৈত্র ১২৯৯] ও 'বসুন্ধরা' [২৬ কার্ত্তিক ১৩০০] কবিতায়।

এরপর ২৭ অগ্র° [রবি 11 Dec] শিলাইদহ বোটে তিনটি স্তবক [৮ম-১০ম] লিখে রবীন্দ্রনাথ 'প্রতীক্ষা' কবিতাটি সম্পূর্ণ করেন।

২৮ অগ্র° [সোম 12 Dec] সকালে রবীন্দ্রনাথ পাবনা যাত্রা করেন। নদীপথে যেতে যেতে মৃণালিনী দেবীকে লিখছেন : 'আজ শিলাইদহ ছাড়বার আগেই তোমার চিঠিটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। তোমরা আসচ এক হিসাবে আমার ভালোই হয়েচে,···আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই, সেইজন্যে তোমাদের কাছে পাবার জন্যে আমার প্রায়ই মনে মনে ইচ্ছে করত।' জোড়াসাঁকোর আত্মীয়-সমাকীর্ণ ও নানা স্বার্থদ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট পরিবেশ সন্তানদের মানসিক বিকাশের অনুকূল ব'লে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন না। তাই স্ত্রীকে লিখলেন : 'আমি বেশ জানি যতদিন তোমরা সোলাপুরে থাকবে ততদিন তোমাদের পক্ষে ভাল হবে। ছেলেরা অনেকটা শুধ্রে এবং শিখে এবং ভাল হয়ে আস্‌বে এই রকম আমি খুব আশা করে ছিলুম। যাই হোক্ সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়! যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণে নিজের কর্ত্তব্য করে যেতে হবে—তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল।[২] এই চিঠি একজন পারিবারিক মানুষের—ইনিই আবার কয়েক দিন পরে 'মানসসুন্দরী'র বন্দনা করেছেন!

৩০ অগ্র° [বুধ 14 Dec] রবীন্দ্রনাথ পাবনা থেকে শিলাইদহে ফিরে আসেন। এইদিন[৩] প্রমথ চৌধুরীকে নিজের খবর দিয়ে লিখলেন : আমি কতক জমিদারীর কাজ দেখ্‌চি, কতক সাধনার জন্যে লিখ্‌চি এবং চেষ্টা

করচি এরই মধ্যে একটুখানি অবসর করে নিয়ে লিখ্‌তে। কিন্তু হয়ে উঠ্‌চে না। কেননা কবিতা অন্যান্য ললনার মত একাধিপত্য প্রয়াসিনী। "আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসরমত বাসিয়ো" এ ঠিক তার সেন্টিমেন্ট নয়। এইজন্যে আমি কিছু মনের অসুখে আছি। বাস্তবিক এ জীবনে কবিতাই আমার সব প্রথম প্রেয়সী—তার সঙ্গে বেশিদিন বিচ্ছেদ আমার সহ্য হয় না।'[৪]

পরের দিনের [১ পৌষ বৃহ* 15 Dec] চিঠিতে তাঁকে লিখলেন : 'কবিত্বের অনবসর সম্বন্ধে দুঃখ করে কাল তোমাকে এক চিঠি লিখেচি—লিখে ভাবলুম বসে বসে দুঃখ করার চেয়ে দুঃখ মোচনের চেষ্টা করা ভাল। অমনি আমার বোটের শয্যাতল আশ্রয় করে একখানি শ্লেট হাতে করে বসে গেলুম। বেশ যখন একটু জমিয়ে নিয়েছি এমন সময় কাজ এসে পড়ল। সাধনার লেখা এখনকার মত একরকম চুকিয়েছি—এখন সেই ভাঙ্গা কবিতাটা নিয়ে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দেব মনে করছি।[৫] 'ভাঙ্গা কবিতাটা' হল 'মানসসুন্দরী' [দ্র সোনার তরী ৩। ৬৫-৭৭]। ৪ পৌষ [রবি 18 Dec] কবিতাটি লেখা শেষ হয়। পরের দিনের পত্রে [* 19 Dec] খবরটি জানিয়েছেন প্রমথনাথকে : 'আমি কাল তোমার চিঠি পেয়েছি—কিন্তু একটা কবিতা নিয়ে পড়েছিলুম বলে কাল আর উত্তর দিতে পারিনি।'[৬]

৩৩৮ ছত্রের সমিল প্রবহমান পয়ারে লেখা দীর্ঘ কবিতাটির পাণ্ডুলিপি Ms. 129-এ আছে। সংশোধন-সংযোজনের পরিমাণ অত্যন্ত কম, বোঝাই যায় প্রথম খসড়া অন্যত্র রচিত হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ নিজেও শ্লেট হাতে ক'রে বসে যাওয়ার কথা লিখেছেন; কিন্তু কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায়, কী তীব্র হৃদয়-নিংড়ানো আবেগ এর ছত্রগুলিতে স্পন্দিত হয়েছে। কয়েক মাস পরে সম্ভবত এই কবিতাটি সম্পর্কেই ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল—কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়—আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক-সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন।'[১]

৭ পৌষ [বুধ 21 Dec] শান্তিনিকেতন আশ্রমে দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত বিবরণে রবীন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখ নেই, তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কি না বলা শক্ত।

তবে পৌষের মাঝামাঝি তিনি যে কলকাতায় ছিলেন, তার প্রমাণ ১৬ পৌষ [শুক্র 30 Dec] ৫০, পার্ক ষ্ট্রীট' থেকে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'শিক্ষার হেরফের'—বিষয়ে লেখা তাঁর পত্র। প্রবন্ধটি তার আগের দিন পৌষ-সংখ্যা সাধনা-য় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি হ'ল :

৯৩-১১২ 'শিক্ষার হের-ফের' দ্র শিক্ষা ১২।২৭৭-৮৯ ['শিক্ষার হেরফের']

১১৭-২৭ 'ছুটি' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।২২৯-৩৫

১৩৬-৩৮ 'তোমরা এবং আমরা' দ্র সোনার তরী ৩।২৪-২৬ ['তোমরা ও আমরা']

১৫৬-৬৫ 'কড়ায়-কড়া কাহন-কানা' দ্র সমাজ ১২।২০৫-১১ ['আচারের অত্যাচার']

১৭৯-৮০ 'সমালোচনা'

‘ছুটি’ গল্পটি শ্রাবণ মাসের পূর্বেই রচিত, ঐ সময়ে বলেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর পত্র থেকেই বোঝা যায়। গল্পের বীজটি তাঁর মনে প্রোথিত হয়েছিল সাজাদপুরের ঘাটে বোটে বসে নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনা থেকে, যার বর্ণনা দিয়েছেন ইন্দিরা দেবীকে লেখা [?25] Jun 1891-এর একটি চিঠিতে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৫৮-৬০, পত্র ২৪]। ঐ গ্রামের অধিবাসী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এই গল্পের নায়ককে ‘দ্বারিয়াপুরের চক্রবর্তীদের ছেলে হারাণচন্দ্র’ ব’লে সনাক্ত করেছেন।[২] রজনীরঞ্জন সেন তাঁর *Glimpses of Bengal Life* (1913) গ্রন্থে ‘The School Closes’ নামে অনুবাদ করেন। C.F. Andrews রবীন্দ্রনাথের সহযোগে ‘The Home-coming’ নামে গল্পটির আর একটি অনুবাদ করেন, সেটি *Hungry Stones and Other Stories* (1916) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

‘কড়ায়-কড়া কাহন-কানা’ চন্দ্রনাথ বসুর ‘কড়াক্রান্তি (সুদূরগামিতা)’ প্রবন্ধের [সাহিত্য, কার্ত্তিক। ৪১৩-২০] প্রতিবাদে রচিত। চন্দ্রনাথের ‘আহার’ বা ‘লয়’ প্রবন্ধের যে সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, সেগুলি তিনি তাঁর কোনো প্রবন্ধ-সংগ্রহে সংকলন করেন নি; কিন্তু এই প্রবন্ধটির বক্তব্য তাঁর কাছে এতই গুরুতর ব’লে মনে হয়েছিল যে, গদ্য-গ্রন্থাবলী সংকলনের সময়ে ১৩শ খণ্ড ‘সমাজ’ [১৩১৫] গ্রন্থে এটিকে ‘আচারের অত্যাচার’ নামান্তরে গ্রহণ করেছিলেন। ‘আহার’ বা ‘লয়’ প্রবন্ধের সমালোচনা যখন তিনি করেছিলেন, তখন নিরপেক্ষ পাঠকের মনে হতে পারে যে তিনি অনর্থক শক্তির অপব্যয় করেছেন। কিন্তু চন্দ্রনাথের বর্তমান প্রবন্ধটি এতই উদ্ভট এবং বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিতে ক্ষতিকর ব’লে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে যে, এর দীর্ঘ প্রতিবাদ ও সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তাঁর এই ভাবনা আমাদের অসংগত মনে হয় না।

প্রবন্ধের শুরুতেই চন্দ্রনাথের লেখা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে : ‘···হিন্দু বলেন যে ধর্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবানও কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সমাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াকান্তিটি পর্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।’ কী সেই ভাবনা ও ব্যবস্থা? রজোদর্শনে কন্যার মনে পুরুষসঙ্গলিপ্সা জাগে ও মন কলুষিত হয়, সুতরাং ‘সতী-ধর্ম্মের কড়াক্রান্তিটুকু পর্যন্ত সঞ্চয় করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে অনার্তবার বিবাহের ব্যবস্থা’! বিধবা কুন্দনন্দিনী ‘সারি গাঁথা নগেন্দ্র-নগেন্দ্র-নগেন্দ্র নাম জপ’ করতে করতে তাকে ভালোবেসেছিল, সুতরাং বিধবারা ‘পুষ্পমূলফলঃ’ আহারে দেহক্ষীণ করবে ও পরপুরুষের নাম উচ্চারণ করবে না![১] মনু বলিয়াছেন—/মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।/ বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥/মাতা ভগিনী কন্যা প্রভৃতির সহিতও পুরুষ নির্জন গৃহে বাস করিবে না, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ একান্ত বলবান হইয়া জ্ঞানবান পুরুষকেও আকর্ষণ করে।’ চন্দ্রনাথ এই শ্লোক উদ্ধারের আগে নিজেই লিখেছেন, ‘কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে একটু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে’—তবুও তা সমর্থনযোগ্য, কারণ এর মধ্যেই হিন্দুর ‘কড়াক্রান্তি’-জ্ঞান বা ‘সদূরগামিতা’ পরিস্ফুট হয়েছে!

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটির প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রথমেই লিখলেন : ‘সকল দিক সমানভাবে রক্ষা করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্য মানুষকে কোনো-না-কোনো বিষয়ে রফা করিয়া চলিতেই হইবে।···কাজে নামিলেই অতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া চলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।’ কিন্তু আমাদের দেশে বিধিব্যবস্থা-আচার-বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দিতে গিয়ে

সমাজনীতি যতই কঠোর হয়েছে, ধর্মনীতি ততই শিথিল হয়ে এসেছে। 'আমি যদি অস্পৃশ্য নীচজাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দন্তি-হিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচজাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন। প্রতিদিন রাগদ্বেষ লোভমোহ মিথ্যাচরণে ধর্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি, অথচ স্নান তপ বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না।' পাপপুণ্য সম্বন্ধে এই যান্ত্রিক মনোভাব মানুষের স্বাধীন বুদ্ধিকে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত, কারণ তাহলেই ক্বচিৎ কাকদন্তির হিসাবে গরমিল হওয়াও বিচিত্র নয়। অথচ 'স্বাধীনভাবে আমরা যাহা লাভ করি সে-ই আমাদের যথার্থ লাভ; অবিচারে অন্যের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করি তাহা আমরা পাই না।' পরিশেষে তিনি একিলিস ও কচ্ছপ নামক ন্যায়ের কুতর্কের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন : 'আমাদের পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, কড়াকান্তি-দন্তিকাক লইয়া আমাদের কচ্ছপসমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অগ্রসর হইয়া আছে; কিন্তু দ্রুতগামী মানবপথিকেরা এক-এক দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের সমস্ত সূক্ষ্ম প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহাদিগকে যদি ধরিতে চাই তবে চুল-চেরা হিসাব ফেলিয়া দিয়া রীতিমতো চলিতে আরম্ভ করা যাক।'

লক্ষণীয় প্রবন্ধটিতে চন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরোধিতা থাকলেও, আক্রমণ নেই। সেটি করলেন সাধনা-র মাঘ-সংখ্যায় 'বাঙ্গলা লেখক' [পৃ ১৮১-৮৯; দ্র সাহিত্য (১৩৬১)। ২৩৫-৪১] প্রবন্ধে, এবং সেই কারণেই প্রবন্ধটি গ্রন্থভুক্ত করেন নি। এতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, যেহেতু আমাদের দেশে সচেতন পাঠক নেই, সেহেতু 'লেখকেরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করেন না। সত্য কথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভালোবাসেন। সুবিজ্ঞগুরু হিতৈষীবন্ধু অথবা জিজ্ঞাসুশিষ্যের ন্যায় প্রসঙ্গের আলোচনা করেন না, কূটবুদ্ধি উকিলের ন্যায় কেবল কথার কৌশল এবং ভাবের ভেল্কি খেলাইতে থাকেন' এবং "নিতান্ত 'ছেলেখেলা' করিয়া গেলেও তাহা 'প্রথম শ্রেণী'র ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়।" অন্য দেশে লেখকেরা সযত্নে লেখে এবং পাঠকেরা সযত্নে পাঠ করে, প্রতিবাদযোগ্য কথার প্রতিবাদ হয় এবং আলোচনাযোগ্য কথার আলোচনা হয়ে থাকে। 'কিন্তু এ দেশে লেখার প্রতি সাধারণের এমনি সুগভীর অশ্রদ্ধা যে, কেহ যদি আন্তরিক আবেগের সহিত কাহারও প্রতিবাদ করে তবে লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়। ভাবে, সময় নষ্ট করিয়া এত বড়ো একটা অনাবশ্যক কাজ করিবার কী এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছিল! অনর্থক কেবল লোকটার মনে আঘাত দেওয়া!' ঠিক এই অভিযোগ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ফাল্গুন-সংখ্যা সাহিত্য-তে করেছিলেন তাঁর 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধটিতে!

কিন্তু এই অভিযোগ মেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকাকে রবীন্দ্রনাথ কর্তব্যভ্রষ্টতা ব'লে মনে করেছেন। সেইজন্যই তাঁর প্রশ্ন : 'চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার 'কড়াক্রান্তি' প্রসঙ্গে যেখানে মনুসংহিতা হইতে মাতৃসম্বন্ধে একটা নিরতি-কুৎসিত শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া তাহা হইতে একটা বৃহৎ আধ্যাত্মিক বাষ্প সৃজন করিয়াছেন সে কি কেবল কথার কথা, রচনার কৌশল, সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়, আধ্যাত্মিক ওকালতি? সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসংকোচ স্পর্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই! অন্য দেশের পাঠক কি এরূপ নির্লজ্জ কদর্য তর্কচাতুরী সহ্য করিত?'—দুঃখের বিষয়, এই প্রশ্নকে তখনকার মতো এখনকার দিনের সমালোচকও 'রবীন্দ্রনাথের চন্দ্রনাথ তথা হিন্দু বিদূষণ মনোভাব'[১] ব'লে অভিহিত করেছেন! কিন্তু চন্দ্রনাথ যে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ আর লেখেন নি, এটিও উল্লেখযোগ্য।

সাধনা-র পৌষ-সংখ্যার 'সমালোচনা'য় কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোক-চরিত' ও তারাকুমার কবিরত্নের 'পঞ্চামৃত' গ্রন্থ-দুটি সমালোচিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। দু'টি সমালোচনাতেই রবীন্দ্র-রচনার বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, কিন্তু বেনামীতে প্রথমাবধিই রবীন্দ্রনাথ সাধনা-র সম্পাদক ছিলেন ব'লে এগুলিকে আমরা তাঁর লেখা ব'লে গ্রহণ করেছি।

ভারতী ও বালক-এর পৌষ-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'গান/আমার পরাণ লয়ে' [পৃ ৫৩৬-৩৭; দ্র গীত ২। ২৮২] ও সরলা দেবীকৃত 'কি হল তোমার? বুঝি বা সখি' গানটির স্বরলিপি [পৃ ৫২৬-৩২; দ্র স্বর ২০] মুদ্রিত হয়। স্বরলিপিটির সঙ্গে টীকা : 'শ্রীমতী কুমুদিনী কান্তগিরির অনুরোধে নিম্নলিখিত গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হইল'—সমাজের একটি অংশে রবীন্দ্রনাথের গানের জনপ্রিয়তার স্মারক। 'আমার পরাণ লয়ে' গানটির সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি পত্রিকাটির মাঘ-সংখ্যায় [পৃ ৫৮০-৮২; দ্র স্বর ১০] মুদ্রিত হয়।

১১ মাঘ [সোম 23 Jan 1893] মহর্ষিভবনে ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে ছ'টি নূতন গান রচনা করলেন :

(১) ভূপালী-তালফেরতা। জয় রাজরাজেশ্বর। দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৫; গীত ৩।৮৪৫; স্বরলিপি নেই। সম্ভবত কোনো পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত।

(২) মহিশূরী খাম্বাজ-ঠুংরি। চির বন্ধু, চির নির্ভর, চির শান্তি। দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৫; গীত ১।১৭৯-৮০; স্বর ২৭; সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি, ভারতী ও বালক, ফাল্গুন। ৬৫৮-৫৯; মহিশূরী গানের আদর্শে রচিত।

(৩) পূর্ণ ষড়জ-একতালা। (একি) লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে। দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৬; গীত ১। ২১২-১৩; স্বর ৪৫; সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি, ভারতী ও বালক, ফাল্গুন। ৬৫৯-৬১; মহীশূরী গানের আদর্শে রচিত।

(৪) মিশ্র হাম্বির-তালফেরতা। আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে। দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৬; গীত° ১।২৫৫; স্বর ৪৭; ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি, সাধনা, মাঘ। ২৭২-৭৫; মহীশূরী গানের আদর্শে রচিত।

(৫) বেহাগ-কাওয়ালি। হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৬; গীত° ১।১৫৭; স্বরলিপি নেই। সম্ভবত কোনো পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত।

(৬) মহিশূরী ভজন। আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ। দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৭; গীত° ১।১৮৭-৮৮; স্বর ৪। মূলগান : কায়ৌ শ্রী গৌরী/করুণা লহরী দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।১০০-০১।

সরলা দেবী এই গুচ্ছের গানগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন : মহীশূরে যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবিমামার পায়ের তলায় সে গানের সাজিখানি খালি না করা পর্যন্ত, মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, সেগুলিকে মুগ্ধচিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন—তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হল। "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে", "এস হে গৃহদেবতা", "এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ", "চিরবন্ধু চিরনির্ভর" প্রভৃতি আমার আনা সুরে বসান গান।'[২] অন্যত্র তিনি লিখেছেন : 'মহীশূরে পদার্পণ করে দেখলুম একেবারে সঙ্গীতের রাজ্যে প্রবেশ করেছি।···'মহারাণী গার্লস স্কুল' দেখতে গেলুম। সেখানে দেওয়ানের পৌত্রীর তরঙ্গায়িত কণ্ঠে ত্যাগরাজ নামে প্রসিদ্ধ তেলেগু কবির রচিত

অনেকগুলি ওদেশী ক্লাসিকাল গান শুনে মুগ্ধ হলুম এবং মেয়েটিকে বাড়িতে আনিয়ে তার কাছ থেকে সেগুলি আদায় করলুম। দেশে ফিরে রবিমামাকে উপঢৌকন দিলুম। তিনি তাদের ভেঙে ভেঙে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করলেন—বাঙলার সুররাজ্য বিস্তৃত হল।'[৩] লক্ষণীয় অধিকাংশ স্বরলিপি সরলা দেবীরই করা।

মাঘোৎসবের সময়ে ও পরে কিছুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন। ১৩ মাঘ [বুধ 25 Jan] সত্যপ্রসাদ তাঁর হিসাব-খাতায় লিখে রেখেছেন :

'রবিমামার, ৫৫০্ টাকার মধ্যে অদ্য তারিখে দেন ১৩০্'-এর মধ্যে ৩৫০্ টাকা সত্যপ্রসাদ 'রবিমামাকে হাওলাত' দিয়েছিলেন ২৬ পৌষ তারিখে।

সাধনা, মাঘ ১২৯৯ [২/৩] :

১৮১-৮৯ 'বাঙ্গলা লেখক' দ্র সাহিত্য [১৩৬১]। ২৩৫-৪১

১৯৮-২১৬ 'ডায়ারি।/(ভূমিকা)' দ্র পঞ্চভূত ২।৫৪১-৪৯ ['পরিচয়']

২২৬-২৭ 'উক্ত প্রবন্ধ [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'সুখ না দুঃখ?'] সম্বন্ধে বক্তব্য'

২৬৪-৭১ 'প্রসঙ্গ-কথা' [সূচীপত্রে : 'ছাত্রদের নীতিশিক্ষা']

২২৮-৩৭ 'সুভা' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭।২৩৬-৪২

এছাড়া 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে' গানটির ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয় [পৃ ২৭২-৭৫]।

ভারতী ও বালক-এর মাঘ-সংখ্যায় [১৬।১০] সরলা দেবী-কৃত 'আমার পরাণ লয়ে' গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছিল [পৃ ৫৮০-৮২]।

'ডায়ারি' সাধনা ও বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজন। পত্রিকাটির জীবৎকালের প্রায় শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণীর রচনা প্রথমে প্রায় নিয়মিত ও পরে অনিয়মিত ভাবে 'ডায়ারি', 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' ও 'পঞ্চভৌতিক ডায়ারি' শিরোনামে বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে স্বতন্ত্র ষোলোটি শিরোনামে রচনাগুলি 'পঞ্চভূত' নামে সংকলিত হয় বৈশাখ ১৩০৪-এ। বর্তমান সংখ্যার রচনাটি উক্ত 'ডায়ারি'র ভূমিকা', গ্রন্থে 'পরিচয়' শিরোনামে আখ্যাত। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই লিখেছেন : 'পাঠকেরা যদি "ডায়ারি" শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন।···শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটা মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা।···কোনো মানুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে।···পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে গুটিকতক বিশেষ মানুষ বিশেষরূপে সংলগ্ন হইয়া একটি বিশেষ ঐক্য নির্ম্মাণ করে। তাহার অসংখ্য আলাপী আত্মীয়দের মধ্যে সেই কয়েকটি লোকই যেন তাহার সীমানা নির্দেশ করিয়া দেয়।···রচনার সুবিধার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবল পাঁচ জনকে লওয়া যাক্। এবং তাঁহাদের পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক্। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।'[১] অপ্ তেজ ও মরুৎ-এর নূতন নামকরণ করা হয় স্রোতস্বিনী, দীপ্তি ও সমীরণ [গ্রন্থে সমীর নামে আখ্যাত]। এ ছাড়া আছেন ভূতনাথ বা লেখক স্বয়ং। কোনো একটি বিষয় নিয়ে এই ছ'জনের বক্তব্য অবলম্বন করে এক-একটি রচনা গড়ে উঠেছে।

এই বিশিষ্ট রচনারীতির মূলে বিভিন্ন ইংরেজ লেখকের প্রভাবের কথা অনেকে অনুমান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন, সেই সূত্রে বিভিন্ন লেখকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তাঁর রচনায় থাকতেই পারে। কিন্তু তাঁর নিজের লেখাতেই এই রীতির সাক্ষাৎ মেলে ১২৯২ বঙ্গাব্দে বালক পত্রিকায় মুদ্রিত 'চিরঞ্জীবেষু' 'শ্রীচরণেষু' রচনা-মালায়—একটি বিষয়কে দু'টি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার উদাহরণ রয়েছে ঐ রচনাগুলিতে। এরপর ২২ কার্ত্তিক ১২৯৫ তারিখে যে 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-এর উদ্বোধন হ'ল, তাতে নানা বিষয়ে ঠাকুরপরিবারের বিভিন্ন সদস্য ও তাঁদের বন্ধুরা যেভাবে বিভিন্ন বিতর্কের অবতারণা করেছেন আমরা যথাস্থানে সে-সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্রনাথ পালিতের 'পত্রালাপ' এই রীতির আর-একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের ধারণা, এই-সব প্রচেষ্টার পরিবর্ধিত ও পরিণত রূপ দেখতে পাওয়া যায় 'পঞ্চভূত'-এর রচনারীতিতে। পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ রবীন্দ্রনাথের লেখা বেশ কয়েকটি রচনা সামান্য সংস্কার-সহ 'পঞ্চভূত'-এ গৃহীত হয়েছে, এই তথ্যটি আমরা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি।

পঞ্চভূত-এর চরিত্রগুলিতে ব্যক্তিবিশেষের ছায়াপাত ঘটেছে, এ-সম্পর্কে সকলেই একমত—কিন্তু কোন্ চরিত্রটি কার আদলে গঠিত, এ-নিয়ে নানা জল্পনা হয়েছে। দীঘাপতিয়ার শরৎকুমার রায় লিখেছেন : "অক্ষয়বাবুর [মৈত্রেয়] মুখে শুনিয়াছি, তিনি এবং নাটোর মহারাজ [জগদিন্দ্রনাথ রায়] নাকি রবিবাবুর পঞ্চভূতের ডায়েরীর দুইটি 'ভূত' ছিলেন।"[১] এছাড়া ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় সরলা দেবী ও নিজের সম্পর্কে বলেছেন : 'আমার এক একবার মনে হয় রবিকা তাঁর পঞ্চভূতের ডায়েরীতে কতকটা আমাদের ছায়াবলম্বনে দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর চিত্র এঁকেছেন; তবে সেটা আমার অনুমান মাত্র হতে পারে।' আমরা এই অনুমান সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করি। রবীন্দ্রনাথও পঞ্চভূতের অন্তর্গত দুই নারী চরিত্র স্রোতস্বিনী ও দীপ্তিকে লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে বর্ণনা করেছেন। নম্র, লজ্জানত, স্নেহশীল নারীত্বে মণ্ডিত স্রোতস্বিনী ইন্দিরা দেবীরই একটি প্রতিরূপ—ভূতনাথের সহানুভূতি-পূর্ণ স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব এই নারীটির প্রতিই অধিক। প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও মনীষায় সমুজ্জ্বল দীপ্তি চরিত্রটির সঙ্গে সরলা দেবীর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়বে। সে-তুলনায় পুরুষ চরিত্রগুলি কিছুটা বিমিশ্র ধরনের—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বভাববৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর কথা পুনরায় উদ্ধার করি : 'রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে কোনোরূপ লেখাপড়া করতেন না। কিন্তু মনে মনে একখানি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করতেন। সে বইয়ের নাম পঞ্চভূতের ডায়ারি; যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং আমাদের তর্কের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। লোকেনের সঙ্গে তর্কে আমার মতামতের অনুকূল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং মহারাজা।'[২] এই বিতর্ক-সভার সভ্যগণ পঞ্চভূতের তিনটি পুরুষ-চরিত্রের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়েছেন।

বর্তমান সংখ্যার 'ডায়ারি'তে পঞ্চভূত-সম্প্রদায়ের পরিচয় দেওয়া ছাড়াও ডায়ারি লেখার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ 1890-তে বিলাত-ভ্রমণের সময়ে ডায়ারি রক্ষা করেছিলেন এবং সেই ডায়ারির সুসংস্কৃত রূপ 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' নামে সাধনা-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। আমাদের অনুমান, এই ডায়ারির সূত্রেই রবীন্দ্রানুরাগী আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছিল সেটিকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে রূপ দিয়েছেন। 'পঞ্চভূত' বাঙালি পাঠকের একটি অবশ্য পঠনীয় পুস্তক, সুতরাং এই অলোচনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই—এখানে আমরা কেবল গ্রন্থে বর্জিত সাধনা-র মূল

পাঠের কিছু অংশ উদ্ধার করে দিচ্ছি, তাতে দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর বেনামীতে সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবীর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকস্মিত মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে : 'মেয়েদের মাথায় অনেকগুলি অন্ধ সংস্কার থাকে, শ্রীমতী দীপ্তির মাথায় তন্মধ্যে এই একটি সংস্কার ছিল যে, আমি নিতান্ত যে-সে লোক নহি। আমি কি ভাবি, কি করি, তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকা কর্ত্তব্য; অন্ধ বর্ত্তমান যদিবা আমাকে অনাদর করিয়া থাকে দূরদর্শী ভবিষ্যৎ আমাকে নিশ্চয় সন্ধান করিয়া বাহির করিবে। বলা বাহুল্য, এই সংস্কার দূর করিবার জন্য আমি অত্যধিক প্রয়াস পাই নাই।/শ্রীমতী স্রোতস্বিনীও আমার মস্তকের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া দুই একটা অকালপক্ক কেশের সন্ধান করিতে করিতে, স্নেহ-মুখে, সস্মিতনেত্রে কহিলেন "সত্যি, তুমি ডায়ারি লেখনা কেন?" বিশ্বাস-পরায়ণা স্রোতস্বিনীর মাথায়ও আমার সম্বন্ধে দুই একটি অমূলক সংস্কার আছে।'[৩]

'উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'সুখ না দুঃখ?' [পৃ ২১৬-২৫] প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধটি হাল্‌কা চালে রচিত, মানবজীবনে সুখ ও দুঃখের মধ্যে কোন্‌টির প্রাধান্য বেশি এই নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখলেন : 'মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জনা করিবেন।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বক্তব্য'-তে প্রথমেই অভিযোগ করলেন : 'লেখক মহাশয়ের লেখনী অজ্ঞাতসারে বামের দিকেই কিঞ্চিৎ অধিক হেলিয়াছে—তিনি মনে মনে দুঃখকেই যেন বেশী প্রাধান্য দিয়াছেন।' সুখ-দুঃখ সম্পর্কে একটি দার্শনিক বোধ তাঁর মনে বহুদিন ধরেই সক্রিয় ছিল, এখানে সেই বোধ থেকে দুঃখ সম্বন্ধে লিখেছেন : 'ধর্ম্মব্যবসায়ীরা অন্ধভাবে বলপূর্ব্বক দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ করিয়া কেবল ছেলে ভুলানো হয় মাত্র।...জগতে এমন শত সহস্র দুঃখ আছে যাহার মধ্যে মানববুদ্ধি কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারে না। এমন অনেক কষ্ট, অনেক দৈন্য আছে, যাহার কোন মহিমা নাই, যাহা জীবের আত্মাকে অভিভূত, সঙ্কীর্ণ, শ্রীহীন করিয়া দেয়—দুর্ব্বলের প্রতি সবলের, প্রাণের প্রতি জড়ের এমন অনেক অত্যাচার আছে, যাহা অসহায়দিগকে অবনতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে—আমরা তাহার কোন কারণ, কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই না। মঙ্গল পরিণামের প্রতি যাহার অটল বিশ্বাস আছে তিনি এ সম্বন্ধে বিনীতভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং জগদীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিথ্যা ওকালতি করিতে বসা স্পর্দ্ধা বিবেচনা করেন। অতএব জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহি না।' কিন্তু দুঃখকে ঐকান্তিক দৃষ্টিতে দেখে অভিভূত হওয়ার তিনি বিরোধী, কারণ 'অনেক সময়ে একটা জিনিষকে তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে গেলে তাহাকে অপরিমিত গুরুতর করিয়া তোলা হয়।...আমরা আমাদের কল্পনাশক্তির সাহায্যে দুঃখকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত সংসারের মধ্যে সে অনেকটা লঘুভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই কারণেই এই দুঃখ পারাবারের মধ্যেই সমস্ত জগৎ এমন অনায়াসে সন্তরণ করিতেছে, অমঙ্গল মঙ্গলকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না, এবং আনন্দ ও সৌন্দর্য্য চতুর্দ্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।'

'প্রসঙ্গ-কথা' রচনাটি স্বাক্ষরহীন, কিন্তু বক্তব্য ও রচনারীতির দিক দিয়ে এটিকে আমরা রবীন্দ্র-রচনা ব'লে গ্রহণ করেছি। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি গ্রন্থ-সমালোচনা, দীর্ঘতার জন্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য আলোচনার

সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র। প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন : 'রাজসাহী কলেজের কোন একজন প্রোফেসর "ইন্দ্রিয়-সংযম" নামক এমন একখানি গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন যে, আমি ত ওরকম পুস্তক বালকদের হস্তে দিতে সঙ্কোচ বোধ করি। বালকবালিকা ও মহিলাদের পাঠ্য মাসিকপত্রে এরকম পুস্তকের সম্যক সমালোচনা করা অসম্ভব।···এই বইখানি আবার রাজসাহী কলেজের নিয়ম অনুসারে সকল ছাত্রই পড়িতে ও শুধু পড়িতে নয় কিনিতে বাধ্য।' ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দেবার এই অত্যুৎসাহকে রবীন্দ্রনাথের 'হুজুক' ব'লে মনে হয়েছে : 'শুদ্ধমাত্র "মর‍্যাল টেক্স্‌ট্‌বুক" পড়াইয়া নৈতিক উন্নতিসাধন করা যায় একথা যদি কেহ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে এপ্রকার অসীম বিশ্বাসকে সকৌতুকে প্রশংসা করা ছাড়া আমি আর কিছু বলিতে চাহিনা। এরকম বিশ্বাসে পর্ব্বত নড়ান যায়, দুর্নীতি ত সামান্য কথা।' এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের নীতিশিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তার উপাদান রয়েছে, শিক্ষা-সম্পর্কে এই সময় থেকেই তিনি কত গভীরভাবে ভাবছেন তার পরিচয় হিশেবে সেটি উদ্ধারযোগ্য : 'নীতিশিক্ষার উচিত উপায় হচ্ছে [যদ্দৃষ্টং], কর্ত্তব্য ও পবিত্রতার সৌন্দর্য্য বাল্যাবস্থায় মনের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। পবিত্রতা, সত্য, দয়া, অহিংসা ইত্যাদিকে যদি হৃদয়মধ্যে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল করিতে চাই ত এই সব গুণের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই মন আপনা হইতেই এদিকে আকৃষ্ট হইবে।···নীতিবচনের বাঁধি বোলের মধ্যে পবিত্রতা ও ন্যায়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কতদূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ ত বরং ভাল নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও। মরাল টেক্স্‌ট্‌বুক-এর সহিত হৃদয়ের কোনই সংশ্রব নাই।/আমাদের নীতিজ্ঞেরা আমোদ-আহ্লাদের উপর বড়ই নারাজ। কিন্তু আমি বলি যে, যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে চাও ত তাহার পরিবর্ত্তে বৈধ আমোদ-আহ্লাদটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়'। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা-ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। 'সুভা' গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক অনাথনাথ মিত্র *The Modern Review* পত্রিকার Sep 1910 (pp. 289-93)-সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এই অনুবাদটিই *Mashi and Other Stories* (1918) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সম্ভবত মাঘ মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ উড়িষ্যা যাত্রা করেন। এই সফর পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল, ২৮ অগ্র° মৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন : 'চেষ্টা করব উড়িষ্যায় যদি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। সে জায়গাটা ভারি স্বাস্থ্যকর। আমি বাবামশায়কে আমার ইচ্ছে কতকটা জানিয়ে রেখেচি তিনিও কতকটা বুঝেচেন —আর দুই একবার বল্লে কিছু ফল হতেও পারে—কিন্তু আগে থাক্‌তে বেশি আশা করে বসা কিছু না।'[১]— এই আশা পূর্ণ হয় নি, মৃণালিনী দেবীর পরিবর্তে তাঁর সঙ্গী হলেন বলেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত আগের বারের মতোই সমুদ্রপথে স্টীমারে কটকে গিয়েছিলেন। কটকে এবার তাঁরা ওঠেন ডিস্ট্রিক্ট জজ বিহারীলাল গুপ্তের বাসায়। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু বিহারীলাল ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ দিন ধরেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী গুপ্ত 'সখিসমিতি'র অন্যতম সদস্যা। এঁদের কন্যা স্নেহলতার বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পুনা-র নিকটবর্তী খির্‌কি থেকে 'সুখে থাকো আর সুখী করো সবে' গানটি লিখে পাঠিয়েছিলেন [২০ বৈশাখ ১২৯৬]—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

কটকে যাবার পর ইন্দিরা দেবীকে লেখা প্রথম চিঠিটি হ'ল ছিন্নপত্রাবলী-র ৭৬-সংখ্যক পত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই পত্রটি দিয়েই ছিন্নপত্রাবলী-র পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খাতাটির উদ্বোধন হয়েছে। আপাদমস্তক খণ্ডিত এই পত্রটিতে সম্ভবত সাধনা-য় প্রকাশিত 'সুখ না দুঃখ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ব্যাখ্যাত হয়েছিল।

মঙ্গলবার 7 Feb [২৬ মাঘ] 'বালিয়া' থেকে লেখা চিঠিটির [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ১৬৩-৬৪, পত্র ৭৮] স্থান-নির্দেশ যদি সঠিক হয়, তবে অনুমান করতে হয় যে, কটকে আসার অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ জমিদারি-পরিদর্শনের জন্য বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে বালিয়াতে গমন করেন। চিঠিটি আত্মবিশ্লেষণে পূর্ণ : 'ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে।···আমি যে কোণটি ভালবাসি, সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে। আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনি অশ্রান্ত ভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কর্মোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে, যে সে অস্থির হয়ে ওঠে···এতদূর পর্যন্ত তার বাড়াবাড়ি যে, [বলু] আমার সঙ্গে এসেছে তাও যেন সে সহ্য করতে পারছে না।···সৃষ্টিকর্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী সে আপনার ভাবরাজ্যের মধ্যখানে তেমনি একলা বিরাজ করতে চায়। নইলে যেন তার সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত অস্তিত্ব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।'

বালিয়াতে দু'একদিন থেকে তাঁরা আবার কটকে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে লেখা একটি পত্রে বিহারীলাল গুপ্ত, তাঁর পরিবার ও তাঁদের বাড়িতে নিজেদের জীবনযাত্রার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : 'Mrs. Gupta ভারি নিরুপায় গোছের মেয়ে—তিনি কিছুই গুছিয়ে গাছিয়ে করে-কর্ম্মে নিতে পারেন না—··· বিহারীবাবুর অনেকটা আমার মত ধাত আছে দেখ্‌লুম। তিনি সকল বিষয়েই ভারি ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন।···কেবল তিনি আমার মত খুঁৎখুঁৎ খিট্‌খিট্‌ করেন না—সেটা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা মহা সুবিধে।··· আমাদের এমন যত্ন করেন—ঠিক যেন ঘরের লোকের মত—খুব যে বেশি আদর দেখিয়ে ব্যস্ত করে তোলা তা নয়—আমরা আমাদের ঘরে সমস্ত দিন যা-খুসী তাই করতে সময় পাই।···এমনকি বলুকেও অনেকটা বাগিয়ে আন্‌তে পেরেচেন—সে বেচারা যদিও এখনো ক্রমাগত মাথা নীচু করে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া ত একরকম বন্ধ করেচে। ওঁরা যা খেতে বলেন তাতেই মাথা নাড়ে। ভাগ্যি ওঁরা দুজনে মিলে অনেক পীড়াপীড়ি করেন তাই মুখে দুটি অন্ন ওঠে। নইলে এতদিনে শুকিয়ে যেত।'[১]

রবীন্দ্রনাথের এবারের উড়িষ্যা-ভ্রমণ বেশ ঘটনাবহুল। বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেয়ে যে খুশি হয়েছিলেন, তা পূর্বোদ্ধৃত পত্র থেকেই বোঝা যায়। স্বভাবতই এই সুদর্শন তরুণ জমিদার ও বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত কবিকে তিনি স্থানীয় উচ্চপদস্থ ইংরেজ ও ভারতীয় সমাজের সঙ্গে পরিচিত করানোর আগ্রহ বোধ করেছেন। এরই প্রথম ধাপ হিশেবে তিনি 9 Feb [বৃহ ২৮ মাঘ] তাঁর বাড়িতে একটি ডিনার-পার্টির আয়োজন করেন। ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিরূপতার কথা রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ-প্রবাসী পত্র'-এর যুগ থেকেই বলে আসছেন—সেই কথাই লিখলেন ইন্দিরা দেবীকে ছিন্নপত্রাবলী-র ৭৭-সংখ্যক পত্রে, যেটি সম্ভবত এই পার্টির পূর্বে লেখা : 'একে তো ভারতবর্ষীয় ইংরেজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। তারা স্বভাবতই আমাদের বড়ো অবজ্ঞার ভাবে দেখে, আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই, তার উপরে আবার

তাদের কাছে নিজেকে exhibit করা আমার পক্ষে বড়োই কষ্টকর।···আমাদের মধ্যে একটা কোনো পদার্থ আছে এটা যতক্ষণে ওরা স্বীকার না করবে ততক্ষণ ওদের কাছে যেতে হলে হয় অবনতি স্বীকার করে যেতে হবে, নয় অপমান অনুভব করতে হবে।'[২]

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা সত্য হয়েছিল। ডিনার পার্টির পরদিন 10 Feb [শুক্র ২৯ মাঘ] তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখলেন : 'খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। আমি একে অ্যাংলো ইন্‌ডিয়ান্‌গুলোকে দেখতে পারি নে, তার উপরে আবার কাল ডিনার-টেবিলে তাদের রূঢ় স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল[১] একটা উৎকট ইংরেজ—প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেড় হাত চিবুক, গোঁফ দাড়ি কামানো, মোটা গলা, র-অক্ষরবহীন জ্যাব্‌ড়ানো উচ্চারণ—সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা পূর্ণপরিণত জন্‌বৃষ।···গবর্মেন্ট্‌ আমাদের দেশের জুরি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চার দিকে ভারী একটা আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে বো—[? বিহারী] বাবুর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। বললে এ দেশের moral standard low, এখানকার লোকের lifeএর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়।'[২]

এখানে রবীন্দ্রনাথ যে-বিষয়টির উল্লেখ করেছেন, সেটি বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর স্যার চার্লস ইলিয়টের একটি আদেশ-সম্পর্কীয়। 20 Oct 1892 [বৃহ ৫ কার্ত্তিক] তারিখে গেজেটে প্রকাশিত একটি আদেশে বাংলার ৭টি জেলায় জুরির সাহায্যে বিচারের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হয়।[৩] প্রবল জনমতের চাপে Jan 1893-র মাঝামাঝি এই আদেশ প্রত্যাহৃত হলেও দেশীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রসমূহে যে চাপান-উতোরের পালা চলছিল, তার ফলে বাঙালি ও ইংরেজের সম্পর্ক বিষিয়ে উঠেছিল। 'উৎকট ইংরেজ' মিঃ হলোয়ার্ডের উক্তির মধ্যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

মিঃ হলোয়ার্ড ধন্যবাদের পাত্র এই জন্যে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এমন একটা পত্র লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন! একশ্রেণীর ইংরেজের প্রতি এমন ঘৃণা ও স্বদেশ প্রীতির এমন সোচ্চার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের রচনায় খুব সুলভ নয়। তিনি লিখেছেন : 'আমার যে কী রকম করছিল সে তাকে কী বলব! আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না।···ভেবে দেখ্‌ দেখি [বব] একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে!···উঃ, ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর আমাদের কী দৈন্য, কী হীনতা! অপমান চুপ করে সয়ে থাকাই যথেষ্ট হেয়, কিন্তু তার উপরে আবার ওদের কাছে গায়ে পড়ে আদর কাড়তে যাওয়া আমার বোধহয় অবনতির একশেষ।···তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের আদরের টুকরোর জন্যে আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই, আমি তাতে পদাঘাত করি। মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়, সত্যি জাত যায়—যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়, নিজের কৌলীন্য এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়—তার পরে আর আমার কিসের গৌরব!···আমাদের ভারতবর্ষের সব চেয়ে জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিট্‌ফাট

কাপড় প'রে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে, তারা যতই সভ্য যতই উন্নত হোক, আমি যদি কখনো তাদের সংশ্রবের জন্যে লালায়িত হই তবে যেন আমার মাথার উপরে জুতো পড়ে।[৪] আবেগকে এত তীব্র ভাষায় প্রকাশ করতে অভ্যস্ত নন বলেই এই বাক্যাবলীর মধ্যে আমরা অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করি। উল্লেখ্য, এর অনেক অংশই ছিন্নপত্র-তে বর্জিত।

পরের দিন [২৯ মাঘ শুক্র 10 Feb] আর একটি সম্মিলনও বিহারীলাল গুপ্তের বাসায় হয়। অবন্তী দেবী লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শুনিবার জন্য ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য শ্রীযুক্তা সৌদামিনী গুপ্তা স্থানীয় কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁহার বাড়ীতে সান্ধ্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ করেন। আমার বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ-আলাপ এই বারেই হয়।'[৫] মধুসূদন রাও উড়িষ্যার একজন প্রধান কবি, ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সদস্য ও সেই সময়ে কটক র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নব্যভারত-এ মুদ্রিত এঁর বাংলা কবিতা 'ঋষিচিত্র' পৌষ ১২৯৮-সংখ্যা সাধনা-য় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। ছিন্নপত্রাবলী-র ৮০-সংখ্যক পত্রে সম্ভবত এর কথাই আছে; যদিও সেটি বিশেষ প্রশংসার নয় : 'তার পরে তাঁর অন্যান্য দুটো-চারটে কবিতাও পড়া গেল। ভদ্রতার মিথ্যা প্রশংসাবাক্য কিছুতেই আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, আবার বিনা নোটিশে ফস্ করে নিন্দার কন্টকটুকু যথাসম্ভব মোচন করে গুছিয়ে কথা বলা ভারী শক্ত।···তার কবিতাগুলো যে খুব খারাপ তা নয়, কেবল চলনসই মাত্র।··· তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকম-সকম আছে, আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই, কেবল সেই সংগীতটি নেই যাতে মুহূর্তের মধ্যে সমস্তটি কবিতা হয়ে ওঠে।···কামিনী সেনের কবিতা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলেছিলুম। তাঁর লেখায় বড়ো ভাব এবং নতুন ভাব ঢের থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আগুন ধরে ওঠে নি।'[১]

১ ফাল্গুন শনিবার [11 Feb] মধ্যাহ্নে স-পরিবার বিহারীলাল গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ পুরীর উদ্দেশ্যে কটক থেকে যাত্রা করেন। এই দিন সকালে স্ত্রীকে লিখেছেন : 'আজ এগারোটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরতে হবে। আজ রাত্তির পথের মধ্যে একটা ডাক বাঙ্গলায় কাটাতে হবে, তারপরে কাল বোধ হয় সন্ধের মধ্যে পুরীতে গিয়ে পৌঁছতে পারব। Mrs. Gupta এবং তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাচ্চেন, সে জন্যে তাঁদের বিস্তর জিনিসপত্র বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেচে।'[২]

রবীন্দ্রনাথের মন 'ফোটোগ্রাফের wet plate-এর মতো; যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনি ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়'—সেই কারণেই তিনি হয়তো পুরীর যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেখে গিয়েছেন Pocket Book বা মজুমদার-পুঁথির পাতায় : 'কাঠযুড়ি। ধূসর বালুকার প্রান্তে স্বচ্ছ স্রোত। উচ্চ পথ, দুই ধারে নিম্ন ক্ষেত্র। মুকুলিত আম্র। বট অশ্বত্থ। খেজুর নারিকেল, বালুহস্তা, ভাগবী। সদ্দাইপুর। পথে দূরে ভুবনেশ্বর, ধাউলি inscription। পাহাড়—উপরে ভগ্নমন্দির। কেয়াগাছের বেড়া, মেঘদূত, নগনদী। সন্ধ্যার সময় বেড়ানো —দীর্ঘ পরিষ্কার ছায়াময় রাজপথ—দুই একটা covered carts। যাত্রীর অভাব। রাত্রে মুকুন্দপুর যাত্রা— নিদ্রাতুর। প্রাতে সত্যবাদী যাত্রা। পথে ক্রমে যাত্রীর আধিক্য। সারি ২ গাড়ি। সত্যবাদী। বলুরা গেল। ভোগ উপহার। পুনর্ব্বার যাত্রা। ক্রমে যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি। সন্যাসী। পথের ধারে তরুতলে যাত্রী সমাগম। চটি। বড় ২ পুষ্করিণী মন্দির। swamps। পথতরুর বিরলতা। দক্ষিণে বৃহৎ বিলের মত, মধ্যে ২ চারাধান্য, পশ্চিমে তরুশ্রেণীর মধ্যে জগন্নাথ। বালুতীর। দুটি চারটি বিচ্ছিন্ন বাড়ি। সুনীল সমুদ্র। সন্ধ্যালোকে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ।

প্রাতে স্নান।' পকেট বুকের এই পেনসিল-স্কেচ যেন রঙে-রূপে ভরে উঠেছে 14 Feb [মঙ্গল ৪ ফাল্গুন] পুরী থেকে লেখা ছিন্নপত্রাবলী-র ৮১-সংখ্যক পত্রে [পৃ ১৭১-৭৫]। কাঠযুড়ি নদীর বর্ণনায় লিখেছেন : '···এই বিস্তীর্ণ বালির ও পারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর আর-একটি উপমা যেন দেখা যায়।' পথের বর্ণনা : 'পথটা উঁচু—তার দুই ধারে নিম্নক্ষেত্র। বড়ো বড়ো গাছে ছায়াময়। অধিকাংশ আম গাছ। এই সময়ে সমস্ত আম গাছে মুকুল ধরেছে, গন্ধে পথ আকুল হয়ে আছে। ঘন দীর্ঘ তরুশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গাঢ় গেরুয়া রঙের দিব্যি তক্‌তকে পরিষ্কার পথটি চলে গেছে—দু ধারে চষা মাঠ নেবে গেছে। আম অশ্বত্থ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছ-ঘেরা এক-একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে।' চিঠির শেষে লিখেছেন : 'উড়িষ্যার এই পথটা দেখে আমার ক্রমাগত কালিদাসের মেঘদূত মনে পড়ছিল। কেয়াগাছের-বেড়া-দেওয়া দশার্ণগ্রামের কথা মেঘদূতে আছে, এখানেও অনেক গ্রাম কেয়ার বেড়া দেওয়া। বরাবর দিগন্তের ধারে ধারে নীলবর্ণ পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর মেঘদূতে যাকে নগনদী ব'লে, লেখা আছে, অর্থাৎ পাহাড়ে নদী, যে-সব নদীতে কেবল বর্ষাকালে পাহাড়ের জলস্রোত আসে, গ্রীষ্মকালে বালি এবং নুড়ি পড়ে থাকে, সেরকম নদী এখানে অনেক।'

উপরের নোটটি সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ পত্রটি লিখেছিলেন—পাঠক মিলিয়ে দেখতে পারেন।

বত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ভারতবর্ষ ও য়ুরোপে নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথ সমুদ্র দেখেছেন, তবু 'পুরীর সমুদ্র যে আমার কত ভালো লাগছে সে আমি প্রকাশ করে বলতে পারব না—এই পর্যন্ত বললেই যথেষ্ট হবে আমার মতো দরিদ্র ব্যক্তি ধার করে এখানে সমুদ্রের ধারে একটি বাংলা তৈরি করবার উদ্যোগ করছে।' এই উদ্যোগ সম্ভবত বর্তমান সময়ে সার্থক হয় নি—১৩০৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে রবীন্দ্রনাথ পুরীতে একটি বাড়ি ক্রয় করেন।

পুরীর সমুদ্র যে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছে, তার আরও প্রমাণ আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত নোটেই 'প্রাতে স্নান'-এর উল্লেখ পেয়েছি, পকেটবুকে লিখিত হিসাবে 'পুরীতে স্নানের ধূতি একযোড়া—২' ও 'পানিওয়ালা [? নুলিয়া]—২' সন্ধান পাওয়া যায়। একটি পৃষ্ঠার শীর্ষে লেখা আছে : 'হে সিন্ধু ধরিত্রী গর্ভের সন্তান,/অনিন্দ্য সুন্দর। কত দীর্ঘ যুগ ধরে/আঁধার জঠরে'—সবটাই কেটে দেওয়া; কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার বীজ এখানে রোপিত হয়েছে—প্রায় দেড় মাস পরে রামপুর বোয়ালিয়া-য় সেটি প্রস্ফুটিত হয়।

উক্ত পত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমরা আবার আজ রাত্রে কনারককে সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে যাচ্ছি।'[১] তাঁর নিজের লেখার কণারক-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিশেষ রূপ লাভ করেনি, কিন্তু বলেন্দ্রনাথের লেখা 'কণারক/ (উড়িষ্যার সূর্য্যমন্দির') প্রবন্ধ সাধনা-র ভাদ্র ১৩০০ [পৃ ৩১২-১৭] সংখ্যায় মুদ্রিত হয়—আমাদের ধারণা, রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথের হস্তচিহ্ন বহুল পরিমাণে বর্তমান। বস্তুত, তিনি যেন উড়িষ্যা ভ্রমণকে অবলম্বন করে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব বলেন্দ্রনাথকেই অর্পণ করেছিলেন। 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' [বৈশাখ ১৩০০। ৪৫৭-৬৬], 'খণ্ডগিরি' [ঐ, জ্যৈষ্ঠ। ১-৭], 'কণারক' ও 'প্রাচীন উড়িষ্যা' [ঐ, আশ্বিন-কার্ত্তিক। ৩৯৯-৪০৮] প্রবন্ধে তিনি এই অভিজ্ঞতাকে সাহিত্য-রূপ দেন। 'সম্মুখে আম্রমুকুলিত ছায়াময় প্রাচীন পথ, কাঠজুড়ির বালুগহ্বর হইতে উঠিয়া পুরুষোত্তমের দ্বার অবধি প্রসারিত।···মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী বাসন্তী নগনদী পথের

মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদুপ্রবাহে বহিয়া গিয়াছে।'[২] ইত্যাদি বর্ণনা প্রমাণ করে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের নোটটিও ব্যবহার করেছিলেন।

কটকে ভারতবর্ষীয় ইংরেজের সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুখজনক হয় নি, পুরীতেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটল। এর পরেই তিনি ইন্দিরা দেবীকে পত্র লেখেন, কিন্তু পত্রটি রক্ষিত হয় নি। পরে সোমবার [6 Mar ২৪ ফাল্গুন] কটক থেকে লেখা আর একটি পত্রে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। পুরীতে থাকার সময়ে একদিন বিহারীবাবু ও তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের উদ্দেশে পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়াল্‌স-এর বাড়িতে যান। চাপরাশি এসে খবর দিল, পরদিন সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে। বিরক্ত ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর 'সন্ধের সময় চিঠি এল যে মিসেস ওয়াল্‌স··· ভারী দুঃখিত। জজসাহেব এবং তাঁর মেমসাহের যে খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর চাপরাশি সে কথা তাঁকে জানায়নি। আমিও তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু এর ভিতরকার কথাটা এই যে, ম্যাজিস্ট্রেট যদিও জজসাহেবকে অমান্য করতে চায় না—কিন্তু কোনো 'নেটিভ' ভদ্রলোক গেলে তাকে তার পরদিন সকালবেলা মুলাকাৎ করতে আসতে বলে।···আমি যতই ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্ত লোক হই-না কেন, ওদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই।···পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট পরদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কি তাতে ভারী খুশি হয়েছিলুম? তা মনেও করিস নি। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড়ো বেশি স্পষ্টরূপ অভিমান প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্বতা হয়—তা ছাড়া বিহারীবাবুদের বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়। তাই খেতে গেলুম, ম্যাজিস্ট্রেটের শ্যালীর পাণিগ্রহণ করে সহাস্যমুখে টেবিলে বসলুম—···তার পরে *সাহেবের* গান শুনলুম, *সাহেবকে* গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম [বাঁকা অক্ষরের শব্দ দু'টি পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা ও ছিন্নপত্র-তে গৃহীত]। এই-যে বাহবাটুকু পাওয়া যায় একি যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে?···ওতে আমরা অতি সামান্য বাহ্য সম্মান পাই, কিন্তু আমাদের যথার্থ আত্মসম্মান তলে তলে নষ্ট করে ফেলে। আমরা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ঐ করতালির নির্দেশমত আপনার জীবনটা গঠিত করতে থাকি এবং তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে ফেলি।'[৩]

—কটকের ও পুরীর দু'টি অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। দেড় বছর পর লেখা 'অপমানের প্রতিকার' [দ্র সাধনা, ভাদ্র ১৩০১। ২৮৩-৯৪; রাজা প্রজা ১০। ৪১০-১৭] প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি কটকের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন : 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' [দ্র সাধনা, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০১। ৪৯৯-৫৪৬; রাজা প্রজা ১০ | ৩৭৯-৪০৩] প্রবন্ধটি পুরীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা—পত্রের শেষে মৃৎপাত্র ও কাংস্যপাত্রের যে উপমাটি আছে, ঠিক সেই উপমাটিই প্রবন্ধের একস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'পয়সার লাঞ্ছনা' [দ্র সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০। ১২-১৫; ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৫১৮-২০] নামক ব্যঙ্গ-রচনাটি এই-সব ঘটনার অভিঘাতেই রচিত হয়েছিল ব'লে আমাদের ধারণা।

পুরী থেকে রবীন্দ্রনাথ কবে কটকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন জানা যায় নি। ফেরার পথে তাঁরা ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি ও উদয়গিরি খণ্ডগিরির গুহা-ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন। মজুমদার-পুঁথিতে এই ভ্রমণেরও একটি বিবরণ আছে : 'খণ্ডগিরি। রাণীগুম্ফ—ছবি—পালিলেখা—মানুষের ভাব খুদে রাখবার প্রবৃত্তি—উপর থেকে

দৃশ্য—অরণ্যপথে মানুষ টানা গাড়ি দুইধারে বিরলপত্র কুঁচলের বন। হাজারিবাগের ধরন পাহাড়ে রাস্তা, সরীসৃপের মত। উপরে যখন চড়ে পর্ব্বতদৃশ্য। দৈবাৎ মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত। বড় রাস্তা। দুই ধারে প্রস্তরময় উঁচু নীচু পাহাড়ে জমি। সম্মুখে ঘন মেঘ ও সুনীল পর্ব্বতমালা। ঈষৎ বৃষ্টির সূত্রপাত। অদূরে বাঙ্গলা। মধ্যে ভাঙ্গা পথ। বন্যায়।' অল্প একটু হিসাবও পাওয়া যায় : 'সর্দ্দাইপুর—রেজেষ্ট্রি &c ২্ / ভুবনেশ্বর—পাণ্ডা &c ৭্ / খণ্ডগিরি গাড়িটানা কুলি—॥,'। রবীন্দ্রনাথ অনেক বছর পরে 'মন্দির' [দ্র বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১০। ৪০৭-১১; ভারতবর্ষ ৪। ৪৫৫-৬০] প্রবন্ধে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখার স্মৃতিকে তত্ত্বায়িত করে প্রকাশ করেছেন।

ভ্রমণ শেষে কটকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ যেন উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন। 25 Feb [শনি ১৫ ফাল্গুন] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'দেখিস আমার লেখা আজ হু হু করে এগিয়ে যাবে—চৈত্র মাসের সাধনার জন্যে যে ডায়ারিটা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম এবং যা ভাঙা রাস্তায় বহুভারগ্রস্ত গোরুর গাড়ির মতো কিছুতে এগোতে পারছিল না, আজ সেটা নিশ্চয় শেষ করে ফেলব। যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মতো বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি।··· আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব—নিদেন আমার দু-চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মর্‌চে পড়তে দেব না —এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব।'[১] বরাবরের মতো রবীন্দ্রনাথ সাধনা-কে হাতে রেখে দিতে পারেননি, কিন্তু প্রথমাবধি তিনি একে কুঠারের মতোই ব্যবহার করেছেন—সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে তা বার বার ঝল্‌সে উঠেছে।

চিঠিতে যে 'ডায়ারি'র কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে 'নরনারী' [দ্র ২। ৫৫৮-৬৮] নামে সংকলিত হয়। 'স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-এ, এই নিয়ে শরৎকুমারী চৌধুরানী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বিতর্কে প্রবৃত্ত হন; পরে কৃষ্ণভাবিনী দাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিতর্ক হয় সমাজে নারীর স্থান নিয়ে—রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছেন। বর্তমান 'ডায়ারি'টিতে সেই-সব বিতর্কের কিছু চিহ্ন থাকলেও পুরুষের তুলনায় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা এর প্রধান উপজীব্য—পঞ্চভূত-সভার দু'টি নারী-সদস্যা নানা ভাবে তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। প্রবন্ধটির সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এর শেষাংশের দীর্ঘ সংযোজন। স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির প্রস্থানের পর ১৩৪২-এর সংস্করণে এই সংযোজনের রহস্য উদ্ধার করেছেন ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সুধীরচন্দ্র করের 'কবি-কথা' গ্রন্থ থেকে : 'পঞ্চভূত ছাপা হচ্ছে; অনেকদিন পর নূতন সংস্করণ হবে। কবি নিজে একটি প্রুফ দেখতে চাইলেন। মেয়েদের আলোচনার অংশে এসে দাঁড়ালো এক বিপর্যয়। তাঁরই জানা উচ্চশিক্ষিতা একটি মেয়ে বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলেন, ভালোবেসেছিলেন একজনকে। তাঁর ভালোবাসার দায়ে পুরুষটির উন্নতির পথ ব্যাহত হয়। অথচ শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তাঁকে বিয়ে করলেন না। কবি ঘটনা জেনে

মর্মাহত হয়েছিলেন। রেগে গিয়ে বলেছিলেন,—সংসারে পুরুষদেরই অপবাদ—মেয়েদের তারা ডোবায়। কিন্তু কত মেয়ে যে পুরুষদের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়েছে, ভালোবাসার উৎপীড়নে শেষ পর্যন্ত জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে, তার খবর কে রাখে।/ এই বলে আটকে রাখলেন প্রুফ। তাতে যোগ হল নূতন এক অধ্যায়, মেয়েদের উপর কড়া মন্তব্য নিয়ে।'[১]

কটকের ব্রাহ্ম পরিবারগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আগেই আলাপ হয়েছিল; তাঁদের আহ্বানে তিনি ১৬ ফাল্গুন [রবি 26 Feb] স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিলেন। মধুসূদন রাও-এর কন্যা অবন্তী দেবী লিখেছেন : 'সেই বারেই কটকের ওড়িয়াবাজারস্থিত ব্রহ্মমন্দিরে এক রবিবাসরীয় উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত গাহিবার ভার লইয়াছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ কোন্ গান গেয়েছিলেন বিবরণে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু উপাসনা অনুষ্ঠানটি তাঁর পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয়নি সেকথা জানিয়েছেন 27 Feb [সোম ১৭ ফাল্গুন] ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে : 'কিন্তু মধুসূদন রাও ব'লে যিনি বেদীতে বসেছিলেন তিনি এমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, শ্রোতাদের কিছুমাত্র ধৈর্য ছিল না। ওরকম ক্রমাগত কথা শুনতে শুনতে মন একেবারে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায় —উপাসনার ঠিক বিপরীত ফল হয়।'[২] রবীন্দ্রনাথ তখনও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, তবু আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা প্রকাশ করে লিখেছেন: 'ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় এই জন্যেই যেতে ইচ্ছে করে না।···এইজন্যে আমি নিজেও বেদীতে উঠে বলতে চাই নে, জানি সে বিষয়ে আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই—এবং প্রতি বুধবারে নিয়মিত চিন্তামণি [চট্টোপাধ্যায়]-র বক্তৃতা শুনে আসাও আমার কর্তব্য জ্ঞান করি নে—বড়দাদা যখন একটা কিছু বলেন তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং উপকার হয়।'[৩] এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকত্ব হিসাব-পত্র দেখা, বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও সংগীত-পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দীর্ঘ দিন পরে ৭ পৌষ ১৩০৬ তারিখে শান্তিনিকেতনের নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বেদী গ্রহণ ক'রে উপদেশ প্রদান করেন।

পরের দিন 'কটক/মঙ্গলবার' [১৮ ফাল্গুন 28 Feb] লেখা চিঠিটি সম্ভবত ছিন্নপত্রাবলী-র ৭৭-সংখ্যক চিঠি-প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীর পত্রের উত্তরে লিখিত। অসম্পূর্ণতা আত্মপ্রকাশের পক্ষে অনুপযুক্ত এ-কথা তিনি বালক-এর 'বীর গুরু' [শ্রাবণ ১২৯২] প্রবন্ধ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলে আসছেন, বর্তমান পত্রে সেই কথাটিই বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; পুনর্বার গুরু গোবিন্দের আত্মগঠনের নির্জন সাধনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে লিখেছেন : 'যারা ইংরেজ-সংসর্গ-সম্মানের স্বাদ একবার পেয়েছে তারা যে সেটাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে সেজন্যে আমি তাদের দোষ দিই নে—এ আকর্ষণ এ প্রলোভন খুব গুরুতর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই জন্যেই আমি নিজের কোটরে লুকোতে চাই। কুচবিহারের রাজা যে স্বদেশে বসে রাজত্ব করার চেয়ে সিমলায় গিয়ে সাহেবের সঙ্গে টেনিস খেলতে এবং মেমের সঙ্গে নাচতে ভালোবাসে—সাহেব-মেমেরা তাকে দ্বারভাঙ্গার রাজার চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা করে, বলে যে একজন ইংরেজের সঙ্গে এর কোনো প্রভেদ নেই—এখন তার পক্ষে কুচবিহারে বসে রাজত্ব করা কি কম কঠিন! আমি হলেও হয়তো ঠিক ঐ রকম হতুম—আমিও বাঙালি, আমারও স্বাধীন তেজ নেই। সেই জন্যেই সেটা গোপনে সঞ্চয় এবং বহু যত্নে পালন করতে হবে—সেটা যতক্ষণ না সবল ও আত্মরক্ষণক্ষম হয়ে উঠবে ততদিন তাকে অন্তরালে রেখে কাঠখড় যোগাতে হবে। তার পরে আর কাউকে ভয় করি নে'[৪]—বিশ্বখ্যাতি লাভের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনও এই দীর্ঘ সাধনার ইতিহাস।

লক্ষণীয়, এই সংকল্পের ঘোষণা রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশবাসীর কাছেও গোপন করতে চেয়েছেন—বর্তমান চিঠিটি সম্পূর্ণ এবং ৭৭-সংখ্যক পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ ছিন্নপত্র [১৩১৯]-তে সংকলিত হয়নি।

এর পর রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে আবার জমিদারি-পরিদর্শনে যান। 'শুক্রবার' [২১ ফাল্গুন 3 Mar] বালিয়া থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : "আমরা এখনো বোটেই আছি। ছোট্ট বোটখানি। একটি বড়ো জলিবোটের উপর ছাত তৈরি করে এই বোটটি হয়েছে—'আমার মতো লম্বা লোকের দৈর্ঘ্যগর্ব খর্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি।' জমিদারি দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলেও জলপথে অলস ভ্রমণের ভাবই তাঁর আচরণে ফুটে উঠেছে : 'আজ আর শীত কিম্বা সভ্যতার কোনো খাতির নেই—বনাতের চাপকান এবং চোগা হুকের উপর উদ্‌বন্ধনে ঝুলছে—নীল-লোহিত-রেখাঙ্কিত জিনের রাত্রিবস্ত্র প'রে নিঃসংকোচে প্রভাতযাপন করছি, ঘণ্টাও বাজছে না, সসজ্জিত খানসামা এসেও সেলাম করছে না—অর্ধসভ্যতার অপরিচ্ছন্ন শৈথিল্য এবং আরাম উপভোগ করছি।'[১] এই চিঠিতে লিখেছেন, 'শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ে এসেছে—রৌদ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে'—কিন্তু একই দিনে 'তীরতল' থেকে লেখা চিঠির বর্ণনা অন্যরকম : 'বাদলার পর বাদলা, এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখেশুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে কটকের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি—আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্র স্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠবে, ভালোবাসার ছলছল মুগ্ধ দৃষ্টির মতো, সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে।' পত্রটিতে মফস্বল-ভ্রমণের সময়ে তাঁর পড়াশুনোর আয়োজনটি কেমন থাকত তার একটি তথ্যবহুল ও কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা আছে : "আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচার থেকে আরম্ভ করে শেকস্‌পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই ছোঁব না, কিন্তু কখন্ কী আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্য বার বরাবর আমার বৈষ্ণবকবি এবং সংস্কৃত বই আনি; এবার আনিনি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না, তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল, একেই বলে 'হেরফের'।"[২]

পাণ্ডুয়ায় বর্ষাযাপন দীর্ঘায়ত হয়নি, পরদিনই ২২ ফাল্গুন [শনি 4 Mar] 'তালদণ্ডা খাল/ পাণ্ডুয়া হইতে কটকের পথে' কবিতা লিখলেন 'অনাদৃত' [দ্র সোনার তরী ৩। ৭৭-৭৯]। ৩০ আষাঢ় ১৩০০ [13 Jul 1893] সাজাদপুর থেকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির ভাব-ব্যাখ্যা করেছেন, 'সোনারতরী' কবিতার আলোচনায় আমরা তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি। পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 129] কবিতাটির নামকরণ হয়নি, পত্রে সেটি 'জাল ফেলা' নামে অভিহিত।

২৩ ফাল্গুন [রবি 5 Mar] লেখা হ'ল দু'টি কবিতা; 'খালপথে। ঝড়বৃষ্টি। অপরাহ্ণ' কালে প্রকৃতির রূপটি বাণী লাভ করল 'নদীপথে' [দ্র সোনার তরী ৩। ৮০-৮২] কবিতায় ও 'তালদণ্ডা খাল/ বালিয়া হইতে কটক পথে' লিখলেন 'দেউল' [ঐ ৩। ৮২-৮৬]। শেষোক্ত কবিতাটির ভাব ব্যাখ্যাত হয়েছে পূর্বোল্লিখিত পত্রে : 'যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র প'ড়ে সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা

এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি। বোধ হয় উড়িষ্যার মন্দিরগুলো দেখে দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে।’[৩]

২৪ ফাল্গুন [সোম 6 Mar] রবীন্দ্রনাথ আবার কটকে এসে পৌঁচেছেন। ‘সোমবার’ ইন্দিরা দেবীর পত্রের উত্তরে তাঁকে পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ১৮৮-৯১, পত্র ৮৭]। ‘মঙ্গলবার’ [২৫ ফাল্গুন 7 Mar]-এর পত্র সুরেন্দ্রনাথ-বিষয়ে—এর প্রতিটি ছত্র এই ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি ভালোবাসায় স্নিগ্ধ : “সুরি বেচারা এক্‌জামিন পাস করবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি। ওর উচিত ছিল আমার মত পাশ-কাটানো ‘লিটারেরি’ হওয়া।”[৪] ‘লিটারেরি’ শব্দটায় উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেওয়ার লক্ষ্য ভারতী ও বালক-এর আশ্বিন-কার্তিক ১২৯৮-সংখ্যায় মুদ্রিত ‘বরখাস্তী উমেদার’ যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ‘লিটারেরী’ প্রবন্ধ—প্রথম-সংখ্যা সাধনা-য় রবীন্দ্রনাথ রচনাটির বিদ্রূপ সমালোচনা করেছিলেন। ছিন্নপত্রাবলী-র চিঠিতে অনেক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ এইভাবে উদ্ধৃতি-চিহ্নাঙ্কিত, যার অনেকগুলির সূত্র নির্ধারণ করা যায়নি—সম্ভবত আত্মীয়-মহলে বিশ্রম্ভালাপের সময়ে এই-সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হত।

২৮ ফাল্গুন [শুক্র 10 Mar] রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ‘উড়িয়া’ জাহাজে ক’রে কলকাতা রওনা হন। পথে বৈতরণী নদীর উপর ‘বিশ্বনৃত্য’ [দ্র সোনার তরী ৩। ৮৬-৯০] কবিতা রচিত হয়। গ্রন্থে কবিতাটির রচনার তারিখ : ২৬ ফাল্গুন, ১২৯৯, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে তারিখের বদলে ‘শুক্রবার’ লিখিত—এই নির্দেশ থেকে আমরা কবিতাটির রচনাকাল ও রবীন্দ্রনাথের কলকাতা রওনা হওয়ার তারিখ নির্ধারণ করেছি।

রবীন্দ্রনাথের কটক-পুরী ভ্রমণের প্রায় পুরো সময়টাই বৃষ্টি-বাদলায় কেটেছে, কলকাতায় এসে কয়েকদিন একই আবহাওয়ায় কাটানোর পর রোদ উঠলে 16 Mar [বৃহ ৪ চৈত্র] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : ‘এতদিন মেঘলা দিনগুলো যেন কালো ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল, আজ বেশ একখানি বসন্তী রঙের কাপড় প’রে প্রফুল্ল সুস্থ মুখে বেরিয়ে এসেছে।’[১] পত্রটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে শেষ পর্যন্ত কালি বুলিয়ে কাটা থাকলেও ছিন্নপত্রাবলী-র সম্পাদক কোনো কৌশলে তার পাঠোদ্ধার করেছেন এবং মুদ্রিত পাঠ পাশে রেখে পরীক্ষা করলে যথার্থ পাঠ উদ্ধার করা গেছে ব’লে ধারণা হয়। সুরেন্দ্রনাথ কোনো একজন বিদেশিনীর সঙ্গে সপ্রতিভ ভাবে কথোপকথন ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে রবীন্দ্রনাথ সকৌতুক বিস্ময় অনুভব করেছেন—এই হচ্ছে উক্ত বর্জিত অংশের বিষয়বস্তু। এই অংশটুকু অবলুপ্ত ক’রে দেবার প্রয়াস কেন নেওয়া হয়েছিল তা নিয়েও আমরা বিস্ময়-মিশ্রিত কৌতুক অনুভব করতে পারি। ছিন্নপত্রাবলী-র পাণ্ডুলিপির আরও কয়েকটি জায়গায় অনুরূপ পাঠোদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলি বর্জনেরও কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এর পরের সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু-সন্দর্শনে আবার রামপুর-বোয়ালিয়া-য় যান। ১১ চৈত্র [বৃহ 23 Mar] ‘রাজসাহী যাইবার পথে’ পদ্মায় ‘মিনো’ জাহাজে লেখেন ‘দুর্বোধ’ [দ্র সোনার তরী ৩। ৯১-৯৩] কবিতা।

এবারে রামপুর-বোয়ালিয়া-তে থাকার সময়টি কাব্যসৃষ্টির দিক দিয়ে ফলপ্রসূ। যাওয়ার পথে একটি কবিতা লেখার পর সেখানে গিয়ে ১৩ চৈত্র [শনি 25 Mar] লিখলেন ‘সুখ’ [দ্র সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০। ৫৭৪-৭৬; চিত্রা ৪। ২২-২৪]। বলা শক্ত, কবিতাটি কেন সোনার তরী-তে গৃহীত হয়নি। পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 129] ‘দুর্বোধ’, ‘সুখ’ ও ১৫ চৈত্র [সসাম 27 Mar] লিখিত ‘ঝুলন’ কবিতা কালানুক্রমে সজ্জিত, সুতরাং ভ্রমক্রমে কবিতাটি স্খলিত হয়েছে এমন ভাবার অবকাশ নেই। সোনার তরী কাব্যগ্রন্থ

প্রকাশের আগে ও চিত্রা কাব্যের সূচনার পূর্বেই এটি সাধনা-য় মুদ্রিত হয়েছিল, এই তথ্যটি এখানে উল্লেখযোগ্য।

'সমুদ্রের প্রতি' [দ্র সাধনা, বৈশাখ ১৩০০। ৪৯২-৯৫; সোনার তরী ৩। ৫৫-৫৮] কবিতা লিখিত হয় ১৭ চৈত্র [বুধ 29 Mar] রামপুর-বোয়ালিয়াতে। পুরীতে সমুদ্র দেখে প্রবহমান পয়ারে কবিতাটির সূচনা হয়েছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। সমুদ্রের বিশালতার সঙ্গে সংগতি রেখে আঠারো মাত্রার মহাপয়ার এই কবিতার পক্ষে উপযুক্ত, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবে থাকতে পারেন। 16 Apr [রবি ৪ বৈশাখ] কবিতাটি ইন্দিরা দেবীকে পাঠিয়ে তিনি লিখেছেন : 'এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, আমাদের যে-একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝান যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে, তা যেন বোঝা যায়।'[২] উল্লেখ্য, পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় ৬৭-৮০ ছত্রগুলি ['আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাতব্যথাভরে···চেয়ে আছি তোমা পানে; তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে'] পরে যুক্ত হয়েছে, এর অব্যবহিত পরের আড়াইটি ছত্র আগেই লেখা হয়েছিল। উক্ত ছত্রগুলির গদ্যরূপ পাওয়া যায় ছিন্নপত্রাবলী-র উল্লিখিত পত্রে।

বৎসরের শেষটি রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় কাটান। উপযুক্ত বন্ধু-সঙ্গ পাবার জন্য তাঁর মনে একটি আকাঙ্ক্ষা সবসময়েই জেগে থাকত। বার বার লোকেন পালিতের কাছে ছুটে যাচ্ছিলেন এই কারণেই। 6 Apr [বৃহ ২৫ চৈত্র] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'মো···র সঙ্গে আজকাল আমার মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়, আমার বড়ো ভালো লাগে। এই রকম আলোচনা করবার জন্যে আমার মন অনুক্ষণ তৃষিত হয়ে থাকে। এই হতভাগা জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে—কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করছে।···আমি আজ সকালে প্রি···বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।'[১] প্রি···বাবু যে প্রিয়নাথ সেন, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি—কিন্তু মোহিতচন্দ্র সেনের [1870-1906] সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে আলাপ হয়েছিল কিনা জানা না থাকায় 'মো'···র পরিচয়টি উদ্ধার করা যায়নি। অবশ্য মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করে থাকতে পারেন। মোহিনীমোহন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা।

সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯ [২।৪] :

২৭৭-৮৮ 'মহামায়া' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭। ২৪৩-৫০

২৮৮-৯১ 'বৈষ্ণব কবিতা' দ্র সোনার তরী ৩। ৪০-৪৩

৩১৭-৩১ 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' দ্র পঞ্চভূত ২। ৫৯৫-৬০৩ ['গদ্য ও পদ্য']

৩৪৬-৫৬ 'প্রসঙ্গ-কথা।/(সমুদ্রযাত্রা।) দ্র সমাজ ১২। ২১১-১৭

৩৫৭-৬০ 'সমালোচনা।/কঙ্কাবতী'

‘মহামায়া’ গল্পটির যদুনাথ সরকার-কৃত একটি ইংরেজি অনুবাদ ‘Adamant’ নামে *The Modern Review*-এর Dec 1912 [pp. 571-75]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

‘পঞ্চভূতের ডায়ারি’র অনেক অংশ বাদ দিয়ে গ্রন্থে ‘গদ্য ও পদ্য’ নামে সংকলিত হয়েছে। বর্জিত প্রথমাংশের অনেকটাই ‘পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক’-এর ‘শরৎকাল’-শীর্ষক ৬২-সংখ্যক প্রস্তাবের [রচনা : ১৬ আশ্বিন ১২৯৬] অনুলিপি। উল্লেখ্য, 13 Aug 1893 [২৯ শ্রাবণ ১৩০০] পতিসর থেকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নিয়ে ঈষৎ ভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন।

‘সমালোচনা’য় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কঙ্কাবতী’ [১২৯৯] সমালোচিত হয়েছে। রচনাটি স্বাক্ষর-হীন এবং রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি বা এই সমালোচনা-সম্পর্কে তাঁর কোনো উল্লেখ বা মন্তব্য নেই এই যুক্তিতে ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এটিকে রবীন্দ্র-রচনা ব'লে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন।[২] এই কুণ্ঠা স্বাভাবিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অ-স্বাক্ষরিত অনেক রচনাই ভাষা বক্তব্য ও রচনাকৌশলের নিরিখেই তাঁর লেখা ব'লে গৃহীত হয়েছে—তাছাড়া ড ভট্টাচার্যও স্বীকার করেছেন যে, প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথ ‘সাধনা-র অঘোষিত সম্পাদক ছিলেন, বলেন্দ্রনাথকে লেখা তিনটি পত্র ও ছিন্নপত্রাবলী-র অনেক চিঠিকে এর সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করানো যায়। সাধনা-য় প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ-সমালোচনাকেও আমরা এই যুক্তিতে রবীন্দ্র-রচনা ব'লে গ্রহণ করেছি। এই দায়িত্ব তাঁর উপরে ছিল ব'লেই অত্যন্ত আপত্তি সত্ত্বেও তিনি সাধনা-র ফাল্গুন ১৩০১-সংখ্যায় যোগেন্দ্রনাথ সাধু-রচিত ‘দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব’ ও কুমারকৃষ্ণ মিত্র-প্রণীত ‘মনোরমা’র সমালোচনা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

‘কঙ্কাবতী’র সমালোচনাটি দীর্ঘ। প্রথমেই গ্রন্থটির প্রশংসা করে লিখেছেন : ‘এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধা নিয়ম, কোন চিহ্নিত [যদ্দৃষ্টং] রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়ম-পথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ, রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসঙ্গত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম-বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্যসারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসা নহে।’ উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু অভিযোগ থাকলেও তিনি সেই সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করেছেন, কারণ ‘আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালকবালিকাদের এবং তাহার পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।’ আমাদের দেশে বালকবালিকার উপযোগী যথার্থ গ্রন্থ কম, কারণ এই স্বভাববৃদ্ধ জাতির কাছে যথার্থ ছেলেমানুষি অবজ্ঞার যোগ্য। ‘আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষী বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার ত কথাই নাই।’ আমাদের দেশের পাঠকেরা ‘পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ, সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কি রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠে ঙোমুল্লুকনিবাসী শ্রীমান্ ঘ্যাঁঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহবার্ত্তা আমাদের এই দুইঠেঙোমুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে।’ এরপর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেন : ‘সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা

নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানব-হৃদয় জলধির বিচিত্র উত্থানপতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়।' ড বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী' [১৩৬৭] গ্রন্থে সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথ-কৃত হিশেবে সংকলিত হয়েছে।

ভারতী ও বালক-এর ফাল্গুন-সংখ্যায় [পৃ ৬৫৭-৬১] 'চির বন্ধু, চির নির্ভর, চির শান্তি' ও '(একি) লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে' মাঘোৎসবে গীত দু'টি গানের সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।

সাধনা, চৈত্র ১২৯৯ [২ / ৫] :

৩৬১-৭০ 'দান প্রতিদান' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৭। ২৫১-৫৭

৩৭৮-৯৫ 'ডায়ারি' দ্র পঞ্চভূত ২। ৫৫৮-৬৮ ['নরনারী']

৩৯৬-৪০০ 'সভাভঙ্গ' দ্র কাহিনী ৭। ৯৩-৯৫ ['গানভঙ্গ']

৪২১-২৭ 'প্রত্যুত্তর' ['পহুঁ'] দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২। ৫৪৩-৪৬

৪৪০-৫৪ 'প্রসঙ্গ-কথা/(তিনখানি পত্র)' [সূচীপত্র : 'বঙ্কিম বাবু, গুরুদাস বাবু ও আনন্দমোহন বাবুর পত্র —'] দ্র শিক্ষা-গ্রন্থপরিচয় ১২। ৬১৬-২৩

৪৫৪-৫৫ "সাহিত্য"-পাঠকদের প্রতি দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ১৫৬

বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহৃত 'পহুঁ' শব্দ সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমার রায় ও ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর সঙ্গে দু'দফা বিতর্ক সাধনা-র জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ ও শ্রাবণ ১২৯৯-সংখ্যায় আগেই হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান সংখ্যায় ক্ষীরোদচন্দ্র 'পহুঁ' নামে আর-একটি প্রবন্ধ লেখেন [পৃ ৪২১-২৭]; রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিয়েছেন এই আলোচনায়। প্রবন্ধের শেষে তিনি যে লিখেছেন : 'কিছুকাল পূর্বে যে হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম তাহাতে পহু ব্যতীত কুত্রাপি পহুঁ দেখি নাই'—তাঁর বৈষ্ণবপদ-চর্চায় অভিনিবেশের দৃষ্টান্ত, সময় ও সুযোগ পেলে এইভাবে তিনি পুঁথি নাড়াচাড়া ক'রে তাঁর বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের পদ সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ করবার উদ্যোগ তিনি একাধিকবার গ্রহণ করেছিলেন—দুঃখের বিষয়, তাঁর সেই প্রয়াস সার্থক হয়নি।

পুরীতে থাকার সময়ে ৬ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁর প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশ করার জন্য সাহিত্য-সম্পাদককে পাঠিয়েছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রতিবাদ-পত্রটি তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ না ক'রে পত্রের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে উত্তর দেন। কিন্তু 'হিং টিং ছট' কবিতা যে চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য করে লেখা হয়নি, এই কথাটি ঘোষণা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য"-পাঠকদেরপ্রতি' তাঁর বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। সাহিত্য-সম্পাদক বৈশাখ ১৩০০-সংখ্যায় [পৃ ৮১-৮৪] টীকা-সহ রবীন্দ্রনাথের পত্রটি ছেপে দেন।

ভারতী ও বালক-এর চৈত্র-সংখ্যায় [পৃ ৬৮২-৮৫] 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে' ও 'তবু মনে রেখো' গান-দু'টির স্বরলিপি মুদ্রিত হয়। স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত থাকলেও মনে হয় সরলা দেবী এই স্বরলিপি রচনা করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

১২৯৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে সুশোভিনী দেবীর সঙ্গে অরুণেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। এটি তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ, তাঁর প্রথমা পত্নী চারুশীলা দেবী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে ১৯ মাঘ ১২৯৫ [31 Jan 1889] মারা যান। 'বাবু অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভ বিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় যৌতুক দেন মোহর ও বালা ক্রয়ের মূল্য শোধ' হিসাব পাওয়া যায় ২৯ বৈশাখ [মঙ্গল 10 May] তারিখে মহর্ষির নিজস্ব ক্যাশবহিতে।

কার্তিক মাসে সত্যেন্দ্রনাথ বির্জিতলার বাড়ি ছেড়ে পিতার বাসস্থান ৫২/২ পার্ক স্ট্রীটের কাছে ৫০ নং বাড়িতে উঠে আসেন। তত্ত্ববোধিনী-র অগ্র° -সংখ্যায় [পৃ ১৩৯] 'গৃহপ্রবেশ' শিরোনামে 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহপ্রবেশোপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনা ও 'উক্ত গৃহপ্রবেশোপলক্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা' মুদ্রিত হয়। হিন্দুপ্রথাগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে ঠাকুর-পরিবারে গৃহীত হয়েছিল, এটি তার একটি উদাহরণ।

সত্যেন্দ্রনাথ 2 Apr 1893 [রবি ২১ চৈত্র] থেকে 15 Mar 1894 [৩ চৈত্র ১৩০০] পর্যন্ত তাঁর দ্বিতীয় দফার ফর্লো ছুটি গ্রহণ করেন। 1878-এ প্রথমবার ছুটি নিয়ে তিনি ইংলন্ডে গিয়েছিলেন, এবারের ছুটি কাটান প্রধানত সিমলায়। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'পরের বার যে ফর্লো পাই তাহাতে সিমলা প্রয়াণ। রাজপুতানা লাইন দিয়া বোম্বাই ছাড়িয়া আগ্রায় আমাদের দলবলের সহিত মিলিত হইলাম। পথে আবু ও জয়পুর দেখিয়া লইলাম।···জয়পুর হইতে আগ্রা। বলা বাহুল্য যে তাজ দর্শন না করিয়া আগ্রা ছাড়ি নাই।'[১]

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ মহা সমারোহে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিল, এই বৎসর ৭ পৌষ [বুধ 21 Dec] সেখানে যথাযোগ্য মর্যাদায় দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হ'ল। তত্ত্ববোধিনী-র মাঘ-সংখ্যা [পৃ ১৯৩-৯৯] থেকে জানা যায়, প্রাতঃকালীন উপাসনায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উদ্বোধন, উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। 'অনাথ অন্ধ খঞ্জদিগকে দিবার জন্য এ বৎসর পাঁচ শত খণ্ড বস্ত্র ও পর্য্যাপ্ত তণ্ডুল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে মন্দিরের চারিদিকে সোপানশ্রেণীর উপরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উপাসনান্তে তাহা উৎসর্গ করা হইল।

'প্রাতঃকালের উপাসনা ভঙ্গ হইবার পরেই সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের নিম্নে মহর্ষির সাধনবেদীর দিকে চলিলেন। সেখানে বাবু কুঞ্জবিহারি দেব প্রমুখ কয়েকজন অনেকক্ষণ ধরিয়া সঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন করিতে লাগিলেন।/ মধ্যাহ্নের পর মঠের ভিতর রাজকুমার বাবুর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।'

সান্ধ্য উপাসনা আরম্ভ হয় ৬টার সময়। দ্বিজেন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ বেদী গ্রহণ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন ও উপাসনা করলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ উপদেশ দিলেন ও অচ্যুতানন্দ হিন্দিতে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করলেন। বেদীর পাশ থেকে নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম কী বুঝিয়ে দেবার পর বন্দনাগীত হয়ে উপাসনা ভঙ্গ হয়। 'পরিশেষে স্থানীয় লোকদিগের সন্তোষ সাধনার্থে নানারূপ আতসবাজী প্রদর্শিত হইয়াছিল।'

মহর্ষির ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, এই উৎসব উপলক্ষে ২২৪১ টাকা ২ আনা ৩ পয়সা ব্যয়িত হয়। এর আগে ৮ বৈশাখের একটি হিসাব : 'ব° বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শান্তিনিকেতনের ট্রষ্টী দিগর দং শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মমন্দির নির্ম্মাণ ও ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যয় জন্য দেওয়া যায়···৩৩৩৯ ৬'—এটি অবশ্য প্রধানত মন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসবের ব্যয়, নির্মাণাদির জন্য আগেই বিভিন্ন দফায় অনেক টাকা মঞ্জুর হয়েছিল।

১১ মাঘ [সোম 23 Jan 1893] আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। প্রাতঃকালে মহর্ষিভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন, প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা ও দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রার্থনা হয়। সায়ংকালে শম্ভুনাথ গড়গড়ির বক্তৃতার পর দ্বিজেন্দ্রনাথ 'অপ্রতিম পরমাত্মা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। দু'টি অধিবেশন মিলিয়ে মোট ষোলটি গান হয়। বেদমন্ত্রে সুর দিয়ে গাওয়ার প্রথা এইবারই প্রচলিত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের ছ'টি গান ছাড়া বাকি গানগুলি হ'ল :

ইমন কল্যাণ—চৌতাল। পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, অলক্ষ্য নিরঞ্জন

ইমন কল্যাণ—মধ্যমান। মগন হও রে আনন্দে পরব্রহ্মের ধ্যানে

ইমন কল্যাণ—চৌতাল। তব রাজ-সিংহাসন, প্রভু, বিরাজিত বিশ্ব-মাঝে

সিন্ধু—ঢিমাতেতালা। হে অন্তর-যামী ত্রাহি

সিন্দুড়া—ঝাঁপতাল। কে গো তুমি হাহা করে ভ্রমিতেছ

সিন্দুড়া—কাওয়ালি। কাতরে আমার প্রাণ সংসারে

দেওনট—তাল ফেরতা। ধন্য তুমি ধন্য, ভব-জলধি-তারণ ব্রহ্ম

ছায়ানট—চৌতাল। যোগী জগৎ-ত্যাগী কে বলে

বেহাগড়া—একতালা। কি আনন্দ হৃদয়ে জাগিল হৃদয়ে

খাম্বাজ—কাওয়ালি। জগ-দরশন মেলা

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

বাংলার ছোটলাট স্যার চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট-কর্তৃক বিচারব্যবস্থায় জুরিপ্রথার সংস্কার-বিষয়ক নির্দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন বর্তমান বৎসরের সব চেয়ে বড়ো রাজনৈতিক ঘটনা। বিশেষ ধরনের কয়েকটি অপরাধের বিচার জুরির সাহায্যে করতে হবে, এই প্রথা বাংলার সাতটি জেলায় প্রথম প্রবর্তিত হয় 1862-তে। May 1890-তে ভারত সরকার এই প্রথার কার্যকারিতা সম্পর্কে বাংলা সরকারকে একটি রিপোর্ট দিতে বলেন, অপরাধদমনে এই প্রথা কতখানি সাহায্য করেছে এবং এর উন্নতি করার জন্য কী করা উচিত সে-সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয়েছিল। কমিশনার, জেলা জজ ও পুলিস কর্তৃপক্ষের মতামত ছোটলাট চেয়ে পাঠান। এঁদের একটি বড়ো অংশ জুরিপ্রথার বিরোধিতা করেন। স্যার ইলিয়ট এই-সব মতামত খতিয়ে দেখে ভারত সরকারকে জানান যে, যে পদ্ধতিতে বর্তমানে জুরিপ্রথা চালু আছে তা মোটেই অভিপ্রেত নয়। কিন্তু একবার যখন এই পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং বিচার-ব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ রাজনৈতিক আদর্শে প্রার্থিত হয়েছে, তখন প্রথাটির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি উচিত হবে না। এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে জুরির

সাহায্যে বিচারের ক্ষেত্র সংকুচিত করার সুপারিশ করলেন। ভারত সরকার তাঁর সব সুপারিশ গ্রহণ না করলেও কয়েকটি বিশেষ ধরনের অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে জুরিপ্রথা সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব সমর্থন করেন। 20 Oct 1892 [বৃহ ৫। কার্তিক] স্যার ইলিয়ট তাঁর আদেশ জারী করলেন, সঙ্গে এ-সম্পর্কিত সমস্ত আলাপ-আলোচনার বিবরণও গেজেটে প্রকাশিত হয়।

এর ফলে দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত হল। অধিকার সংকোচনের প্রতিবাদে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ মুখরিত হয়ে উঠল। অন্য দিকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে কি-ধরনের লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল র‍্যাভেনশ' কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হলোয়ার্ডের উক্তিতে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ছোটলাটের আদেশের প্রতিবাদে 20 Dec [মঙ্গল ৬ পৌষ] কলকাতার টাউন হলে একটি সভা আহূত হয়। *The Indian Mirror*-এর খবর : The place was crowded almost to suffocation'। এর ফলে সমস্ত অবস্থা বিবেচনার জন্য একটি কমিশন গঠিত হ'লে কমিশন জুরিপ্রথা পূর্বের আকারে বহাল রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তখন 20 Oct-এর আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

---

১ নানা রবীন্দ্রনাথ।৪৮

১ ছিন্নপত্রাবলী।৯৬, পত্র ৪৩

২ ঐ। ৯৭, পত্র ৪৪

৩ ঐ। ৯৮-৯৯, পত্র ৪৫ [মঙ্গলবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ]

৪ ঐ। ১০১, পত্র ৪৬ [বুধবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ]

৫ ঐ।১১২, পত্র ৫১

১ 'রবীন্দ্রনাথের পত্র,' সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০।৮৩

২ ছিন্নপত্রাবলী। ১০২, পত্র ৪৭

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১১৪, পত্র ৫২

২ ঐ।১৩০-৩১, পত্র ৬১

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১১৫, পত্র ৫৩

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১১৬-১৭, পত্র ৫৪

২ ঐ। ১১৮-২০, পত্র ৫৫

৩ ঐ। ১২২, পত্র ৫৬

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১২৫, পত্র ৫৮

২ ঐ। ১২৮, পত্র ৫৯

৩ ঐ। ১১৩, পত্র ৫১; এরপরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর-সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকাব্যের আবেগ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে—অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়।'—তিনি তখন সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন যে, 'রাজা ও রানী' লেখা হয়েছিল চৈত্র ১২৯৫-তে।

১ রবীন্দ্রকথা। ২১৮

২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৭৭]। ৩৪৬ ৪৭

৩ চিঠিপত্র ১। ২৫, পত্র ১০

৪ ছিন্নপত্রাবলী। ১৩০-৩১, পত্র ৬১

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৩২-৩৪, পত্র ৬২

২ ঐ। ১৩৫, পত্র ৬৩

৩ 'বিহারীলাল', আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪১৬

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৩৭, পত্র ৬৪

২ ঐ। ১৩৮, পত্র ৬৫

৩ শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। ৩৬৮-৬৯

৪ ছিন্নপত্রাবলী। ১৪০, পত্র ৬৬

১ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩। ২৮৯-৯০

১ 'কিছু দূরে গোরাইয়ের একটি শাখানদীর (ডাকুয়াখাল) তীরে ঠাকুর জমিদারির পাস্তীমহাল, যশোহর জেলার সীমানায়।'—শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। ৬

২ চিঠিপত্র ১। ২৭, পত্র ১১

৩ ছিন্নপত্রাবলী। ১৪২, পত্র ৬৭

৪ ঐ! ১৪৩, পত্র ৬৮

৫ জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮]। ১৪৯-৫০

১ পুণ্যস্মৃতি। ১৯২

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৪৫, পত্র ৬৯

২ ঐ। ১৪৭-৪৮, পত্র ৭০

১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭২। ২২-২৩

২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৩। ৯১

১ দ্র রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। ৪৭-৪৮

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৪৯-৫০, পত্র ৭১

২ 'আত্মকথা',—বি. ভা. প., ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫১২

৩ বি. ভা, প., ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫১৩-১৪

৪ ৭ শ্রাবণ ১২৭৯ তারিখে 'রাজসাহী আসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়, দ্র *The Indian Mirror*, Aug 13, 1892

৫ Vol. XXVIII, No. 107, p.5

১ দ্র *The Bengalee*, Jul 18, 1891

১ দেনা, শারদীয়া ১৩৭৯। ৩৫৯

২ রবীন্দ্র রচনাবলী-তে 'বিশ্ব' শব্দটি বাদ পড়েছে।

১ চিঠিপত্র ৯। ৯৫, পত্র ৪৫

২ পুণ্যস্মৃতি। ১৭৮

৩ শরৎকুমার রায় : 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' ['রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজয়ন্তী সভায় সভাপতি-কর্তৃক পঠিত। সন ১৩৩৮ সাল, ৪ঠা মাঘ।']। ৫

১ বি. ভা, প., ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫১৩

১ সাধনা-র পৌষ ১২৯৯-সংখ্যায় গানটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয় [পৃ ১৪৪-৪৬], ভৈরবী-কাওয়ালি।

২ ছিন্নপত্রাবলী। ১৫১, পত্র ৭২

৩ ঐ। ১৫৩, পত্র ৭৩

৪ বি. ভা. প., ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫১৪

৫ ছিন্নপত্রাবলী। ১৫৭, পত্র ৭৫

১ ঐ। ছিন্নপত্রাবলী। ১৫৫, পত্র ৭৪

২ চিঠিপত্র ১। ২৮, পত্র ১২

৩ তারিখটি অনুমিত, খামের উপর ডাকঘরের মোহরে দেখা যায় চিঠিই 15 DE 92 তারিখে 63 Dharmatalla Street-এ পৌঁছয়।

৪ চিঠিপত্র ৫। ১৫৭, পত্র ১০

৫ ঐ। ১৫৮, পত্র ১১

৬ ঐ। ১৫৯, পত্র ১২

১ ছিন্নপত্রাবলী। ২০২, পত্র ৯৪ [8 May 1893]

২ দ্র. শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ। ৪৫-৪৭

১ দ্র চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য। ১৭৫

১ চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য। ৭০

২ জীবনের ঝরাপাতা। ৩৩

৩ ঐ। ৯০

১ সাধনা, মাঘ। ১৯৮-৯৯

১ 'রবীন্দ্র-স্মৃতি'। ৬

২ বি. ভা প., ফাল্গুন ১৩৪৯। ৫১৪

৩ সাধনা, মাঘ। ২০৫-০৬

১ চিঠিপত্র ১। ২৯, পত্র ১২

১ চিঠিপত্র ১। ৩০-৩১, পত্র ১৩

২ ছিন্নপত্রাবলী। ১৬০, পত্র ৭৭

১ 'র‍্যাভেনশ' কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হলোয়ার্ড। 'হলোয়ার্ড সাহেবের শাসননীতি বেশ কঠোর ছিল। ইনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, সকাল ১০টা ২৫ মিনিটের পূর্বে স্কুলের গেট খোলা হইবে না। তাহার ফলে গ্রীষ্মকালে বহু ছাত্রকে গেটের বাহিরে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কষ্টভোগ করিতে হইত। ইহার প্রতিকারের কোন উপায় না পাইয়া রাত্রিতে কোনও ছাত্র গেটের তালা চুরি করিয়া লয়; অধ্যক্ষ মহাশয়ের অবিচারে বহু নির্দোষ ছাত্র শাস্তিভোগ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে ছাত্রগণের অভিভাবক ও জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সভা-সমিতি করিয়া অধ্যক্ষের কার্যের তীব্র প্রতিবাদ চলে।'—অবন্তী দেবী : 'ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ' [১৩৭০]। ৪৪

২ ছিন্নপত্রাবলী। ১৬৫, পত্র ৭৯

৩ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

৪ ছিন্নপত্রাবলী। ১৬৫-৬৭, পত্র ৭৯

৫ ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ। ১২৩

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৬৯-৭০, পত্র ৮০

২ চিঠিপত্র ১।৩০, পত্র ১৩

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৭৫, পত্র ৮১

২ সাধনা, বৈশাখ ১৩০০। ৪৫৯

৩ ছিন্নপত্রাবলী। ১৮৮-৯১, পত্র

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৭৬, পত্র ৮২

১ সাধনা ও সাহিত্য। ২৬২-তে উদ্ধৃত।

২ ছিন্নপত্রাবলী। ১৭৮, পত্র ৮৩

৩ ঐ। ১৭৮-৭৯

৪ ছিন্নপত্রাবলী। ১৮২-৮৩, পত্র ৮৪

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৮৪-৮৫, পত্র ৮৫

২ ঐ। ১৮৭, পত্র ৮৬

৩ ঐ। ২৩২-৩৩, পত্র ১০৭

৪ ঐ। ১৯২, পত্র ৮৮

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৯৫, পত্র ৮৯

২ ঐ। ১৯৮, পত্র ৯১

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৯৭, পত্র ৯০

২ দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ২৬৩-৬৪

১ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস [1915]। ১০৮-০৯

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

১৩০০ [1893-94] ১৮১৫ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর

১৩০০ বঙ্গাব্দের নববর্ষের দিনটি [বৃহ 13 Apr 1893] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন, কিন্তু মহির্ষ-ভবনে নববর্ষ-উৎসবের জন্য তিনি কোনো গান লেখেননি।

ইন্দিরা দেবী তখন পিতামাতার সঙ্গে সিমলা যাত্রার পথে আগ্রায় অবস্থান করছেন, রবীন্দ্রনাথ 16 Apr [রবি ৪ বৈশাখ] তাঁকে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি পাঠিয়ে লিখছেন : 'তোদের ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কিরকম লাগবে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় তোদের আগ্রার হোটেল!'[১]

এর ক'দিন পরে রবীন্দ্রনাথের গানের দ্বিতীয় সংকলন 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' প্রকাশিত হল ৮ বৈশাখ [বৃহ 20 Apr]। তাঁর প্রথম সংগীত-সংকলন 'রবিচ্ছায়া' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৯২-এ। রবীন্দ্রনাথ ১০ চৈত্র ১২৯৯ তারিখে স্বাক্ষরিত 'বিজ্ঞাপন'-এ সেকথা উল্লেখ করে লিখেছেন :

> শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয় আমার কতকগুলি গান নানা খাতাপত্র হইতে উদ্ধার করিয়া "রবিচ্ছায়া" নাম দিয়া একটি গানের বহি করেন। সে জন্য পাঠকেরা না হউন্ আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। এই গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যে অনেকগুলি নূতন গান রচিত হইয়াছে। এই কারণে নূতন পুরাতন সমস্ত গান লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।
>
> ইহার সহিত "বাল্মীকি-প্রতিভা" নামক একটি গীতিনাট্য সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া গেল। কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত "সারদামঙ্গল" নামক কাব্য পাঠ করিয়া উক্ত গীতিনাট্যের ভাব আমার মনে উদয় হয়। এমন কি দুই একটি গানে সারদামঙ্গলের অনেকগুলি পদ প্রায় অবিকৃত ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, এজন্য বিহারী বাবুর নিকট আমি ঋণী আছি।
>
> অবশেষে পাঠকদিগের নিকট নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের অধিকাংশ গানই পাঠ্য নহে। আশা করি সুরসংযোগে শ্রুতিযোগ্য হইতে পারে।

এরপর তিনি 'পুনশ্চ' লিখেছেন : 'ভ্রমক্রমে দুই একটি গান এই গ্রন্থে একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনবসর ও অনুপস্থিতিক্রমে প্রুফ সংশোধনে মনোযোগ দিতে না পারায় অন্যান্য ভ্রমও থাকিতে পারে পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।' 'দুই একটি' নয়, অন্তত দশটি গান দু'বার করে মুদ্রিত হয়েছে। সূচীপত্রে দশটি গানের প্রথম ছত্র উল্লিখিত হয়নি, কয়েকটি গানের প্রথম ছত্র আবার দু'বার করে ছাপা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর ভুল আছে সূচীপত্রে; সেখানে মুদ্রিত হয়েছে: '১-চিহ্নিত [যদ্দৃষ্টং] গানগুলি আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত'—এর ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের *সুরে* রচিত গানগুলি সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক ভুলের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। সূচীপত্রে উল্লিখিত এইরূপ ১-চিহ্নিতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে রচিত গানের সংখ্যা ২০টি। সূচীপত্রে আরও নির্দেশ আছে : '২-চিহ্নিত গানের সুর

হিন্দুস্থানী হইতে লওয়া। আমার স্বরচিত অথবা প্রচলিত সুরের গানে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় নাই।' এই গ্রন্থে ২-চিহ্নিত হিন্দিগান-ভাঙা মোট গানের সংখ্যা ৮৯, তার মধ্যে ৭৮টিই ব্রহ্মসংগীত।

ভুল গ্রন্থটিতে আরও আছে। গানগুলি 'গানের বহি', 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'ব্রহ্মসংগীত' আখ্যায় তিনটি ভাগে বিভক্ত হলেও একাদিক্রমে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। এই হিসাবে শেষ গানটির সংখ্যা ৪২৩; কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায়, কয়েকটি সংখ্যা দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে ও কোনো কোনো সংখ্যা বাদ গেছে। এই সব গোলযোগ বাদ দিয়ে গ্রন্থটিতে বাল্মীকি-প্রতিভার ৫৫টি গান-সহ মোট ৪১৫টি গান সংকলিত হয়েছে। পূর্ববর্তী 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থটির ২০১টি গানের মধ্যে ৩৫টি গান 'গানের বহি'তে বর্জিত হয়, এর মধ্যে বেশির ভাগ সুরহীন কবিতা, কিন্তু স্বরলিপি রক্ষিত হয়েছে এমন কতকগুলি সুপরিচিত গান কেন বর্জিত হ'ল তার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। রবীন্দ্রনাথ যখন উড়িষ্যা-ভ্রমণে ব্যস্ত, সম্ভবত তখনই গ্রন্থটি মুদ্রণের কাজ চলছিল, বিভিন্ন অসংগতির উদ্ভব হয়তো সেই কারণেই।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত দু'টি গ্রন্থের কোনোটিতেই আখ্যাপত্র নেই। আখ্যাপত্র ছাড়া পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২৬+৪০৭।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত উল্লিখিত দু'টি গ্রন্থের একটি ইন্দিরা দেবীর নিজস্ব সংগ্রহভুক্ত [Ms. 290]। গ্রন্থটির একটি বিশেষত্ব আছে। এতে 'গানের বহি' অংশের ২২৬ পৃষ্ঠার অব্যবহিত পরে অনেকগুলি নীল রুল টানা কাগজ দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছিল। এই কাগজগুলিতে একাদিক্রমে সংখ্যাচিহ্নিত রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে ৫৮টি গান লেখা আছে। মুদ্রিত পুস্তকের মতো এই পাণ্ডুলিপিতেও সংখ্যা ব্যবহারে শিথিলতা দেখা যায়। এই গানগুলিকে 'গানের বহি'র অনুক্রম বলা যায়। এই গানগুলির অধিকাংশই প্রথম লেখা হয়েছিল মজুমদার-পুঁথিতে, পরে সেখান থেকে গানের বহি-তে নকল করা হয়েছে। আমাদের অনুমান, রবীন্দ্রনাথ আশ্বিন ১৩০৪ [Oct 1897]-এর পরে গানগুলি নকল করেছিলেন—কারণ, মজুমদার-পুঁথি অনুসারে এখানে অনুলিখিত গানের রচনা-তারিখের ঊর্ধ্বসীমা ১৩ আশ্বিন ১৩০৪ [28 Sep 1897], ওই দিনে কলকাতাভিমুখী রেলপথে 'এ কি সত্য সকলি সত্য' গানটি লেখা হয়েছিল। উল্লেখ্য, মজুমদার-পুঁথিতে লেখা ব্রহ্মসংগীতগুলি রবীন্দ্রনাথ এখানে নকল করেননি, 'গানের বহি' অংশটি প্রধানত প্রেম-প্রকৃতি পর্যায়ের গানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

সাধনা, বৈশাখ ১৩০০ [২।৬] :

৪৬৭-৭৩ 'সম্পাদক' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৮। ২৫৩-৫৭

৪৯২-৯৫ 'সমুদ্রের প্রতি'/(পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া) দ্র সোনার তরী ৩। ৫৫-৫৮

৫৩০-৪৩ 'ডায়ারী' দ্র পঞ্চভূত ২। ৫৭৫-৮৩ ['মনুষ্য']

সাধনা-র 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'র অনুসরণে 'সাহিত্য' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩০০-সংখ্যা থেকে 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' নামে একটি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। এই বিভাগটিতে সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নিজেই লিখতেন। তিনি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় গল্পটি সম্পর্কে লেখেন : "সম্পাদক" ছোট গল্প, লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পটি সামান্য, কিন্তু ব্যঙ্গের বড় বাড়াবাড়ি। এরপর গল্পটির সারাংশ দিয়ে 'জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোন জবাব লেখা হইল না। হার

মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই' উদ্ধৃত ক'রে মন্তব্য করেছেন : 'হার মানিয়া অন্ততঃ জবাব না লিখিয়া, যে সময় সময় সুখ হয়, এ কথা লেখকের মুখে কিছু নূতন শুনায়।'[১] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'রবীন্দ্র বাবুর পত্র' শিরোনামায় সম্পাদকের টিপ্পনী-সহ 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিঠি বৈশাখ-সংখ্যা সাহিত্য [পৃ ৮১-৮৪]-তে মুদ্রিত হয়েছিল।

গল্পটির W. W. Pearson [1881-1923]-কৃত ইংরেজি অনুবাদ 'The Editor' নামে *The Modern Review*, Aug 1917 [pp. 156-58]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল ও পরে *Broken Ties and Other Stories* [1925] গ্রন্থে সংকলিত হয়।

এই সংখ্যার 'ডায়ারী' পঞ্চভূত গ্রন্থে 'মনুষ্য' নামে সংকলিত হওয়ার সময়ে অনেক অংশ বর্জিত হয়েছিল। আমরা তার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি : 'আমি কহিলাম—ভাষা ভূমির মতো। তাহাতে একই শস্য ক্রমাগত বপন করিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। দিনকতক "ভারতমাতা" শব্দটাকে লইয়া সকলে মিলিয়া এত বারবার ব্যবহার করিত যে, অবশেষে তাহাতে আর ভাব উৎপন্নই হইত না। এখন তাহার পরিবর্ত্তে "আর্য্য" শব্দটা লইয়া সকলে পড়িয়াছে—কথাটার মধ্যে যতটুকু সার ছিল এক প্রকার নিঃশেষ হইয়াছে। যথার্থ ভাবুক যখন পুরাতন ভাষায় একটা নূতন ভাব বপন করেন তখন যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সেই শস্য যেমন একদিকে ভাষা হইতে সমস্ত সার আকর্ষণ করিয়া লয়, তেমনি অন্যদিকে অজস্র পল্লব বর্ষণ করিয়া মাতৃভূমিকে সারাল করিয়া তোলে। কিন্তু তাহার সহস্র অনুকরণকারীরা তেমন প্রাণবান বীজবপন করিতে পারে না, কেবল ভূমিকে কর্ষণ করিয়া শ্রান্ত করে, ভাষাকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়; কতকগুলা শীর্ষহীন, মৃতপ্রায় শীর্ণ শুষ্ক যষ্টি উদগত হয়, তাহারা দেশকে শস্য দেয় না, ভূমিকে সার প্রত্যর্পণ করে না—তাহারা সত্যকে মিথ্যার মত ক্ষীণকায় করিয়া তোলে।'[২]

'ভারতী ও বালক' বৈশাখ ১৩০০ থেকে পুনরায় 'ভারতী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সংখ্যায় 'মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত' 'বিবাহ-উৎসব'-এর ২য় দৃশ্যের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের চারটি গান মুদ্রিত হয় : ১। 'ওই জানালার কাছে বসে আছে' [দ্র গীত ৩। ৭৭৮], ২। 'সাধ করে কেন সখা ঘটাবে গেরো' [দ্র ঐ। ৭৭৮], ৩। 'তুমি আছ কোন পাড়া' [দ্র ঐ। ৭৭৯], ৪। 'ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এস হে'—এর মধ্যে প্রথম দু'টি গানের সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি এই সংখ্যায় [পৃ ২৩-২৬] মুদ্রিত হয়, বাকি দুটি গানের স্বরলিপি ছাপা হয় জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় [পৃ ৮২-৮৪]। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানটি গানের বহি-তে সংকলিত হয় নি।

১৯ বৈশাখ [সোম 1 May] পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন। তার আগের দিন [30 Apr] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'কাল তাই রাত্তির দশটা পর্যন্ত ছাতে পড়ে থাকতে পেরেছিলুম। চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছিল —চমৎকার হাওয়া দিচ্ছিল–ছাতে আর কেউ ছিল না। আমি একলা পড়ে পড়ে আমার সমস্ত জীবনের কথা ভাবছিলুম। এই তেতালার ছাত, এইরকম জ্যোৎস্না, এইরকম দক্ষিণের বাতাস জীবনের স্মৃতিতে কত রকমে মিশ্রিত হয়ে আছে।'[১] রবীন্দ্রনাথের মনের একটা অংশ স্মৃতিলোকেই বাস করত, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রথম বয়সের এইসব স্মৃতি বারেবারেই ফিরে ফিরে এসেছে।

মঙ্গলবার [২০ বৈশাখ 2 May] তিনি শিলাইদহে যান। সেখানে গিয়ে বোট থেকে লিখছেন : 'এক দিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাত হয়ে যায়! কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসে ছিলুম সে এক-রকম, আর আজ এখানে দুপুর-বেলায় বোটে বসে আছি এ এক-রকম।' কলকাতায় থাকার সময়ে নিশ্চয়ই নানাবিধ

ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর দিন কেটেছিল, তাই এখানে এসে লিখছেন : 'পাব্লিক-নামক গ্যাসালোক-জ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না—···সাধনা চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁস্ ফাঁস্ করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়—তার ভিতরে অনেক জিনিষ থাকে যা খাঁটি সোনা নয়, যা খাদ—আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারও প্রতি দৃক্‌পাত না করে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করে যাই তা হলেই যথার্থ কাজ হয়।'[২]

রবীন্দ্রনাথের ত্রয়স্ত্রিংশতম জন্মদিন [২৫ বৈশাখ শনি 7 May] এবার কেটেছে শিলাইদহে বোটের উপর। কিন্তু ৯ বৈশাখ সত্যপ্রসাদের হিসাব-খাতায় 'রবিমামার জন্মদিনোপলক্ষে কাপড় খরিদ ৩০্' দেখে মনে হয়, আত্মীয়েরা আগেই তাঁর জন্মদিন পালন করেছিলেন।

পরের দিন 8 May ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিটি তিনি লিখেছেন, সেটি দু'টি দিক দিয়ে মূল্যবান। এর প্রথম অংশটি সম্ভবত 'মানসসুন্দরী' কবিতা সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীর কোনো প্রশ্নের উত্তরে লিখিত, যার কিয়দংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। দ্বিতীয় অংশটি পেনসিল দিয়ে কাটা ছিল, পাঠোদ্ধার ক'রে যা জানা গেছে তা চিত্রকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রসবোধের দৃষ্টান্ত হিশেবে গৃহীত হতে পারে : 'রবিবর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকালবেলাটা গেল। আমার সত্যি বেশ লাগে। হাজারই হোক, আমাদের দিশি বিষয় এবং দিশি মূর্তি ও ভাব আমাদের কাছে কতখানি, এই ছবিগুলি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। অনেকগুলো ছবির হাত পা, দেহের পরিমাণ, খুব অসমান আছে, কিন্তু মোটের উপর সবসুদ্ধ জড়িয়ে খুব মনের ভিতরে প্রবেশ করে।'[৩] ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টি পরে পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর বর্তমান মনোভাব এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ওই সময়ে আমাকে মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনী ও রবিবর্মার ফোটোগ্রাফের অ্যালবাম দিয়েছিলেন।'[৪] 'ওই সময়' বলতে অবনীন্দ্রনাথ আরও বছর-চারেক পরের কথা বুঝিয়েছেন, যা দেশীয় চিত্রকলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের দীর্ঘস্থায়িত্ব সপ্রমাণ করে।

ছিন্নপত্রাবলীর পরের দু'টি চিঠি অন্য অর্থে মূল্যবান। জমিদারী কার্যোপলক্ষে নদীমাতৃক গ্রামবাংলায় দীর্ঘদিন অবস্থান রবীন্দ্রনাথের মনে যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিনব রসদৃষ্টির উদ্বোধন ঘটিয়েছে, তেমনই বাংলার দরিদ্র সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। ইন্দিরা দেবীকে 11 May [২৯ বৈশাখ]-র চিঠিতে লিখেছেন : 'এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সত্যি সত্যি আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোখ ছল ছল করে আসে। এই মাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিল—সে যেন তার সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদয়খানি দিয়ে আমার পা-দুটো মুছিয়ে দিয়ে গেল।'[১] এর আগের দিনের চিঠিতে লিখেছিলেন : 'আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো—নিরুপায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই।'[২] সোশ্যালিস্ট্‌রা সমস্ত মানুষের মধ্যে ধনবন্টন করে দিতে চায়, আবার অনেকে বলেন জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় ন্যূনতম সামগ্রীও সকলের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার-পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সমস্যাটি সত্যই কঠিন : 'বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং

ধন গেলে সমাজের কত-যে শ্রী সৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।' এই সমস্যা সমাধানের জন্য জমিদার হিসেবে যতটুকু করা সম্ভব, ততটুকু অবশ্য তিনি করেছেন। সত্যপ্রসাদ ২২আষাঢ় তাঁর হিসাব-খাতায় লিখেছেন : 'রবিমামার আদেশানুযায়ী সাহাজাদপুরের কর্জ্জা তহবিলে হাওলাত দিই ৫০০০৲'—অল্প সুদে প্রজাদের ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করে রবীন্দ্রনাথ মহাজনের পীড়ন থেকে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। জমিদারি-বিভাগের পর যখন তিনি কালীগ্রাম পরগনার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হয়েছেন, তখন প্রজাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নানাপ্রকার অভিনব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন—একথা আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি।

16 May [মঙ্গল ৩ জ্যৈষ্ঠ] ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিলাইদহের জীবনযাত্রা বর্ণনা করেছেন 'আমি বিকেলে বেলা সাড়ে ছ'টার পর, স্নান করে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়ে চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তার পর আমাদের নতুন জলিবোটটাকে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটি পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চিৎ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি। শৈ···[আমার] কাছে বসে নানা কথা বকে যায়।' এই 'শৈ···'-এর পরিচয় নিয়ে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ও গোপালচন্দ্র রায় অনেক বিতর্ক উত্থাপন করেছেন।[৩] তাঁদের মতে, ছিন্নপত্র গ্রন্থে মুদ্রিত 'শ···' আদ্যক্ষরটিই সঠিক, কারণ ইনি হচ্ছেন 'শিলাইদহ কাছারির একজন বিশিষ্ট কর্মচারি শরৎচন্দ্র সরকার'—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেন, তিনি ছিলেন পেশকার, পদমর্যাদায় যিনি নায়েবের ঠিক পরেই। আমাদের কাছে বিরাহিমপুর কাছারির কর্মচারীদের দু'টি তালিকা আছে—একটি মজুমদার-পুঁথিতে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে লেখা, অন্যটি ১৩০৫ বঙ্গাব্দের জমিদারীর ক্যাশবহি [রবীন্দ্রভবন সংগ্রহণ-সংখ্যা : ১১৩]-র অন্তর্গত। প্রথমটিতে শরৎচন্দ্র সরকার নামের কোনো কর্মচারী নেই—দ্বিতীয়টিতে পেশকারের নাম অম্বিকাচরণ দাস, শরৎচন্দ্র সরকারের পদমর্যাদা 'এ, নবীশ'। বস্তুত 'শৈ···' আদ্যক্ষরটি ইন্দিরা দেবী ঠিকই লিখেছিলেন, কারণ ইনি হলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। এই পরিবারটির প্রতি তিনি মমত্ব বোধ করতেন। সেই কারণে তিনি শৈলেশচন্দ্রকে প্রথমে শিলাইদহ কাছারিতে নিয়োগ করেন ও পরে তাঁকে কালীগ্রাম পরগনার নায়েব পদে উন্নীত করেছিলেন। ১৩০৫-এর তালিকায় তাঁকে কালীগ্রামের নায়েব রূপেই পাওয়া যায়।

৩ জ্যৈষ্ঠের এই চিঠির পর রবীন্দ্রনাথের গতিবিধি নির্ধারণ করা দুরূহ। তবে ২০ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 2 Jun] সত্যপ্রসাদের হিসাব-খাতায় দেখা যায় 'রবিমামার নিকট প্রাপ্য টাকার মধ্যে ১০০৲' তিনি ফেরৎ পেয়েছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ৩০ জ্যৈষ্ঠ [সোম 12 Jun]-এর হিসাব–'ব° শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের জন্য জাপানীজ সিল্কের কাপড় ক্রয় ৮৫৲'—তাঁর কলকাতায় অবস্থানের প্রমাণ।

ইন্দিরা দেবীর কিছু ফরাসী বই প্রমথ চৌধুরী ধার নিতে চেয়েছিলেন—এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের পত্রালাপের বিবরণ আছে উভয়ের পত্রাবলীতে 19 May [শুক্র ৬ জ্যৈষ্ঠ] প্রমথ চৌধুরী কলকাতা থেকে লিখেছেন : 'কাল শ্যামাচরণবাবু [মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ভ্রাতা] আমাকে আপনার খানকতক ফরাসি বই দিয়েছেন।···আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাকে কিছুদিনের জন্য খানকতক বই পড়তে দিতে আপনার কোনও আপত্তি হবে না। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু যখন সিমলা হতে

লিখিত অনুমতি আনাবার প্রস্তাব করেন তখন আমি তাঁকে জানাতে বাকি রাখিনি—আমার বিবেচনায় ওরকম করাটা শুধু technical objection তুলে দেরি করা।'[১] ইন্দিরা দেবী এই পত্রের উত্তরে লিখেছেন : 'রবিকা যে আমার মতের অপেক্ষা না ক'রে আমার বই আপনাকে দিতে চাননি তা ঠিকই করেছিলেন। যাঁদের হাতে আমার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বিশ্বাস করে রেখে এসেছি, তাঁরা কি আমাকে না জিজ্ঞেস করে চাবা মাত্রই একজন লোককে কখনো তার মধ্যে কিছু দিতে পারেন? আপনার অদৃষ্টক্রমে আবার আমি এ বিষয়ে রবিকাকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা কোন কারণে তাঁর পেতে অনেক দেরি হয়ে যায়, অথচ যথাসময়ে পেয়েছেন মনে করে আমি মামাকে তাড়া করে লেখা আবশ্যক মনে করিনি।'[২] এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠি রক্ষিত হয়নি। প্রমথ চৌধুরীর চিঠিটি সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় বলেছেন : 'যাঁর সঙ্গে পরে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলাম, তাঁর প্রথম চিঠি বোধহয় এই সিমলা পাহাড়েই সেবার পাই—···আমার উত্তর (বা হয়ত তার আগেই লেখা) আমার প্রথম চিঠিখানিও রেখেছি, যদিও আমার লেখা আর সব চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছি।' ইন্দিরা দেবী শেষের কথাটি ঠিক লেখেন নি, উক্ত পত্র-সংকলনই তার প্রমাণ। মেয়েলি স্বভাবে সঞ্চয় করে রাখার প্রবৃত্তি তাঁর প্রচুর পরিমাণেই ছিল, তার ফলে, রবীন্দ্র-রচনার বহু পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য উপকরণ রক্ষিত হয়েছে। আমাদের আশা, ছিন্নপত্রাবলী-র পাণ্ডুলিপিতে অনুলিখিত মূল পত্রগুলিও হয়তো তিনি নষ্ট করেন নি—কোনোদিন যদি সেগুলি আবিষ্কৃত হয়, রবীন্দ্রজীবনের তথ্যাবলীর একটি অজ্ঞাত ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব।

সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ [২। ৭] :

৮-১২ 'আকাশের চাঁদ' দ্র সোনার তরী ৩। ৪৫-৪৯
১২-১৫ 'পয়সার লাঞ্ছনা' দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৫১৮-২০
৩৯-৫৭ 'মধ্যবর্ত্তিনী' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৮। ২৫৭-৭০
৫৮-৬৩ 'সাময়িক সারসংগ্রহ' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৫৮-৬১
৫৮-৬১ 'পরিবারাশ্রম'
৬১-৬৩ 'উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য্য'
৬৯-৭৫ 'ডায়ারী' দ্র পঞ্চভূত ২। ৫৮৪-৮৭ ['মন']

রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন পরে আবার 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগে লিখলেন। সোশ্যালিজম নিয়ে পড়াশুনো ও ভাবনাচিন্তা তিনি কিছুদিন ধরেই করছিলেন। ফর্টনাইটলি রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে 'পরিবারাশ্রম' রচনায় তিনি তারই একটি বাস্তব চিত্র বর্ণনা করেছেন। 'উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য্য' ঠিক 'সাময়িক সারসংগ্রহ' নয়, প্রকটর ও র‍্যানিয়ার্ডের রচিত *Old and New Astronomy* [1892] গ্রন্থ অবলম্বনে একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা।

এই সংখ্যার 'ডায়ারী' পঞ্চভূত-এর অন্যান্য রচনা থেকে আলাদা, এটি লেখক ভূতনাথের স্বগতকথন। প্রবন্ধটি সম্ভবত লেখা হয়েছিল চৈত্র মাসে রামপুর-বোয়ালিয়ায় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের বাসায় গিয়ে। ছিন্নপত্রাবলী-র ৯৯-সংখ্যক পত্রে ইন্দিরা দেবীর প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধটির ভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন : 'এবারকার ডায়ারিটা তো ঠিক প্রকৃতির স্তব নয়—মন-নামক একটা সৃষ্টিছাড়া চঞ্চল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কিরকম একটা উৎপাত হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে।···ও দিকে নারায়ণ সিং দেখো ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে দধি সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজন-পূর্বক দু-এক ছিলিম তামাক টেনে দুপুর বেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং সকালে বিকালে লো [কেনে]-র সামান্য দু-চারটে কাজ ক'রে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে'[৩]—লোকেন্দ্রনাথের ভৃত্য এই নারায়ণ সিং-কে প্রবন্ধে স্বনামেই পাওয়া যায়। রামপুর-বোয়ালিয়া-র চৈত্র-মধ্যাহ্নের স্থানিক রূপটি রচনার শুরুতেই আছে।

[প্রবন্ধটির একটি স্থানে কিছুটা শ্লেষ ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়—"কদলী বলে না 'আমি সর্বাপেক্ষা অল্প মূল্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি' এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রের আয়োজন করে না!"—তখনকার দিনের সাময়িকপত্রের জগতে অল্প মূল্যে বৃহৎ পত্র প্রকাশ নিয়ে যথেষ্ট রেষারেষি বর্তমান ছিল!]

সম্ভবত আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকেন। ৩০ জ্যৈষ্ঠ [সোম 12 Jun] মহর্ষির ক্যাশবহির হিসাব : 'ব° শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের জন্য জাপানীজ সিল্কের কাপড় ক্রয় ৮৫্'। সরকারী ক্যাশবহিটি পাওয়া গেলে দেখা যেত, প্রায় প্রতিদিনই তিনি পিতার কাছে পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াত করেছেন।

এই মাসে মানসী-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল, আখ্যাপত্রে মুদ্রিত তারিখ '১ আষাঢ় ১৩০০' [বুধ 14 Jun 1893]। এই সংস্করণের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত হ'ল :

মানসী।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ (দ্বিতীয় সংস্করণ।)/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত/ ও প্রকাশিত।/ ১ আষাঢ়, ১৩০০ / ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড মূল্য ২্ টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ [আখ্যাপত্র]+২ [ভূমিকা]+৪ [সূচীপত্র]+২২৪।

পৃষ্ঠাসংখ্যা, কবিতাসংখ্যা [৬৫টি] প্রভৃতি দিক দিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রথম সংস্করণের অবিকল প্রতিলিপি। মূল্যের পরিবর্তনটি লক্ষণীয়—প্রথম সংস্করণটি মাত্র ২২০ কপি ছাপা হয়েছিল, সেই কারণেই হয়তো তার দাম ছিল দু'টাকা।

মানসী প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর নব্যভারত-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কাব্যটির একটি সুন্দর সমালোচনা করেছিলেন [দ্র নব্যভারত, চৈত্র ১২৯৭। ৬৬৫-৬৭], সে কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তত দু'টি উৎকৃষ্ট সমালোচনা আমরা দেখেছি। একটি প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকার পৌষ ১৩০০-সংখ্যায় [পৃ ৭০৪-২১], সমালোচক রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রিয়নাথ সেন। সমালোচনাটি যখন সাহিত্য-তে মুদ্রিত হচ্ছিল, তখনই সেটি পড়ে কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ১৯ ও ২০ পৌষের ডায়ারিতে লেখেন : 'পৌষ মাসের "সাহিত্য" মুদ্রিত হইতেছে। রবীন্দ্র বাবুর "মানসী" নামক কবিতাপুস্তকের সমালোচনা দেখিলাম। এমন ***সমালোচনা কখনও পাঠ করিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। ইহা প্রকৃত সমালোচকের স্বাধীন মতের অভিব্যক্তি নহে, অন্ধ ভক্তের স্তুতিমাত্র। লেখক মহাশয় সমালোচনায় হাত না দিয়া মানসী-মঙ্গল কাব্য লিখিলে তাঁহার উদ্দেশ্য বোধ হয় অধিকতর সুসিদ্ধ হইত।'[১] প্রিয়নাথ সেন তাঁর বিশ্বসাহিত্য-

পাঠের অভিজ্ঞতার আলোকে মানসী কাব্যের রসবিচার করেছেন। বিশু মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' [১৩৬৯, পৃ ৭১-৯০] ও অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-বিতান' [১৩৬৮, পৃ ১১-২৯] গ্রন্থে সম্পূর্ণ সমালোচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, সুতরাং উদ্ধৃতির বিশেষ প্রয়োজন নেই। প্রিয়নাথ তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন এই ভাবে : 'এইরূপে মানসীতে পূর্ণতম সৌন্দর্য, উচ্চতম কবিত্ব, এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যই ইহা "শ্রেষ্ঠতম প্রাণের বিকাশ" বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন এবং কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু।'[২]

অপর সমালোচনাটি ইংরেজিতে লেখা, প্রকাশিত হয়েছিল May 1894-সংখ্যা *National Magazine* [pp. 185-93]-এ— সমালোচক অতুলচন্দ্র ঘোষ! প্রিয়নাথ সেনের সমালোচনা তিনি পড়েছিলেন, তাঁরই মতো দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি মানসী-র কাব্যমূল্য ও রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব বিচার করেছেন। প্রথমেই তিনি গীতিকাব্য হিশেবে মানসী-র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ক'রে লিখেছেন : 'Babu Rabindra Nath, the best lyric poet of modern Bengal, published sometime ago a collection of poems, chiefly lyrical, entitled Manasi, which after repeated perusal we have no hesitation to call the best of its kind not excepting even Brajangana.' 'কড়ি ও কোমল' ও 'সোনার তরী'র সঙ্গে তুলনা ক'রে তাঁর সিদ্ধান্ত : 'We may assert that Manasi is the grandest effort, "রাজা রানী" excepted, of the author's genius.' রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য-অভিমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা ক'রেও তাঁর প্রেম-কবিতার প্রশংসায় সমালোচক পঞ্চমুখ : '...it is in the description of this passion that Rabindra Nath chiefly excels. From his earliest efforts down to his present perfect effusion—from the "লাজময়ী" of শৈশব সঙ্গীত down to "ভুলে", "ভুলভাঙ্গা", "আমার সুখ" of Manasi, his poems have traversed all phases of this master-passion with that fine, keen sensibility which is at once indicative of the highest sense of delicacy and the truest art; with a sublimity, pathos and depth which is worthy of Petrarch or Alcaeus, or, in our literature, of the Vaishnava poets'. সমালোচক স্থানাভাবে সব-ক'টি কবিতার আলোচনা করতে পারেন নি ব'লে দুঃখপ্রকাশ করেছেন, আমরাও একই কারণে দুঃখিত—এই উৎকৃষ্ট রসগ্রাহী সমালোচনাটি পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকার সময়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি শরৎকুমারী দেবীর কন্যা স্বয়ম্প্রভার সঙ্গে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এই ভাগিনেয়ীটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল; তাঁর চিঠিতে একাধিকবার এর উল্লেখ আছে—'বেলাকে নিয়ে স্বয়ম্প্রভা এন্ড কোম্পানির লুটোপুটি' [Jun 1889, ছিন্নপত্রাবলী। ১৫], 'কাল স্বয়ম্প্রভারা ছোটো বাংলাতে মাছের তরকারি রাঁধতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাগল কতকগুলো আম নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল—ছোটোবউ স্বয়ম্প্রভারা ভয় পেয়ে তাকে বিদায় করে দেয়' [ঐ। ১০০] ইত্যাদি। স্বয়ম্প্রভা দেবীর বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত একটি চিঠিতে এ-সম্পর্কে কিছু লিখেছিলেন, ইন্দিরা দেবী সে-সম্পর্কে খোঁটা দিয়ে লেখেন বিয়ে প্রভৃতি বিষয় পুরুষেরা 'কিছু বেশি থিওরেটিক্যালি' দেখে—রবীন্দ্রনাথ সেই অভিযোগ মেনে নিয়ে 22 Jun [বৃহ ৯ আষাঢ়] কলকাতা থেকে লিখলেন : 'স্ব [য়ম্প্রভা]র বিয়ের সম্বন্ধে আমি যে-সব ফিলজফাইজ করেছিলুম সেটা কোনো কাজেরই না। সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই আছে, কোনোটা একেবারে অতিরিক্ত পরিমাণে নেই—মোটের উপরে দুটি নরনারী

পরস্পরের জীবনে গ্রন্থি বদ্ধ করে মিলে-মিশে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবারই কথা…আমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়া 'চিন্তাশীল' লোকেরা এইটে ঠিকটি বুঝতে পারে না। আমরা নিজের সম্বন্ধেও কেবল চিন্তা ক'রে কল্পনা ক'রে নিজেকে ব্যর্থ বিফল ক'রে ফেলেছি—প্রত্যেক খণ্ড অবস্থাই আমাদের কাছে বড়ো বেশি প্রাধান্য ধারণ করে। সুখ অত্যন্ত অধিক সুখ হয় এবং দুঃখ একান্ত তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু জীবনের যে প্রধান সুখ প্রধান শান্তি আপনার আদ্যোপান্তের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য একটি ঐক্য সেটি নেই…। কিন্তু যারা মন-পদার্থের দ্বারা অতিমাত্র উৎপীড়িত নয়, পৃথিবীর কোনো অবস্থাতেই তাদের বিশেষ আশঙ্কা নেই—তারা সুখী হবেই, সুখী করবেই, এবং জীবনের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।'[১] ১২ আষাঢ় [রবি 25 Jun] লিখিত 'হৃদয়যমুনা' [দ্র সোনার তরী ৩। ৯৭-৯৯] ও ১৬ আষাঢ়ে [বৃহ 29 Jun] লেখা 'ব্যর্থ যৌবন' [দ্র ঐ ৩। ৯৯-১০১] কবিতা-দু'টি এই পত্রটির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। অবশ্য বৈষ্ণব-কবিতার অনুষঙ্গ ও অন্তর্গূঢ় প্রেমচেতনার সংযোগে কবিতা-দু'টি অন্য স্তরে উন্নীত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক বাদ দিয়ে 'ব্যর্থ যৌবন' ['আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়/ কেমনে?] কবিতাটির একটি গীতিরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করেন [দ্র গীত ২। ৩৭০; স্বর ৩৫]।

কবিতা-দু'টি কোথায় রচিত হয়েছিল, পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। তবে ১৭ আষাঢ় [শুক্র 30 Jun] শিলাইদহ থেকে মিসেস্ পি. কে. রায় [সরলা রায়]-কে লেখা একটি চিঠি পাওয়া গেছে, তাতে তিনি লিখেছেন : 'আমি এই ঘন বর্ষায় এখন বোটে, গোরাই নদীর উপরে। এখান হইতে দুই চারিদিনের মধ্যে ছাড়িব—অনেকগুলি ছোট ছোট নদীর মধ্য দিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে।' এই চিঠির ভাবে মনে হয়, এর কিছুদিন আগেই তিনি শিলাইদহে এসেছিলেন—কবিতা-দু'টি সেখানেই লেখা।

উক্ত চিঠিটি খুবই মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ ১৬ আশ্বিন ১৩০১ [1 Oct 1894] তারিখে চৈতন্য লাইব্রেরি ও বীডন স্কোয়ার লিটারারি ক্লাবের ৩৭ তম অধিবেশন উপলক্ষে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মিনার্ভা থিয়েটারে 'মেয়েলি ছড়া' [দ্র সাধনা, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০১। ৪২৩-৭৪; লোকসাহিত্য ৬। ৫৭৭-৬০৮]-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের উপকরণ কত আগে থেকে তিনি সংগ্রহ করছিলেন, তার পরিচয় আছে এই চিঠিটিতে : 'ইংরাজিতে যেমন Nursery Rhymes আছে আমি সেইরূপ বাঙ্গলার সমস্ত প্রদেশের ছড়া সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কতক কতক সংগ্রহও হইয়াছে। আপনি যদি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত কাহারো নিকট হইতে যথাসম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন তা বড় উপকার হয়। ছড়া যতই সামান্য তুচ্ছ এবং চলিত হউক্ না কেন আমার নিকট তাহা বহুমূল্য। এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে আমাদের সমাজের অনেক প্রাচীন ইতিহাস ও দৃশ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং অনেক তুচ্ছ কথার মধ্যে গভীর কবিত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। যদি এরূপ সংগ্রহক্ষম কাহাকেও পান তবে তাঁহাকে বলিয়া দিবেন যেন গ্রাম্যতা অথবা কুরুচি দোষের জন্য কোন ছড়া বাদ না দেওয়া হয় এবং অর্থহীন শব্দসমষ্টিকে সামান্য জ্ঞান না করেন।'[১] বৎসরাধিক পূর্বেই প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের মনে **স্পষ্ট আকারে** দেখা দিয়েছিল, এই পত্রটিতে তার **সাক্ষ্য রয়েছে**।

বর্ষামুখরিত আষাঢ় মাসে নদীবক্ষে বাস রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লেগেছে, এইসময়ে লেখা চিঠিগুলিতে এই ভালো লাগারই কথা। সোমবার [২০ আষাঢ় 3 Jul] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'নদীর জল প্রতিদিনই

বেড়ে উঠছে।···ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে—লজ্জার সীমা উপছে এল ব'লে, প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে। এই ভরা বাদরে ভরা নদীর মধ্য দিয়ে নৌকো করে যেতে বেশ লাগবে—বাঁধা বোট ছেড়ে দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়ে আছে।'[২]

কিন্তু এর একটি বেদনার দিকও আছে, সেটি লিখেছেন মঙ্গলবারের চিঠিতে : 'আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে—আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। যখন আর চার দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারছিস।'[৩] এই পত্রাংশ পড়ে 'সোনার তরী'র সমালোচকদের কথা মনে পড়ে। বিলাতফেরৎ কৃষিতত্ত্ববিদ্ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'সোনার তরী'র সমালোচনায় লিখেছিলেন : 'কৃষক ধান কাটিতেছেন বর্ষাকালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে ধান কেহই কাটে না; বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে। ধান তিন প্রকার (১) হৈমন্তিক তাহাই কৃষকের আসল ধান্য—কাটে হেমন্তকালে, অগ্রহায়ণ মাসে; (২) আশু (নিজে খাইবার জন্যই প্রায় করে)—কাটে শরৎকালে, ভাদ্রমাসে; (৩) বোরো (উড়িষ্যা অঞ্চলেই অধিক হয়)—কাটে গ্রীষ্মকালে, বৈশাখ মাসে।···ক্ষেত খানি তবে একটি দ্বীপ। তবে এ চর জমি। এরূপ জমিতে ধান করে না। এ সব জমি শ্রাবণ ভাদ্রমাসে ডুবিয়া থাকে। শীতকালে নদীগর্ভ হইতে বাহির হয়।'[৪] এই বৈজ্ঞানিক তথ্য অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই, কিন্তু সমসাময়িক পত্রে 'কবি'র দেওয়া বর্ণনাই বা অস্বীকার করি কী করে?

২২ আষাঢ় [বুধ 5 Jul] শিলাইদহের কাজকর্ম সেরে বিকেল বেলায় রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর রওনা হন। পরের দিনে ইছামতী নদীর উপর দিয়ে যাবার সময়ে এই নৌকাযাত্রার একটি বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : 'খানিক দূরে গিয়ে অনুকূল বাতাস পাওয়া গেল। পাল তুলে দিতে বললুম; পাল তুলে দিলে। দু দিকে ঢেউ কেটে কল্ কল্ শব্দ তুলে বোট সগর্বে চলে যেতে লাগল।···বাতাস বেগে বইতে লাগল, পদ্মা নৃত্য করতে লাগল, পাল ফুলে উঠল, দিনের আলো মিলিয়ে এল, আকাশের ধারের মেঘগুলি ক্রমে আকাশের মাঝখানে ঘনঘটা করে জমে গেল, চার দিকে পদ্মার উদ্দাম চঞ্চল জল করতালি দিচ্ছে।···আমি যেন প্রকৃতির রাজার মতো বসে আছি আর আমাকে তার দুরন্ত ফেনিলমুখ রাজ-অশ্ব সনৃত্য গতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।'[৫]

'ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের-ছাত-ওয়ালা বাজার, বাঁখারির-বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল কুল খেজুর শিমুল কলা আকন্দ ভেরেণ্ডা ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টি-বদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকোর দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে' রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে পৌঁছলেন ২৩ আষাঢ় [বৃহ 6 Jul] সন্ধ্যার সময়ে। এখানে তিনি প্রায় এক মাস অবস্থান করেন; এই কথাই লিখলেন পরদিন সকালে : 'এখন কিছুদিনের মতো এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। অনেকদিন বোটে থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো—একটা যেন নূতন স্বাধীনতা পাওয়া যায়—···আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে ব'সে জানলা থেকে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ও পারের তরুমধ্যগত গ্রাম,

এবং এ পারের অনতিদূরবর্তী লোকালয়ের মৃদুকর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ ক'রে বেশ একটুখানি মনের আনন্দে আছি।'[১]

মনের এই আনন্দিত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ দু'টি গান লেখেন। কিছুদিন আগে লেখা 'হৃদয়যমুনা' ও 'ব্যর্থ যৌবন' কবিতা-দু'টি লেখার সময়েই তাঁর মনের মধ্যে গানের সুর ধ্বনিত হয়েছিল—দু'টি কবিতাকেই তিনি সুর-যোজনার উপযুক্ত মনে করেছিলেন। এছাড়া সম্ভবত এই সময়ে তিনি আরও দু'টি গান রচনা করেন। 10 Jul [সোম ২৭ আষাঢ়] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'আমার গানগুলো পেয়েছিস। 'বড়ো বেদনার মতো' গানের সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়।···এ-সব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো।···ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেক দিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম···। এ গানটা আমি এখনও সর্বদা গেয়ে থাকি—আজ প্রাতঃকালেও অনেক ক্ষণ গুণ্‌গুণ্‌ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়। অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'[২]

আর একটি গান সম্ভবত 'হৃদয়ের এ কূল ও কূল দু কূল ভেসে যায়'। এই গানটির রচনা-কাল সম্বন্ধে কোনো সংবাদ না পাওয়ায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। গানগুলি সম্ভবত কয়েক দিন আগে রচিত হয়ে ইন্দিরা দেবীর কাছে প্রেরিত হয়েছিল :

[১] 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে' দ্র গীত ২। ২৯৫; স্বর ১৩; কাব্যগ্রন্থাবলী। ৪২৯, 'কীর্ত্তনের সুর'।

[২] 'হৃদয়ের এ কূল ও কূল দু কূল ভেসে যায়' দ্র গীত ২। ৩০৫; স্বর ১০; কাব্যগ্রন্থাবলী। ৪২৯, 'বিভাস'।

লক্ষণীয়, দু'টি গানের ভাষায় ও সুরে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব আছে।

ইন্দিরা দেবীকে উক্ত চিঠি লেখার দিন ২৭ আষাঢ় [সোম 10 Jul] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন দু'টি কবিতা —'ভরা ভাদরে' [দ্র সাধনা, ভাদ্র। ৩৯৪-৯৫; সোনার তরী ৩। ১০১-০২] ও 'প্রত্যাখ্যান' [দ্র সোনার তরী ৩। ১০৩-০৫]। পরের দিন ২৮ আষাঢ় [মঙ্গল 11 Jul] লেখা হ'ল 'লজ্জা' কবিতা [দ্র ঐ। ১০৬-০৮]। এই কবিতাগুলি সম্পর্কে ৩০ আষাঢ় [বৃহ 13 Jul] তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে—এ দিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয়নি, ও দিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন-কার্ত্তিকের যুগল সাধনা রিক্তহস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি।'[৩] পত্রটিতে বহুমুখী রচনাপ্রতিভার অধিকারীর সংকটটি সুন্দর ফুটেছে : 'মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে'। ছোট গল্প, ডায়ারি-জাতীয় লেখা, সামাজিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক, গান, অভিনয় সব-কিছুর মধ্যেই তিনি সুখ ও সার্থকতা অনুভব করেন—'আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ-যে চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে।' রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বয়স অবশ্য কোনো

বাধাই সৃষ্টি করতে পারে নি, জীবনের শেষ পর্বে প্রায় বিস্ফোরণের মতো চিত্রী রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমান সময়েও তাঁর পেনসিল দিয়ে আঁকিবুঁকির অনেক দৃষ্টান্ত আছে 'পকেট বুক'-এ। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, 'একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে—বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন—আমার ছেলেবেলাকার ভালোবাসা, আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।'

সাধনা, আষাঢ় ১৩০০ [২।৮] :

৯৭-১০৩ 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৫২২-২৫

১০৩-১৫ 'অসম্ভব গল্প' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৮। ২৭০-৭৮ ['অসম্ভব কথা]

১২৭-২৮ 'সোনার তরী' দ্র সোনার তরী ৩। ৭-৮

১৬৯-৭২ 'সাময়িক সারসংগ্রহ' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৬২-৬৪ 'অভ্যাসজনিত পরিবর্ত্তন'

১৯৪-২০০ 'প্রসঙ্গ কথা' দ্র শিক্ষা-পরিশিষ্ট ১২। ৫০১-০৫ ['শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি']

এছাড়া 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গানটির ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি ১৬৫-৬৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' রচনাটি সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির পছন্দ হয়নি; তিনি লিখেছেন : '"প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ" কষ্টকল্পিত রহস্য, আরম্ভ ভাগ বরং ভাল, কিন্তু শেষটা নিতান্তই টানিয়া বোনা হইয়াছে। ইহাকে কোন মাসিকের প্রথম স্থান অধিকার করিতে দেওয়া সঙ্গত হয় না।'[১] রবীন্দ্রনাথের লেখাটি অবশ্য শুধু রহস্য নয়, ব্যঙ্গের কশাঘাত এখানেও আছে।

'অসম্ভব গল্প' রূপকথার আবহে রচিত। সম্ভবত 'কঙ্কাবতী'র সমালোচনা করতে গিয়ে গল্পের ভাবটি তাঁর মনে আসে। শিশু ও বয়স্ক মনে রূপকথার প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণটি এখানে লক্ষণীয়। সাহিত্য-সম্পাদক লিখছেন: 'ইহার উপক্রমণিকা টুকু অতি সুন্দর, বাল্য স্মৃতির মধুর সৌরভে আমোদিত হইয়া আছে।' জীবনস্মৃতি-র 'নানা বিদ্যার আয়োজন' অধ্যায়ের একটি অংশের সঙ্গে গল্পটির প্রারম্ভিক ভাগের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

দ্বিতীয়বার বিলাতভ্রমণ শেষে দেশে ফেরার সময়ে একটি শুক্রবারের [10 Oct 1890 ২৫ আশ্বিন ১২৯৭] বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ দিনলিপিতে লিখেছিলেন : 'Wallace-এর *Darwinism* পড়ছি, বেশ লাগছে—ইচ্ছে করছে বাংলায় তর্জমা করতে। কিন্তু আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।'[২] এই বইটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এবারের 'সাময়িক সারসংগ্রহ'-এর অন্তর্গত 'অভ্যাসজনিত পরিবর্ত্তন' প্রবন্ধটি রচনা করেন।

এবারের 'প্রসঙ্গ-কথা' সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

মিসেস পি. কে. রায় [সরলা রায়]-কে ছড়া-সংগ্রহের যে অনুরোধ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, তা কতটা রক্ষিত হয়েছিল আমাদের জানা নেই—কিন্তু এর উত্তরে তিনি যে প্রীতিপূর্ণ পত্র পাঠিয়েছিলেন ৮ শ্রাবণ [রবি 23 Jul] সাজাদপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ তার প্রত্যুত্তরে জানান : 'আমি ইতস্তত হইতে অনেকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়াছি এবং গল্পও গুটি দশ বারো পাওয়া গেছে—আপনি যেটি লিখিতেছেন শেষ হইলে পাঠাইয়া দিবেন।'

এর থেকে অনুমান করা যায়, রূপকথা-সংগ্রহও রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল—কিন্তু রূপকথা সংগ্রহ ক'রে আলোচনাসহ প্রকাশ করার উদ্দেশ্য তিনি সার্থক করতে পারেন নি, এইজন্য দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার যখন 'ঠাকুরমার ঝুলি' [১৩১৪] প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের রূপকথা সংগ্রহের প্রসঙ্গটি এখানে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "শিলাইদহে যখন রবিকাকা ছিলেন, আমায় লিখলেন যে—'আমি এখানে ছেলেদের ছড়া ও রূপকথা সংগ্রহ করছি, তুমি দেখতো কোলকাতায় দেশ বিদেশের রূপকথা সংগ্রহ করতে পারো কিনা?' আমাদের বাড়ী ভরা ছিল নানারকম গাঁয়ের লোক। তাদের ধরে অনেক ছড়া, রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহ করলুম। রবিকাকা ওখান থেকে এসে বল্লেন—'দেখি তোমার খাতা।' আমি ছবি ও ছড়ায় রূপকথা লিখছিলুম। রবিকাকা একখানি খাতা দিলেন; বল্লেন—'এই খাতায় রূপকথা আছে। দেখতো তুমি এর থেকে গল্প লিখতে পারো কিনা।' তা থেকে আমি ক্ষীরের পুতুল, চোর চক্রবর্ত্তী ও আরও অনেক ছোট গল্প লিখলুম, আমার শকুন্তলা [1895] লেখার পর।"[১] অন্যত্র তিনি লিখেছেন : 'তিনি কাকীমাকে (রথীর মা) দিয়েও অনেক রূপকথা সংগ্রহ করিয়েছিলেন। কাকীমা সেগুলি একখানি খাতায় লিখে রাখতেন, তাতে অনেক ভালো ভালো রূপকথা ছিল। তাঁর সেই খাতাখানি থেকেই আমার "ক্ষীরের পুতুল" গল্পটি নেওয়া।'[২] রবীন্দ্রনাথও সাজাদপুর থেকে একটি তারিখ-হীন চিঠিতে অবনীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেল। বেশ লাগ্চে। এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাজাঞ্চির কাছ থেকে গোটা আষ্টেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্চি তাকেই অনুরোধ করচি। তোমাদের বুড়ি দাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভুলোনা।'[৩] গগনেন্দ্রনাথকে শিলাইদহ থেকে লিখেছেন : 'তোমাকে আমার সেই ছড়া সংগ্রহের কথা স্মরণ করাবার জন্যে এই পত্রখানি লিখ্‌চি—সে কথাটা যেন ভুলো না এবং অধিক বিলম্বও কোরো না।'[৪] এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ছড়া ও রূপকথা সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ কতখানি উৎসাহী হয়েছিলেন। অথচ এই স্বেদাক্ত পরিশ্রমের চিহ্ন 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধে কবিত্বের সৌরভের অন্তরালে অদৃশ্যপ্রায়। তাছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিই কেবল তাঁর কাম্য ছিল না, গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার যে প্রয়াসের সূচনা তিনি এখন করলেন, জীবনের বিভিন্ন পর্যায় তা অব্যাহত থেকেছে। সাধনা-তেই তিনি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে মেয়েলি ব্রতকথা ও দীনেন্দ্রকুমার রায়কে দিয়ে পল্লী-উৎসবের বিবরণ সংকলন করিয়েছিলেন, এ-কথা বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সরলা রায়কে লেখা ৮ শ্রাবণের যে-পত্রটির কথা আমরা আগের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, সেটি মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটি অন্তরঙ্গ প্রকাশ হিশেবে উদ্ধারযোগ্য : '···আমি অকপট চিত্তে কহিতেছি আপনি আমাকে যতটা সমাদরের আসন দিয়াছেন আমি তাহার যোগ্য নহি।···আমি লেখকমাত্র; সেজন্য যতটুকু সম্মান ও কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য তাহাতে আমার অধিকার থাকিতে পারে কিন্তু আমার জীবনে কোন গৌরব নাই। লেখক জাতিকে বিশ্বাস করিবেন না, তাহাদের কোথাও স্থিরতা নাই—তাহাদের জীবন বড় বিক্ষিপ্ত, দশদিকের আকর্ষণে দশদিকে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। অনুভব এবং প্রকাশ করিবার ক্ষমতা এক এবং জীবনপথে চলিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র। আমাকে আপনি ভুল বুঝিবেন না—আমাকে আপনাদেরই একজন জানিবেন এবং সাধারণের অপেক্ষা ঢের বেশি দুর্ব্বল জানিয়া মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন। আমি এই পৃথিবীতে যে জাতিভুক্ত,

সে জাতির লোক সর্ব্বদাই অপরাধ করে অথচ কঠিন শাস্তি সহিতে পারে না এবং সহানুভূতির জন্য আকণ্ঠ লালায়িত।···অতএব আমাকে যে আদরের স্থানটুকু দিয়াছেন সেটুকু দয়া করিয়া রাখিবেন; এই সহৃদয়তা ও স্নেহের নীড় আমাদের মত লালায়িত-স্বভাবের লোকের পক্ষে বড় লোভের জিনিষ—কিন্তু আমাকে একজন ছন্দরচক কবিতা লেখকের বেশি বলিয়া জ্ঞান করিবেন না।'[৫] স্নেহকাতর সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ অকুণ্ঠ প্রকাশ খুব বেশি সুলভ নয়।

অথচ একই দিনে দার্জিলিং-বাসী প্রমথ চৌধুরীকে তিনি যে পত্রটি লিখেছেন, সেটির স্বাদ কিঞ্চিৎ তিক্ত: '···হাজার হোক্, মানুষ ত আর কাজ করবার যন্ত্র নয়, মানুষের হৃদয়টাই তার কাছে সব চেয়ে প্রার্থনীয়, সেই অন্য হৃদয়ের সংসর্গ উত্তাপের অভাবে আমি যে কাজে নিযুক্ত আছি তারও উৎসাহ অনেক কমে এসেছে।··· গায়ে পড়ে পৃথিবীর উন্নতি সাধন কার্য্যে শর্ম্মা বোধহয় শীঘ্রই অবসর নেবেন। পাব্লিক নামক অকৃতজ্ঞ জীবের চরণতলে যে তৈল যোগান যেত সেইটে নিজের নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করে কিছুকাল নিদ্রা দেবার জন্যে অত্যন্ত ইচ্ছা করচে।'[৬] সম্ভবত এই মনোভাবের অভিঘাতে কয়েক দিন পরে 'পুরস্কার' কবিতাটি লিখিত হয়, সহানুভূতি ও অনুরাগ লাভের আকাঙক্ষায় সেখানে 'কবি'র কাছে ধনৈশ্বর্যও তুচ্ছ ব'লে মনে হয়েছে।

'পুরস্কার' [দ্র সোনার তরী ৩। ১০৯-৩১] কবিতাটির নীচে তারিখ দেওয়া আছে ১৩ শ্রাবণ ১৩০০ [শুক্র 28 Jul], স্থানের কোনো উল্লেখ নেই—অথচ পাণ্ডুলিপিতে [মজুমদার-পুঁথি] অসংশয়িতভাবে 'সাহাজাদপুর'-এর উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে সম্ভবত এটি দীর্ঘতম কবিতা—যাঁরা পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটি দেখেছেন তাঁরা জানেন কী অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ৬৬২ ছত্রের এই সুদীর্ঘ কবিতাটি লিখে গেছেন—কাটাকুটির পরিমাণ দৈর্ঘ্যের তুলনায় সামান্যতম। পাণ্ডুলিপিদৃষ্টে অনুমান করা যায়, এখানেই কবিতাটি প্রথম রচিত হয়েছিল—আর এই অনুমান সত্য হ'লে ছন্দ-ভাষা-মিলে তাঁর নৈপুণ্যে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। মৃণালিনী দেবীকে একটি তারিখ-হীন চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : 'সমুদ্রতীর এবং সমুদ্রতরঙ্গের উপর যখন কবিতা লিখ্‌চি তখন আর কাঠা বিঘের জ্ঞান থাকে না, তখন অনন্ত সমুদ্র তীর চোদ্দ অক্ষরের মধ্যে। আর সেই সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট বাঙ্গলা বানাতে যাও, তখন এঞ্জিনিয়র কন্ট্রাক্টর এষ্টিমেট্ চিন্তা পরামর্শ ধার এবং টোয়েল্‌ভ্‌পার্সেন্ট্ সুদ—তার উপরে আবার কবির স্ত্রীর পছন্দ হয় না, লোক্‌সান বোধ হয়—স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতে হয়ে উঠল না দেখছি। কবিত্বে এক পয়সা খরচ নেই (যদি না বই ছাপাতে যাই) আর সংসারটাতে পদে পদে ব্যয়বাহুল্য এবং তর্কবিতর্ক।'[১] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে নিশ্চয়ই কবিতাটি মৃণালিনী দেবীকে পাঠ ক'রে শুনিয়েছিলেন—জানতে ইচ্ছে হয়, তখন 'কবির স্ত্রী' কি বলেছিলেন! সন্দেহ নেই, কবিতাটি লেখার সময়ে স্ত্রী-র ছবিটি তাঁর মনে উপস্থিত ছিল।

এই দীর্ঘ কবিতাটি লেখার পর রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের কচ ও দেবযানীর কাহিনী অবলম্বনে একটি কাব্যনাট্য লিখতে আরম্ভ করেন, পাণ্ডুলিপিতে রচনা-সমাপ্তির তারিখ : 'কালিগ্রাম/২৬ শ্রাবণ' [বৃহ 10 Aug]। কাব্যনাট্যটি একটি গদ্য-ভূমিকা-সহযোগে 'বিদায়-অভিশাপ' নামে সাধনা-র মাঘ-সংখ্যায় [পৃ ২৪৩-৫৮] মুদ্রিত হয়; 'চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালে—আখ্যাপত্রে মুদ্রিত তারিখ : '১৬ শ্রাবণ ১৩০১ সাল।'

রবীন্দ্রনাথ কবে সাজাদপুর থেকে কালীগ্রাম যাত্রা করেন, আমাদের জানা নেই। সরলা রায়কে ৮শ্রাবণের চিঠিতে লিখেছিলেন : 'আপাততঃ কিছু দিন আমি স্থলচরভাবেই আছি।···আবার কিছুদিন পরে জলপথে যাত্রা করিতে হইবে।' প্রমথ চৌধুরীকেও তিনি কালীগ্রাম যাওয়ার কথা লিখেছেন। ইন্দিরা দেবীকে পতিসার থেকে লেখা 11 Aug [শুক্র ২৭ শ্রাবণ]-এর চিঠির তারিখ যদি ঠিক হয়, তবে তার দু-এক দিন পূর্বেই তিনি সেখানে পৌঁচেছিলেন—পত্রটি যাত্রা পথের সজীব বর্ণনায় পূর্ণ। সেক্ষেত্রে 'বিদায়-অভিশাপ' কাব্যনাট্যটি তিনি বোটেই লিখতে শুরু করেছিলেন, সেটি শেষ হয় ২৬ শ্রাবণ পতিসরে পৌঁছবার পর—এমন সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত।

'বিদায়-অভিশাপ'-এর পাণ্ডুলিপিটি | Ms. 130] ৩৪ পৃষ্ঠার একটি ছোটো নোটবুক-জাতীয় খাতা। প্রথম ২টি পৃষ্ঠা সাদা—২য় পৃষ্ঠায় হাঁটুর মধ্যে মুখ-গুঁজে পিছন-ফিরে বসা পুরুষমূর্তির কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার পেনসিল-স্কেচ আছে। বাকি পৃষ্ঠাগুলি হালকা নীল রুল টানা—প্রতি পৃষ্ঠায় ২২টি রুল আছে। খাতার ডান দিকের পৃষ্ঠাগুলিতেই লেখা হয়েছে, প্রয়োজনমতো দীর্ঘ সংযোজন করা হয়েছে বাঁদিকের পৃষ্ঠায়—রচনা-শেষে তারিখটি কালিতে লেখা, তাছাড়া সমস্ত রচনাটিই পেনসিলে লিখিত। ৩২৮ ছত্রের সমিল প্রবহমান পয়ারে লেখা এই কাব্যনাট্যের পাণ্ডুলিপিতে শব্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অসন্তোষ সুস্পষ্ট—কাটাকুটির পরিমাণ তাই স্বভাবতই বেশি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার পর আর কোনো পরিবর্তন হয়নি—সাধনা ও রচনাবলী-র পাঠে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই।

মাঘ-সংখ্যা সাধনা-য় কাব্যনাট্যটি প্রকাশিত হওয়ার পরের দিন ১৬ মাঘ কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ডায়ারিতে লেখেন : '···রবিবাবু মিত্রাক্ষরের সহিত অমিত্রাক্ষরের পদ্ধতি মিশাইয়া আজ কাল যেরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বেশ প্রীতিপ্রদ।···বর্ত্তমান কবিতায় "ধর্ম্ম জানে প্রতারণা করি নাই" ইত্যাদি গদ্যময় পংক্তি এবং যতি ও শব্দবিন্যাসের দোষ অনেক স্থলে দেখিলাম। কিন্তু ঠাকুর-কবির স্বভাবসুলভ সুন্দর বর্ণনা ও সহজ কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিতাটি পড়িতে বিরক্তিবোধ হয় না। ব্রাহ্মণতনয় কচ স্বার্থময় প্রেমের উপর কর্ত্তব্যের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, এবং দেবযানীর কঠোর অভিশাপের বিনিময়ে যে উদার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহাই এই কবিতার বর্ণনীয়। উদ্দেশ্যের জন্য যতটুকুর প্রয়োজন, কবিতাটিকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। কচের চরিত্র মহাভারত হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছে।'[১] সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় লিখেছেন : "বিদায় অভিশাপ" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা, দুইটি মাত্র চরিত্র ও বিদায়ের দৃশ্য লইয়া নাটকীয় প্রথায় রচিত। কচ ও দেবযানী ইহার নায়ক ও নায়িকা। এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, বাঙ্গলা সাহিত্যের সৌভাগ্য কল্পনা করিয়া দৃপ্ত হইয়াছি।···রবীন্দ্র বাবু কচের চরিত্র মহাভারত অপেক্ষা উন্নত করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দ এমন অবলীলাকল্পিত যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক একটি বর্ণনা ও চিত্র, যেন প্রকৃতির ফটোগ্রাফ। তাঁহার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণশক্তিও প্রশংসনীয় এবং উপভোগের যোগ্য। রবীন্দ্র বাবু গীতিকবিতায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনি চরিত্রসৃষ্টি করিয়া এখনও সফল হইতে পারেন নাই। আশা করি, রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে অবহিত হইবেন, এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ কাব্যজগতের চরিত্র হইতে আমরা শিক্ষা ও সুখ লাভ করিব।'[২]

আত্মীয়-বন্ধু ও সমালোচকদের কাছ থেকে আরও সমালোচনা ও বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই শুনেছিলেন, সেইগুলি অবলম্বন ক'রে তিনি লিখলেন 'কাব্যের তাৎপর্য' [দ্র সাধনা, অগ্র০ ১৩০১। ৪৯-৫৯; পঞ্চভূত ২। ৬০৩-১০]—সেখানে ব্যোম, ক্ষিতি, সমীর ও স্রোতস্বিনী তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে। স্রোতস্বিনীর উক্তি : 'কচ-দেবযানী-সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।' লেখক স্পষ্টতই স্রোতস্বিনীকে সমর্থন করেছেন।

পতিসরে পৌঁছে 11 Aug [শুক্র ২৭ শ্রাবণ] পথের বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-চিঠিটি লিখেছেন, তার শেষে আছে : 'ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—/'যোবতী, ক্যান বা কর মন ভারী?/ পাবনা থেকে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।'/ স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন করে সংগীত রচনা করেছেন—আমরাও ও ভাবের ঢের লিখেছি, কিন্তু কিছু ইতরবিশেষ আছে।···এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক, কিন্তু দেশকালপাত্র-বিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে। আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবিভ্রাতার রচনাগুলিও এই গ্রামের লোকের সুখদুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।'[৩] গ্রামীন লোককথার সৌন্দর্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে ছড়া ও রূপকথা সংগ্রহে ব্রতী, সেই জন্য এই লোকগীতির সহজ মাধুর্য তাঁর অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছে। কৌতুকের ভঙ্গিতে বললেও এটি তাঁর সমকালীন মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

13 Aug [রবি ২৯ শ্রাবণ] তিনি ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিটি লিখেছেন, সেটিতে আছে ছন্দ ও ভাষার সম্পর্কে তাঁর ভাবনা। ফাল্গুন ১২৯৯-সংখ্যা সাধনা-য় 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'তে তিনি গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনাটির সঙ্গে বর্তমান চিঠিটির কিছু সাদৃশ্য আছে। তিনি লিখেছেন : 'তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক-একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই; সে একটা বৃহৎ বিশেষত্বহীন বিলের মতো।···অনেক মূর্খ মনে করে কবিতার ছন্দোবন্ধ কেবল একটা বাহাদুরি করা, ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে সুখ দেয়—ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সে ভারী ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে ব'লেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি।'[৪] কিছুদিন পূর্বেই তিনি দু'টি বড় কবিতা রচনা করেছেন —এইচিঠিটিকে আমরা তার কৈফিয়ৎ-স্বরূপে গণ্য করতে পারি।

সাধনা, শ্রাবণ ১৩০০ [২। ৯] :

২০১-১৭ 'শাস্তি' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৮। ২৭৮-৮৯

২৮১-৮৩ 'হৃদয়-যমুনা' দ্র সোনার তরী ৩। ৯৭-৯৯

২৮৪-৯৪ 'পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি' দ্র পঞ্চভূত ২। ৫৮৮-৯৫ ['অখণ্ডতা']

এছাড়া *ভারতী*-র শ্রাবণ-সংখ্যায় [১৭।৪] রবীন্দ্রনাথের 'তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না' [গীত ১। ১৬৩, স্বর ৪] ও 'এ কি এ সুন্দর শোভা' [গীত ১। ২১৪, স্বর ২৩] গান দু'টির শৈলবালা রায়-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয় [পৃ ১৯৪-৯৯]। এতদিন আত্মীয়েরাই রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করছিলেন, এই প্রথম ঠাকুরবাড়ির বাইরের লোক তাঁর গানের স্বরলিপি করলেন।

'শাস্তি' গল্পটির 'Punishment' নামক রজনীরঞ্জন সেন-কৃত একটি ইংরেজি অনুবাদ *Glimpses of Bengal Life [1913]* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-সম্পাদকের গল্পটি ভালো লাগেনি : 'লেখক গল্পটি লিখিয়া কাহাকে শাস্তি দিতে চাহেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি পাঠককে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে।'[১] পুরুষের স্বেচ্ছাচার-ক্লিষ্ট একটি প্রাণচঞ্চল অভিমানিনী নারীর নীরব হৃদয়বেদনা সমালোচকের অন্তর স্পর্শ করতে পারে নি দেখে আশ্চর্য বোধ হয়।

এবারের 'ডায়ারি'টিকে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'মন'-এর পরিশিষ্ট বলা যায়। 'মন' লেখক-এর একক রচনা, পাঞ্চভৌতিক সভার অন্য সভ্যেরা সেখানে গরহাজির, কিন্তু বর্তমান সংখ্যার 'ডায়ারি'টি তাদের উপস্থিতিতে সরগরম। *পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক*-এর হাস্যপরিহাস-মুখরিত বিতর্কের পরিবেশটি এখানে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এমনকি ভূতনাথ বাবুর লেখার নীচে সমীর তার মন্তব্য লিখে রেখেছে— এই ইঙ্গিতটিও পারিবারিক খাতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। *ছিন্নপত্রাবলী*-র ১১০-সংখ্যক পত্রে [পৃ ২৩৮-৪০] রবীন্দ্রনাথ এই ডায়ারির ভাবটি ব্যাখ্যা করেছেন।

উক্ত পত্রের তারিখটি সম্পর্কে সংশয়ের কারণ আছে। *ছিন্নপত্র* ও পাণ্ডুলিপিতে '২৬ শ্রাবণ' [বৃহ 10 Aug] তারিখটি পাওয়া যায়, পত্র-প্রাপ্তির তারিখ 22 Aug। কিন্তু অন্য পত্রগুলিতে দেখা যায়, সাধারণত ৪ দিনে সাজাদপুর থেকে সিমলায় চিঠি পৌঁচেছে—সেক্ষেত্রে বর্তমান পত্রটির ১২ দিন লাগা একটু অস্বাভাবিক। তাছাড়া এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ-যে লিখেছেন : 'আমি তোকে সেদিনকার চিঠিতে বন্ধনকে সৌন্দর্যের কারণ ব'লে অনেকখানি লিখেছিলুম মনে আছে'—এখানে যে-চিঠির কথা বলা হয়েছে, সেটি 13 Aug [২৯ শ্রাবণ]-এ লেখা। সেইজন্য পত্র-প্রাপ্তির তারিখ থেকে হিসাব ক'রে চিঠিটি 18 Aug [শুক্র ৩ ভাদ্র] লেখা হয়েছে ধরে নেওয়াই সংগত।

আবার 21 Aug [সোম ৬ ভাদ্র]-এ লেখা পরের চিঠিটির রচনাস্থল 'কলকাতা' সঠিক ব'লে আমাদের মনে হয় না। এতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "আজ একজন এসে বলছিল, 'সে বছর ভালো ধান হয় নি ব'লে চুঁচড়োয় বুড়ো বাপের [মহর্ষির] কাছে এন্‌ছাপ নিতে গিয়েছিলুম'···" ইত্যাদি—এই বর্ণনা পতিসরে বসে লেখা হওয়াই স্বাভাবিক। পত্রটি রবীন্দ্রনাথের প্রজাবাৎসল্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃতিযোগ্য : 'আজ তোর কাছ থেকে কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচি-ছাঁটা টুকরো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট্-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্য-নিবেদন! আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি—এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই-সমস্ত অটলবিশ্বাস-পরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক।'[২]

এই পত্রটিই সাহিত্য-রূপ পেয়েছে সাধনা-র আশ্বিন কার্ত্তিক-সংখ্যার 'ডায়ারি'-তে [দ্র 'পল্লীগ্রামে', পঞ্চভূত ২। ৫৬৮-৭৫]। রচনাটির শুরু কালীগ্রামের প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে ও তারপরে লিখেছেন : 'এই-সমস্ত মানুষগুলির স্নিগ্ধ হৃদয়াশ্রমে যখন বাস করিতেছি এমন সময়ে আমাদের পঞ্চভূত-সভার কোনো একটি সভ্য আমাকে কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরো কাটিয়া পাঠাইয়া দিলেন।···তিনি লন্ডন হইতে, প্যারিস হইতে, গুটিকতক সংবাদের ঘূর্ণাবাতাস সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে এই জলনিমগ্ন শ্যামসুকোমল ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন।' এরপর সমস্ত প্রবন্ধটি যেন এই চিঠিটিরই ভাষ্য।

কিছুদিন পূর্বে প্রমথ চৌধুরীকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'গায়ে পড়ে পৃথিবীর উন্নতি সাধন কার্য্যে শর্ম্মা বোধহয় শীঘ্রই অবসর নেবেন।' কিন্তু দায়ে পড়ে তাঁকে এই কাজেই নিযুক্ত হতে হল। ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কের জটিলতা ও এ-বিষয়ে উভয়ের কর্তব্য বিশ্লেষণ ক'রে তিনি এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' [দ্র সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন। ৪৯৯-৫৪৬; রাজাপ্রজা ১০। ৩৭৯-৪০৩]। 12 sep [?] কার্মাটার থেকে প্রমথনাথকে লিখেছেন : 'চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকের অবিশ্রাম উত্তেজনায় এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, নইলে পাব্লিকের কাছে ঘেঁষতে আমার আর বড় ইচ্ছা করে না। তীর একবার ধনুক থেকে বেরিয়ে গেলে আর তূণের মধ্যে প্রবেশ করা তার পক্ষে অসাধ্য—আমি সেইরকম দূরদৃষ্টক্রমে পাব্লিকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, এখন আর আমার কোথাও শান্তি নেই।'[১]

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে হেনরি মরলির ক্লাসে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' প্রবন্ধ অবলম্বনে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের ব্যবহারকে নিন্দা ক'রে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার ও ফেরার সময়ে তিনি যে ডায়ারি রেখেছিলেন, তাতেও বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে উক্ত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্য্যালোচনা করেন। উড়িষ্যা-ভ্রমণে গিয়ে কটকের ইংরেজ প্রিন্সিপাল মিঃ হলোয়ার্ড ও পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়াল্স্-এর ব্যবহার সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন এবং ভারতীয়, বিশেষত বাঙালির ইংরেজ-চাটুকারিতার সমালোচনা করেন। এই-সব বিচ্ছিন্ন ভাবনাই সংহত রূপ নিয়েছে এই 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে।

কালীগ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরে প্রবন্ধটি তিনি চৈতন্য লাইব্রেরি ও বীডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাবের অধিবেশন উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনের হলে পাঠ করেন। প্রমথ চৌধুরীকে উল্লিখিত পত্রে লিখেছেন : 'আমার খুব ইচ্ছা ছিল বক্তৃতাটা তোমাদের একবার শুনিয়ে নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করতে। কিন্তু সে সময় কলকাতায় তোমরা কেউ উপস্থিত ছিলে না।···আমি অসহায়ভাবে একলা বসে বসে ঐ লেখাটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা তর্ক পরিবর্তন সংশোধন করেছিলুম—এবং শেষ পর্যন্ত ঐ লেখাটার ভালমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলুম না'। একবার কেবল বঙ্কিমবাবুকে শোনাতে হয়েছিল—তাঁর প্রশংসাবাক্যে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলুম।' এই কথা তিনি আবার স্মরণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভা উপলক্ষে পঠিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে : 'সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদরসহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদরবাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে, আজ তাহা লইয়া সর্বসমক্ষে গর্ব

করিলে ভরসা করি সকলে আমাকে মার্জনা করিবেন।'[২] অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া প্রয়োজন ছিল যে, প্রবন্ধটির মধ্যে রাজদ্রোহমূলক কোনো কথা নেই।

অধিবেশনের একটি বিবরণ দিয়েছেন বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সে দিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণে জেনারেল এসেম্বিলীর স্বল্পায়তন হলে লোকে লোকারণ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ উপস্থিত। সেই সভায় বহুলোক অতিকষ্টে, কেবল দাঁড়াইবার স্থান পাইয়া কৃতার্থ। রবিবাবুর প্রবন্ধপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা জনৈক ভদ্রলোক কিছু বলিতে উঠিয়াছিলেন। প্রথমে শিষ্টভাবে, শেষে রুক্ষভাবে, পরে অভদ্রোচিত ইতর বচন বিন্যাসে নানা রঙ্গভঙ্গ করিয়া শ্রোতারা সভাগৃহকে কোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিলেন।' রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের একজায়গায় প্রসঙ্গক্রমে আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ সমদর্শী রাজনীতির প্রশংসা করেছিলেন। চণ্ডীচরণের রচনা থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতির মন্তব্যে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন : 'তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন "আক্‌বরের নামে দেশের লোক এত নাচে কেন? তাঁহার দ্বারা হিন্দুজাতির রক্ষা ও স্থিতি বিষয়ে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার উচ্চ উদার রাজনীতিজ্ঞানের মূলে বিজাতীয় স্বার্থপরতা লুক্কায়িত। তিনি সুবিধামত বাছিয়া বাছিয়া রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজকুমারীদিগকে মোগল অন্তঃপুরে গ্রহণ করিয়াছেন এতে স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়, উদারতার লেশমাত্রও ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত যে, মোগল রাজকুমারীদের সঙ্গে হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের পরিণয় ব্যবস্থার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলেও না হয় একদিন মনে করা যাইত যে, তিনি সমদর্শী ছিলেন। সমাজ ও শাসন বিষয়ে আক্‌বর স্বার্থপরতাদুষ্ট অসাধারণ শক্তিসামর্থ্যের পরিচালনায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন মাত্র।" ···'[১] রবীন্দ্রনাথ ৮ ভাদ্র ১৩১৮ [25 Aug 1911] বোলপুর থেকে কোনো 'অজ্ঞাত' ব্যক্তিকে এই বিষয়ে লিখেছিলেন : '···বহুকাল হইল জেনেরাল এসেমব্লির হলঘরে ভারতবাসী ও ইংরাজ নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। প্রবন্ধে আকবরের কিছু প্রশংসা ছিল তাহারই উত্তরে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন— আকবরের মত কোনো মোগল বাদসাই হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। তিনি বন্ধুত্বচ্ছলেই হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তি কোনো ছাপার কাগজে বা গ্রন্থে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।' [মূল পত্র : রবীন্দ্রভবন] 'হিন্দু' বঙ্কিমের মনোভাব এই উক্তির মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল মাত্র, মন্তব্যটি তাঁর ইতিহাস-বোধের পরিচায়ক নয়।

সাধনা, ভাদ্র ১৩০০ [২। ১০] :

৩১৭-৩০ 'পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি' দ্র পঞ্চভূত ২। ৫৪৯-৫৭ ['সৌন্দর্যের সম্বন্ধ']

৩৫৩-৬৪ 'সাময়িক সারসংগ্রহ' দ্র সাধনা ও সাহিত্য। ৩৬৪-৭১

৩৫৩-৫৭ 'মানুষসৃষ্টি'

৩৫৭-৬০ 'ওলাউঠার বিস্তার'

৩৬০-৬২ 'জিব্রাল্টার বর্জ্জন'

৩৬২-৬৪ 'ঈথর'

৩৯৪-৯৫ 'ভরা ভাদরে' দ্র সোনার তরী ৩। ১০১-০২

৩৯৫-৯৮ 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৮। ২৮৯-৯১

এছাড়া 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি' [গীত ২। ৩২৭, স্বর ২৮] গানটির ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয় [পৃ ৩৪৫-৪৮]।

প্রায় একবছর আগে 5 Jul 1892 [২২ আষাঢ় ১২৯৯] একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরের পুণ্যাহ-উৎসবের একটি বর্ণনা লিখে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমান বৎসরে সেইরূপ বর্ণনা-সংবলিত কোনো চিঠি নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, অনুরূপ একটি উৎসবের পরেই তিনি ডায়ারি-টি রচনা করেছিলেন। সৌন্দর্যের সম্বন্ধ পাতিয়েই মানুষ দেনা-পাওনার স্থূলত্বকে অতিক্রম করে, পাঞ্চভৌতিক সভার বিভিন্ন সভ্যের আলোচনায় এই তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার সময়ে কিছু-কিছু অংশ পরিত্যক্ত হয়েছিল, এখানে আমরা তার একটি অংশ রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রবণতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। ব্যোম বলেছিল : 'রামপ্রসাদের গানে আছে—/ তোমায় মা মা বলে আর ডাকব না।/ আমায় দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।/ এই উদার অকৃতজ্ঞতা কোনো য়ুরোপীয় ভাষায় তর্জমা হইতে পারে না।' সাধনা-য় এর পরে আছে : 'ক্ষিতি বলিল, কেন পারিবে না। আমি এখনি করিয়া দিতেছি।

Oh I never shall call you mother

You have giv'n a deal of bother!'

—লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ ছন্দ মিল রেখে কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন!

এবারের 'সাময়িক সারসংগ্রহ'-তে রবীন্দ্রনাথই প্রধান লেখক, *Fortnightly Review* [June], *New Review* [May] প্রভৃতি পত্রিকা থেকে বিচিত্র বিষয়ের সার তিনি সংকলন করে দিয়েছেন। এদের মধ্যে তৃতীয়টির বিষয় রাজনৈতিক—জিব্রাল্টারের দুর্গরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টা না ক'রে উত্তমাশা অন্তরীপের জলপথ সুগম করার জন্য গ্যাম্বিয়র সাহেবের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'ভারতবর্ষের কণ্ঠলগ্ন লৌহশৃঙ্খলটি বরাবর নিরাপদ সমুদ্রমধ্যে দিয়া একটানে চলিয়া গিয়া ইংলন্ডের দ্বারদেশে দৃঢ়পাকে বদ্ধ হইয়া থাকিবে।' প্রথমটি মানবসৃষ্টি বিষয়ে মধ্য-আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত গল্প-সম্পর্কিত হলেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক কৌতূহলাক্রান্ত, অন্য দু'টি স্পষ্টতই বিজ্ঞানের বিষয়কে অবলম্বন করেছে।

সাধনা-র প্রথম তিনটি বর্ষে রচনার সঙ্গে লেখকের নাম মুদ্রিত না হলেও মলাটে রচয়িতার নাম উল্লিখিত হত, ষাণ্মাসিক সূচীতে তো বটেই। কিন্তু 'ভরা ভাদরে' ও 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' রচনা-দু'টিতে মলাটে লেখকের নাম ছিল না। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন : '···"ভরা ভাদরে" কবিতাটিতে লেখকের নাম নাই,—কিন্তু যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক বাঙ্গলা কবিতার অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কাছে, "ভরা ভাদরের" লেখক কোনও মতে আত্মগোপন করিতে পারিবেন না। এই কবিতাটি দেখিয়াই আমাদের "সোণার তরীর" স্বর্গীয় ঝঙ্কার মনে পড়িয়াছিল। কবিতাটি "সোণার তরী"র মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক,—মনোরম বটে।···"একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প" বোধ করি কোনও জেঠা মহাশয়ের কল্পনা—লেখক নাম না দিয়া ভালই করিয়াছেন—যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া নেপথ্যে অভিনয় করাই অনেক সময় নিরাপদ।···'[১]

ভাদ্র মাসের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনের আবাস সাঁওতাল পরগণার কার্মাটারে দেখা যায়। তাঁর সঙ্গী ছিলেন অনেকে, অন্তত অরুণেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ। শনিবার 9 Sep [২৫ ভাদ্র] 'কর্মাঠার' থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'গোলাপ ফুলে বাগান একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটা শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে ভুর্‌ভুর করছে। শিরীষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সুন্দর গন্ধ।···টেবিলে আমার সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে, একেবারে যেন নরম মিষ্টি আদরের মতো, চোখের ঘুমের মতো।'[২] মঙ্গলবার [২৮ ভাদ্র 12 Sep] প্রমথ চৌধুরীকে কলকাতার বক্তৃতার কথা বর্ণনা ক'রে লিখেছেন : 'তুমি যদি অক্টোবর মাসে দেশ ছেড়ে বেরও আমি তার বহুপূর্ব্বেই কলকাতায় ফিরব। বোধ হয় আর পাঁচ ছ দিনের বেশি দেরি হবে না। আগামী সোম মঙ্গল বারের [৩-৪ আশ্বিন 18-19 Sep] মধ্যেই রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছবার সম্ভাবনা।'[৩]

প্রমথনাথ ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংলন্ড যাত্রা করেন 17 Oct [১ কার্ত্তিক], সুতরাং কলকাতায় তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল। এরপর তিনি আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার কার্মাটারে যান, এবার সপরিবারে। সেখানে দু'দিন থেকে স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে গাজিপুরে রওনা করিয়ে দিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন ১৮ আশ্বিন [মঙ্গল 2 Oct]। এই-সব খবর পাওয়া যায় ১৯ আশ্বিন ৫০ পার্ক স্ট্রীট থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লেখা একটি পত্রে। এই ব্যক্তির পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পারি নি, পাঠকেরা যদি পারেন এই আশায় পত্রটি উদ্ধৃত করছি :

আপনি বড় ফাঁকি দিয়েছেন। আমি যেদিন কম্মাটার গিয়ে পৌঁছলুম আপনি সেইদিন সকালেই চলে এসেছেন। আশ্রম শূন্য, আপনার খাটিয়া শূন্য, অরু এবং বলু বান্ধবহীন বিষণ্ণ। এদিকে আবার বস্তিতে বিসূচিকার আবির্ভাব। অতএব দেখা গেল সেখানে না আছে বন্ধু, না আছে আনন্দ, না আছে স্বাস্থ্যের সম্ভাবনা—তাই দুদিন থেকে পরিবারবর্গকে গাজিপুর রওনা করে দিয়ে আমি কাল রাত্রে রাজধানীতে এসে হাজির হয়েছি। আপনার এখানকার আশ্রমদ্বারেও এই অতিথিকে হঠাৎ দেখ্‌তে পেতেন কিন্তু ইতিমধ্যে কিছুতেই সময় করে উঠতে পারলুম না আমি আবার আগামী পর্শু সিমলা পর্ব্বতে রওনা হচ্চি। পথে একবার গাজিপুরে উঁকি মেরে যাব—আবার বিলেত থেকে আমার গুটি দুই তিন বন্ধু ফিরে এসেছেন, এই সমস্ত নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে আছি। আগামী কল্য অথাৎ বৃহস্পতিবার সকালে সুরেশবাবুকে একবার আমাদের পার্কষ্ট ীটের বাড়ি পদার্পণ করতে অনুরোধ করেছি আপনি যদি তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে একবার ও অঞ্চলে যান তাহলে যাবার আগে দেখাটা হয়ে যায়।—আপনার সমালোচনার কথাটা শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। "সংক্ষিপ্ত সমালোচনা"র একটা ডেফিনিশন্ তৈরি করেছি,—যে সমালোচনা সম্যক রূপে ক্ষিপ্ত হলে গ্রন্থকারকে সম্যক্‌রূপে ক্ষিপ্ত করে তোলে তাকেই বলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। একবার আপনি সাহিত্যরণভূমিতে এই হতভাগ্যের প্রতি শরসন্ধান করে আবার প্রতিসংহার করে নিয়েছেন—এবারেও আপনার প্রতি নিবেদন এই যে, বাঙ্গালী গ্রন্থকারবর্গকে তপোবনের নিরীহ হরিণ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, অতএব ক্ব বচ হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং ইত্যাদি। একেত আমরা ক্ষুদ্র বাঙ্গলা দেশের ক্ষুদ্র গ্রন্থকার, ইমর্টালিটির কোন ধার ধারিনে—তারপর আবার যে কটা দিন পরমায়ু আছে তার মধ্যেও যদি মধ্যে মধ্যে সমালোচনার বজ্রসার শর এসে পড়ে তা হলে মা সরস্বতীর দুটি পায়ে গড় করে বিদায় নেওয়াই সুযুক্তি।

যা হোক্, যদি অসুবিধা না হয় তা হলে এই ভক্তটিকে দর্শন দেবেন।[৪]

এই পত্র অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ২১ আশ্বিন [শুক্র 5 Oct] সিমলার পথে গাজিপুর যাত্রা করেন।

এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আর-একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় : 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি ২য় খণ্ড', বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে প্রকাশের তারিখ : 23 Sep 1893 [শনি ৮ আশ্বিন ১৩০০]—বাংলা তারিখটি আখ্যাপত্রেও মুদ্রিত আছে :

যুরোপযাত্রীর ডায়ারি।/ দ্বিতীয় খণ্ড ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও/ প্রকাশিত।/ ৫৫ নং চিৎপুর রোড ।/ ৮ আশ্বিন ১৩০০ সাল।/ মূল্য ॥০ আট আনা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+৯৭। মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০।

এই খণ্ডটিও প্রথম খণ্ডের মতো লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে উৎসর্গীত, লোকেন্দ্রনাথ তখন পুনরায় ইংলন্ড ভ্রমণ করছেন।

এবারে ১ কার্ত্তিক [মঙ্গল 17 Oct] দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়। সেইজন্য সাধনা-র দ্বিতীয় বর্ষের শেষ দু'টি সংখ্যা আশ্বিন-কার্ত্তিক যুগ্ম-সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয় ১৫ আশ্বিন [শনি 30 Sep] :

৪০৮-৩৮ 'সমাপ্তি' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৮। ২৯২-৩১০

৪৭০-৮২ 'ডায়ারি' দ্র পঞ্চভূত ২। ৫৬৮-৭৫ ['পল্লীগ্রামে']

৪৯৯-৫৪৬ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৩৭৯-৪০৩ ['ইংরেজ ও ভারতবাসী']

৫৭৪-৭৬ 'সুখ' দ্র চিত্রা ৪। ২২-২৪

'আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে' [গীত ২। ৪৮১-৮২, স্বর ৫০] গানটির ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয় ৪৮২-৮৭ পৃষ্ঠায়।

ভারতী-র কার্ত্তিক সংখ্যায় [পৃ ৩৭৯-৮০] বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরং' গানের 'দেশ—কাওয়ালি' সুর-তালে রবীন্দ্রনাথ কৃত সুরের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়। স্বরলিপিটি করেন সরলা দেবী।

'সমাপ্তি' গল্পটি সম্ভবত বহুপূর্বে লেখা। গল্পটির উৎস আছে সাজাদপুরের ঘাটে চোখে-দেখা ঘটনায়, যার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন 4 Jul 1891 [২১ আষাঢ় ১২৯৮] তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৬৪-৬৬, পত্র ২৬]। সাজাদপুরের অধিবাসী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এই গল্পের নায়িকা মৃণ্ময়ীকে শনাক্ত করেছেন সেখানকার বিশিষ্ট মহাজন গোপাল সাহার কন্যা হিশেবে।[১] C. F. Andrews-কৃত গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ 'The Conclusion' নামে Nov 1917-সংখ্যা [pp. 514-21] *The Modern Review*-এ প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গল্পটির সমালোচনায় লিখেছেন : 'আমরা বহুদিন পরে মাননীয় রবীন্দ্র বাবুর একটি গল্পের প্রশংসা করিবার অবকাশ পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহার পুরুষপ্রকৃতি, চঞ্চলস্বভাব মৃণ্ময়ী, তাঁহার পাড়াগেঁয়ে ইয়ং-বেঙ্গল অপূর্ব্ব, অল্পের ভিতর বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। গল্পভাগও মনোরম। কিন্তু, স্বামীর প্রতি চিরবিরূপ মৃণ্ময়ী কেমন করিয়া সহসা পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল,—গল্পে তাহার তথ্য পাওয়া যায় না।···রবীন্দ্র বাবু যদি কারণ ও ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া, মৃণ্ময়ীর হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তন দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গল্প সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।'

রাজনৈতিক প্রবন্ধটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ইংরেজ ও ভারতবাসী" চিন্তাপূর্ণ, সহৃদয়তার পরিচায়ক উচ্চদরের প্রবন্ধ। লেখক অসামান্য দক্ষতা ও সহানভূতির সহিত ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধের বিচার করিয়াছেন। ইহাতে স্বজাতিপ্রেমের সৌরভ আছে, কিন্তু পরজাতিবিদ্বেষের কন্টক নাই; স্বজাতির দুঃখে ও অপমানে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা আছে, কিন্তু দুর্ব্বলতার পরিচায়ক কাঁদুনি নাই।'[২] সম্পাদক পরিশেষে 'সময়ান্তরে ও স্থানান্তরে এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা' প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁর সেই বাসনা ফলবতী হয় নি।

গাজিপুরে রবীন্দ্রনাথ কিছু কাল অবস্থান করেছিলেন। কিছুদিন পরে 'ইংরেজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে তিনি এই ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন : 'সম্প্রতি ভ্রমণোপলক্ষে পশ্চিম-ভারতে গিয়া দেখিয়াছি, গোরক্ষার জন্য লোকে আর ততটা ব্যস্ত নহে' ইত্যাদি; প্রসঙ্গক্রমে 'গাজিপুরের জজ ফক্স্-সাহেব ন্যায়পরায়ণ বলিয়া সাধারণের নিকট সুবিদিত' ব'লে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন! গাজিপুরের উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা আমরা আগেও বলেছি।

রবীন্দ্রনাথ গাজিপুর হয়ে কবে সিমলা পৌঁচেছিলেন, আমাদের জানা নেই। সমগ্র কার্ত্তিক মাস জুড়ে তাঁর গতিবিধি অনিশ্চিত। এই সময়ে লেখা তাঁর কোনো চিঠি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি; যে-দু'টি কবিতা এই মাসে লেখেন, তাতেও রচনা-স্থানের উল্লেখ নেই—তাদের পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। কবিতা দু'টি হ'ল ২৬ কার্ত্তিক [শনি 11 Nov] লিখিত 'বসুন্ধরা' [দ্র সোনার তরী ৩। ১৩১-৪১] ও ২৯ কার্ত্তিক [মঙ্গল 14 Nov]-এ লেখা 'কন্টকের কথা' [সাধনা, অগ্র°। ৬২-৬৫-এ ও প্রথম দিকের সংস্করণগুলিতে 'তুলনায় সমালোচনা' নামে মুদ্রিত, দ্র সোনার তরী ৩। ১৪৭-৫০]।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহেও রবীন্দ্রনাথ আটটি কবিতা লেখেন—সব-ক'টিই সনেট—শেষ কবিতার শেষে তারিখ আছে ৫ অগ্র° [রবি 19 Nov]; এই তারিখেই সবগুলি সনেট রচিত হয়েছিল কিনা জানা নেই —এদেরও কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। সনেটগুলি হ'ল : 'মায়াবাদ' [দ্র সোনার তরী ৩। ১৪১], 'খেলা' [ঐ। ১৪২], 'বন্ধন' [ঐ। ১৪২-৪৩], 'গতি' [ঐ। ১৪৩], 'মুক্তি' [ঐ। ১৪৩-৪৪], 'অক্ষমা' [ঐ। ১৪৪], 'দরিদ্রা' [ঐ। ১৪৫] ও 'আত্মসমর্পণ' [ঐ। ১৪৫]।

আমাদের অনুমান, কবিতাগুলি সিমলাতেই লেখা। 'বসুন্ধরা' কবিতা ও সনেটগুলির সঙ্গে ছিন্নপত্রাবলী-র অন্তর্গত বিভিন্ন পত্রের আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য দেখা যায়। এমন হওয়া খুবই সম্ভব, ইন্দিরা দেবীর কাছে রক্ষিত পুরোনো চিঠিগুলি পড়তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে পত্রে বর্ণিত ভাবগুলি প্রেরণা রূপে সঞ্চারিত হয়েছে এবং কাব্যরূপ লাভ করেছে। আশা করি, কাব্যরসিকেরা বক্তব্যটি বিচার করে দেখবেন।

সমসাময়িক দু'টি কবিতায় অবশ্য রচনাস্থল হিশেবে সিমলা চিহ্নিত আছে। তার মধ্যে একটি হ'ল 'অচল স্মৃতি' [দ্র সোনার তরী ৩। ১৪৬-৪৭], ১১ অগ্র° [শনি 25 Nov] তারিখে 'উড্‌ফীল্ড্। সিমলা'য় লিখিত; Ms. 129-এ পেনসিলে লেখা কবিতাটির একটি পাণ্ডুলিপি আছে। আর একটি 'সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ত্ব/লয়ে তুমি আছ মত্ত' [দ্র প্রহাসিনী-সংযোজন ২৩। ৪২-৪৪] 'বনক্ষেত্র। সিমলা শৈল। শনিবার ১৮৯৮' স্থান-কালে পরিচিত হয়ে জ্যৈষ্ঠ ১৩১২-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ১৭০] 'খেয়াল খাতা' বিভাগে 'পত্র' নামে মুদ্রিত হয়, পরে

'পূরবী' [১৩৩২] কাব্যগ্রন্থের 'সঞ্চিতা' অংশে সংকলিত হয়েও পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হয়েছিল। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পত্র-কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে লিখিত ব'লে উল্লেখ করেছেন।[১]

সিমলায় অবস্থান সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় বলেছেন : 'অনুমান ১৮৯২-৯৩ খৃঃ [1893] আমরা মাস আষ্টেকের জন্য আবার সিমলা পাহাড়ে বাস করতে যাই—সেই ছেলেবেলা ইস্কুল যাবার পরে সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয়বার। বাড়ীটার নাম ছিল Woodfield বাগানে অনেক ফুল হত, ···। রবিকাকা অন্ততঃ কিছুদিন ছিলেন; জ্যোতিকামশায়ত ছিলেনই, এবং বাবাও তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন।··· Woodfield-এর আর একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ছিল সেখান থেকে কলকাতায় গগনদাদাদের ৫ নং বাড়ীর সঙ্গে হেঁয়ালী চিত্রের আদান প্রদান। নামেই বোঝা যায় যে সে জিনিষটা হচ্ছে কথার বদলে ছবি দিয়ে ভাবপ্রকাশ করা। যথা ডাক্তার কথাটা অক্ষরে না লিখে ধর একটা ডাক-বাক্স এঁকে তার পাশে টেলিগ্রাফের তার এঁকে দিলুম।···আমাদের পক্ষের চিত্রকর ছিলেন জ্যোতিকামশায় ও সুরেন; আর ৫ নং-এর স্বয়ং গগনেন্দ্র এবং অবনীন্দ্র।···রবিকার হাতেরও ২/৪টে হেঁয়ালি চিত্রের নমুনা আছে। সব ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তিনি স্বকীয়তা দেখিয়েছেন; ফলে তারই একটা ছবির সমাধান বোধহয় আট্‌কে গেছে, এবং অন্য দু'একটা।'

রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে 'ছবি হেঁয়ালির খাতা' নামে দু'টি খাতা আছে [Ms. 277A, Ms. 277B]। দ্বিতীয় খাতাটিতে লেখা আছে : 'ছবি হেঁয়ালির খাতা।/ ১৮৯৩ শালে সিমলা পাহাড়ে চিত্রিত।/ শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।/ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' খাতাটির কিছু বিস্তারিত পরিচয় আমরা প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩-এ দিয়েছি, এখানে রবীন্দ্রনাথের পেনসিলে আঁকা 'ছবি হেঁয়ালি'র কিছু নমুনা দেওয়া যাক্। প্রথম খাতাটির ১২-সংখ্যক পৃষ্ঠায় এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আছে : ···৩। মা* [মাস্টার] ৪। ০+ [গোলযোগ] ৫। নানানানা [নাচার] ৬। ২০টি [বিষ্টি] ···৯। প্রপ্রপ্রপ্রপ্রপ্রপ্রপ্র [প্রণয়] ···ইত্যাদি, আবার অনেকগুলি 'প্র' হারের মতো সাজিয়ে বোঝানো হয়েছে 'প্রহার' [পার্শ্ববর্তী ছবি দেখুন]।

সাধনা-র তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ১৫ অগ্র° [বুধ 29 Nov] প্রকাশিত হ'ল। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা মাত্র দু'টি, তার একটি আবার বহু পূর্বে লেখা। ভাদ্র মাসের শেষ থেকে ক্রমাগত দেশভ্রমণে ব্যাপৃত থাকার জন্যেই সম্ভবত এমনটি ঘটেছে।

৩০-৪০ 'সমস্যা-পূরণ' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৮। ৩১১-১৭

৬২-৬৫ 'তুলনায় সমালোচনা' দ্র সোনার তরী ৩। ১৪৭-৫০ ['কণ্টকের কথা']

সমস্যা-পূরণ' গল্পটি অন্তত ১৭ আষাঢ় ১২৯৯-এর পূর্বে লেখা হয়েছিল, ঐ সময়ে বলেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে তা বোঝা যায়। 'কাবুলিওয়ালা' ও এই গল্পটি পাঠিয়ে তিনি লিখেছিলেন : 'ও দুটো আপাততঃ ব্যবহারের জন্য নয়।' 'কাবুলিওয়ালা' মুদ্রিত হয়েছিল সাধনা-র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় [অগ্র° ১২৯৯], তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হ'ল 'সমস্যা-পূরণ'। রবীন্দ্রনাথের কাছে গল্প-দু'টির বিশেষমূল্য ছিল, এই ভাবে প্রকাশ-কাল নির্ধারণের দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। সুরেশ সমাজপতির গল্পটি ভালো লাগে নি, তিনি লিখেছেন : "যবন পুত্রের জন্মদাতা স্বয়ং কৃষ্ণগোপাল যে কথাটা ছেলেকে বিজন বটতলায় ডাকিয়া

'কম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে' 'কম্পিত স্বরে' চুপি চুপি বলিলেন, এবং 'আবশ্যক হইলে' লোকের কাছে বলিতে বলিয়াছিলেন,—সে কথাটা রবীন্দ্র বাবু স্থির অঙ্গুলিতে লেখনী ধরিয়া অকম্পিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার এমন কি আবশ্যকতা অনুভব করিলেন? বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান গল্পের বিষয় রবীন্দ্র বাবুর মত লেখকের লেখনীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।'[১] ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু কৃষ্ণগোপালের যবনী-সংস্পর্শ হয়তো সুরেশচন্দ্রের সংস্কারে আঘাত করেছিল!

ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ 'The Riddle Solved' নামে *The Modern Review*-এর Dec 1909 [pp. 549-53]-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদটি *Mashi and Other Stories* [1918] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

অগ্রহায়ণের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কলকাতায় ফিরে আসেন। ২৭ অগ্র° [সোম 11 Dec] 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' রচিত হয়। এই কবিতাটিরও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, রচনাস্থলেরও উল্লেখ নেই। আমাদের অনুমান, কলকাতায় ফিরেই রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ মুদ্রণের আয়োজন করেন—তারই শেষ কবিতা হিশেবে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' লেখেন, 'সোনার তরী'-র পুনরাবির্ভাব ঘটিয়ে যেন বৃত্তটি সম্পূর্ণ করা হ'ল। সাধনা-র পৌষ-সংখ্যায় [পৃ ১৩৭-৪০] কবিতাটি মুদ্রিত হবার কয়েকদিন পরেই 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯ পৌষ তারিখে।

৭ পৌষ [বৃহ 21 Dec] শান্তিনিকেতনে যে তৃতীয় সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হয়, রবীন্দ্রনাথ সেখানে সংগীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন : 'এই প্রাতের উপাসনায় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত করিয়া উৎসবকে আরো মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।'[২]

সাধনা, পৌষ ১৩০০ [৩। ২] :

১০১-১০ 'কর্ত্তব্যনীতি।/ (অধ্যাপক হক্সলির মত।)' দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২। ৪৭৮-৮৪

১১০-২৩ 'বিনিপয়সায় ভোজ' দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৩৩৭-৪৫ ['বিনি পয়সার ভোজ']

১২৯-৩৭ 'ইংরাজের আতঙ্ক' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৩৭-৪১

১৩৭-৪০ 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' দ্র সোনার তরী ৩। ১৫০-৫৩

এছাড়া ১৯১-৯৫ পৃষ্ঠায় 'এখনো তারে চোখে দেখিনি' [গীত ২। ৪১৫, স্বর ৩২] গানটির ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।

ভারতী-র পৌষ-সংখ্যায় 'নূতন গান' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথে 'কে যাবি পারে' গানটি ও সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপিটি মুদ্রিত হয় ৫৭২-৭৩ পৃষ্ঠায়। গানটি ইতিপূর্বেই 'গানের বহি'তে ছাপা হয়েছিল।

'কর্তব্যনীতি' Thomas Henry Huxley [1825-95]-লিখিত *Evolution and Ethics* [1893] গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কেবল হাক্স্লির মতের সারসংক্ষেপ করেন নি, ধর্মনীতির অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে তাঁর নিজের ভাবনাকেও রূপ দিয়েছেন।

‘বিনি পয়সার ভোজ’ একটি অভিনব কৌতুকনাট্য—একটি মাত্র চরিত্রের অভিনয়ের মাধ্যমে সমস্ত ঘটনার বিবৃতি ও নাট্যরসের বিস্তার ঘটেছে। রবীন্দ্ররচনাতেও এটি একক মর্যাদার অধিকারী। তিনি এই আদর্শে পরে ‘অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি’ [সাধনা, ভাদ্র ১৩০১] ও ‘নূতন অবতার’ [ঐ, পৌষ ১৩০১] নাটিকা দু’টি লিখলেও সেখানে দ্বিতীয় চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির আত্মীয় বিখ্যাত অভিনেতা ও গায়ক অক্ষয়চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এঁর কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ এই কৌতুকনাটিকাগুলি রচনা করেছিলেন; তিনি লিখেছেন : বর্ত্তমান বাংলা ভাষার কয়েকটি অতুলনীয় সম্পদ তাঁহার অভিনয়কুশলতাকে ক্ষেত্র দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ও তাঁহারই অভিনয় দ্বারা উচ্চ শিক্ষিত সমাজে উহা প্রচারিত হয়। পট, পরিচ্ছদ ও রঙ্গমঞ্চের সাহায্য না লইয়া, শুধু বৈঠকখানায় বন্ধু সমাগমে যে ভাঁড়ামি বর্জিত বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রস দ্বারা ভদ্র মহোদয়দের নাটকীয় স্পৃহা এবং গল্পরসের আনন্দ একাধারে উপভোগ্য ও চরিতার্থ করা যায়, তাহা কবি তাঁহারই ব্যঞ্জনায় সপ্রমাণ করেন।···বড় অক্ষয়বাবুর জন্য লিখিত “বিনি-পয়সার ভোজ” “অ-রসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি” এবং “হঠাৎ অবতার” [‘নূতন অবতার’] আজও তরুণবৃন্দের প্রীতি-সম্মিলনে স্বচ্ছ হাস্য ও আনন্দ বিতরণ করিতেছে।’[১]

‘ইংরেজের আতঙ্ক’ একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। কিছুদিন আগে গাজিপুর গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গোরক্ষিণী সভার আন্দোলন ও তাকে অবলম্বন ক’রে ইংরেজ শাসনকর্তাদের আচরণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ‘গোরক্ষিণী সভা’ বালগঙ্গাধর তিলকের [1856-1920] সৃষ্টি। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই নেতা মহারাষ্ট্রে নব্যহিন্দু আন্দোলনের একজন প্রবক্তারও ভূমিকা নিয়েছিলেন। গণপতি উৎসবের প্রবর্তন করে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদের তিনি একতাবদ্ধ করছিলেন, গোরক্ষিণী সভার মাধ্যমে এই ঐক্যকে তিনি বিস্তৃত করতে চাইলেন সমগ্র ভারতে। স্বভাবতই মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এর ফলে বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থানে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয়, শুরু হয়ে যায় ইংরেজ শাসনকর্তাদের দমন-পীড়ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘ইংরেজের আতঙ্ক’ প্রবন্ধটি লেখা। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : ‘ইংরেজ যখন কোনো কারণে আমাদিগকে ভয় করে তখনই সেটা আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—তখনই ভয়ের কম্পনে দয়ামায়া সুবিচার আপাদমস্তক টলমল করিতে থাকে।’ 1855-এ সাঁওতালদের ভয় পেয়ে ইংরেজ একবার স্বাভাবিক বিবেচনাশক্তি হারিয়েছিল, আর-একবার ভয় পেয়েছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময়ে। ‘কিন্তু কন্‌গ্রেসটার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপে আঘাত করা হয় নাই।···এই নবনির্মিত জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তাহাকে তলে তলে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কন্‌গ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে’। ইংরেজ জানে, হিন্দুর হাতে পলিটিক্‌স্ তেমন মারাত্মক নয়—আবহমান কালের ইতিহাসে হিন্দুদের রাজনৈতিক ঐক্যের দৃষ্টান্ত নেই; কিন্তু ‘ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্‌স্‌ও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে। মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কন্‌গ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।’ এই কারণে ইংরেজেরই কূটকৌশলে মুসলমানসমাজ কংগ্রেস থেকে দূরে থেকেছে।

কিন্তু গোরক্ষিণী সভা স্থাপনকে ইংরেজ ভয়ের চক্ষে দেখছে। ‘কারণ, ইংরেজ ইহা বুঝিয়াছে যে, স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য যে হিন্দু এক হইতে পারে না, গোষ্ঠ এবং গোজাতি রক্ষার জন্য চাইকি তাহারা এক

হইতেও পারে। স্বাধীনতা স্বদেশ আত্মসম্মান মনুষ্যত্ব প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠতর পদার্থের অপেক্ষা গোরুকে রক্ষা করা যে আমাদের পরমতর কর্তব্য, এ কথা হিন্দু ভূপতি হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই সহজে বুঝিবে।' এই তির্যক ভঙ্গি থেকেই আন্দোলনটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাবটি ধরা যায়, কিন্তু প্রবন্ধটির লক্ষ্য ভিন্নতর ব'লে তিনি ইঙ্গিতমাত্র ক'রেই ক্ষান্ত হয়েছেন। উক্ত আন্দোলন ইংরেজের আতঙ্কের কারণ হয়েছে, গাজিপুর ভ্রমণে গিয়ে তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন পশ্চিমভারতের হিন্দুদের অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য ক'রে : 'যে-সকল কথা ঘরে ঘরে আলোচিত হইতেছে সে-সকল কথা যদি প্রকাশ হইত তবে কী হইত। যে প্রকাশ করিত তাহাকে সম্ভবত নির্দিষ্ট রাজ-অট্টালিকায় রাজপ্রহরীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হইত।' এই আতঙ্কের আরও একটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন : 'গাজিপুরের জজ ফক্স্ সাহেব ন্যায়পরায়ণ বলিয়া সাধারণের নিকট সুবিদিত। গোহত্যাসম্বন্ধীয় মকদ্দমার আপীল হাইকোর্ট তাঁহার নিকট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথের ধারণা, ইংরেজের অহেতুক আতঙ্ক থেকেই এইসব অনাচারের উদ্ভব। 'হিন্দুমুসলমানে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্মেন্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেন্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে, আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস।' রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসও যে ভিন্নতর নয়, প্রবন্ধটির মধ্যে তার প্রমাণের অভাব নেই।

'সোনার তরী' কাব্যের বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ-অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 2 Jan 1894 [মঙ্গল ১৯ পৌষ]। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

সোনার তরী।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রণীত।/ কলিকাতা;/ ১২ নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে,/ শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত/ ও/ ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী/ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।/ ১৩০০।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২+২০৯; মুদ্রণ-সংখ্যা : ২৫০।

গ্রন্থটি কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনকে উৎসর্গ করা হয় : 'কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন/ মহাশয়ের কর-কমলে/ তদীয় ভক্তের এই প্রীতি-উপহার/ সাদরে সমর্পিত হইল।'

গ্রন্থটিতে ফাল্গুন ১২৯৮ থেকে অগ্র° ১৩০০ পর্যন্ত রচিত ৪৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'সুখ' এই সময়ের মধ্যে রচিত হলেও গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

২৯ পৌষ [শুক্র 12 Jan 1894] রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ সন্তান ও তৃতীয়া কন্যা মীরা [অতসীলতা]-র জন্ম হয়।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পর পৌষ ও মাঘ মাস এবং ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতে অবস্থান করেন। ২ মাঘ [রবি 14 Jan] তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধ নিয়ে মনোমালিন্য হলেও এই সময়ে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা চোখে পড়ে। লক্ষণীয়, 'সোনার তরী' এবং তার পরে 'ছোট গল্প', 'বিচিত্র গল্প' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), 'কথা-চতুষ্টয়' ও 'গল্প-দশক' [ভাদ্র ১৩০২] গ্রন্থগুলি সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য-যন্ত্র' থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু উক্ত সাক্ষাৎকার-বিষয়ে তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন : 'সকালে সু-র বাটীতে

রবি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। "সোনার তরী"-র কথা উত্থাপিত হওয়াতে তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি তাঁহার প্রথম ও শেষ কবিতার সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই। তিনি বলেন,—"উহাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকিতে পারে, আমি তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই। একটু সম্বন্ধ অবশ্যই আছে।"···"প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্ত্তব্য", "প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ", "রাজার সতর্ক দৃষ্টি পড়ুক সর্ব্বত্র" ইত্যাদি লাইনে ছন্দের ঝঙ্কার আদৌ নাই ইহা তিনিও স্বীকার করিলেন; আর বলিলেন, "অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আমি একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ঠিক নহে;—আমার ভ্রম।"···'[১]

৫ মাঘ [বুধ 17 Jan] রাত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করেন 'সোনার তরী' প্রকাশের পর প্রথম কবিতা 'জ্যোৎস্না রাত্রে', কবিতাটি শেষ হয় পরের দিন ৬ মাঘ।

ক্ষিতীন্দ্রনাথের উৎসাহে আদি ব্রাহ্মসমাজ এই সময়ে যথেষ্ট কর্মতৎপর। চতুঃষষ্ঠিতম সাংবাৎসরিক উপলক্ষে ৫মাঘ থেকেই আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে বক্তৃতাদির আয়োজন হয়। অন্যতম সম্পাদক হিশেবে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কিছুটা ব্যস্ত থাকেন।

১১ মাঘ [মঙ্গল 23 Jan] যথারীতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় মহর্ষিভবনে ব্রহ্মোৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষে 'য আত্মদা বলদা যস্য' ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটি গীত হয়। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রটির একটি পদ্যানুবাদ করেন—'আত্মদা বলদা যিনি' [দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২০৭; রূপান্তর। ৯]। ছ'টি নূতন গানও তিনি রচনা করেন :

[১] আনন্দভৈরবী—কাওয়ালি। এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে কর পবিত্র দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীত ২। ৬১২

[প্রথম ছত্র : এসো হে গৃহদেবতা]; স্বর ২৭; সরলা দেবী লিখেছেন, এটি মহীশূর থেকে 'আমার আনা সুরে বসান গান'।[১] তাঁর আনা আরও কয়েকটি গান ভেঙে গত বৎসর মাঘোৎসবের জন্য তিনটি ব্রহ্মসংগীত তিনি রচনা করেছিলেন। পাঠান্তর : এসো আশ্রমদেবতা।

[২] ললিতাগৌরী—ঝাঁপতাল। হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীত ১। ৭৭; স্বর ২৩; মূল গান : উড়ত বন্দন নব দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৪৪-৪৫।

[৩] মালকোষ—কাওয়ালি। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ১। ১৩৭; স্বর ৪৫; মূল্য গান : লাগি মোরে ঠুমকে পলঙ্গনা দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮৪-৮৫।

[৪] কানাড়া–চৌতাল। হে মহাপ্রবল বলী দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ১। ১৮৬; স্বর ২৭; মূল্যগান : হে মা প্রবল বলী দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ২৭।

[৫] বেহাগ—ঝাঁপতাল। অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ১। ১০৮-০৯; স্বর ২৫; মূল গান : কৌন যোগী ভয়ো দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৪৭।

[৬] দেশকার—চৌতাল। কামনা করি একান্তে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২০; গীত ১। ১৭০; স্বর ২৫; মূল গান : প্রথম কর শৃঙ্গার দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ২০।

মাঘোৎসবের কয়েকদিন পরে ১৪ মাঘ [শুক্র 26 Jan] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন আর একটি দীর্ঘ কবিতা—'প্রেমের অভিষেক' [দ্র সাধনা, ফাল্গুন। ৩৪৭-৫৩; চিত্রা ৪। ২৭-৩০]। সাধনা-য় মুদ্রিত কবিতাটি ১৫২ ছত্রের, গ্রন্থ-সংকলন কালে ৭৬টি ছত্র বর্জিত হয়ে ঠিক অর্ধেক আকারে মুদ্রিত হয় [রবীন্দ্র-রচনাবলী-র গ্রন্থ-পরিচয় অংশে পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত ছত্রগুলি সংকলিত দ্র পৃ ৫৪৪-৪৭]। রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী-সংস্করণ

'চিত্রা'-র 'সূচনা'য় লিখেছেন : '"প্রেমের অভিষেক"-এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম, তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, [লোকেন্দ্রনাথ] পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম'। 'চিত্রা'য় পরিবর্তিত আকারে কবিতাটি প্রকাশিত হ'লে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪ চৈত্র ১৩০২ [16 Mar 1896] দিলদারনগর থেকে অনুযোগ ক'রে লেখেন : 'প্রেমের অভিষেক মাটি করিয়া দিয়াছেন মহাশয়? ইহার একটি উৎকৃষ্ট অংশ ছাঁটিয়া দিলেন কেন? আপনার এই ছাঁটা রোগের জন্য কি তারকেশ্বরে হত্যা দিব? অপোগণ্ড সাহেব শাবক কি অপরাধ করিল? যাহারা এটি নূতন পড়িবে তাহাদের কেমন লাগিবে বলিতে পারি না, কিন্তু যাহারা সাধনায় পড়িয়াছিল, তাহারা হায় হায় করিবে। 'আমি' বলিয়া লিখিয়াছিলেন, চাকরি করিবার লজ্জার ভয়ে কি সেটুকু বাদ দিলেন?'[২] রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ৬ চৈত্র [18 Mar] শিলাইদহ থেকে লেখেন : 'প্রেমের অভিষেক কবিতাটি চিত্রা কাব্যে যে আকারে বাহির হইয়াছে তাহাকে সংশোধন বলা যায় না—কারণ, ইহাই উহার আদিম রূপ। সাধনায় যখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল তখন কাহারও কাহারও মনে এতই আঘাত করিয়াছিল যে, বন্ধুবিচ্ছেদ হইবার যো হইয়াছিল। তাঁহারা বলেন, কোনও আপিসবিশেষের কেরাণী বিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে আত্মহৃদয়ের উচ্ছ্বাস সহকারে ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা ঢের বেশি সরল উজ্জ্বল উদার এবং বিশুদ্ধভাবে দেখান হয়—সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমান-ক্ষুণ্ণ নিরুপায় কেরাণীর মুখে একথাগুলো যেন কিছু অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায়; উহার সহজ স্বতঃপ্রবাহিত সর্ববিস্মৃত কবিত্বরসটি থাকে না; মনে হয় সে মুখ যতই বড়াই করুক না কেন, আপনার ক্ষুদ্রতা এবং অপমান কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। এই সমস্ত আলোচনাদি শুনিয়া আমি গোড়ায় যেভাবে লিখিয়াছিলাম, সেইভাবেই প্রকাশ করিয়াছি।'[৩] আমরা জানি না, Ms. 129-এ 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটির পাণ্ডুলিপি কোন্ সময়ে লিখিত হয়েছিল—এতে মোটামুটি 'চিত্রা'র পাঠটিকেই পাওয়া যায়।

সাধনা, মাঘ ১৩০০ [৩/৩]

২৪৩-৫৮ 'বিদায়-অভিশাপ' দ্র বিদায়-অভিশাপ ৪। ১২৩-৩৫

মাঘ-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কেবল এই রচনাটিই মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া মাঘোৎসবের জন্য ঋগ্বেদের 'য আত্মদা বলদা' যে-মন্ত্রটিতে তিনি সুর দিয়েছিলেন, ইন্দিরা দেবী-কৃত তার স্বরলিপি মুদ্রিত হয় ২৮০-৮৫ পৃষ্ঠায়; মূল মন্ত্র [ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল ১২১ সূক্ত। প্রজাপতি দেবতা, হিরণ্যগর্ভ ঋষি] ও রবীন্দ্রনাথ-কৃত মন্ত্রটির পদ্যানুবাদ [পৃ ২৭৯-৮০]ও এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তখন বীরভূম জেলায় কর্মরত। সরস্বতী পূজার ছুটিতে তিনি কলকাতায় আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন অসুস্থ। শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন : 'তাঁহার স্বর্গারোহণের বৎসর সরস্বতী পূজার বিসর্জ্জন দিনে [৩০ মাঘ রবি 11 Feb] বীরভূম হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।···স্নেহের শেষ চিহ্নস্বরূপ এক খণ্ড পুস্তক [রাজসিংহ, পরিবর্ধিত সংস্করণ, 1893] উপহার দিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যেন একটা সমালোচনা করি।···সেই উপহৃত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াই যোগ্যতর সমালোচক "সাধনায়" তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু তখন অন্তিম শয্যায়, সম্ভবতঃ পড়িতে পারেন নাই।'[১]

শ্রীশচন্দ্র বঙ্কিমের অন্তিম ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে সমালোচনার জন্য বইটি রবীন্দ্রনাথকে দেন। কিন্তু কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি বইটি পড়ার সুযোগ পান নি। তিনি লিখেছেন : '···সৌভাগ্যক্রমে রাজসিংহ গ্রন্থখানি কলিকাতায় প্রথম আমার হস্তগত হইবামাত্রই অপহৃত হইয়া যায়। চৌরের উদ্দেশে গালি পাড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেটা পাছে আমার কোনো নিকট আত্মীয় অথবা প্রিয় আত্মীয়ার গায়ে বাজে এই ভয়ে ধৈর্যরক্ষাপূর্বক বিরত ছিলাম, আজ তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জনা করিলাম।'[২] 'সৌভাগ্যক্রমে' 'মার্জনা করিলাম' ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, তিনি কয়েকদিন বাদে গ্রন্থটি পাঠ করার অধিকতর উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করেছিলেন।

ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনোপলক্ষে পতিসর যাত্রা করেন। এবার জলপথে না গিয়ে ট্রেনে আত্রাই স্টেশনে নেমে পাল্কি-যোগে পতিসর যান। আর তখনই তিনি রাজসিংহ উপন্যাসটি পড়ার উপযুক্ত অবসর লাভ করলেন। তিনি লিখেছেন : 'চষা মাঠের মাঝখানে ভাঙা পথ বাহিয়া পালকি চড়িয়া চলিতে চলিতে বঙ্কিমবাবুর নূতন সংস্করণ 'রাজসিংহ' পড়িতেছিলাম।···মাঝে মাঝে যখন গ্রামের নিকটে আসিতেছিলাম আমার গ্রন্থপাঠের সহিত বনের ছায়া, পাখির গান এবং আম্রমুকুলের গন্ধ মিশ্রিত হইতেছিল। অখণ্ড অবসর ছিল—এবং কল্পনাকে বাধা দিবার জন্য না ছিল জনতা, না ছিল অট্টালিকা, না ছিল অবরুদ্ধ রাজপথের ধূলিমিশ্রিত কোলাহল।···এইজন্য মাঠের মধ্যে আমার 'রাজসিংহ' পড়িবার বড়ো সুযোগ ঘটিয়াছিল। বইখানি আমার হাতে ছিল বটে—কিন্তু আসল ব্যাপারটি বাঁধানো গ্রন্থের কালো মলাটের কারাপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত মাঠ এবং সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতেছিল।'[৩]

এই অভিনব উপায়ে গ্রন্থপাঠের সুযোগ পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনার যে-পদ্ধতি গ্রহণ করলেন সেটিও অভিনব। এই সমালোচনা একজন সাহিত্যরসপিপাসু সহৃদয় পাঠকের পরিতৃপ্তির প্রকাশ। লক্ষণীয়, পরবর্তীকালে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের সমালোচনা কিছু পরিমাণে রবীন্দ্র-প্রভাবিত।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা মুদ্রিত হয় সাধনা-র চৈত্র-সংখ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বহুমূত্রের মরণান্তিক পীড়ায় তখন শয্যাগত। সাধনা প্রকাশিত হয় ১৫ চৈত্র [মঙ্গল 27 Mar],বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনাবসান ২৬ চৈত্র [শনি 7 Apr]—তাঁর এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাটি তিনি সম্ভবত দেখে যেতে পারেন নি।

পতিসরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোটে আছেন। আলস্য-মন্থর তাঁর জীবনযাত্রা। 19 Feb [সোম ৮ ফাল্গুন][৪] ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে লিখছেন : 'যে পারে বোটে লাগিয়েছি এ পারে খুব নির্জন—গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধূধূ করছে,···আমাদের দুটো হাতি আছে তারাও এ পারে চরতে আসে।···বৃহৎ শরীর, বিপুল বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ—এই প্রকাণ্ড জন্তুটাকে দেখতে আমার বেশ লাগে।' এর থেকে কিছুটা তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা হ'ল : 'আমি এক-একবার ভাবছিলুম হাতির প্রতি আমার মনের এই স্নেহরসার্দ্র ভাব, অনেকটা হয়তো পুরুষজাতির প্রতি মেয়েদের মনের ভাবের মতো। বড়োত্বের সঙ্গে সঙ্গে যে-এক রকম শ্রীহীনত্ব আছে তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে, অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়···ব [ড়োদাদা?]কে দেখলেও আমার ঐ রকমের

একটা সসম্ভ্রম করুণার উদয় হয়—ওঁর সমস্ত অপরিচ্ছন্ন অনবধানের মধ্যে একটা অশান্ত অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পায়।···সাধারণত পুরুষদের বলের সঙ্গে সঙ্গে একটা অকওয়ার্ড অসহায়তা এবং বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণ জড়বুদ্ধির মিশল আছে বলে তাদের প্রতি মেয়েদের মনে কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধার সহিত অনেকটা পরিমাণে মাতৃস্নেহের উদ্রেক হয়।'[১] এই সময়ে ডায়ারি-জাতীয় গদ্য-রচনা নেই, নইলে এই ভাবনা হয়তো সাহিত্যরূপ লাভ করত।

পরের দিন ৯ ফাল্গুন [মঙ্গল 20 Feb] সন্ধ্যায় লিখলেন 'সন্ধ্যা' কবিতা [দ্র সাধনা, মাঘ ১৩০১। ২১৩-১৫; চিত্রা ৪। ৩০-৩২]। সন্ধ্যার বর্ণনায় গদ্যে-পদ্যে রবীন্দ্রনাথ ক্লান্তিহীন, কিন্তু প্রকৃতি ও সৌন্দর্যবোধের সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কবিতাটি বিশেষত্ব দাবি করতে পারে। ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'এক বিপুল ইতিহাস-চেতনা ও জীববিজ্ঞান-পরিচয় কবির প্রকৃতিধ্যানকে গভীর অর্থগৌরবে ভরিয়া তুলিয়াছে। অনাদি অতীত বসুন্ধরার মনে অনন্ত ভবিষ্যতের সীমাহীন যাত্রাপথের চিন্তা জাগাইয়াছে ও এক সমাধানহীন জিজ্ঞাসাচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছে।'[২]

26 Feb [সোম ১৫ ফাল্গুন]-এর চিঠিটি পতিসরের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ : 'এখানে আমি দলছাড়া, এবং এখানকার প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন—নিত্য-নিয়মিত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনাগুলি এবং অবসরটিকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই—সময় কিম্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই।'[৩]

'সন্ধ্যা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজের উদ্দেশে লিখেছিলেন :

> ধীরে নামাইয়া আনো
> বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পূরবীর ম্লান-
> মন্দ স্বরে। রাখো রাখো অভিযোগ তব,—
> মৌন করো বাসনার নিত্য নব নব
> নিষ্ফল বিলাপ।

এই নিস্তরঙ্গ জীবনের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ তাঁর মনে যে ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, মনকে শান্ত করার এই প্রয়াসের মধ্যেই তা প্রতীয়মান। বিক্ষোভটি ফুটে উঠল কয়েকদিন পরে রামপুর-বোয়ালিয়ায় লোকেন্দ্রনাথের কাছে বেড়াতে গিয়ে। ২৩ ফাল্গুন [মঙ্গল 6 Mar] তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' [দ্র সাধনা, চৈত্র। ৪২৬-৩১; চিত্রা ৪। ৩২-৩৬]। পরাধীন দারিদ্র্যকাতর অসহায় প্রজাদের করুণ জীবনযাত্রার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির পরিচয় ছিন্নপত্রাবলী-র পত্রে আমরা বার বার পেয়েছি, তার কিছু-কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃতও করেছি। সেই জনসাধারণের ছবি এঁকেছেন এখানে :

> ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
> মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
> বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
> বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
> তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
> নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
> মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
> শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ

রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে-অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।

কয়েক মাস পরে 20 Sep 1894 [৫ আশ্বিন ১৩০১] তিনি ইন্দিরা দেবীকে-যে লিখেছেন : 'এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না'[১] —এই একই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি উপরোক্ত ছত্রগুলির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। এই সব 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দেওয়া ও 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশার সঞ্চার করা তিনি কর্তব্য ব'লে মনে করেছেন। যেখানে তিনি জমিদার, যেখানে তিনি কর্মী—সেখানে তাঁর যথাসাধ্য তিনি করেছেন, সে-কথা আমরা জানি : কিন্তু এখানে তিনি কবি হিসেবে তাঁর কর্তব্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন :

সে-বাঁশিতে শিখেছি যে-সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

কবিতার বাকি অংশ স্বর্গের অমৃতের জন্য অন্তরের গভীর পিপাসা জাগানোর কথা—তিনি জানেন, আত্মার উদ্বোধন হ'লে সব-কিছুকেই আয়ত্ত করার শক্তি জাগ্রত হয়; রবীন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যভাবনায় মগ্ন থেকেছেন, তখনও এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি।

সাধনা, ফাল্গুন ১৩০০ [৩/৪] :

৩৪৭-৫৩ 'প্রেমের অভিষেক' দ্র চিত্রা ৪। ২৭-৩০ [বর্জিত অংশ : দ্র চিত্রা [গ্র°প°] ৪। ৫৪৪-৪৭]

এছাড়া 'সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল' [দ্র গীত ২। ৩৩০, স্বর ৫০] গানটির ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয় [পৃ ৩২৯-৩২]।

ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প-সংকলন 'ছোট গল্প' প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রে মুদ্রিত তারিখ : '১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল' [সোম 26 Feb 1894]। গ্রন্থের আখ্যাপত্র :

ছোট গল্প।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও/ প্রকাশিত।/ ৫৫ নং চিৎপুর রোড।/ ১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল।/ মূল্য ১ এক টাকা।

উৎসর্গ।/ পূজনীয় জ্যেষ্ঠসোদরোপম/ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস,/ মহাশয় করকমলেষু।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২+১৮৯; মুদ্রণ-সংখ্যা : ১০০০।

১৬টি গল্প এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয় : ১। রাজপথের কথা ২। দেনাপাওনা ৩। পোস্টমাস্টার ৪। রাম কানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা ৫। তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি ৬। ব্যবধান ৭। খাতা ৮। সম্পাদক ৯। একরাত্রি ১০। ছুটি ১১। দান প্রতিদান ১২। কাবুলিওয়ালা ১৩। সমস্যা-পূরণ ১৪। গিন্নি ১৫ | ঘাটের কথা ১৬। রীতিমত নভেল।

গ্রন্থটির একটি বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন যদুনাথ সরকার দ্বিভাষিক 'সুহৃদ' [১৩০১] পত্রিকার [? ৭ম সংখ্যা] 134-38 পৃষ্ঠায়—ইংরেজিতে লেখা সমালোচনাটির শিরোনাম 'The New Leaven in Bengal./ [An Appreciation of Babo Robindranath Tagore's Short Stories.]'—ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম. এ. যদুনাথের বয়স তখন চব্বিশ বৎসর। তিনি লিখেছেন : 'But such a rendering of life, esp., of modern life, has been given by Robindronath in his short stories, with a degree of success unequalled by any other of our writers. The form chosen is the most felicitious. He has naturalised the short story in Bengali with wonderful success; he has retained all the excellent features of its (French) original, while he has added beauties which are peculiar to him....some of the descriptions are flawless gems, perfect prose-poems, which only a practised poetical artist could have produced'. আধুনিক সমাজের বিচিত্র জটিলতা, আগেকার দিনে অজ্ঞাত নতুন ধরনের জীবনযন্ত্রণার রূপটি ব্যাখ্যা ক'রে তিনি লিখেছেন: 'Robindronath Tagore is an interpreter of this new phase of our society, of these new forms of suffering. Paradoxical though it may sound, we confidently predict that his short stories will last longer than his poems. For those are a truer representation of life, or rather a fuller view of life as a whole than his poems—which give only a partial sketch of life and are incomplete even in that.' রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের একটি সমকালীন সমালোচনা হিশেবে এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

চৈত্র মাসের গোড়াতেই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ রামপুর-বোয়ালিয়া থেকে পতিসরে ফিরে গেছেন। 'শুক্রবার রাত্রি' [16 Mar ৪ চৈত্র[১]]-তে তিনি ইন্দিরা দেবীকে জানাচ্ছেন : 'জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধের পরেও অনেকক্ষণ বাইরে বেড়াই।'[২] সম্ভবত এর আগের দিন সরলা রায়কে লেখা [পত্র পৌঁছবার তারিখ 16 Mar]একটি পত্রে তিনি জানিয়েছেন : 'আমি যে কবে কলিকাতায় ফিরিব তাহার স্থিরতা নাই—এবারে বোধ হয় কিছু বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা আছে।' কিছুদিন আগে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি ইংরেজি পত্র লিখেছিলেন, সেটি নিয়ে আত্মীয়বন্ধু মহলে একটি ঘোঁট পাকানো হয়েছিল। সেটি জেনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এ সকল সংসাররহস্য সংসারেই থাকুক্ আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার প্রীতিসম্বন্ধ হইতে আমাকে দূরিত করিবেন না।'[৩] ছিন্নপত্রাবলী-র কোনো-কোনো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কিছু-কিছু উষ্মার প্রকাশ দেখা যায়, ইন্দিরা দেবীর সম্পাদনার ফলে তার হেতু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়—এই পত্রটি থেকে বোঝা যায়, কলকাতার কোলাহল কিভাবে গ্রামীণ বাংলার শান্তরসাস্পদ নির্জনতাকে ঘুলিয়ে তোলে।

৯ চৈত্র [বুধ 21 Mar] দোলপূর্ণিমার দিন ইন্দিরা দেবীকে আবার প্রজাদের প্রতি বাৎসল্যের কথা লিখেছেন তিনি : 'এদের সরল ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই ব'লে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায় তখন ভারী মিষ্টি লাগে।'[৪]

এইসব চিঠি পড়লে মনে হয়, দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা জনকল্যাণের কোনো তাত্ত্বিক ভাবনা থেকে নয়—প্রত্যক্ষ সংস্পর্শজাত। শ্রেণীগত সামাজিক বাধা অবশ্যই ছিল।

> চাষী খেতে চালাইছে হাল,
> তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
> বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
> তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
> অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
> সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
> মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
> ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।[১]

—এ যে নিছক কাব্যকথা নয়, এই চিঠিগুলিই তার প্রমাণ।

পরের দিন 22 Mar [বৃহ ১০ চৈত্র]-এর চিঠিতে মানবপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছে পশুপক্ষীর মধ্যে। আগের দিনে তাঁর বাবুর্চিখানার নৌকো থেকে পলাতক একটি মুরগির পুনর্বন্ধন দেখে 'আমি ফটিককে ডেকে বললুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ডাকে বলুর 'পশুপ্রীতি' লেখাটা এসে পৌঁছল, আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না।' রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহুবার আমিষাহার ত্যাগ করেছেন—শারীরিক কারণে ও আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে বারবার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন : 'আমার একটি নির্জনের প্রিয় বন্ধু জুটেছে—আমি লো [কেনে]র ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's, Journal ধার করে এনেছি—যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এ বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এ বইটি আমার মনের মতো বই। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনো বই ঠিক আরামের বোধ হয় না—···সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়।'[২]

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বইটির একটি খণ্ড আছে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করছি :

Macmillan's Colonial Library/AMIELS JOURNAL/THE JOURNAL INTIME/OF/HENRI-FREDERIC AMIEL/TRANSLATED/WITH AN INTRODUCTION AND NOTES/BY/MRS. HUMPHRY WARD/.../LONDON/MACMILLAN AND CQ./AND NEW YORK/1889/*All rights reserved.*

পাতায় পাতায় দাগ-দেওয়া ও চিহ্নিত এই বইটিই রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন ব'লে মনে হয়—যদিও দাগ দেওয়ার রীতিটি ঠিক তাঁর মতো নয়। ড উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'আমিয়েলের জার্নাল ও রবীন্দ্রমানসিকতা'[৩] প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। 1887-এ ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষি বইটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন, তার প্রমাণ উদ্ধার করেছেন রবীন্দ্র-জীবনীকার।[৪]

উপরে উল্লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "'পশুপ্রীতি' বলে ব [লু] একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছে, আজ সমস্ত সকাল বেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম।···আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে—ব [লু তার লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। সব-সুদ্ধ ব [লু]র এ লেখাটা আমার তেমন ভালো লাগে নি—···। কাদম্বরীর সেই মৃগয়া-বর্ণনা থেকে অনেকটা আমি ব [লু]কে তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতটা আমাদেরই মতো—একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই—পাখির সন্তানবাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো—এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তি দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন—সেই touch of nature makes the whole world kin!"

বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধ সাধনা-র চৈত্র সংখ্যায় [পৃ ৪৫০- ৬১] প্রকাশিত হয়—আমিয়েলের জার্নাল থেকে 'জন্তুদের প্রতি অবিচার ক্রমে যে মানুষ পর্য্যন্ত ওঠে' এই মন্তব্য-সহ 6 Oct 1866-এর 'দৈনন্দিন লিপি' থেকে একটি দীর্ঘ অংশ এর পাদটীকায় উদ্ধৃত হয়েছে, কাদম্বরীর মৃগয়া-বর্ণনা মূল-সহ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে—এমন কি 'Touch of nature makes the whole world kin' উক্তিটি পর্য্যন্ত প্রবন্ধটিতে স্থান করে নিয়েছে।

বাণভট্টের কাদম্বরী রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন আগে প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন [৮ শ্রাবণ] : 'কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শ দুয়েক পাতা হয়েচে—আরো ততগুলো পাত বাকি আছে।'[১] রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত ৪০১ পৃষ্ঠার এই বইটি রবীন্দ্রভবনে আছে :'কাদম্বরী-কথায়াঃ/ পূর্ব্বভাগঃ / মহামহোপাধ্যায় - মহাকবি - বাণভট্ট - বিরচিতঃ/ সুসঙ্গত -পাঠান্তর - সমন্বিতঃ/ শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন/ বিরচিতয়া সঙিক্ষপ্তটীকয়া সমলঙ্কৃতঃ/ কলিকাতারাজ ধান্যাং/ ২৪ নং, গিরিশবিদ্যারত্নম্ লেন/ গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে/ শ্রীহরিশচন্দ্র-কবিরত্নেন যত্নেন মুদ্রিতঃ/ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিতশ্চ।/ মূল্যং মুদ্রাচতুষ্টয়ম্।] [মূল্য চার টাকা।'—শেষাংশটি বাংলা হরফে ছাপা।

রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যাপত্রের উপরে বাংলা হরফে লিখেছেন : 'কাদম্বরী।/ পূর্ব্বভাগঃ ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। ভিতরে পাতায় পাতায় তিনি পেনসিল দিয়ে নিম্নরেখা টেনেছেন, কোথাও কোথাও সংস্কৃত বা ইংরেজি অর্থ লিখে রেখেছেন—বোঝা যায়, সংস্কৃত অভিধান তাঁর হাতের কাছেই থাকত। স্বতন্ত্র একটি কাগজে তাঁর হাতে লেখা কয়েকটি শব্দ, পৃষ্ঠাসংখ্যা, শব্দার্থ ইত্যাদি পাওয়া যায়। 1883-তে মুদ্রিত 'বাণভট্ট-তনয়-বিরচিত 'কাদম্বরী/উত্তর-ভাগঃ'ও তাঁর সংগ্রহে আছে। এই বইটিতে নিম্নরেখা থাকলেও অর্থনির্ণয় নেই। পুস্তানির পাতায় অবশ্য তিনি কয়েকটি শব্দ ও তাদের মধ্যে দু'টির অর্থ লিখে রেখেছেন।

বেশ কয়েক বছর পরে 'প্রদীপ' পত্রিকায় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্কিত 'কাদম্বরী চিত্র-শূদ্রকের রাজসভা' চিত্রটির প্রতিলিপি মুদ্রণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধ রচনা করেন [দ্র প্রদীপ, মাঘ ১৩০৬।৪১-৪৮; প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫৩৭-৪৮]। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রমাণ এই প্রবন্ধটি। লক্ষণীয়, 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধে উদ্ধৃত পক্ষীশাবকদের বর্ণনার অংশটি সেখানেও উৎকলিত করা হয়েছে।

চৈত্র মাসে ইন্দিরা দেবীকে লেখা আর তিনটি চিঠি আছে। 24 Mar [শনি ১২ চৈত্র]-এর চিঠিতে প্রকৃতিরসসম্ভোগের বর্ণনাটি কবির কলমে লেখা। 28 Mar [বুধ ১৬ চৈত্র]-এ লেখা চিঠিটি গুরুত্বপূর্ণ। এতে লিখছেন : 'আমি কাল ভাবছিলুম মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলছে—হু হুঃ শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে, স্নায়ুগুলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে।··· নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারী ভয় হয়—কী করতে পারব না-পারব কিছুই জোর করে বলতে পারিনে—মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই, আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে—জানি নে এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব—আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্যভারটা যোজনা করে দেবার কী আবশ্যক ছিল! ···আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কল-বল আছে; কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত, কেবল কী বাজে সেইটেই জানি—সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি।'[২] উদ্ধৃতি অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু 'অন্তর্যামী' [ভাদ্র ১৩০১],[৩], 'সাধনা' [৪ কার্ত্তিক ১৩০১], 'জীবনদেবতা' [২৯ মাঘ ১৩০২] প্রভৃতি কবিতার আন্তর-রূপটি কিভাবে দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে গড়ে উঠছিল তার দিক্-নির্দেশক হিশেবে পত্রটি মূল্যবান।

১৯ চৈত্র [শনি 31 Mar] 'পাতিসর, আত্রাই' থেকে মালদহে উমেশচন্দ্র বটব্যালকে [1852-98] লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে তাঁর গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট উমেশচন্দ্রের 'বৈদিক সোম', 'মধুচ্ছন্দার সোমযাগ' প্রভৃতি সাহিত্য-তে প্রকাশিত রচনার সপ্রশংস উল্লেখ তিনি করেছিলেন সাধনা-র পৃষ্ঠায়। এরপর উমেশচন্দ্র সাধনা-তেও আষাঢ় ১৩০০ সংখ্যা থেকে 'সাংখ্যদর্শন'-শীর্ষক ধারাবাহিক রচনা লিখতে থাকেন। তিনি 'পাঠকের বিরাগ ও শ্রান্তির আশঙ্কা' ক'রে পত্র লিখলে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে লেখেন : 'আপনার সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা পুনশ্চ আপনাকে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাইলাম। বঙ্গভাষায় আপনার এ রচনার আর তুলনা নাই। বড় ইচ্ছা ছিল মালদহে উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় লাভ করিব এবং সশরীরে আপনাকে সাধুবাদ দিয়া আসিব কিন্তু ব্যস্ততাবশতঃ সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল—কোন এক সময়ে পরিচয়ের অবসর হইবে এরূপ আশ্বাস রহিল।'[১] এর পূর্বে আষাঢ়-সংখ্যায় 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হ'লে রবীন্দ্রনাথ রচনাটির প্রশংসা ক'রে একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেটি জানা যায় উমেশচন্দ্রের মালদহ থেকে লেখা 7 Jul 1893 [শনি ১৮ আষাঢ়] তারিখের পত্রে : 'প্রিয়তম রবীন্দ্রবাবু।/আপনাকে পরিচিতের ন্যায় পত্র লিখিতে সঙ্কোচবোধ করি না। এ দেশে অনেক লোক যাহারা আপনাকে চক্ষে দেখে নাই বা দেখিবে না তাহারা সাহিত্যসংসারে আপনাকে সুপরিচিতের ন্যায় বোধ করে এবং করিবে। আমার সামান্য প্রবন্ধ আপনার ন্যায় পাঠকের যে প্রীতিকর হইয়াছে ইহা আমার পরম আহ্লাদের বিষয়। এই প্রবন্ধটি লিখিয়া আপনার সহিত যে আমার পরিচয় হইল ইহা পরম লাভ। বঙ্গদেশের মধ্যে আপনাদের পরিবার সুরুচি, সুশিক্ষা ও সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকের আদর্শস্বরূপ এবং আপনি এক্ষণে সেই পরিবারের একটি রত্নস্বরূপ। আপনার গদ্যে ও পদ্যে বঙ্গভাষা ভূষিত হইতেছে—মধ্যে মধ্যে আপনার

রচনাপাঠে আপনার স্বজাতীয় বলিয়া আপনাকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করি।'[২] বয়োজ্যেষ্ঠ সুপণ্ডিত সাহিত্যিকের প্রীতিসুমধুর এই পত্র পাঠ করলে মনে হয়, বাঙালির নিন্দাবাদকে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা অতিরঞ্জিত ক'রে দেখেছেন। নিন্দার কন্টক তো ছিল-ই, কিন্তু সমাদরও কিছু দুর্লভ ছিল না!

সাধনা, চৈত্র ১৩০০ [৩/৫] :

৪০২-১৬ 'রাজসিংহ।/ (নূতন পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৪৬৩-৬৯

৪২৬-৩১ 'এবার ফিরাও মোরে' দ্র চিত্রা ৪।৩২-৩৬

৪৪০-৪৯ 'রাজনীতির দ্বিধা' দ্র রাজাপ্রজা ১০।৪০৪-১০

'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির সময়ে 'রাজসিংহ' প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অনেকগুলি অনুচ্ছেদ বর্জিত হয়, রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশে [৯।৫৫৭-৬০] সেগুলি সংকলিত হয়েছে; কিন্তু বর্জিত শেষ অনুচ্ছেদটি অসংকলিত থাকায় আমরা সেটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি : 'রাজসিংহ উপন্যাসখানি সম্বন্ধে মোট কথাটা আমার যাহা মনে উদয় হইয়াছে আমি তাহাই এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিলাম। হয়ত খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণ করিয়া ইহার সমস্ত দোষগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করা যাইতে পারিত। কিন্তু সেভাবে লেখা আরম্ভ করি নাই এবং সে নৈপুণ্যও আমার নাই, অতএব এইখানেই বিরত হইলাম।' রবীন্দ্রনাথের আলোচনার প্রকৃতিটি এই অনুচ্ছেদ থেকে বুঝে নেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই বহু ইংরেজি সাময়িকপত্র পাঠ করতেন। বিচিত্র বিষয়ে য়ুরোপ-আমেরিকার সর্বাধুনিক ভাবনা-চিন্তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার এইটাই ছিল সহজতম পন্থা। আর এই চিন্তাজগৎ সম্পর্কে বাঙালি পাঠককে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই সাধনা-য় তিনি 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগের প্রবর্তন করেছিলেন, এ-কথা আমরা আগেও বলেছি। 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধটি সাময়িক সারসংগ্রহ নয়, কিন্তু সাময়িকপত্রের সংবাদ অবলম্বনেই লেখা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবেলিদের রাজা লোবেঙ্গুলা [Lobengula, 1833-94] ইংরেজদের অধিকার দিয়েছিলেন তাঁর অধীনস্থ রাজ্যে বাণিজ্য করতে, সোনার ও হীরার খনির সন্ধান পেয়ে ইংরেজদের লোভ বেড়ে যায়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ম্যাটাবেলিদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেধে যায়। অসম এই যুদ্ধে মেসিনগানের গুলিতে অসংখ্য ম্যাটাবেলির মৃত্যু হয়। পরাজিত হয়ে লেবেঙ্গুলা পলায়ন করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ইংরেজি সাপ্তাহিক *Truth* -এ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। ইংরেজদের শোষণে ভারতীয় অর্থনীতি কিভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সে-সম্বন্ধে কিছুদিন ধরেই সচেতন হচ্ছিলেন। আফ্রিকার ম্যাটাবেলি-যুদ্ধের বিবরণ থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভারত, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকায় যে শোষণ ও নিপীড়ন দেখা গিয়েছে তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একই য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী প্রবৃত্তি দেশে দেশে সভ্যতার নীতি নিয়মের চূড়ান্ত ব্যভিচার ঘটিয়ে চলেছে। তাই তিনি লিখলেন : 'সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেই সঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মতো খসিয়া পড়ে; এবং

সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে, উলঙ্গ ম্যাটাবেলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে।··· নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে—অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্বর লবেঙ্গুলা ইংরেজদের ক্রূর ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীর-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে, ইংরেজদের ক্রুর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে, ইংরেজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন রাজনীতির দ্বিধা। নিজের ও জাতির সমৃদ্ধির জন্য অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে খেতেই হবে, অথচ সেই সমাজেরই আর-একটি অংশ উক্ত কাজের সমালোচনা করবে—'জাতির হৃদয় এইরূপে বিভক্ত হইয়া গেলে বলের খর্বতা হয়—আপনি আপনাকে বাধা দিতে থাকে। আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-সম্প্রদায় ইহাই লইয়া সুতীব্র আক্ষেপ করে। তাহারা বলে, আমরা কিছু জোরের সহিত যে কাজটা করিতে চাই, ইংলণ্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে। সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ৎ দিতে হয়।' ইংরেজের মধ্যে অখণ্ড বলের অভাবের জন্যই ভারতে কংগ্রেস ও সংবাদপত্রসমূহের অভ্যুদয় হয়েছে। 'এখন চোরকে ধর্মের কাহিনী বলিলে যদি-বা সে না মানে তবু তার একটা ধর্মসংগত জবাব দিতে চেষ্টা করে এবং ভালো জবাবটি দিতে না পারিলে তেমন বলের সহিত কাজ করিতে পারে না। অতএব, যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বাহুল্যবিস্তারে আক্ষেপ প্রকাশ করে তাহারা যথার্থপক্ষে স্বদেশীয়দের জাতীয় প্রকৃতিতে ধর্মবুদ্ধির অস্তিত্ব লইয়া দুঃখ করে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, ইংরেজদের 'রাজনীতির মধ্যে ধর্মবুদ্ধি একটা সত্য পদার্থ। কখনো-বা তাহার জয় হয়, কখনো-বা তাহার পরাজয় হয়; কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না।' কিন্তু তিনি জানেন, 'গবর্মেন্ট যদি-বা আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সংকোচ বোধ করে, ছোট ছোট কর্তারা কোনো সুযোগে একবার আমাদিগকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না।' কিন্তু ল্যাঙ্কাশিয়রের স্বার্থ ও ইংরেজের প্রেসটিজ ক্ষুণ্ণ হলে সেক্ষেত্রে তাদের ধর্মবুদ্ধি কী ধরনের নীরবতা অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছেন। আর সেটা জানা আছে ব'লেই আয়র্লণ্ড দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ইংরেজের ধর্মবুদ্ধিকে দলে পেতে চেষ্টা করে, অন্যদিকে খুনের ছুরিতেও শান দিতে থাকে। ভারতীয় রাজনীতির এই 'দ্বিধা' অবশ্য কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করতে পারে নি।

চৈত্র মাসের শেষে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। ২৮ চৈত্র [সোম 9 Apr] সত্যপ্রসাদ তাঁর হিসাব-খাতায় লেখেন : 'রবিমামাকে হাওলাত দেওয়া যায় ১৫০'।

'বর্ষশেষ। বৃহস্পতিবার ১২ এপ্রিল ১৮৯৪' [৩১ চৈত্র] রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসে লিখলেন 'স্নেহস্মৃতি' কবিতা [দ্র চিত্রা ৪।৩৭-৩৯]। কোনো সন্দেহ নেই, কবিতাটি কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি-সুরভিত। আর ক'দিন পরেই তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পূর্ণ হবে। এই শোচনীয় মৃত্যুর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর আবাস ত্যাগ ক'রে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন ও কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি-বিধুর তেতালার ঘরটি আসে রবীন্দ্রনাথের অধিকারে। উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে দীর্ঘ দিন প্রবাস যাপনের পর জোড়াসাঁকোর এই ঘরটিতে ফিরে এসে তাই তিনি সেই অনতিক্রম্য স্মৃতিভারে পীড়িত হয়েছেন। তাঁর সেই শোকাশ্রু নিবেদন করেছেন পরম্পরাক্রমে লিখিত কয়েকটি কবিতা ও গানে—'স্নেহস্মৃতি' [বর্ষশেষ ১৩০০], নববর্ষে [নববর্ষ ১৩০১], 'দুঃসময়' [৫ বৈশাখ ১৩০১], 'মৃত্যুর পরে' [৫ বৈশাখ ১৩০১] ও 'ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ' [৮ বৈশাখ ১৩০১]—লক্ষণীয়, কাদম্বরী দেবীর বিষপানের সেই চরম দিনটিতে কীর্তনের সুরে রবীন্দ্রনাথ এই বেদনা-গাথা সমাপ্ত করেছেন। এরপর 'মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া'।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিসের নিয়ম অনুযায়ী চাকুরীকালে দু'বার 'ফর্লো' [furlough] ছুটির অধিকারী ছিলেন। প্রথমবারে ছুটিতে [20 Sep 1878-10 May 1880] তিনি বিলাতে যান, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বারের ছুটি [2 Apr 1893-15 Mar 1894] তিনি প্রধানত সিমলাতে কাটান সপরিবারে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের সঙ্গী। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন : '১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে সিমলা গিয়া পৌঁছান যায়; ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে আমাদের অধিবাস'।[১] ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় বলেছেন যে, সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংকটাপন্ন নিউমোনিয়া ও খুব জ্বর হয়, ডাঃ রাজেন্দ্র দত্তের চিকিৎসায় তাঁরা রোগমুক্ত হন। 'Woodfield Simla'য় রাজেন্দ্রবাবু'র ছবি এঁকে [7 May ও 22 Oct 1893] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সিমলা প্রবাসে তিনি আরও অনেকের ছবি এঁকেছেন। এইপর্বের শেষ ছবি 'Lady Harman Singh' ও 'Mr. Pousamby'-র—4 Dec [২০ অগ্র °]-এ আঁকা; এর থেকে তাঁদের সিমলা পরিত্যাগ ক'রে কলকাতায় ফিরে আসার সময়টি অনুমান করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ এর পরে কিছুদিন কলকাতায় কাটান ও মাঘোৎসবে [23 Jan 1894] বক্তৃতা করেন। ছুটির শেষে 10 Mar [শনি ২৭ ফাল্গুন] তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন,[২] ও বোম্বাই প্রদেশে তাঁর নূতন কর্মস্থল সাতারায় অস্থায়ী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসন্স জজ পদে যোগদান করেন 16 Mar 1894 [৪ চৈত্র]। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যেরা সেখানে যান আষাঢ় ১৩০১-এ।

শরৎকুমারী দেবীর তৃতীয়া কন্যা স্বয়ম্প্রভার সঙ্গে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। তারিখটি আমরা জানতে পারিনি; সত্যপ্রসাদ 'স্বয়ংপ্রভার বিবাহোপলক্ষে যৌতুক খরিদ' করেছেন ৩ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 16 May] ও মহর্ষির নিজস্ব ক্যাশবহির ৩০ জ্যৈষ্ঠ [সোম 12 Jun] তারিখের হিসাব : 'শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভবিবাহের উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় যৌতুক দেন গিনি ২৫০ থান ১৬।৯ হিসাবে ৪০৯৩ ০'—এরই অন্তর্বর্তী কোনো সময়ে বিবাহটি সম্পন্ন হয়েছিল।

২৯ পৌষ [শুক্র 12 Jan] রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা ও চতুর্থ সন্তান মীরা দেবীর জন্ম হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাবী পুত্রবধূ অবনীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী প্রতিমা দেবীর জন্ম হয় ২০ কার্ত্তিক [রবি 5 Nov] —পিতা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, মাতা বিনয়িনী দেবী।

ইন্দিরা দেবীর ভাবী স্বামী প্রমথ চৌধুরী ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করেন 17 Oct [মঙ্গল ১কার্ত্তিক]। এর কয়েক মাস পরে তাঁর পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী 5 Jan 1894 [শুক্র ২২ পৌষ] তারিখে মারা যান, দীর্ঘকাল তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন।

ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হিন্দুমেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা *The National Paper*-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের মৃত্যু হয় 20 Jan 1894 [শনি ৮ মাঘ]। জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এই মানুষটির মৃত্যু সেইদিন প্রায় অলক্ষিত থেকে গেছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

ক্ষিতীন্দ্রনাথের উৎসাহে আদি ব্রাহ্মসমাজ বর্তমান বৎসরে বিশেষ কর্মচঞ্চল। পিতামহ মহর্ষিদেবের কাছ থেকে বিভিন্ন দিনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে যে-সমস্ত উপদেশ লাভ করেছিলেন, সেগুলিকে লিপিবদ্ধ ক'রে তিনি ধারাবাহিক ভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রচার করতে থাকেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী অচ্যুতানন্দ স্বামী মধুবনী, দ্বারভাঙ্গা ['দ্বারবঙ্গ'] প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচারে যান [দ্র তত্ত্ব°, আষাঢ় ।৩৯-৪৩, ৫৭]।

৫ আষাঢ় [রবি 18 Jun] আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ব্রহ্মলাভ ও ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা যাহাতে মনুষ্যের বিশেষ লক্ষ্য হয় ইহার স্থাপনকর্ত্তাদিগের ইহাই উদ্দেশ্য।' উপাচার্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা। একটি ব্রহ্মসংগীত বিদ্যালয় এখানে কয়েক বৎসর থেকেই চালু ছিল।

৭ পৌষ [বৃহ 21 Dec] শান্তিনিকেতন আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব হয়। '৭ পৌষ সুনির্ম্মল প্রাতঃকালে সকলে মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বন্দনাগীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে সঙ্গীত আরম্ভ হইল।' ক্ষিতীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে বক্তৃতা, উদ্বোধন ও উপদেশ দান করেন। 'এই প্রাতের উপাসনায় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত করিয়া উৎসবকে আরো মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সভা ভঙ্গ হইলে অনেকে সপ্তপর্ণ বেদীর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া 'কর তাঁর নাম গান' [দ্বিজেন্দ্রনাথ] এই গানটী সমস্বরে গাহিয়াছিলেন। পরে মধ্যাহ্নের বিশ্রামের পর রামপুরহাটের রাজকুমারবাবু মধুর গম্ভীর স্বরে কীর্ত্তন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।···পরে রাত্রিকাল সমাগত। আলোকমালায় ব্রহ্মমন্দির উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।' প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন উপাসনা ও উপদেশ এবং শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রার্থনা করেন। 'এই ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে দীন দুঃখীদিগকে বিস্তর অন্ন বস্ত্র প্রদান করা হইয়াছিল। যাঁহারা এই তীর্থস্থানে উৎসব দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে তাঁহারা সকল বিষয়ে বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।'[১] মহর্ষির নিজস্ব হিসাব-খাতা থেকে জানা যায়, এই উৎসবের জন্য ১১২০ টাকা ১০ আনা ৯ পাই ব্যয়িত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে এবারের উৎসবে একজন বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন সুইডেনবাসী কার্ল এরিক হ্যামারগ্রেন [Karl Eric Hammergren, 1858-94]।[২] রামমোহনের রচনাবলী পাঠ ক'রে মুগ্ধ বহুভাষাবিদ্‌ এই যুবক বাংলাদেশ ও বাঙালির সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য কয়েক মাস পূর্বে এদেশে আসেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর বেশি যোগাযোগ থাকলেও অন্যান্য সমাজেও তাঁর গতায়াত ছিল। তাঁর মৃত্যুর [3 Jul 1894 ২০ আষাঢ় ১৩০১] পর লিখিত এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হ্যামারগ্রেনের শান্তিনিকেতন-উৎসবে যোগদানের কথা স্মরণ ক'রে লিখেছেন : 'রৌদ্রতাপ এবং উপবাস তিনি কিরূপ সহ্য করিতে পারিতেন বর্তমান লেখক একদিন তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে উৎসব-উপলক্ষে গত বৎসর পৌষ মাসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গিয়া প্রাতঃকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হন বিনা ছাতায় বিনা আহারে সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অপরাহ্ণে উৎসবারম্ভকালে ফিরিয়া আসেন—তখন কিছুতেই আহার করিতে সম্মত না হইয়া উৎসবান্তে রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পদব্রজে স্টেশনে গমনপূর্বক সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।'[৩] অজিতকুমার চক্রবর্তী মহর্ষি গানের যে-তালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় ১২ পৌষ [26 Dec] 'হ্যামারগ্রেন সাহেবকে দিবার জন্য' মহর্ষি শিবনাথ শাস্ত্রীর হাতে ১০০ টাকা দান করেছেন।'[৪] মহর্ষিভবনে মাঘোৎসবেও

তিনি সম্ভবত উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন : 'কলিকাতায় বাঙালির নিমন্ত্রণসভায় উৎসবক্ষেত্রে ধর্মসমাজে এই শুভ্রকোর্তাধারী সৌম্য প্রফুল্লমূর্তি শ্বেতাস্য বিদেশীকে একপ্রান্তভাগে অনেকবার দেখিয়াছি।···অনেক সভাস্থলে আমাদের বক্তৃতার ভাষা আমাদের সংগীতের সুর তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না; ধৈর্যসহকারে হৃদয়ের অন্তরঙ্গতাগুণে আমাদের ভাবের মধ্যে যেন স্থানলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন।' অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ফরাসী ভাষা শেখার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫]

১১ মাঘের উৎসবের আগে ৮-১০ মাঘ তিন দিন আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে বক্তৃতার আয়োজন হয়। এটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণ। ৮ মাঘ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী 'ধর্মজীবনের প্রতিষ্ঠা', ৯ মাঘ যদুনাথ চক্রবর্তী 'ব্রাহ্মসমাজের উত্থান ও অগ্রগতি' ও ১০ মাঘ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্' বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তা ও বিষয়ের বিবরণ *The Indian Mirror* পত্রিকা থেকে গৃহীত, 'এবারে আদি সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে ৮ মাঘ হইতে তিন দিবস বক্তৃতা হইয়াছিল। সভাস্থলে লোক সমাগম মন্দ হয় নাই'— তত্ত্ববোধিনী-র প্রচার এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে [তত্ত্ব°, ফাল্গুন।২২০]।

১১ মাঘ [মঙ্গল 23 Jan] চতুঃষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রাতের ও সন্ধ্যার উপাসনা মহর্ষি-ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। 'সুনির্ম্মল প্রাতঃকালে ভগবদ্ভক্ত সাধুসজ্জন সকল সুসজ্জিত রমণীয় সভাস্থল অলঙ্কৃত করিলে সর্ব্বপ্রথমে 'দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান' [দেবেন্দ্রনাথ] এই অর্চ্চনা সঙ্গীত সমস্বরে গীত হইল। পরে আচার্য্যেরা বেদি গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার লিখিত "বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান" বিষয়ক উপদেশ পাঠ করিলেন।' এরপর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের উদ্বোধন, প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা'-বিষয়ক উপদেশ পাঠ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থনা হয়। সত্যেন্দ্রনাথ-রচিত 'সবে কর আজি তাঁর গুণগান [ভৈরবী-কাওয়ালি] ও 'হে প্রভু পরমেশ্বর তব করুণা' [টোড়ি-কাওয়ালি] এই দুটি ব্রহ্মসংগীত প্রাতঃকালীন উৎসবে গাওয়া হয়।

'রাত্রিকালে বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র পুষ্পে সুসজ্জিত উৎসবক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হইলে' 'য আত্মদা বলদা যস্য' [ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল ১২১ সূক্ত] বেদগান দিয়ে সায়ংকালীন উৎসবের সূচনা হয়। সত্যেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর উদ্বোধন, শম্ভুনাথ গড়গড়ির উপদেশ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থনা উৎসবের প্রধান কার্যক্রম ছিল। মোট ১৪টি ব্রহ্মসংগীত এই অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়, তার মধ্যে ৬টি গান রবীন্দ্রনাথ-রচিত; বাকিগুলি হ'ল :

সুঘড়াই কানেড়া—ঝাঁপতাল। শুভ দিন, ক্ষণ, শুভ এই মাসে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]
ইমন কল্যাণ—ধামার। কেন ম্লান নিরানন্দ [ঐ]
পঞ্চার—সুর ফাঁকতাল। আয় সবে মিলে যাই প্রভুর দ্বারে
মিশ্র বেহাগ—ঝাঁপতাল। আজ আনন্দে প্রেম-চন্দ্রে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]
দেশ-ধামার। তব আশা-বাণী শুনি আহা হৃদয় মাঝে [ঐ]
শুক্ল বেলাবলী—চৌতাল। প্রথম কারণ আদি কবি [সত্যেন্দ্রনাথ]

দেশকার—সুরফাঁকতাল। হৃদাসনে এস হে, এ শুভদিনে [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

কেদারা—চৌতাল। তাঁহারি চরণতল ছায়ে চিরদিন থাক ওরে [ঐ]

অক্ষপ্রকাশ ভদ্র বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী অবসর নেওয়ার পর থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ও ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের সংগীতশিক্ষক ছিলেন। মহর্ষির নিজস্ব ক্যাশবহি থেকে জানা যায় যে, ১৫ ফাল্গুন [26 Feb 1894] তাঁকে কর্মচ্যুত করা হয়।

এই বৎসর ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শিকাগোর ধর্মমহাসভা।[১] কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের চতুঃশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য চিকাগোয় একটি বিশ্বমেলার আয়োজন করা হয়। 1 May 1893 [সোম ১৯ বৈশাখ] এই মেলার উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে ভারত থেকেও বহু শিল্পসামগ্রী সেখানে প্রেরিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর অঙ্গ হিশেবে সেখানে একটি ধর্মমহাসভা [Parliament of Religions] আয়োজিত হয়, সেখানে সারা বিশ্বের সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে নিজ নিজ ধর্মের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করবেন। ধর্মমহাসভার অধিবেশন শুরু হয় 11 Sep 1893 [সোম ২৭ ভাদ্র] তারিখে, সমাপ্ত হয় সতেরো দিন পরে 27 Sep [বুধ ১২ আশ্বিন]। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিবিধ ধর্মের দেশ ভারত থেকেও কয়েকজন এই ধর্মমহাসভায় যোগ দেন। নববিধান সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বৌদ্ধধর্মের এইচ ধর্মপাল, ব্রাহ্মধর্মের বি বি নাগরকর, জৈনধর্মের বীরচাঁদ গান্ধী, থিয়লজিক্যাল সোসাইটির জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হিন্দুধর্মের স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্মমহাসভার বিভিন্ন অধিবেশনে ভাষণ দেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বা এইচ ধর্মপাল দেশেবিদেশে যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু বিস্ময় সৃষ্টি করলেন প্রায় অপরিচিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। এর পরবর্তী একটি দশককে বাংলার ধর্মীয় ও জাতীয় ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ-দশক বলা যায়। খৃস্টীয় ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিক্রিয়ায় গত দশ বছর ধরে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যে প্রয়াস চলছিল, অথচ উপযুক্ত ব্যাখ্যাতার অভাবে যা কেবলই আধ্যাত্মিক কুয়াশা সৃষ্টি করছিল—বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ আবির্ভাবে এবং ধর্মমহাসভায় ও আমেরিকার অন্যত্র তাঁর বিপুল খ্যাতি উক্ত আন্দোলনে এক প্রচণ্ড গতি এনে দিল। আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ব্রাহ্মসমাজ এর চাপে তার সুমহান সংস্কারবাদী ঐতিহ্য নিয়ে আর কখনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি—নিজ নিজ ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

বাংলা দেশে হেঁয়ালি নাট্যের সূচনা 1876-এর কলেজ রি-ইউনিয়ন সভায় দেখা গেলেও তার অপূর্ব সম্ভাবনা উদঘাটিত হয়েছে ঠাকুরবাড়িতে—রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী [কখনো-বা হিরণ্ময়ী দেবী ও গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত] অনেকগুলি এই জাতীয় নাটিকা রচনা করেছেন। বর্তমান বৎসরে এই ঠাকুরবাড়িতেই রচিত হ'ল আর একটি অভিনব খেলা—ছবি হেঁয়ালি বা হেঁয়ালি-চিত্র নামে সেটিকে অভিহিত করা হয়েছে। ইন্দিরা দেবীর ভাষায় এর একটি পরিচয় আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। সিমলা ও জোড়াসাঁকোর এই ঐতিহাসিক চিত্র-যুদ্ধের অমূল্য নিদর্শনগুলি তাঁরই সঞ্চয়-বাতিকের কল্যাণে রক্ষিত হয়েছে। ছবিগুলি শক্ত কার্ডবোর্ডের উপর

সেঁটে পুঁথির মতো তিনি বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। হেঁয়ালির সমাধানও তিনি লিখে দিয়েছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের অপূর্ব উদ্ভাবনক্ষমতার এই নিদর্শনটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে রক্ষিত দু'টি খাতার সংগ্রহণ-সংখ্যা Ms. 277A ও Ms. 277B। *Rabindra-Bhavana Collection/Catalogue-in-Progress, No. 4*[1983]-এ প্রদত্ত খাতা-দু'টির বিবরণ উদ্ধৃত হল: 'Bound Volumes. 18.8×27.8. cm., 25.5 × 34 c.m./Total pages 56; 44. Written pages 53; 38. Language Bengali & English. Script Rabindranath Tagore, Gaganendranath Tagore, Abanindranath Tagare, Jyotirindranath Tagore, Surendranath Tagore and Indira Devi Chowdhurani. [1892-93].'—এখানে '1892'-এর উল্লেখ অবশ্যই ভুল, ছবিগুলি সম্পূর্ণতই 1893-এ Apr-Dec মাসের মধ্যে আঁকা। তাছাড়া ইন্দিরা দেবী নিজে কোনো ছবি আঁকেননি, কেবল টাইপ-করা সমাধানের উপর নিজের হাতে টিপ্পনী যোগ করেছেন : 'প্রথম চারটি লালনীল পেন্সিল আঁকা ছবি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের চিত্র; পরবর্তী হেয়ালি চিত্রের সঙ্গে যার কোন যোগ নেই।' উক্ত চারটি ছবির মধ্যে দু'টি রবীন্দ্রনাথের গান অবলম্বনে অঙ্কিত : 'আজ কি প্রথম এল বসন্ত জীবনে' ও 'কে তুমি [গো] খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার'। চিত্রকরদের নাম ইন্দিরা দেবীও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয় সত্যপ্রসাদও তাঁদের মধ্যে ছিলেন—কয়েকটি ছবিতে লেখা পত্র তাঁকে উদ্দেশ করে রচিত। ছবিগুলিকে না দেখলে হেঁয়ালিচিত্রের আসল মজাটি পাওয়া শক্ত, কিন্তু 'সমাধান'-এর মধ্যেও কৌতুকের অভাব নেই। তাই আমরা তার কয়েকটি সংকলন করে দিচ্ছি, সংখ্যাগুলি খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক। ২ 'Woodfield ভাই সোদ্দা আমরা একান্নবর্ত্তী বিপুল পরিবার, মগর কেউ জীবিকার উপায় অন্বেষণ করচেন না; না বোঝা খারাপ; শেষটা চুরি করে খেতে হবে। ৮ই অগাষ্ট [২৪ শ্রাবণ ১৩০০]। ইতি সুরেন্দ্র'; ২০-২৭ 'স্নেহাস্পদেষু, রোজ রোজ দুপুর বেলা মেজদার নিকট যত বুড়া কাহিল পাঞ্জাবী আসিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া বকবক করে। ফরাসী শিক্ষা কদ্দূর এগোলো। পাণিনীর ব্যাকরণটা কণ্ঠস্থ করা মন্দ নয়। আজকাল তোমাদের ফলাও প্যাঁচাও অসঙ্গত শক্তরকম হেঁয়ালি। ৩১ জুলাই [১৬ শ্রাবণ] শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর'; ৩২ 'সত্য, শনিবারে আমরা চৈতন্য লীলা দেখতে গেছিলুম।···তোমার নয়নতারা শ্রীমতী নরেন্দ্রবালা দেবী কি করচেন? শান্তা সুপু [সুপ্রকাশ] কেমন আছে?' অবনীন্দ্রনাথ-তো একটি গল্পই লিখেছেন ছবি দিয়ে : 'পশুপতি সা'র daughter-এর পাণিগ্রহণে বদ্দিবাটীতে ভারি ধূম; কনে সর-বাদাম ঘষে সাফ, সেজে ফিটফাট হলেন; রূপবান পাত্র হাস্যমুখে চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে গড়ের বাদ্যি সঙ্গে রংমশাল জ্বালিয়ে দর্শন দিলেন। শঙ্খধ্বনি গগনভেদ করিল। সমস্ত বাবুই ঘোর মাতাল, পশুপতির চক্ষু স্থির। শ্যালকেরা চটিয়া দুচোখো লাঠি চালান। ব্যাটা মাতালরা কুপোকাৎ—জামাইয়ের পলায়ন—কনের ফিট। ডাক্তারেরই পোয়াবারো। বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। ইতি বাই অবনীন্দ্র'।

---

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৯৮, পত্র ৯১

১ সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০। ১৭২

২ সাধনা, বৈশাখ ১৩০০। ৫৩৪

১ ছিন্নপত্রাবলী। ১৯৯, পত্র ৯২

২ ঐ। ২০১, পত্র ৯৩

৩ ঐ। ২০৩, পত্র ৯৪

৪ ঘরোয়া। ১৩৭

১ ছিন্নপত্রাবলী। ২০৭, পত্র ৯৬

২ ঐ। ২০৫, পত্র ৯৫

৩ দ্র শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ। ২০৫; রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী। ১৪-১৫

১ ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী [1985]। ১, পত্র ১

২ ঐ। ৩, পত্র ২

৩ ছিন্নপত্রাবলী। ২১৩, 21 Jun 1893 [৮ আষাঢ়]

১ 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি', সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১০। ৪০

২ রবীন্দ্র-সাগরসংগমে। ৯০

১ ছিন্নপত্রাবলী। ২১৫-১৬, পত্র ১০০

১ মূল পত্র—রবীন্দ্রভবন : রমা দত্ত-সংগ্রহ

২ ছিন্নপত্রাবলী। ২১৯, পত্র ১০২

৩ ঐ। ২২০, পত্র ১০৩

৪ 'কাব্যের অভিব্যক্তি', প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩১৩। ৩৬৪

৫ ছিন্নপত্রাবলী। ২২২-২৩, পত্র ১০৪; পত্রটির ৪-৭ পংক্তির '[তবে] কেবল আমার মনটি…সময় পাওয়া যায় নি' অংশটি পাণ্ডুলিপিতে কালি বুলিয়ে কাটা, সম্পাদক পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে 'কিন্তু *আজ* দিনের কাজকর্মের ভিড়ে' ইত্যাদিতে 'আজ' শব্দটি সম্ভবত ভুল পড়েছেন।

১ ছিন্নপত্রাবলী। ২২৪, পত্র ১০৫

২ ঐ। ২২৬, পত্র ১০৬

৩ ঐ। ২২৮, পত্র ১০৭

১ সাহিত্য, শ্রাবণ। ৩৩৯

২ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৩৬৭]। ১৮৮

১ 'রূপকথার আদি কথা', রূপকথা, আশ্বিন ১৩৪৮। ৩

২ 'শিশুদের রবীন্দ্রনাথ', প্রণাম নাও [১৩৬৮]। ৪২

৩ পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত 'গোর্খ-বিজয়' [১৩৫৬]। ১৪৮

৪ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪ [১৩৯২]। ৩৭; পত্রটি সম্ভবত এই সময়ের, সম্পাদক কেন '[নভেম্বর ১৯০০]' অনুমান করেছেন বোঝা শক্ত।

৫ মূল পত্র—রবীন্দ্রভবন : রমা দত্ত-সংগ্রহ

৬ চিঠিপত্র ৫। ১৬৬ক, পত্র ১২ক

১ চিঠিপত্র ১। ৩৫, পত্র ১৫; সম্পাদক চিঠিটির তারিখ অনুমান করেছেন '7 Jul 1893', নানা কারণে তারিখটি গ্রহণযোগ্য নয়।

১ 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি', সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০। ১১৭-১৮

২ সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০০। ৯১৬

৩ ছিন্নপত্রাবলী। ২৩৪-৩৫, পত্র ১০৮

৪ ঐ। ২৩৬-৩৭, পত্র ১০৯

১ সাহিত্য, ভাদ্র। ৪২৪

২ ছিন্নপত্রাবলী। ২৪১, পত্র ১১১

১ চিঠিপত্র ৫। ১৬১, পত্র ১৩

২ আধুনিক সাহিত্য [গ্র°প°] ৯। ৫৫৬

১ 'বঙ্কিম-স্মৃতি', নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২। ৬৩৩-৩৪

১ সাহিত্য, আশ্বিন-কার্ত্তিক। ৫৮৬

২ ছিন্নপত্রাবলী। ২৪৩, পত্র ১১২; সম্পূর্ণ পত্রটি কালি বুলিয়ে কাটা।

৩ চিঠিপত্র ৫। ১৬২, পত্র ১৩

৪ মূলপত্র : রবীন্দ্রভবন

১ দ্র শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ। ২১-২২

২ সাহিত্য, অগ্র°। ৬৬৬

১ দ্র রবীন্দ্র কথা। ১৯৭

১ সাহিত্য, পৌষ। ৭২৬

২ তত্ত্ব°, মাঘ ১৮১৫ শক। ১৮৪-৮৫

১ রবীন্দ্র কথা। ২৪৮

১ 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি', সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১০। ৪৫

১ জীবনের ঝরাপাতা। ৩৩

২ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৫৭

৩ ঐ ১৩৭৫। ১৭৫

১ 'বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ।/(দ্বিতীয় প্রস্তাব)', প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৬। ১৭৫

২ আধুনিক সাহিত্য [গ্র°প°] ৯। ৫৫৮

৩ ঐ [গ্র°প°] ৯। ৫৫৭

৪ পাণ্ডুলিপিতে আছে 'রবিবার। ১৯ ফেব্রুয়ারি', কিন্তু 19 Feb সোমবার। ছিন্নপত্রাবলীর এই সময়কার চিঠিতে এরূপ অসংগতি সুপ্রচুর। রবীন্দ্রনাথ কি ভ্রমক্রমে 1893-এর একটি ডায়েরি ব্যবহার করতেন? সেক্ষেত্রে বারের সঙ্গে তারিখের সংগতি দেখা যায়। এমন হ'লে অবশ্য তারিখের চেয়ে বার-কেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করতে হবে।

১ ছিন্নপত্রাবলী। ২৪৫-৪৬, পত্র ১১৩

২ রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা ১। ৮২

৩ ছিন্নপত্রাবলী। ২৪৭, পত্র ১১৪

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৩৪, পত্র ১৫৩

১ বাঙালি পঞ্জিকাকারদের খেয়ালে ফাল্গুন-সংক্রান্তি কোনো পঞ্জিকায় ২৯শে, কোনো পঞ্জিকায় ৩০শে, ফলে চৈত্র মাসের বাংলা ও ইংরেজি তারিখে এক দিনের পার্থক্য ঘটেছে। আমরা সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নির্মলচন্দ্র লাহিড়ি-সংকলিত যে *Condensed Ephimeris* [1970] ব্যবহার করি, তাতে উক্ত সংক্রান্তি ২৯শে নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং বাংলা ও ইংরেজি তারিখের গণনায় কিছু পার্থক্য ঘটেছে।

২ ছিন্নপত্রাবলী। ২৪৮, পত্র ১১৫

৩ মূল পত্র—রবীন্দ্রভবন : রমা দত্ত-সংগ্রহ

৪ ছিন্নপত্রাবলী। ২৪৯, পত্র ১১৬

১ জন্মদিনে ২৫। ৭৮, ১০-সংখ্যক কবিতা

২ ছিন্নপত্রাবলী। ২৫১-৫২, পত্র ১১৭

৩ দ্র 'এ মণিহার' [১৩৮৮]। ১২৪-৩১

৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ৩৬১

১ চিঠিপত্র ৫। ১৬৬(খ), পত্র ১২ক

২ ছিন্নপত্রাবলী। ২৫৫-৫৭, পত্র ১১৯

৩ পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, কবিতাটির প্রথম তিনটি স্তবক '১০ আগস্ট' [২৬ শ্রাবণ ১৩০১] তারিখে লেখা।

১ সা-সা-চ ৮। ৮৫। ২০-২১

২ মূলপত্র : রবীন্দ্রভবন

১ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ১০৯

২ 'Mr. S. N. Tagore, C.S., Sessions Judge, Sattara, left Calcutta for Bombay by last Saturday's Mail.'— *Indian Mirror*, 16 Mar 1894.

১ তত্ত্ব, মাঘ। ১৭৫—৮৯

২ তার এক আত্মীয় Mr. Tord Nordenstrom 10 May 1979-এ Stockholm থেকে হ্যামারগ্রেনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রভবনে : '··· My relative Karl Hammergren, a son of a vicar, was borne in Sweden in 1858. He became a student at the University of Uppsala in 1877. He worked as librarian in England from 1888. In 1893 he arrived in Calcutta, where he enjoyed the hospitality of Doctor and Mrs. M. M. Bose. He died in Calcutta in 1894'.

৩ 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য', সমাজ-পরিশিষ্ট ১২। ৪৮৫

৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩৬৬

৫ দ্র জোড়াসাঁকোর ধারে। ১৫১-৫২

১ ধর্মমহাসভা-সংক্রান্ত অধিকাংশ তথ্য অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড [৩য় মুদ্রণ, ১৩৮৬] থেকে গৃহীত।

নির্দেশিকা

ব্যক্তি

গ্রন্থ ও পত্রিকা

[পত্রিকার নাম বক্রাক্ষরে]

শিরোনাম

কবিতা ও গানের প্রথম ছত্র

বিবিধ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	৪৩	প্রতিষ্ঠা হয় । 1852-তে,	প্রতিষ্ঠা হয় 1852-তে,
৫০	২৩	মুণালিনী	মৃণালিনী
৬৮	৩০	ওই-যে জন্মের প'ড়ে	ওই-যে জন্মের তরে
৭১	২৮	itwouldbe	it would be
৮২	৩৩	অনুমানের কারণ ঐর	·অনুমানের কারণ । ঐর
৯৮	২৮	তার	তাঁর
১২৯	৪০	কৌতুকজীবন	কৌতুকজনক
১৩৭	২৪	[1889	[1889]
১৪৪	২০	Kavyabagish]	Kavyabisharad]
১৪৫	৩৮	little	title
১৪৬	৩৭	art in this work the Babu dramatized	art. In this work the Babu has dramatized
১৪৬	৩৯	upon tha of the novel.	upon that of the novel.
১৪৯	৩০	ambitions	ambitious.
১৫৪	১৫	2-3 Sep ও	2-3 Sepও
১৫৪	৪২	Suezcanal-এর মধ্যে	Suez Canal—এর মধ্যে
১৫৭	৪১	পথে লিখেছেন : (··· সেখানে	পথে লিখেছেন : '···সেখানে
১৫৯	৪৩	২৫-২৬	২৫-২৬] ।
১৬১	৪০-৪১	[Ms 128] আছে । '২৭-১০-৯০ সোমবার Red Sea—	[Ms 128] আছে '২৭-১০-৯০ সোমবার Red Sea'—
১৬৩	৯	নীতিন্দ্রনাথ	নীতীন্দ্রনাথ
২০৯	১০/১৬	[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]	[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ][১]
২০৯	২২	কার্য্য সম্পাদন করেন ।'[১]	কার্য্য সম্পাদন করেন ।'
২১৮	২-৩	জীবনের আনন্দ করি	জীবনের আনন্দ লাভ করি
২২৩	৩৫	···যেমন ব্যাসাত !' আমরা আগেই বলেছি,···	'আমরা' শব্দ থেকে নূতন অনুচ্ছেদ হবে
২২৪	৪০	রাগিনীতে	রাগিণীতে
২২৬	৮	ডায়ারি	ওয়ারি
২২৬	২০	তথাকর্ত্তব্য	যথাকর্ত্তব্য
২২৮	৫	*সাধনা*, *ভাদ্র* ১২৯৯	*সাধনা*, *শ্রাবণ* ১২৯৯
২৩১	১৭	রীতিতে	রীতিকে
২৩৯	৪২	দেনা	দেশ
২৪৪	৩৩	সমাজিক	সামাজিক
২৪৯	৩১	···পরিলক্ষিত হয় । 'সুভা ···	'সুভা' শব্দ থেকে নূতন অনুচ্ছেদ হবে
২৫০	৩২	'য়ুরোপ-প্রবাসী পত্র'-এর	'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-এর
২৫৩	১০	লেখার	লেখায়
২৬২	২	মহির্ষ-ভবনে	মহর্ষি-ভবনে

২৮২	৫	অক্ষয়চন্দ্র	অক্ষয়কুমার
২৮৩	২১	'ছোট গল্প'	এই নামটি বাদ যাবে